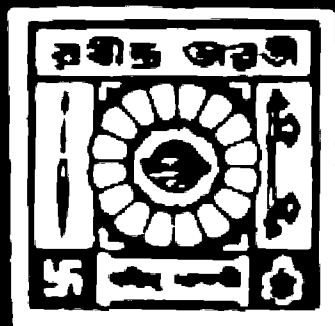


ସ୍ଵର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାସିକା



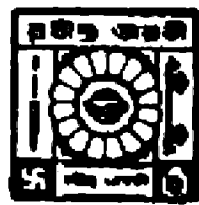
ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଦ୍ଵିତୀୟ ମଂସୀ

ବୈଶାଖ-ଆଶାଢ଼ ୧୯୭୧

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭ • এপ্রিল-জুন ১৯৭০

সম্পাদক
সম্মেলনায় মল্লিক

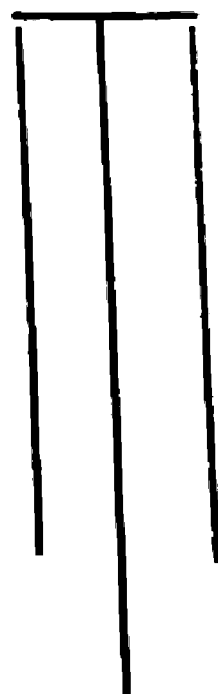


রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেন কলিকাতা ৭

শুনহ মানুষ ভাই—

সবার উপরে স্বদেশ সত্য

তাহার উপরে নাই ।



শ্রী স র স্ব তী প্রেস

লিমিটেড

কলিকাতা-৯

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

মানিকামা ও অমৃত্যু বিষয় বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশনার স্থান : ৬/৪ হারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭
২. প্রকাশের কাল : ত্রৈমাসিক
৩. মুদ্রক : ভবরঞ্জন দে (ভারতীয়)
৬/৪ হারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭
৪. প্রকাশক : ভবরঞ্জন দে (ভারতীয়)
৬/৪ হারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭
৫. সম্পাদক : র মল্লনাথ মল্লিক (ভারতীয়)
৬/৪ হারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭
৬. স্বত্বাধিকারী : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ হারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭

আমি, ভবরঞ্জন দে, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

স্বাঃ ভবরঞ্জন দে

ঋগ্বেদ

মূল, পদবিভাগ, অঙ্কুর, অনুবাদ ও শব্দার্থ ব্যাখ্যাসহ সমগ্র ঋগ্বেদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ১০০ খণ্ডে সমগ্র ঋগ্বেদ সম্পূর্ণ হইবে। সম্প্রতি ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রখ্যাত পত্রপত্রিকা ও পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য তিন টাকা। একশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২৫০ টাকা। চল্লিশ/কুড়ি/দশখণ্ডের অগ্রিম মূল্য যথাক্রমে ১০০/৫০/২৫ টাকা। প্রতি খণ্ড স্বতন্ত্রভাবেও বিক্রয় হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বেদের ছাত্র-ছাত্রীদিগের বিশেষ উপযোগী।

: যোগাযোগের ঠিকানা :

পরিতোষ ঠাকুর, “বেদগ্রন্থমালা”

২২, সদানন্দ রোড, কলিকাতা ২৬

দিন গেল,

সেই বাসন্তী রঙের পঁচিশে বৈশাখের
রঙ করা প্রাচীরগুলো পড়ল ভেঙ্গে !

জীবনের শেষ লগ্নে রবীন্দ্রনাথ নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করেছেন শেষ মণ্ডকের পঁচিশে বৈশাখ কবিতায়। ‘কালের হাতে’ তার “মানসী মূর্তি” বেখে যাওয়ার “অহংকার” ব্যক্ত করেন নি।

কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভা কালজয়ী, রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আলোচনার ধারা শুধু বঙ্গসাহিত্যেই নয় বিশ্বসাহিত্যে পূর্ণোদ্যমে চলেছে।

এই ধারায় আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন :—

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ৬'০০ ॥
ছুই মনীষী : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬'০০ ॥
পিতৃস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬'০০ ॥
পুণ্য স্মৃতি : সীতা দেবী ১০'০০ ॥
রবিচ্ছবি : প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ৬'০০ ॥
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু : ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬'০০ ॥
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও সাধনা : সুনীলচন্দ্র সরকার ৬'০০ ॥
রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায় : ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ ৮'০০ ॥
রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪'০০ ॥
নৌকাডুবির পরে : হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৪'০০ ॥
রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ : শ্রীগৌরীপ্রসাদ ঘোষ ৭'০০ ॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কিত

কবিকণ্ঠ : সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য ৪'০০ ॥
রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ : প্রফুল্লকুমার দাস ১ম খণ্ড ৫'০০, ২য় খণ্ড ৫'০০ ॥
রবীন্দ্র সঙ্গীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা : কিরণশশী দে ১'০০ ॥

জিজ্ঞাসা প্রকাশন বিভাগ

১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

নিয়মাবলী

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি ছাত্র্যাব্দী এপ্রিল জুলাই ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয়।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক গ্রাহক টাকা চার টাকা। 'সার্টিফিকেট অব পোস্টিং' বেখে গ্রাহকের দায়িত্বে পাঠানো হয়। রেজিষ্ট্রি ডাকে মাত্র টাকা।

সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থসমালোচনার জন্যে দু'কপি পুস্তক পাঠাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বিক্রয়কেন্দ্রে, বিভিন্ন পত্রিকাস্টলে এবং পত্রিকা সিন্ডিকেট অফিসে (১২/১ লিওনে স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬) খুচরা সংখ্যা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৫ বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-৫২৪১

কবিগুরুর জন্মদিনে

জেনারেলের প্রদর্শ্য

ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী, এম.এ., ডি. ফিল রচিত

রবীন্দ্রসংগীত

লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ
সংগীতের প্রভাব

॥ দাম ১২.০০ ॥

জেনারেল প্রিন্টার্স ব্যাণ্ড পারিসার্স
প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট

। কলিকাতা-১২ ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

ঃ প্রাপ্তিস্থান :

পাতিরাম, কলেজ স্ট্রিট

ও

অগ্রাণ্ড পত্রিকা স্টলে

ঃ কস্মেকটি মূল্যবান গ্রন্থ :

রবীন্দ্র-নাট্যধারা

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ১০.০০

সাধনা ও সংস্কৃতি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪.৫০

ঐশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য

সঞ্জীবকুমার বসু ৮.০০

স্মৃতিষয় অতীত

সঞ্জীবকুমার বসু ৪.০০

বাংলা কাব্য পাশ্চাত্য প্রভাব

ডক্টর উজ্জলকুমার মজুমদার ১২.০০

আধুনিক বিশ্ব-নাট্যপ্রতিভা

অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০.০০

ঃ প্রাপ্তিস্থান :

বইপাড়ার সমস্ত দোকান

সংস্কৃতি প্রকাশন

১০ হেটস স্ট্রিট কলিকাতা ১ ফোন ২৩-২২০০

প্রকাশিত হল

দ্বিতীয় সংস্করণ

রমেশ রচনাবলী

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। রমেশচন্দ্র দত্তের চরিত্র উপস্থাপন একত্রে: বঙ্গবিজ্ঞান, মাধবীকল্প, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সমাজ ও সংসার-কথা। এই সংস্করণে 'সংসার-উপস্থাপনের পরিবর্তে' লেখকের জীবদ্দশার সংশোধিত 'সংসার-কথা' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [ট্য: ১৩'০০]

রচনাবলী সিরিজের অন্য বই

গিরিশ রচনাবলী

ড: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ড: দেবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে ২১টি নাটক ও প্রহসন: [ট্য: ২০'০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপস্থাপন (মোট ১৪টি) [বঙ্গ] দ্বিতীয় খণ্ডে উপস্থাপন ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য-অংশ। [১৭'০০]। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি রচনা [ট্য: ১৫'০০]

বিজ্ঞান রচনাবলী

ড: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা। প্রথম খণ্ডে (৫টি নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা ও গানের গ্রন্থ ও ২টি গল্পরচনা) — ট্য: ১২'০০। দ্বিতীয় খণ্ডে (৮টি নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা গ্রন্থ, ২টি গল্পরচনা ও ইংরেজি কবিতা) — ট্য: ১৫'০০।

মধুসূদন রচনাবলী

ড: কেএ ওয়াশিংটন সম্পাদিত। একটি খণ্ডে ইংরেজি-সহ সমগ্র রচনা (৪টি কাব্যগ্রন্থ, ২টি কবিতাবলীর গ্রন্থ, ৭টি নাটক ও প্রহসন, ৮টি ইংরেজি রচনা) — ট্য: ১৫'০০।

দীনবন্ধু রচনাবলী

ড: কেএ ওয়াশিংটন সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সমগ্র রচনা (৮টি নাটক ও প্রহসন, ২টি গল্প-উপস্থাপন, ৩টি কাব্য ও কবিতা গ্রন্থ) — ট্য: ১৩'০০।

প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড: কলিকাতা ৯

গল্পসংগ্রহ

প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতাব্দী উপলক্ষে তাঁর 'গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত হয়েছে লেখকের আলোকচিত্র-সংকলিত। মূল্য ১০.০০, শোভন সংস্করণ ১২.০০

প্রবন্ধসংগ্রহ

বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ধসংগ্রহের দুই খণ্ডে সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ১৬.০০, শোভন সংস্করণ ১৮.০০

॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাক্ষ্যলাভ করেছেন - এই গ্রন্থে তা আলোচিত হয়েছে। ২.০০

অবস্থান ও ভাববস্তু বিচার

ফ্রেমিস হার্বার্ট ব্রেডলির Appearance and Reality গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। ৮.০০

আত্মজীবনী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহর্ষি-রচিত এই মূল্যবান গ্রন্থখানিতে অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ১২.০০

পূর্ণকুস্ত ॥ শ্রীরানী চন্দ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরীর ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত। ৫.০০

হিমাঙ্গি ॥ শ্রীরানী চন্দ

কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুস্ত' গ্রন্থের ন্যায় স্থপাঠ্য। ৫.০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

*MAKE 1970—IEY, a year of
Education through better books*

PRABAD RATNAKAR

by (A Treasury of Proverbs)
Satya Ranjan Sen

Vols I, II, III & IV (each) Rs. 3 50
Combined Edition Rs. 15 00

A dependable work of reference
designed primarily for the use
of students and writers of
Bengali, the foreign learner will
find in it a cyclopaedia of
Bengali Proverb, phrase and
idioms.

MAN O SHIKSHA

by Jnanendra Das Gupta and
Sarama Das Gupta Rs. 8'25

MONOVIDYA

by Indra Kumar Roy Rs. 4'25

BON JUNGLE O SHIKARER KATHA

by Bhupendra Ch. Sinha
(of Susanga) Rs. 8'00

ORIENT LONGMANS Ltd.

17 Chittaranjan Avenue
CALCUTTA-13

BOMBAY MADRAS NEW DELHI

THE NEW OXFORD HISTORY OF MUSIC

The whole work, which will be completed
in eleven volumes, has been planned as a
complete survey of music from the earliest
times down to the present day, including
not only the achievements of the Western
world but also the contributions made by
Eastern civilizations and primitive societies.

Volume I

ANCIENT AND ORIENTAL MUSIC

Volume II

EARLY MEDIEVAL MUSIC UP TO 1300

Volume III

ARS NOVA AND THE RENAISSANCE
(1300-1540)

each 70s

Volume IV

THE AGE OF HUMANISM (1540-1630)

140s

V-XI in preparation

Percy A. Scholes

The Oxford Companion
To Music

A Full Encyclopaedia of music
in one volume

9th edition 84s

Phyllis Hartnoll

The Oxford Companion
To The Theatre

3rd edition 84s

Heinrich Zimmer

Myths And Symbols

In Indian Art And Civilization

Edited by Joseph Campbell

\$6'50

OXFORD

University Press

ববীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

সূচীপত্র

চিঠিপত্র	ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২
ববীন্দ্রনাথের আনন্দসীমাংসা	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
ববীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা	আন্ততোষ ভট্টাচার্য	১১৭
ববীন্দ্রনাথের মানবিকতা	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৫
ববীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা	উমা রায়	১৩৪
ববীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরস্বহরীদের গবেষণা	সত্যেন্দ্রনাথ রায়চন্দ্র মজুমদার	১৬০
ববীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি	অজিতকুমার ঘোষ	১৭৬
গ্রন্থসমালোচনা	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫
	পীযুষকান্তি মহাপাত্র	১৮৮
	ক্ষেত্র গুপ্ত	১৯১
সম্পাদকীয়		১৯৪
চি ত্র নু চী		
স্বপ্রতিকৃতি	ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর	

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

THE HOUSE OF THE TAGORES

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ও পরিজনবর্গের বহুশ্রী প্রতিষ্ঠার পরিচয়বাহী বহুতথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থের পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ২'০০

STUDIES IN AESTHETICS

প্রবাসজীবন চৌধুরী

বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সৌন্দর্যবর্ণন, শিল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পানুভূতি, কীটসের সৌন্দর্যচেতনা, ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোকে মেটো ও অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত। মূল্য ১০'০০

TAGORE ON LITERATURE AND AESTHETICS

প্রবাসজীবন চৌধুরী

সৌন্দর্যবর্ণনের আলোকে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের গভীর আলোচনা। ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত। মূল্য ৮'০০

A CRITIQUE OF THE THEORIES OF VIPARYAYA

ননীলাল সেন

ভারতীয় বর্ণনশাস্ত্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা সমস্যা হল 'বিপর্যয়'। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় বর্ণনের তথ্যসমী-মাত্রেরই সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ১৫'০০

STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY

মানস রায়চৌধুরী

সঙ্গীত-শিল্পীদের ব্যক্তিগতজীবনে স্রস্রসাধনার প্রভাব ও মানসিক পরিমণ্ডল বিষয়ে তথ্যবহুল বিশ্লেষণ। মূল্য ১৫'০০

INDIAN CLASSICAL DANCES

বালকৃষ্ণ মেনন

ভারতীয় নৃত্যকলার বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ-কলা নির্দেশিত। বহু চিত্রসুচিত। মূল্য ২৫'০০

REFORM AND REGENERATION IN BENGAL, 1774-1823

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১৬'০০

SOCIOLOGY OF PLANNING

শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১৫'০০

রবীন্দ্র-স্মৃতিস্মিত

রবীন্দ্র-রচনার উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতিসম্ভার।

মূল্য ১২'০০

চৈতন্যোদয়

হরিশচন্দ্র সান্যাল

মানবজীবনের চেতনা-উদ্বোধনের শাস্ত্রীয় পথালোচনা। মূল্য ২'৫০

জ্ঞানদর্পণ

হরিশচন্দ্র সান্যাল

নীতিশাস্ত্র ও ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে তথ্যবহুল আলোচনা। মূল্য ৩'০০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

রবীন্দ্র-রচনার মৃত্যুজিজ্ঞাসার বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ৬'০০

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পদাবলী ও রবীন্দ্র-কবিত্বপ্রতিষ্ঠার আলোচনা। মূল্য ৫'০০

গান্ধীমানস

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন

ও নির্মলকুমার বসু

গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মূল্য ৩'০০

সঙ্গীতচল্লিক

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরলিপি-সহ মূল্যবান গ্রন্থের দুইখণ্ড একত্রে প্রকাশ। মূল্য ১৫'০০

শিল্পতত্ত্ব

বেনিডেটো ক্রোচে

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য-অনূদিত ক্রোচের 'শিল্পতত্ত্ব' ও 'শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়ের একত্রে প্রকাশ। মূল্য ১৫'০০

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিশ্ব

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মূল্য ৩'০০

স্বাক্ষরকানাথ ঠাকুরের জীবনী

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ৫'০০

। বহুদ্র।

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-২ ও ১০৬এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২২



100-15
100-15

চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

87 Alfred Place West
South Kensington
London S. W.,
1 May 1918

প্রকাশ্যদেবু

লওনে ফিরিয়া আসিয়া বুবা এবং প্রশান্ত দুইজনের সঙ্গেই বেথা হইয়াছে। বুবা আমাদের বাসার কাছাকাছিই থাকে এবং প্রশান্তও বোধ হয় আজকালের মধ্যে এই পাড়ায় আসিয়া আশ্রয় লইবে। এখানকার দুই চারিজন ভাললোকের সঙ্গে যাহাতে বুবার আলাপ পরিচয় হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিব। বাহিরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস একেবারেই নাই বলিয়াই এখানকার লোকদের সঙ্গে আলাপ করা আমাদের ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সকলেই বাসার মধ্যে পড়িয়া পড়া মুখস্থ করে—দেশকে এবং দেশের লোককে চেনে না। সে হিসাবে আমাদের কালীমোহন ইংরেজি শিক্ষায় যথেষ্ট কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও এখানকার অনেক ভাল লোকের দলে মিশিতে পাড়িয়াছে এবং তাহাদের কাছ হইতে সকল বিষয়েই উপকৃত হইয়াছে।

Race Conflict প্রবন্ধটি আপনাদের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছি তাহার মধ্যে একটি *Hibbert Journal* ও একটি *Quest* পত্রিকায় দিয়াছি। এই দুটি পত্রই *Quarterly* স্বতরাং জুলাই মাসে বাহির হইবে। এখনো এ প্রবন্ধগুলি এখানকার কেহ দেখে নাই। আগামী ১৯শে মে তারিখ হইতে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বক্তৃতা *Quest Society*র সভায় পাঠ করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছি। অর্থ ও খ্যাতির লোভে রূপণতা করিতে ইচ্ছা করি না—অতএব প্রথম প্রবন্ধটি *Modern Review*র জন্য পাঠাইতেছি। এটি *Chicago University*তে প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ইংরেজির কোনো গলদ থাকে দৃষ্টি রাখিবেন—কেননা ইংরেজি ভাষাটা আমি না জানিয়া আন্দাজে লিখি। এ প্রবন্ধগুলি আমি কানের অভ্যাসে লিখিয়াছি এবং এ দেশের শ্রোতারা কানে শুনিয়া ভাল বলিয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার উপরে ইন্সল মাষ্টারী চোখ পড়ে নাই। একজন ইংরেজ একবার চোখ বুলাইয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র গোটাকতক *artical*এর বাহ্যাবর্জন ও অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকটা অব্যয় প্রয়োগের ভ্রুটিও মার্জনা করিয়াছেন। অতএব অনুমান করিতেছি একেবারে চমক লাগাইয়া দিবার মত ভুল ইহাতে নাই।

চৈত্রমাসের প্রবাসী আমি এখনো পাই নাই—বোধ করি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়া গোলমালে মারা গিয়াছে। বাংলা লেখা অনেকদিন বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছি। ইংরেজিও যে বিস্তর লিখিতেছি তাহা নহে। নিতান্তই কুঁড়েমিতে ধরিয়াছে। বোধ করিতেছি এটা অনাবশ্যক কুঁড়েমি নয়।

শান্তা সীতাকে আমার নববর্ষের আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি ১৮ই বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তরের মধ্যে ঐক্যের চেতনা হচ্ছে মানুষের জগতের স্বলক্ষণ, তার বিশেষত্ব। প্রকৃতির রাজ্যে কিংবা জীবজগতে এই চেতনার অস্তিত্ব নেই। এই ঐক্যবোধ, ঐক্যের এই অজ্ঞানিহিত চেতনা মানুষের অন্তরে দীপ্যমান থাকায় মানবজীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা হচ্ছে যে কি করে জীবনের ব্যক্তিগত অংশের সঙ্গে জীবনের বিশ্বজনীন ভূমিগত অংশের যে বিরোধ আছে সেই বিরোধের অবসান ঘটানো যায়।

বিজ্ঞান এই সমস্যার সমাধান ক'রে ব্যক্তিগত অংশকে সমষ্টিগত সাধারণ অংশের মধ্যে বিলীন করে। ব্যক্তিগত অংশের সত্যতা ও যাথার্থ্য অস্বীকার ক'রে এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে দর্শন। মানুষের এই ব্যক্তিগত দিকের সঙ্গে তার বিশ্বগত ভূমিস্পর্শী দিকের যে কোনো বিরোধ নেই, সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দুয়ের মধ্যে যে ঐক্য বিদ্যমান, সেটা প্রমাণ করে শিল্প ও সাহিত্য। ঐক্যের এই প্রবল অমুভূতি ও চেতনা হচ্ছে শিল্পীর পরম ঐশ্বর্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'It is some untold mystery of unity in me, that has the simplicity of the infinite, and reduces the immense mass of multitude to a single point.'

আমার মধ্যে ঐক্যের একটি রহস্য আছে যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই ঐক্যের মধ্যে আছে অসীমের সহজতার আর এই ঐক্য বিরাট অসংখ্যকে এক বিন্দুতে পরিণত করে।

শিল্পের ও সাহিত্যের যে বিশেষ জগৎ আছে সেই জগতের স্বলক্ষণগুলি কি কি আর তাদের মর্মই বা কি—এই হচ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়। আর সাহিত্যের এই স্বলক্ষণগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা সেইটেই বিশেষ ক'রে দেখানোর চেষ্টা করবো।

সাহিত্যজগতে এক অভূতপূর্ব প্রকাশ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিকে অনন্তসাধারণ শিল্পশ্রষ্টাদের তিনি অন্ততম, অন্যদিকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃজনক্ষানীদের মধ্যেও তিনি একজন। যিনি সাহিত্যশ্রষ্টা তিনি সাহিত্যনীতি সম্বন্ধে পারদর্শী নাও হতে পারেন। সাহিত্যশ্রষ্টা হচ্ছেন ঐক্যসাধক, সাহিত্যনীতিজ্ঞ হচ্ছেন বিশ্লেষণক্ষম। শ্রষ্টা হচ্ছেন আনন্দ ও রসের অধিকারী, বিশ্লেষক হচ্ছেন বিচারবুদ্ধির অধিকারী। এই দুই ভিন্নমুখিন্ গুণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্চর্যরূপে প্রকাশমান।

আলোচনা শুরু করবার আগে আমার এই প্রবন্ধের শিরোনামা সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। ইংরেজি শব্দ aesthetics এর বাংলা আমি করেছি আনন্দমীমাংসা। আনন্দ থেকেই সব সৃষ্টি, সাহিত্যেরও উৎস হচ্ছে আনন্দ। আনন্দ থেকে উৎসারিত হয়ে তার কোন পথ ধরে সৃষ্টির রূপ নেয়, সেই ভাবের প্রকৃতি কি, আনন্দ থেকে উদ্ভূত রসই বা কি বস্তু—এই সবের আলোচনাই হচ্ছে aesthetics বা আনন্দমীমাংসার কাজ। যুরোপ aesthetics কে সৌন্দর্যতত্ত্ব হিসেবে দেখেছে। সৌন্দর্যবোধ থেকেই সৃষ্টি এটি যুরোপীয় ধারণা আর আনন্দ থেকে সৃষ্টি এটি ভারতীয় ধারণা। তার পরে এটি একটি তত্ত্ব নয়, অর্থাৎ শেষ কথা নয়, এটি মীমাংসা। এটি একটি পদ্ধতি, একটি বিচার। তাই aesthetics এর বাংলা আমি করেছি—আনন্দমীমাংসা।

সাহিত্য বস্তুটি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে সাহিত্য হচ্ছে দ্রষ্টা আমির প্রকাশ। এই দ্রষ্টা বিস্তৃত দ্রষ্টা। ব্যবহারিক মন নিয়ে সে কোনো কিছুকে দেখছে না, দেখার বস্তুটিকে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করার কোনো অভিপ্রায় দ্রষ্টার নেই। নিরামৃত ও শুদ্ধ মন নিয়ে সে বস্তুটিকে দেখছে, আর বস্তুটির প্রকৃত সত্তার সঙ্গে দ্রষ্টার প্রাণের মিলন ঘটছে ও বস্তুটির প্রাণরস আবাদন ক'রে সে আনন্দ পাচ্ছে। এই বিস্তৃত দ্রষ্টার, এই বিস্তৃত আমির প্রাণের আনন্দের প্রকাশ হচ্ছে সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট।’ বলছেন—‘আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেকুয়া নদীর শাড়ি পরে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে আমি তাকে দেখছি। এখানে আমি বিস্তৃত দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটি যদি নিজেকে ভাষায় বা বেথায় প্রকাশ করতো তা হলে সেইটেই হ'ত সাহিত্য, সেইটেই হ'ত আর্ট।’ আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘ভাবকে নিজের কবিতা সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই সঙ্গিতকলা।’

এই মতটিকেই ম্যান্লিম গার্কি প্রকাশ করেছেন এইভাবে—Man is confronted with the task of finding himself, his own subjective attitude to life to people to a given fact, and of clothing it in forms of his own, in words of his own.’

সাহিত্য এই আমির প্রকাশ, একটি বিশেষ দ্রষ্টার অহুত্ব একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশ। এ সাহিত্য কখনো সমষ্টির প্রকাশ হতে পারে না, এটি ব্যক্তির ভাবের প্রকাশ। এই আমিটি তার বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বাইরের প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে দেখে ও তার প্রাণের বিশেষ রস দিয়ে তাদের সিক্ত করে। তার ফলে, সে বিশেষ ভাব অহুত্ব করে ও সেই ভাবকে যে রূপ দেয় সেও একটি বিশেষ রূপ যা অন্য কেউ দেয় নি। এই আমির চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখার অপরিমিত কৌতূহল আমাদের মনে আছে। আর প্রতিটি আমির দেখা অন্য আমির দেখা থেকে স্বতন্ত্র বলেই অনন্ত আমির এত বিচিত্র প্রকাশ সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে কিন্তু তাহার মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে, নিজের একটা রূপের পায়ে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।’

সাহিত্যদ্রষ্টা যা কিছু দিচ্ছে সে সব তো বিশেষ রয়েছে, তা হলে তার দেওয়ার বাহাদুরীটা কোথায়? বাহাদুরীটা হচ্ছে এইখানে যে বিশ্বের সর্বত্র ছড়ানো উপাদানগুলিকে সাহিত্যদ্রষ্টা যখন দেখে তখন তাদের মধ্যে থেকে যা সে নেয় সেটাকে শুধু ঝড় ভাবে সে নেয় না, সেটাকে সে নিজের ক'রে নেয়। এই নিজের ক'রে নেওয়ার মধ্যে শিল্পীর মনের ভাব ও রসের একটি প্রক্রিয়া আছে। এই দেখাটা হচ্ছে আনন্দের দেখা, বিশ্লেষণের দেখা নয়; ও নিজের ক'রে নেওয়াটা হচ্ছে ভাবের রসে বস্তুটিকে আবিষ্কারে নেওয়া, বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা নয়।

এই ভাবের রসে বস্তুর সঙ্গে নিজের ঐক্যসাধন করতে পারলে সৃষ্টি আসে। যে শক্তির সাহায্যে আমরা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে আমাদের মনের মিলন ঘটাই দেই শক্তিটি হচ্ছে কল্পনাশক্তি। কল্পনাই হচ্ছে তাই সেই ঐক্যসাধক শক্তি যার ভিতরে সব কিছুর সঙ্গে মেলবার একটা অদম্য ইচ্ছা আছে আর মেলবার শক্তিও আছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি।’

কল্পনা শক্তির কাজটা কি সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না, তখন কল্পনা আপনার সত্য প্রকাশ করে।’

‘কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক’রে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক’রে তাকে মনোময় ক’রে তুলতে পারে।’ এই ভাবে বিশ্বের অক্ষরস্ত বস্তু-উপাদান ব্যক্তির স্বকীয় ভাবরসে-সিক্ত হয়ে ও কল্পনার দ্বারা ব্যক্তির সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে সৃষ্টির দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে। একমাত্র কল্পনার সাহায্যেই মানুষ সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে ও তাদের রস উপভোগ করে। সব কিছুর স্বাদ পাওয়ার জন্যে, উপলব্ধি করার জন্যে মানুষের অন্তরে একটা তৃষ্ণা ও অনন্ত বিবহ আছে। মানুষ চায় ফুলের সঙ্গে ফুল হতে, পাখির সঙ্গে পাখি হতে, আকাশ হতে, নদী হতে, পাহাড় হতে, সব কিছুর সঙ্গে এক হয়ে যেতে। এইটে সম্ভব করে কল্পনা। আর কল্পনার বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ ক’রে মানুষের যে আত্মা-উপলব্ধি তাকেই বলে লীলা।

রবীন্দ্রনাথের মতে লীলা হচ্ছে—‘কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি।’ (অবতরণিকা, সাহিত্যের পথে) এই লীলার দৌলতে অর্থাৎ কল্পনার সিংহাসন দিয়ে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ ক’রে তার সত্তার সঙ্গে এক হবার সুযোগ আছে বলে মানুষ দুঃখের অন্তরেও প্রবেশ ক’রে তার রসান্বাদন করে। মানুষ জীবনে যে দুঃখ এড়াতে চায় লীলার সেটাকে উপভোগ করে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হ’ত বুক যেতো ফেটে।’ আর এই লীলা বাইরের জীবনের কোনো কাজে আসে না। লীলা দিয়ে নিজের কাজ শুদ্ধিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় একেবারে। লীলার খেলাঘর হচ্ছে অন্তরের মধ্যে, তার এলাকা হচ্ছে ভাবের এলাকা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—‘মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে—একটা প্রয়োজনের, আর-একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে, লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের করমাশে এই প্রয়োজনের আসর সবগরম হয়ে ওঠে। ভিতরের করমাশে লীলার আসর জমে।’ (পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী)

আগেই বলেছি যে সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তির বিশেষ অতুভূতির রঙে রাঙানো একটি সৃষ্টি আর তাই এত বিশ্বাসকর বৈচিত্র্য তাতে। এখন একজন ব্যক্তি তার নিজের অতুভূতির প্রকাশ দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করে কি ক’রে? কালিদাস, সেন্সপীয়ার, গোয়েটে, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের রচনা পড়ে লক্ষ লক্ষ পাঠক যে বলে—হ্যাঁ, এতো আমাদেরও মনের কথা। আমরা বোবা, আমরা প্রকাশ-শক্তিবহীন, এঁরা আমাদেরই মনের কথা প্রকাশ ক’রে দিয়েছেন—সেটা কি ক’রে সম্ভব হয়?

সম্ভব হয় এই জন্যেই যে সাহিত্যের মধ্যে যে আমির প্রকাশ, সেই আমির ব্যক্তিস্বতন্ত্র গভীর অতুভূতি, তার ব্যক্তি-স্বতন্ত্র নিবিড় রস-উপলব্ধি যখন রূপ নেয়, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে তখন বিশ্বজনীন রূপ নেয়। সৃষ্টির রহস্য এমনি। যা একান্তভাবে ব্যক্তির রসোপলব্ধি তা সকলের ভাবের ও রসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যে যে আমির প্রকাশ সেই বিশুদ্ধ আমির ও ভ্রষ্টা আমির নির্মল অতুভূতি ও ভাব যদি সফল রূপ নেয় তো সে সকলের প্রাণ স্পর্শ করবেই করবে অর্থাৎ সে প্রকাশ বিশ্বজনীন হবে। আমাদের দেশের অলঙ্কার শাস্ত্রের আচার্যেরা ব্যক্তির অতুভূতির প্রকাশকে বিশ্বজনীন রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে

‘সাধারণীকৃত’ বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘The Religion of An Artist’ গ্রন্থে সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন—‘It is a creation of a uniquely personal and yet universal character.’ অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে একাধারে একান্ত ব্যক্তিগত ও বিশ্বজনীন সৃষ্টি।

সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তির যে প্রকাশ সেই প্রকাশটির প্রকৃতি কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এই ‘প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে আমরা সকলেই বলতে পারি—এ যে আমার।’

কিন্তু এই প্রকাশটি কিসের প্রকাশ? প্রকাশটি অন্তরের ঐশ্বর্যের প্রকাশ। নিঃস্বতা থেকে প্রকাশ আসে না, প্রকাশ আসে অন্তরের পরিপূর্ণতা থেকে, তার আত্মার মহিমা থেকে। আর এই পরিপূর্ণতার আর আত্মিক মহিমার উৎস হচ্ছে—ঐক্যবোধ, বিশ্বাত্মবোধ। যথার্থ মিলনের ফলে এই ঐশ্বর্যের সৃষ্টি। আর এই ঐশ্বর্যসুধা উপচে পড়ে অন্তরের পেয়ালার থেকে। একে অন্তরের মধ্যে বন্দী ক’রে রাখার সাধ্য নেই কারো।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘অন্তের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য। সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে প্রকাশ নেই।’ বলেছেন—‘যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিন্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোথাগারে কোথাও সে আর ধরে রেখে দিতে পারে না। সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই।’

কিন্তু মানুষের অন্তরের প্রতিটি ভাবই কি তার ঐশ্বর্য? না, যে ভাবগুলি তার প্রতিদিনের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার কাজে লাগে সেগুলি নিঃশেষ হয়ে যায় প্রয়োজন পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে। যে ভাবগুলির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রয়োজনের তাগিদে নয়, ব্যক্তির স্বকীয় প্রয়োজনের এলাকার বাইরে যে অসীম ভাবজগৎ আছে যে ভাবগুলি সেই জগতের বাসিন্দে, সেইগুলিই অন্তরের ঐশ্বর্য। সেগুলি একাধারে ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত। একমাত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেটি ব্যক্তিগত সেটি বিশ্বগত হতে পারে।

ঐশ্বর্যের প্রকাশ সৃষ্টিতে, ঐশ্বর্য না থাকলে সৃষ্টি সম্ভব নয়—এইটে স্বীকার ক’রে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে—সৃষ্টি বলতে সঠিক ভাবে বোঝায় কি? কতকগুলি মালমশলা জড়ো ক’রে সেগুলি দিয়ে যেমনতেমন ক’রে একটা কিছু খাড়া ক’রে তুলতে পারলেই কি সৃষ্টি হ’ল বলে দাবি করা চলবে? সৃষ্টি কি নিছক মালমশলার মিশ্রণ, শুধু উপাদানগুলির সমষ্টি, তার নিজস্ব সত্তা বলে কি কিছুই নেই?

মালমশলার সমষ্টিমাত্র নয় সৃষ্টি। কতকগুলি রঙের মিশ্রণ নয় ছবি, সমস্ত রঙের মিশ্রণের অধিকন্তু আরো কিছু হচ্ছে ছবি। প্রতিটি রঙের মধ্যে ছবি নেই, আবার সমস্ত রঙগুলির এলোপাখাড়ি মিশ্রণের মধ্যও ছবি নেই। সমস্ত রঙগুলি মিশিয়ে একটি অখণ্ড সমগ্র রূপ তৈরি করাই হচ্ছে ছবির জগতের সৃষ্টি। যেই সেই সৃষ্টি হ’ল তখন সেই সৃষ্টি তার সমস্ত মালমশলা ও উপাদানকে ছাপিয়ে তার নিজস্ব মহিমায় দীপ্যমান হয়ে উঠলো। অখণ্ড রূপের অনুরূপতায় মধ্যস্থ ছবির জন্ম, মালমশলার মধ্যে নয়। অফুরন্ত শব্দের ভাণ্ডার থেকে কবি যখন কতকগুলি শব্দ নিয়ে কবিতা রচনা করেন তখন তিনি শব্দগুলিকে এমন ক’রে সাজান যাতে সেই শব্দগুলির মধ্যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে এমন একটি ভাবের সৃষ্টি হয় যে ভাবটি একটি পদের প্রতিটি শব্দকে মনন করেও পাওয়া যাবে না। সমস্ত শব্দার্থ ছাপিয়ে একটি ব্যঙ্গনা প্রাণকে স্পর্শ করে যেটি শব্দাতীত। একেই আচার্য্যেরা ‘ধ্বনি’ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

গানের বেলাতেও সেই একই কথা। সাতটি স্বরের প্রত্যেকটি আলাদা স্বরের মধ্যে ভৈরবী কিংবা সাহানার সন্ধান মিলবে না, কিংবা স্বরগুলির যেমন তেমন সংযোজনেও ভৈরবী আবির্ভূত হবেন না স্বরলোকে। স্বরগুলি দিয়ে একটি বিশেষ নক্সা রচনা হচ্ছে ভৈরবীতে বা অন্ত যে কোনো রাগে। এই রাগসৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে স্বরকারের মনে রাগরূপের যে একটি অখণ্ড ধারণা আছে সেইটি। এই অখণ্ড ধারণার মধ্যে স্বরসৃষ্টির বীজ নিহিত। স্বরগুলির বিচিত্র ও সার্থক মিশ্রণ এই অখণ্ড ধারণা থেকে নিহত।

তাই অস্তরের মধ্যে বাইরের ও ভিতরের বিচিত্র উপাদানগুলির এক বিশ্বয়কর ঐক্যসাধন না করতে পারলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। সৃষ্টিবহুস্তরের মূলে আছে এই ঐক্যসাধন। এই ঐক্যসাধনের ফলে যে রূপসৃষ্টি হয় সে রূপ উপাদানগুলির মধ্যে আলাদা ক'বে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘বিচিত্রের এই সম্মিলন একটি অখণ্ড রূপের ঐক্য পেয়েছে, তাকেই বলে সৃষ্টি।’ (যাত্রী)

এই যে সৃষ্টি, এই যে প্রকাশ এর মধ্যে মানুষের কোন পরিচয়টুকু আমরা পেয়ে থাকি? বুদ্ধির বাক্সে যে মানুষ অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'বে রেখেছে, তার সেই বুদ্ধির পরিচয় কি পাই সৃষ্টিতে কিংবা যে মানুষ খুব রুত্ব পুরুষ, নানা রকম কর্মে যার কৃতিত্ব আছে, তার কৃতিত্বের পরিচয় পাই সৃষ্টিতে? এ দুয়ের কোনোটার পরিচয় দেওয়ার জন্তে সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি হচ্ছে যে সৃষ্টি করছে তার সেই স্রষ্টা মানুষটির নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্তে। সে মানুষটি যে ভাবে বহির্প্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতিকে দেখছে এবং তার অমুভূতিতে এই বিচিত্র বিশ্ব কিভাবে ধরা দিচ্ছে—সেই বিশেষ দেখা, সেই অনন্ত দেখার পরিচয় পাই সৃষ্টিতে। সেক্সপীয়ারের সৃষ্টিতে সেক্সপীয়ারের পরিচয় পাই। ঐ দেখা, ঐ অমুভূতি, ঐ প্রকাশ একান্তভাবে শুধু সেক্সপীয়ারেরই। অনন্ত কালের অনন্ত মানুষের দেখার মধ্যে ঐ বিশেষ দেখা, ঐ অনন্ত দেখা শুধু একবারই ঘটেছে। আপনার কোন পরিচয়টি দেয় মানুষ সৃষ্টিতে? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘উপলব্ধির পরিচয়, অমুভূতির পরিচয়, বহুর মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করার পরিচয়, বহুর সঙ্গে একাত্মবোধের পরিচয়।’

সৃষ্টিতে ব্যক্তির এই যে আত্মপ্রকাশ, তার প্রকৃত মর্ম কি? তার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশ্বভুবনের প্রতিটি জিনিসকে আমার মন কি ভাবে গ্রহণ করছে তার প্রকাশ। গোলাপ ফুল কি কি উপাদান দিয়ে তৈরি তার কিরিল্পি সাহিত্যের কাজ নয়, গোলাপ ফুলটি আমার মনে কি ভাবের উদ্রেক করলো, হৃদয়ের কি ভাব দিয়ে আমি গোলাপ ফুলটিকে স্পর্শ করলু তারই পরিচয় পাওয়া যায় রসসৃষ্টিতে।

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রভেদ এইখানেই। বিজ্ঞানে মানুষ বিষয়টিকে জানে। গোলাপ ফুল কি কি উপাদান দিয়ে রচিত তার সন্ধান দেয় বিজ্ঞান। আর গোলাপ ফুলটি আমার মনকে কি ভাবে স্পর্শ করেছে, গোলাপ ফুলের সঙ্গে আমি এই ব্যক্তির কি বিশেষ ভাবের যোগ তার প্রকাশ সাহিত্যে। আমিকে বাহ্য দিয়ে সাহিত্য সম্ভব নয়। আর আমিকে বাহ্য না দিলে বিজ্ঞান সম্ভব নয়। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের আরো দু'একটি গোড়া-ঘেঁষা প্রভেদ আছে। সাহিত্য একটি বিশেষ গোলাপ ফুলের সঙ্গে একটি মানুষের ভাবের যোগ প্রকাশ করে। বিজ্ঞান একটি গোলাপ ফুলের বিশেষত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না, জাতি হিসেবে গোলাপ ফুলের কি বিশেষত্ব অথবা কি পার্থক্য তার অন্ত জাতের ফুলগুলির সঙ্গে, সেই পরিচয় দেয়। ব্যক্তি সম্বন্ধে ও ব্যক্তির বিশেষ স্বভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোনো কৌতুহল নেই। জাতির কি স্বভাব, সমষ্টির কি স্বভাব, যজ্ঞজাতির স্বভাব নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। আর সাহিত্যের কারবার হচ্ছে একান্তভাবে ব্যক্তিকে নিয়ে, জাতিকে নিয়ে নয়। যজ্ঞজাতির যেটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য সেটা নির্ধারণ

করতে ব্যস্ত বিজ্ঞান, আর একটি ব্যক্তি, তার কি বিশেষত্ব, কি প্রভেদ তার অন্ত মাতৃবদের থেকে, তার পরিচয় দেওয়ার কাজ নিয়ে আছে সাহিত্য।

সাহিত্যের এই ব্যক্তি কিন্তু শুধু মাতৃব নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে স্থাপ্ত তাই ব্যক্তি। জীবজন্তু, গাছপালা নদী পর্বত সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, ভাবের জিনিস সবই ব্যক্তি।’ বস্তুর এই দুই রূপ আমাদের দেশের অলংকার শাস্ত্রের আচার্যদের নজর এড়িয়ে যায় নি। আচার্য মহিমভট্ট তাঁর ‘ব্যক্তিবিবেক’ গ্রন্থে বস্তু সম্বন্ধে বলছেন—‘বৈরূপ্যমিহবিজ্ঞতে’ অর্থাৎ বস্তুর দুটি রূপ আছে—সামান্য আর বিশিষ্ট—সামান্য রূপ ও বিশিষ্ট রূপ। সামান্য রূপে একটি বস্তু অন্ত বস্তুর সঙ্গে সমান। একটি মাতৃব অন্ত মাতৃবদের সঙ্গে সমান। বিশিষ্ট রূপে একটি বস্তু অনন্ত। তার স্বলক্ষণে সে অন্ত বস্তু থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। একটি মাতৃব তার স্বলক্ষণে অন্ত সব মাতৃব থেকে আলাদা।

বস্তুর এই বিশিষ্ট রূপের সাধনা করে মাতৃব সাহিত্যে, আর তার সামান্য রূপের মর্ম উন্মোচন করার কাজে আছে বিজ্ঞান। কবিরা বস্তুর এই বিশিষ্ট রূপের সাধক, সাধারণ মাতৃব এই নিবিশেষ সাধারণ রূপের সাধক।

সৃষ্টি ও নির্মিতি—এই দুয়ের মধ্যে যে আকাশজমিন পার্থক্য আছে সেটিও আমাদের বুদ্ধিতে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তা কার সাধ্য অনুমান করে! কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে তা সকলেই জানে।’ কোনো কিছু নির্মাণ করি আমরা প্রয়োজনের তাগিদে। ঘর তৈরি করি, কারখানা বসাই, তাঁত চালাই—সবই প্রয়োজনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। কিন্তু যখন গান রচনা করি, ছবি আঁকি, কবিতা লিখি—তখন জৈবিক অভাবের তাড়না দ্বারা চালিত হই না আমরা। গান, কবিতা, ছবি আমাদের ক্ষুধিত উদরের রসদ নয়, তৃপ্ত প্রাণের তৃষ্ণা মেটাবার রসদ। বিশ্বের সঙ্গে মানব-মনের গভীর একাত্মবোধের আনন্দ থেকে এদের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘কবি বল, চিত্রী বল, আপনার রচনার মধ্যে সে কি চায়। সে বিশেষকে চায়। বাতালে যে অঙ্গার-বাষ্প সাধারণ ভাবে আছে গাছ তাকে আত্মসাৎ করে আপন ভাল পালার ফুলে ফলে আপন ছন্দে রঙে অত্যন্ত বিশেষ করে যখন তোলে, তখনই তাতে সৃষ্টিলালা প্রকাশ পায়। নীহারিকার জ্যোতির্বাষ্প একটা একাকার ব্যাপার, নক্ষত্র আকারে বিশেষত্ব লাভ করায় তার সার্থকতা। মাতৃবের সৃষ্টি চেষ্টাও সেই রকম অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে স্থনির্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। (যাজী। পশ্চিম যাজীর ডায়ারী) বিজ্ঞানের ‘সাধারণ’এর সঙ্গে শিল্পের ‘বিশেষ’এর পার্থক্যের কথা তুলে কবি বলছেন—‘বস্তুতত্ত্ব (physics) সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাধারণ, সেটা হ’ল বিজ্ঞানের। আর চেহারা পদার্থটা বিশেষের, সেটা হল আর্টের। বিশেষের বেড়া ডান্ডিতে ডান্ডিতে বিজ্ঞান যখন ব্যাপককে পায় তখন তার সার্থকতা, আর ব্যাপকের পদার্থটা তুলে ধরে আর্ট যখন বিশেষকে পায় তখন সে খুঁসি।’ (যাজী। পশ্চিম যাজীর ডায়ারী) কিন্তু বস্তুর মধ্যে এই বিশেষকে দেখার সার্থকতা কোথায়! মাতৃব এই বিশেষকে খোঁজে কেন বস্তুর অন্তরে? খোঁজে এই জন্মে যে বস্তুর মধ্যে যখন বিশেষের সন্ধান পায় তখন সেই বস্তুটির স্বার্থ সন্তান সন্ধান পায়, বস্তুর মধ্যে

নানা উপাদান ছন্দোবদ্ধ হয়ে যে রূপ নিয়েছে তার হৃদিস তখন পাওয়া যায়। আর এই ছন্দোবদ্ধ রূপ আনন্দ দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশ নিয়ে অশোক আপনাদের মধ্যে একটি সুসংগত বিশেষ ঐক্যকে প্রকাশ করে বলেই তার মধ্যে আমাদের মন একটা পুরো দেখাকে দেখে। ইঠের ঢেলায় আমাদের কাছে সস্তার সেই চরমতা।’

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘নির্মান করা মানে মাপে তৈরি করা অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছু মাপে তৈরি করা—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো কিছু মাপের অপেক্ষা করে না, সে নিজেকে সর্জন করা, নিজেকে প্রকাশ করা।’ বলছেন মহাকবি—‘মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে।’

ভারতবর্ষের সাধকদের বিশিষ্ট উপলব্ধির ফল হচ্ছে সৃষ্টির এই আনন্দ উৎসের সন্ধান লাভ। উপনিষদ বলছেন—‘আনন্দ থেকেই এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে, আনন্দই তাদের জীবিত রাখে, আনন্দের দিকেই তাদের যাত্রা, আনন্দের মধ্যেই তাদের সমাপ্তি।’ ‘আনন্দাঙ্কোব খষিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।’ ঋষি বলছেন—‘কোহোবান্যাং কঃ প্রাণাং যদেষ আকাশ আনন্দোন স্তাং।’ যদি এই আনন্দ না থাকতো আকাশে তা হলে কেই বা জীবিত থাকতো? উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের শেষ কথা হচ্ছে এই আনন্দতত্ত্ব, ব্রহ্মোপলব্ধির শেষ পরিণতি এই আনন্দ-উপলব্ধি। আলংকারিকেরা আনন্দের এই রসাস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলেছেন আর বৈষ্ণব আচার্যেরা একে ব্রহ্মের আশ্বাদনের সহোদর নয়, একেবারে স্বয়ং ব্রহ্মেই আশ্বাদ বলে বর্ণনা করেছেন। এই ভাবে ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্দতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রাচীনকাল থেকে।

সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ-উপলব্ধি—এ কথা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বারবার বলেছেন। তাঁর মতে আনন্দ আসে ঐক্য থেকে। যখন ব্যক্তি ও বস্তু এই দুয়ের পরিপূর্ণ মিলন ঘটে, কোনো বাধা কোনো অন্তরায় থাকে না আর, তখন দুটি অনবগুণ্ঠিত সস্তার মিলন থেকে উদ্ভূত হয় আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—‘বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর ঐক্য ঘটনের আনন্দ এই অমুভূতির আনন্দই সাহিত্যের আনন্দ।’ বলছেন রবীন্দ্রনাথ—‘আমি আছি এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ।’ (সাহিত্যতত্ত্ব) আমি আছি এই বোধটি তখনই চরম সচেতনতা লাভ করে যখন আমার বাইরে যে অনন্ত বস্তুজগৎ রয়েছে তার কোনো একটি বস্তুর সঙ্গে ‘আমি’র মিলন ঘটে তখন এই মিলনের দ্বারাই ‘আমি’ তার আমিত্বের পূর্ণ রসাস্বাদন করে। তখন চিন্তের সমস্ত জড়তা, সব উদাসীনতা ঘুচে যায়, আমি তখন এই সৃষ্টির অন্তরতম অমুভূতি লাভ করে ও তার চৈতন্য পরিপূর্ণ উদ্বোধন লাভ করে। আমার এই যে পরিপূর্ণ উদ্বোধন তার নিজের কাছে, তাই আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘প্রবল অমুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেন না সেই অমুভূতির দ্বারা প্রবল রূপে আমরা আপনাকে জানি।’ তাই নিজেকে গভীরভাবে জানা, সত্য ক’রে জানা, নানা বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়তম যোগ স্থাপনের দ্বারা—এই হ’ল আনন্দের কাজ আমাদের জীবনে।

তীত্র ও গভীর অমুভূতি যদি আনন্দদায়ক হয় তা হলে দুঃখের অমুভূতিকে কোন পর্যায়ে ফেলবো আমরা? দুঃখ কি তা হলে আনন্দের এলাকার বাসিন্দে? রবীন্দ্রনাথের মতে দুঃখ হচ্ছে আনন্দেরই অস্তভূক্ত। বলছেন তিনি—‘দুঃখের তীত্র উপলব্ধি আনন্দকর, কেন না সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক।’

গভীর দুঃখের পরশ পেলে সত্তার মুখ থেকে সব অবগুঠন খসে পড়ে যায়, তখন নিজেকে আর আপ্সা ক’রে দেখি নে। অতি স্পষ্ট ক’রে নিজের স্বরূপের ছবি দেখি ও রস আন্বাদন করি। তাই দুঃখ হচ্ছে আনন্দের অস্তভূক্ত। দুঃখ যদি আনন্দ হয় তা হলে সুখ কি? সুখও কি তা হলে আনন্দ? না, সুখ আনন্দ নয়। সুখ হচ্ছে ইতর, ভোলানো তার কাজ, সত্তাকে আবৃত করাই হচ্ছে তার পেশা, যাতে ক’রে ‘আমি’ তার প্রকৃত আশিত্যের, তার স্বলক্ষণের মুখোমুখি না হতে পারে তার জন্তে অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক’রে চলেছে সুখ। তাই সুখ কখনো আনন্দ দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়। বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অস্তভূক্ত।’

এই যে বিচিত্রের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে অনুভব করার কথা বারবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেই অনুভব করার প্রকৃত অর্থ কি? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা।’ বিশেষভাবে নিজেকে পাওয়াই হচ্ছে অনুভব করা। এই বিশেষ ভাবে নিজেকে পেতে হলে কোনো একটি বস্তুর সঙ্গে যোগ স্থাপন ক’রে তার সঙ্গে এক হয়ে নিজেকে পেতে হবে। এই ঐক্যস্থাপন করলে ভাব জগে উঠবে মনে আর ভাব থেকে রস নিস্করিত হবে অস্তরে। কিন্তু এই রস বস্তুটি কি? রস হচ্ছে ভাবের আন্বাদ। আমাদের অস্তরে অনেক ভাব আছে—যেমন ভয়, ক্রোধ, বিষয়। এই ভাবগুলি প্রতিদিনের জীবনে অভিব্যক্ত হচ্ছে। না পাওয়ার জন্তে রাগ আসছে, হারানোর জন্তে আসছে ভয়, অস্তুর ঐশ্বর্য দেখে গর্জে উঠছে ঈর্ষা, বিষয়ও হচ্ছে। এই সব লৌকিক কারণে মনের মধ্যে যে ভাবগুলি জাগে সেগুলি কিন্তু রসসৃষ্টি করে না। সেগুলি লৌকিকবৃত্তি। কেন না সেই ভাবগুলি যদি প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত থাকে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে, তা হলে, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, ভয় ও লোভের আবরণে ভাবগুলির স্বরূপ আবৃত হয়। ধরুনালোকে আনন্দবর্ধন ক্রৌঞ্চমিথুনের সাহচর্য ডক হওয়ার জন্তে মহাকবি বাল্মীকি যে শ্লোক রচনা করেন সেটি তাঁর লৌকিক শোক থেকে উদ্ভূত নয়, এইটি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আচার্য বলেছেন যদি কবি দুঃখ সন্তপ্ত হতেন তা হলে তিনি কাব্যরচনা করতে পারতেন না। দুঃখ-অভিগম্য লোক এতই জড়িত তার দুঃখের সঙ্গে যে সে চিন্তাবৃত্তির স্বাভাবিক নিবান্দী রস অনুভব করতেই পারে না। করুণ রস তখন অস্তরে আসে না। মহাকবি জড়িত ছিলেন না বলেই করুণার রস উপলব্ধি করেছিলেন আর তার থেকেই কবিতা উৎসারিত হয়েছিল। অলংকার শাস্ত্রের আচার্য বলেছেন—‘নিজ সুখাদি বিবলী কৃতশ্চ কথং বস্তুস্তরে সংবিদং বিশ্রাময়েৎ।’ নিজের সুখদুঃখ আরা বিবশ হয়ে থাকলে বস্তুর অস্তরে প্রবেশ করবে কেমন করে? আর বস্তুর অস্তরে প্রবেশ করতে গেলে লৌকিক বৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের মনোভাব একেবারে বর্জন না করলে কোনো উপায় নেই। তাই সাহিত্যরস বাহ্যঘটনার পরাপেক্ষী নয়। এই জন্তেই এই রস আনন্দময়। অস্তরের স্থায়ী ভাবগুলি উদ্ধৃক হয়ে অস্তরকে রসসিক্ত করে। এইটেই হচ্ছে রসান্বাদ—এটি মানস ব্যাপার। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মতে এই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। ‘বাক্যম্ রসাত্মকং কাব্যম্।’ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। বিশেষ এমন কোনো বস্তু নেই

যার মধ্যে রসসম্পর্শ নেই। আর সাহিত্যের এই রস অপ্রয়োজনীয়, অহেতুক। রস পদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না।

এতোকণ যা আলোচনা করেছি সেটিকে নূতনরূপে বলতে হলে বলা যেতে পারে—দ্রষ্টা আমার আনন্দ অমুভূতি, সে অমুভূতি থেকে রসের অবশ্য অস্তরলোকে আর তার থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি। এই যে সাহিত্য সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো কিছু থাকবে—তা হলে সেই উদ্দেশ্যটি কি?

এক কথায় সেই উদ্দেশ্য বলতে গেলে বলতে হয়—আনন্দ পেয়েছি, সেই আমার আনন্দটুকু সকলের জন্যে ধরে দিয়েছি যাতে সেই আমার আনন্দ সকলের আনন্দ বিধান করে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।’ বলছেন—‘বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুভবিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম, কোনো একটা বিশেষ তত্ত্ব-নির্ণয় বা কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা-বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষ্য অনুসারে তাহাকে দর্শন, বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।’

‘অমুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য।’ কোনো একটা বিশেষ তত্ত্বের হয়ে, মতবাদের হয়ে কোমর বেঁধে প্রচারক মাজা সেটাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—‘ম্যাকবেথ নাটকে তমোগুণ বেশি কিম্বা রজোগুণ বেশি, সাংখ্য দর্শনের সবগুণেরই তাতে আবির্ভাব কিম্বা অভাব, এ কথাটি উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক যে-কোনো গুণই তাতে থাক বা না থাক সব গুণ মিলে ঐ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেছে। সৃষ্টি আপনাকে আপনি প্রমাণ করে উপাদানের বিশ্লেষণ দ্বারা নয়। নিজের সমগ্র রূপটি প্রকাশ করে।’ বলছেন কবি—‘কাঁটা গাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ নয়। গোলাপ গাছের প্রকৃতিটা অস্বাভাবী, জগতে শত্রু আছে এ কথা সে ভুলতে পারে না। এই সন্দেহ-চঞ্চল ভাবটা সাত্ত্বিক শাস্তির বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুস হিসেবে নিন্দা করা যায় না। অতি শুভ্র ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে রমনীয়তায় হের এ কথা তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ বলবে না। ভুঁইচাপা গুঠে মাটি ফুড়ে, থাকে মাটির কাছে কিন্তু ফুলের সমজ্ঞার এই রজো কি তমোগুণের লক্ষণটা স্মরণ করিয়ে তাকে সাংখ্যতত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করে না।’

তত্ত্ব কিম্বা মতবাদ প্রচার করা যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়—রবীন্দ্রনাথের এই মতের সমর্থন পাওয়া গেলো আর এক বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখায়। ১৯২৫ সালে ম্যাক্সিম গর্কি রুশীয় লেখক কন্সটানটিন ফেভিন-কে যে চিঠি লেখেন তাতে এক জায়গায় লেখেন—‘True art does not philosophise, does not preach, it only loves’ says one of the heroes of the novel I am writing. To his words I would add ; and hates.’

‘The Religion of An Artist’—এই প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন—‘The immediate consciousness of reality in its purest form, unobscured by the shadow of self-interest, irrespective of moral or utilitarian recommendation, gives us joy as does the self-revealing personality of our own...Art reveals man’s

wealth of life, which seeks its freedom in forms of perfection which are an end in themselves' সব সৃজনশীল শিল্পীমন যে একই সুরে বাজে, একই উপলব্ধির বড়ে রাঙা তার প্রমাণ সাহিত্য সহজে রবীন্দ্রনাথের ও গর্কির সমানধর্মী উক্তিগুলি।

বিশেষ মতবাদ কিংবা নৈতিক আদর্শ অথবা তত্ত্ব প্রচার সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, এটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তা হলে কি সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি সাহিত্যের লক্ষ্য? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘সৌন্দর্য প্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। ছায়ালেটের ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি, ওখেলোর অশান্তি স্মরণ নয়, মানব স্বভাবগত।’

সৌন্দর্যসৃষ্টি তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। এই প্রকাশ যদি সত্য হয়, তা হলে সেটাই হল সাহিত্যের সার্থকতা। তা ছাড়া চলুতি ধারণার ‘সুন্দর’-এর সঙ্গে শিল্পের সুন্দরের গভীর পার্থক্য আছে। চলুতি ধারণার ‘সুন্দর’ হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন কিংবা ইন্দ্রিয়-সুখের অভিব্যক্তি—যেমন সুন্দর কাপড়, সুন্দর বাড়ি, সুন্দরী নারী। শিল্পের সুন্দর, সাহিত্যের সুন্দর হচ্ছে শিল্পীর মনের প্রক্রিয়া একটি মানসিক অভিজ্ঞতা। শিল্পচেতনায় আনন্দের বসম্পন্নন যা সৃষ্টি করে তাই সুন্দর। শিল্পানুভূতিকে (aesthetic feeling) যা গভীর ভাবে নাড়া দেয় তাই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে আর সেইটেই সাহিত্যের সামগ্রী।’ ‘যে সত্যকে আমরা ‘হৃদামনীষামনসা’ উপলব্ধি করি তাই সুন্দর।’ বলছেন—‘বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থকে তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি নয়, বোঁটা নয়, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।’ প্রতিদিনকার জীবনের ‘সুন্দর’, প্রয়োজনের এলাকার ‘সুন্দর’ বিশেষের কোঠায় পড়ে না। সেটা দৃষ্টির উপরতলার সুন্দর। ব্যবহারের পরেই তার সৌন্দর্যের শেষ। ব্যবহারটাই মুখা, ভোগটাই লক্ষ্য। শিল্পের ‘সুন্দর’ এই বিশেষের কোঠায় পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘আটের এলাকার সাহেব পাড়ার সরকারি বাগানের স্থান নেই, আছে চিংপুর রোডের। সরকারি বাগানের অনেক সদৃশ আছে, তাকে সুন্দর বললে লক্ষণে মেলে; সে বাগানে সাধারণ উপকার আছে, কিন্তু বিশেষ স্বাদ নেই। চিংপুর রোডের স্বাদ আছে, উপকার নেই বললেই হয়। কলকাতার ইডেন গার্ডেন ফোটোগ্রাফের অন্ত্যজ পংক্তিতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু চিংপুর রোডের পংক্তি আটের অভিজাতবর্গের কোঠায়।’ (যাত্রী। পশ্চিম যাত্রীর ভায়ারী)

একটি বস্তুর ‘বিশেষ’ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই বস্তুটি তার বিশেষত্বের দ্বারা প্রকাশ হয়েছে আমাদের কাছে। এই প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব যার মধ্যে আছে শিল্পের মূল্যায়নে সেই হচ্ছে সুন্দর। এই সুন্দরকে এড়িয়ে যাওয়ার যো নেই, তার প্রবল ও গভীর প্রকাশের দ্বারা সে আমাদের মনকে ছলিয়ে দেয়, সহজে তার স্থান ক’রে নেয় আমাদের মনে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘সুন্দর হঠাৎ বলে ওঠে, ‘চেয়ে দেখো’। প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিসকে যা না বলি, তাকে তাই বলি, বলি ‘তুমি আছ’। এইটেই হ’ল আসল কথা। সে যে নিশ্চিত আছে এই কথাটাই তার সৌন্দর্য আমার কাছে উপস্থিত করলে।’ (যাত্রী। পশ্চিম যাত্রীর ভায়ারী)

শিল্পের এই সুন্দর, এই সৌন্দর্যবোধ মনকে আগায়, মনকে ভোলায় না। তাই লাবণ্য, যেটি

প্রাণের দীপ্তি দেহের পটে, সেটিকে রঙ মাখিয়ে ঢেকে দিয়ে সম্ভায় মন ভোলানোর কাজে যেতে উঠে শিল্পী তার সৌন্দর্যবোধকে হীনতা-দ্বয় করে না। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—‘উচ্চ অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। সোভীর ভিড় তাড়াবার জন্তে সে অনেক সময়ে কঠোরকে ধারের কাছে বসিয়ে রাখে। এমন কি অনেক সময় কিছু বিলী, কিছু বেস্বর তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, কেন না তার সাহস আছে। সে জানে, যে-বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মিষ্টি মিশোল কববার কোনো দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্তে শিবকে কন্দর্প মাজাতে হয় নি।’ (যাত্রী। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী) শিল্পের সুন্দর তাই চোখের দরজা পার হয়ে অন্তরলোকে প্রবেশ করে। যে শুধু চোখের এলাকায় থেকে গেলো অন্তরে স্থান ক’রে নিতে পারলো না সে সুন্দর নয় রবীন্দ্রনাথের মতে। অন্তরের কাছে এই প্রত্যক্ষ-গোচরতা, রূপের এই সম্পৃষ্টতাই হচ্ছে সাহিত্যের সৌন্দর্য।

সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন—একটি হচ্ছে গায়ে-পড়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধক সৌন্দর্য আর একটি হচ্ছে প্রলোভন-নিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তিনি বলছেন—‘এক ঘাতের বাইজি মহলে চলতি খেলো সংগীত তার হাল্কা চালের স্বরতালের উত্তেজনার সাধারণ লোকের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। বড়ো ওস্তাদেয়া এই নেশা-ধরানো কান-ভোলানো কাকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। তাঁরা যে-বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ বলে জানেন সে-বিশিষ্টতা প্রলোভন-নিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেমনি সাধনা চাই। এই জন্তেই তার মূল্য। নিরলস হতে তার ভয় নেই। সবলতার অভাবকে, আড়ম্বরকে সে ইতর বলে ঘৃণা করে। সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। সুসংগত বলেই তার গৌরব।’ (যাত্রী) যে ভোলায়, নেশা ধরায়, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধক তাকে রবীন্দ্রনাথ ‘সুন্দর’ নামেই অভিহিত করেছেন, আর যে আমাদের মনোহরণ করে, মনকে জাগায়, তাকে রবীন্দ্রনাথ ‘মনোহর’ নামে নির্দিষ্ট করেছেন। এই দুয়ের পার্থক্যের হেতু কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত গুণের তারতম্য নয়—পার্থক্যের হেতু হচ্ছে রূপের তারতম্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘আর্টে আমরা গুণবানকে চাইনে রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দর বলছি। রূপের সম্পৃষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়দস্ত। বিষয়কে অনেক নামজাদা নায়ক-নায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেছেন তার উপরে আমি আর কিছু বলতে চাইনে, কেবল এইটুকু বলে রাখি বিষয়কে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, সে রূপবান বলে। সাধারণ সম্পৃষ্টতার মধ্যে সে বিশেষ বলে, সুপ্রত্যক্ষ বলে।’

এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় এত অপূর্বভাবে ধরে দিয়েছেন যে সেটি—উদ্ধৃত কববার লোভ সহরণ করতে পারছি নে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘চরিত্রনৈতিবিলাসী ঐতিহাসিক তাঁর মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নাম দিয়ে সঙ্গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে সর্বদা আমাদের চোখের উপর ধরে রেখেছেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট করে চোখে পড়েন না, আর চরিত্রচিন্তাবিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংঘের অপবাদে লালিত করেও আমাদের কাছে সম্পৃষ্ট করে তুলেছেন। যারা সত্য কথা বলতে ভয় করে না তারা স্বীকার করবেই যে, সর্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে। তার একমাত্র কারণ ভীমসেন সম্পৃষ্ট। সেক্সপীয়রের ফল্‌স্টফও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত বলে সমাজে আদরণীয় নয়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলেই সাহিত্যে আদরণীয়। রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি

ভয় করি, তাই খুব চুপি চুপি বলছি, সাহিত্যে যামের চেয়ে লক্ষণ বড়ো। বান্দীকিকে সিজেস করলে তিনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, যাকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষণকে তিনি ভালোবাসেন।' (যাজ্ঞী)

তাই তাকে কে ভালো বললো, গুণবান বললো—এ নিয়ে শিল্পের স্বন্দর মাথা ঘামায় না, তাকে রূপবান বললো কি না সেটি জানবার জন্তে তার কোতূহল ও উৎকর্ষার শেষ নেই। শুধু চোখের তারিক নিয়ে মনোহরের কারবার নয়, সেটি হ'ল স্বন্দরের কারবার। অস্তরের সায় না পেলে মনোহর হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছেন যে, 'শুধু চোখে চেয়ে সরাসর যায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। যেখানে সহজ আদর্শে যা অস্বন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন কি সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয় তো গভীরতর। ঠুংরি টপ্পা শোনবা মাত্র মন চঞ্চল হতে থাকে, টোড়ির চোতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্ভূত করে। 'ললিতলবঙ্গলতা পরিলীন' মধুর হতে পারে কিন্তু 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' মনোহর। একটা কানের আর একটা মনের, একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আর একটাতে চরিত্রই প্রধান।' রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে, 'যাকে স্বন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূর-প্রসারিত।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ নায়ক আচার্য কুস্তক তিনিও এই বাইরের মহলের চটকদার সৌন্দর্যের সঙ্গে অস্তরমহলের সৌন্দর্যাত্মকতার পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে বহিঃকল্প সন্নিবেশ বিশেষে—লাবণ্য, আর যা ঘটায় চেতন-চমৎকারিত্ব, সেটি হচ্ছে সৌভাগ্য। বাইরের নাড়া যা দেয় সেটি লাবণ্য, আর যা চেতনাকে চমৎকারিত্বের রসে আগ্রস্ত করে সেটি হচ্ছে সৌভাগ্য।

যে অস্তর-রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে বস্তু মনোহর হয়, একটি অল্পমাত্র রূপ গ্রহণ করে, সাহিত্যের মধ্যে সেই প্রাণরস, সেই রূপের মহিমা খোঁজে না এ কাল। এ কাল মেতে উঠেছে বিষয় নিয়ে। কি বিষয়টি নিয়ে সাহিত্যটি রচিত হয়েছে, তারই গৌরবে সাহিত্যের গৌরব, এ কথাটি এ কালের মুখে অহরহ শোনা যাচ্ছে। যদি কেউ গল্প লেখে মজুরদের কিংবা চাষীদের জীবন নিয়ে তা হলে বিষয়ের মাহাত্ম্যে সেই গল্প অনবদ্য হয়েছে বলে ধরে নিতেই হবে, গল্পের শিল্পকলার দিক থেকে সে গল্প সম্পূর্ণ অচল হলেও। শিল্পকলানৈপুণ্য যেটি না হলে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়, আর যে নৈপুণ্যটি একেবারেই শুলভ নয়, সেটিকে এড়িয়ে গিয়ে স্বজনীশক্তিহীন মাতৃষদের সাহিত্যিক বলে চালিয়ে দেবার এটি হচ্ছে একটি চতুর চেষ্টা।

প্রথমেই 'বিষয়' সম্বন্ধে ভরতমূনির মোক্ষম উক্তিটি স্মরণ করি। তিনি বলেছেন—এমন শব্দ নেই, এমন বিষয় নেই যেগুলি কাব্যের অঙ্গ না হতে পারে, যদি বিষয়টিকে রসাত্মক ক'রে তোলা যায়। আর অগ্নিপূরাণ বলেছেন—'লক্ষ্মীরিব বিনাত্যাগাৎ না বাণী ভাতি নীরসা' অর্থাৎ লক্ষ্মী যেমন ত্যাগ ছাড়া দীপ্যমানা হন না, নীরস বাণীও তেমনি দীপ্তি পায় না। এইগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শাস্ত্রকারদের বক্তব্য হচ্ছে যে, যে-কোনো বিষয় নিয়ে সৃষ্টি করতে চাও করো, কিন্তু তাকে রসরূপ দাও। যদি সেটা না পারো তো বিষয়টি যত উপাদেয়ই হোক না কেন, সমজ্ঞার লোক তাকে সাহিত্য বলে স্বীকার করবে না।

রবীন্দ্রনাথ বারবার এই কথাটাই আমাদের শুনিয়েছেন যে সাহিত্যের গৌরব হচ্ছে সৃষ্টির গৌরব, রূপের গৌরব, বিষয়ের গৌরব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, 'বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে, দর্শনে কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।' বিষয়ের অপূর্বতায় নয় রূপের অপূর্বতায় সাহিত্য ভাস্বর।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদান রূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দানের ইতর বিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাকেই দেখি।’

তাই একটি সাহিত্যে সমকালীন সমস্তার কথা বলা হয়েছে, যখন যে মতটি প্রবল হয়ে উঠেছে তার ধ্বনি সাহিত্যের মধ্যে ধরে দেওয়া হয়েছে, অতএব এই রচনাগুলি সাহিত্য হয়েছে—এই দাবি বহুজনসমর্থিত হলেও, মহাকালের ধোপে টিকবে না কিছুতেই, কালের আবর্জনা কুণ্ডে তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—‘বিষয়টি যত বড়ই হিতকর বা অপূর্ব হোক না কেন, যতক্ষণ সে কোনো-একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিত্রপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত, যুগোচিত, এইটেতেই যার একমাত্র গৌরব তিনি উচু দরের মাস্তুল হতে পারেন কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।’

সমকালীন যুগের সামাজিক ধারণাকে তোলাজ করবার জন্তে ধনী বা দরিদ্রকে সাহিত্যের বিষয় করবার যে সচেতন চেষ্টা করা হচ্ছে সেটার ভঙ্গিমূলক মূল্য যাই থাক, সাহিত্যিক মূল্য কতটা আছে সেটা বিচার্য। কয়লাখনির মজুরদের বিষয় ক’রে জোলা জার্মিনাল লিখেছিলেন, আমাদের শৈলজানন্দ কয়লাখনির মজুরদের বিষয় ক’রে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। এঁদের দুজনেরই রচনা উচুদরের সাহিত্য হয়েছে। তার কারণ বিষয়টি তাঁদের প্রাণের রসে জারিয়ে সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন এঁরা দুজন। অনেক গল্প লেখা হয়েছে মজুরদের জীবন নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায়। বেশির ভাগ তার ভঙ্গিমূলক ও বিষয়ের জাঁকে ভরপুর। আন্তিন-গোটানো চীৎকারে তারা ভর্তি, তাই রূপ পেলো না কিছু। সবটা ঘেন কাঁধার মতো, নানা ছেঁড়া টুকরোর সমষ্টি। অথচ বিখ্যাত রুশীয় নাট্যকার ত্রিচিয়াকভের ‘রিচি কিতাই’ চীনের ডাক নামক নাটক পড়েছি ও দেখেছি মস্কোতে, সেখানে বিষয় তার গৌরব প্রচার করবার জন্তে চীৎকার ক’রে কানে তাল লাগাচ্ছে না, শিল্পের জাদুতে বিষয় নম্র হয়ে কলালক্ষীর কাছ থেকে শিল্পরূপ ভিক্ষা ক’রে সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারা তার উৎকর্ষ ঘটে না; ভাবভাষাভঙ্গি সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হ’ল কি না, এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। ‘তুমি থাও তাঁড়ে জল আমি থাই ঘাটে’—দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়-হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড় কিন্তু কাব্য হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

কমতাহীন নিকট সাহিত্যিকের পক্ষে তার রচনার বিষয়ের গৌরব করা ছাড়া গতি নেই, কেন না রসরূপ-সৃষ্টির গৌরব দাবি করবার সাহস তার নেই। মনে রাখা ভালো যে উপাদানগুলিকে জড়ো করলেই সৃষ্টি হয় না, একটা সমগ্রতার রসে তাদের সিক্ত করে রূপে একে তাদের বাঁধতে হয় তবেই সৃষ্টি হয়। আর ঐক্যসাধনের দ্বারা যেটি সৃষ্টি হয় সেটি তার উপাদানগুলির চেয়ে অনেক বেশি একটি বিশেষ রসে ও রূপে। স্কন্ধনির যেগুলি উপাদান সেই কাঁচকলা, উচ্ছে, আলু—তাঁদের প্রত্যেকটির মধ্যে আলাদা ভাবে স্কন্ধনির স্বাদ নেই, মিশ্রণের দ্বারা একটি বিশেষ ধরনের ঐক্যসাধনের দ্বারা সেই স্বাদটি এসেছে। এটা বাঁধিয়ে হাতের জাদু। তেমনি সাহিত্যের উপাদানগুলির প্রত্যেকটিকে

আলাদা ক'রে দেখলে তাতে সৃষ্টির রস নেই, যেই তাদের মধ্যে রসের ঐক্যসাধন ক'রে রূপ দেওয়া হ'ল অমনি সৃষ্টি সার্থক হ'ল। এই হ'ল সৃষ্টির জাদু। তাই উপাদানের বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের বিচার চলে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘বিশ্লেষণে হীরকে অক্সারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্মাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয় কিন্তু এতে ক'রে সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে বলতে হবে যে সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেন না উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র।’ (সাহিত্য বিচার)

সাহিত্য বিষয়ের গৌরব ও উপাদানের বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের মাহাত্ম্য নির্ণয়—এই দৃষ্টি সমকালীন মতবাদের সঙ্গে সাহিত্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে একটি বিতর্ক বেশ কিছুকাল বাংলা সাহিত্যের আসন্ন জমিয়ে রেখেছিল। বাস্তববাদীদের বক্তব্য ছিল এই যে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব ঘটেছে, জীবনকে যথার্থ ভাবে দেখানো হচ্ছে না, জীবনকে রঙ লাগিয়ে সুন্দর ক'রে দেখানো হচ্ছে—এটা একটা বিকৃতি। ভাবালুতা ও আবিষ্কার কিংবা সুন্দর ক'রে সাজাবার সচেতন প্রয়াস সাহিত্যকে যে কখনো খর্ব করে নি তা নয়, কিন্তু সেটি বাস্তবতাবোধ নিরপেক্ষ একটি সাহিত্যিক ক্রটি। সেটি খেলো সাহিত্যের লক্ষণ, শক্তিহীন সাহিত্যিকের দৈশ্বে্যের অভিব্যক্তি। তার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার কিংবা অবাস্তবতার কোনো সম্বন্ধ নেই। কোনো সার্থক সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য বাস্তবতা-বিবর্জিত হতেই পারে না। এখন প্রশ্ন ওঠে—সাহিত্যের বাস্তব বস্তুটির স্বলক্ষণ কি, তার অর্থ ই বা কি?

প্রথমেই বলা দরকার যে বাইরের জগতের বস্তুগুলির ছব্ব নকলকে শিল্পের বাস্তবতা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে চলবে না। সৃষ্টির নিজস্ব বাস্তবতাকে রূপ দেওয়ার অক্ষমতার জন্তেই এই নকলনবিশিষ্টানাকে বাস্তবতা বলে চালিয়ে দেওয়ার সস্তা খেলা। চীনে শিল্পী ঘোড়া এঁকেছেন। ঘোড়ার সামনে ছোটো পা, তার মাথা ও তার পরে পিঠের ও দেহের আভাস দেওয়া করেকটি রেখা। তার পেছনের পা দুটি ছবিতে নেই। এই ছবি দেখে সব ঘোড়াটাকে দেখতে পেলুম। দেখলুম তেজী ঘোড়া মাঠের উপর দিগে ছুটে চলেছে, তার খুড়ের আঘাতে ধূলো উড়ছে, তার ঝাঁকানো ঘাড়ের চুল হাওয়াতে উড়ছে। বাস্তবের ঘোড়া ছব্ব নকল ক'রে পুরো ঘোড়াটা আঁকেন নি শিল্পী। যেটুকু এঁকেছেন সেটি হচ্ছে শিল্পের ঘোড়া, তাই দিগে সমস্ত ঘোড়াটাকে দেখবার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন। দর্শককে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি, তার কল্পনার উপর শ্রদ্ধা রেখে শিল্পী যতটুকু রেখায় ফোঁটালে ঘোড়ার সার্থক রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় তাই করেছেন। আর বাস্তববাদীদের মন ঘুগিয়ে ইংরেজ শিল্পী ঘোড়া এঁকেছেন। ঘোড়ার ঘাড়ের ও ল্যাজের চুলগুলিকে বোধ হয় জ্যাস্ত ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে এঁকেছেন। চার পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ঘোড়া, কিন্তু এটা কাঠের ঘোড়া, মরা ঘোড়া, এটা শিল্পের ঘোড়া নয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—‘আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল। তারা উপবাসজীর্ণ কুশ শরীরের যথার্থ প্রতিক্রম তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির হিসাব গনিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শিল্পীও তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব

ইতিহাস নাই। তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্ত নহে। তাহা বাস্তবকে কিছু মাত্র আমল দেয় নাই বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে।' শিল্পের বাস্তব তাই ফোটোগ্রাফি নয়, প্রতিরূপও নয়, সে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত একটি রূপ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে শিল্পীরা 'এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন।' (অন্তরবাহির। পথের সঞ্চয়) আর চোখের সামগ্রীকে মনের সামগ্রী করাতেই হ'ল সাহিত্যের বাস্তবতা। চোখ যা দেখে তাকে মনের ক'রে তুলতে হলে অনেক কিছু বাদ দিয়ে দিতে হয়। যে মনে করে বাইরের অনেক কিছু বাদ দিয়ে ভারতীয় শিল্পীরা ও চীনের শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন যুগযুগান্ত ধরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বাইরের রূপের দৌরাখাকে খর্ব না করে সেটা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী আর্টিষ্ট বাস্তবের সাক্ষী, শিল্পী আর্টিষ্ট সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাখাকে খর্ব করিতেই হইবে। বাহিরের রূপটিকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে—'তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র।' তাই বাইরের এই অসুখতি বা প্রতিরূপ সৃষ্টির চেষ্টা শিল্পের বাস্তবের পক্ষে হানিকর, কেন না রবীন্দ্রনাথের কথায়—'স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়।' আর বস্তুর আসল রূপটি উপলব্ধি করার জন্তে ও প্রকাশ করার জন্তে যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে শৈল্পিক সংঘম। কেনিলতা নয়, উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে মনকে উত্তেজিত করা নয়, মনকে ভিতরের দিকে পরিচালিত করা—এই হচ্ছে শিল্পের কাজ। মনকে সস্তা খেলনা দিয়ে ভোলানো নয়, তাকে গভীর বসোপলব্ধির দ্বারা জাগানো—এই হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যের কাজ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর মোটা তুলির দাগ বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদের ছেলে ভুলাইব না। তাহারা মনে করে বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে ঝেঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ সুসিদ্ধ হয়। এই জন্ত নারদকে আকিতে গেলে তাহারা যাত্রার দলের নারদকে আকিয়া বসে—কেন না ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে, যাত্রার দলে ছাড়া আর কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।' (অন্তরবাহির। পথের সঞ্চয়) তাই প্রতিদিনকার জীবনের বাস্তব, সাহিত্যের বাস্তব নয়। বিজ্ঞানের বাস্তবও সাহিত্যের বাস্তব নয়। বিজ্ঞানের বাস্তব হ'ল যা কিছু বিদ্যমান তাই বাস্তব, আর যা কিছু আছে তাকে অসুখতির বণ্ডে বাঙিয়ে কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে দেখে মনের কাছে তাকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ক'রে দেখতে পারলে সেই অসুখতি সাহিত্যের বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাহিত্যের 'এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসঙ্গত। যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।'

আমাদের চেতনাকে যা গভীরভাবে স্পর্শ করে সেটাই নবীন রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়—বিশ্বের তখন অস্ত নেই, আনন্দের তখন কুলকিনারা পাওয়া যায় না। অথচ এই নবীনকে পাওয়ার জন্তে হাতড়ে বেড়াবার কোনো দরকার নেই। এই বহু যুগের প্রাচীন পৃথিবী তার বিশ্বের অসুখতি নবীনত্ব নিয়ে আমাদের ঘিরে আছে, যদি চোখ জবাগ্রন্থ না হয়ে থাকে, যদি মন মনোহরের স্পর্শ পাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে না থাকে, তা হলে এই নবীনতার চিরনূতনত্ব দিয়ে আমাদের আনন্দ দেবেই দেবে।

সাম্প্রতিক কালে নতুন চাই নতুন চাই বলে যে সব উঠেছে সেই নতুনত্বের দাবি যাচাই ক'রে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্ত ঘটে তখনই মাতৃব ভাল ঠুঁকে নতুনদের আশ্ফালন করে। পুরাতনের পাতে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করে থাকে। সে দিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি ‘রক্ত’ শব্দের জয়গায় ব্যবহার করেছেন ‘খুন’। পুরাতন ‘রক্ত’ শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাৎ-এর খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।’ (কবির ভাষণ। প্রেসিডেন্সী কলেজ রবীন্দ্র-পরিষদ)

এই সকল আধুনিকতার অন্তরের স্বরাকে চাকবার জন্যে সমকালীন যুগের প্রতিনিধিদের দাবি ক’রে সাহিত্যসৃষ্টিতে নতুনের আবির্ভাবের জন্যে কোলাহল করে। ভুলে যায় যে চিরদিনই সাহিত্যে স্বত্ব-পরিবর্তন ঘটেছে আর সেই পরিবর্তন জনসভার দাবিতে নয়, মিছিলের দাবিতে নয়, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত দাবিতে স্রষ্টার শিল্পকৃতি সেটি। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। সেটি জনতার দাবি মেটানোর তাগিদে নয়, সমাজের স্বত্বপরিবর্তনের অলঙ্কার সমাহৃত্তির প্রেরণায় একটি মহৎ শিল্পীর প্রকাশসীমা সেটি। মাইকেল মধুসূদনের বেলাতেও সেই একই কথা। প্রাক-মধুসূদন যুগের বাংলা কবিতা আর মধুসূদনের কবিতা—এই দুয়ের মধ্যে যে আসমানজমিন প্রভেদ, সেটিই বা কি ক’রে সম্ভব হ’ল। মাইকেল কি নতুন কিছু করতে হবে বলে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন? আদবেই নয়। বাংলার জাতীয় জীবনে বিরাট স্বত্বপরিবর্তন কাজ করছিল ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় অর্ধশতাব্দী ধরে। বাঙালির জাতীয় জীবনের এই স্বত্বপরিবর্তনের স্বত্বরাজ রামমোহন আসবার পর থেকে বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন—এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য সেই স্বত্বপরিবর্তনের উজ্জল সাক্ষ্য দেয়।

তাই সাহিত্যে চিরদিনই নতুন-এর আবির্ভাব ঘটেছে—কিন্তু সেটি এসেছে শিল্পীর অন্তরের সৃষ্টির অসহনীয় আবেগে। নতুন কিছু ক’রে তাক লাগাবার নিশ্ফল প্রয়াসের ফল সেটি নয়। ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই বলেছেন—‘আমার কাব্যে স্বত্বপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলঙ্কারে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারিদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতায় টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা, কোনো পাহাড়ী মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র, আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে। কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল, এতো স্বাভাবিক। এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্য মনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে।’

আর এক জায়গায়, রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—‘অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে ও অভিজ্ঞতার নতুন আশ্ফালন ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে... মনের ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বতে যখন ফুল ফোটার, ফল ফলায়, তখন সেইটের আবেগ ও

বাস্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ।' তাই নতুন চিরদিনই দেখা দিয়েছে সাহিত্যে—খুঁজু-পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিতে, কিন্তু তার আবির্ভাব রস-উপলব্ধির আন্তরিকতা থেকে, নতুন কিছু করতে হবে—এই আন্তরিকতাহীন স্বল্প বুদ্ধির খেলা থেকে নয়।

কবির সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার উস্তবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভাষণ পাঠ করেন তাতে বলেন—'কবি যদি ক্লাস্ত মনে এমন কথা মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তা হলে বুঝবো আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অমুরাগের রস পৌঁছচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারলো না। যে কল্পনা নিজের চারদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিভ্রম। রসনায় যার কচি মরেছে, চিরদিনের অগ্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগবি অগ্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।'

এই নূতনের সন্মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি অল্পময় ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করবো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সবদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাইনে, সেইখানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টিষ্টের কাজ। সেইজন্মেই তো বড়ো বড়ো আর্টিষ্টের রচনার বিষয় চিরকালের জিনিস। আর্টি পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকৈ সে দেখতে পায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিস নয় যে খুঁড়তে খুঁড়তে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে-যে ঝরণা, তার প্রাচীন ধারা যে চিরদিনই নবীন হয়ে বইছে, এইটেই প্রমাণ করবার জন্মে তাকে কোনো অস্বস্ত ভক্তি করতে হয় না। 'অশোকের মঞ্জরী কালিদাসের আমলে যে-রঙে বসন্তের স্তম্ভল বন্ধ রাঙিয়ে দিয়েছে, আজও নূতনত্বের ভান করে সেই রঙ বদল করবার তার দরকার হয় নি। নির্ভয়ে সে বর্ষে বর্ষে পুরাতনের বাসর ঘরেই নবীনের ঘোমটা খুলে দিচ্ছে। বারে বারেই চোখের উপর থেকে জড়তার মোহ কেটে যাচ্ছে আর চিরবিশেষকৈ দেখতে পাচ্ছি।' (যাজ্ঞী। পশ্চিমযাজ্ঞীর ডায়ারী)

আনন্দজাত এই সাহিত্য সাহিত্যশ্রষ্টার সস্তার কি কোনো বিশেষ অংশের পরিচয় দেয়? পরিচয় কি দেয় যে সে বিজ্ঞানী কিম্বা ঐতিহাসিক কিম্বা দার্শনিক কিম্বা সমাজতত্ত্ববিদ? সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যশ্রষ্টার এই খণ্ড পরিচয় নেই, আছে তার সস্তার সম্পূর্ণ একটি পরিচয়। বিভিন্ন ধারা মিশে নদী সৃষ্টি হয়—সেই ধারাগুলির কোনো একটি ধারাকে নদী বলা চলে না। ব্যক্তিসস্তার মধ্যেও বিভিন্ন ধারা আছে, সেগুলি পৃথক ভাবেও আছে, আবার মিলিত হয়ে ঐক্যসাধনের দ্বারা একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিসস্তারও সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য এই ঐক্যলব্ধ ব্যক্তিসস্তার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি রচনা করে—পর্ষবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে। চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে। গ্যায়টে উদ্ভিদতত্ত্ব সংক্ষেপে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিদবৃহৎ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গ্যায়টের কিছু প্রকাশ পায়নি অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গ্যায়টে যে-সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গ্যায়টের অংশও অলঙ্কিত মিশ্রিত ভাবে তার মধ্যে আছে।

অন্তরের বিভিন্ন ধারার মিশ্রণে ও ঐক্যসাধনে সস্তার যে অপূর্ণ নদী ব্যক্তির অন্তরে প্রবাহিত তারই পরিচয় দেয় সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা

আশুতোষ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের বিভিন্ন রচনা গভীর ভাবে অনুসরণ করলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর মানসপ্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। সেইজন্তু কেউ তাঁকে উপনিষদের মন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেছেন, কেউ আবার পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের প্রভাব তাঁর উপর অনুভব করেছেন। ভারতীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে, তাঁরা কেউ তাঁর উপর বৌদ্ধ ধর্ম এবং কেউ কালিদাসের সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধের প্রভাব কল্পনা করেছেন। কেউ আবার তাঁর মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জীবন এবং সৌন্দর্য দর্শনের সমন্বয় অনুভব করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপর মহত্ব আরোপ করবার আগ্রহেই জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বলে কীর্তিত হয়েছে, তার সঙ্গেই তাঁর যোগ আরোপ করা হয়েছে। সেই উৎসাহের প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে একটি অত্যন্ত ছোট কথা আমরা প্রায় বিশ্বস্ত হয়ে থাকি যে বাঙালী এবং মূলতঃ বাঙালীর প্রাণরসেই রবীন্দ্রসাধনা পরিপুষ্ট লাভ করেছে। অনেকেই এ কথা মনে করতে পারেন যে, এ কথাটা বাড়িয়ে বললে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব কিংবা তাঁর বিশ্বপ্রমিত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, কিন্তু তা সত্য নয়। কবির ভাব এবং ভাবনার একটা প্রত্যক্ষ অবলম্বন আবশ্যিক। এ কথা সত্য জগতের প্রত্যেক মহৎ কবিই বিশ্বমানবের কথাই বলে থাকেন, বিশেষ কোনো যুগে কিংবা দেশে আবদ্ধ যে মানুষ কেবলমাত্র তার কথাই বলেন না; রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন; সেইজন্তু তিনি মহৎ কবি এবং বিশ্বকবি। এ কথা আশা করি কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে মহৎ কবি মাত্রই বিশ্বকবি—কারণ, কবিত্বের যেখানে সার্বকতা সেখানে দেশ এবং কালের সর্কারিতা থাকে না। সেইজন্তু বিশ্বকবি বলে রবীন্দ্রনাথের একটা আলাদা জাত নির্দেশ করা যায় না। কবিকে একটা কিছু আশ্রয় ক'রে বিশ্বের চিরকালের দরবারে গিয়ে পৌঁছতে হয়, তাঁর আশ্রয় জীবন এবং সে জীবন প্রত্যক্ষ জীবন; কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ভাব-সর্বস্ব জীবন নয়। কবির মনোভাবকে আশ্রয় করবার জন্তু তাঁর যে বস্তুকে অবলম্বন করবার আবশ্যিক হয় তা তাঁর নিজের দেশ এবং তাঁর নিজের দেশের মানুষ। নিজের দেশের ভাষার মতই নিজের দেশের মানুষ এবং তার চিন্তা ভাবনা কবির কাব্যরচনার পক্ষে অপরিহার্য। সেখান থেকেই কবির বিশ্বযাত্রার আরম্ভ হয়। এই আশ্রয়কে যে কবি যত দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করতে পারেন, তাঁর বিশ্বের পথে যাত্রা ততই সহজ হয়; এখানে যদি তাঁর আন্তরিকতার কিছু মাত্র অভাব থাকে, তবে সেই পরিমাণেই তাঁর বিশ্বের পথে যাত্রা পদে পদে কঠিন হয়ে উঠে। সেক্ষণীয় বিশ্বকবি হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডকে তাঁর সাহিত্যসাধনার সূদৃঢ় অবলম্বন ক'রে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে যখন ভারতীয় উপনিষৎ কিংবা বিদেশী কোনো সাহিত্যের ভাবনা, তাঁর মনের উপর কোনো স্থল্পষ্ট প্রভাব স্থাপন করতে পারে নি এবং যখন তিনি উন্মুক্ত মন নিয়ে বিশ্বের দিকে বিশ্বাসে তাকাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর মনের মধ্যে বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবন থেকে স্বতঃ উৎসারিত একটি ভাবনা, তাঁর অন্তরে এসে আশ্রয় লাভ করেছিল—সমস্ত জীবন তিনি তার প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ

করতে পারেন নি। সেই ভাবনাটি সামগ্রিক ভাবে বাঙালীর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল বলে বাঙালীত্বের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের তরুণ কবিমানসে স্বভাবতঃই অনুরণিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের সাড়া অনুভব করেছিলেন—তা বাংলার বাউলের গান। তখন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২২ বৎসর।

সেই সময় বাউল গানের একটি সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়ে। মাত্র কিছুকাল আগে ‘প্রভাত-সঙ্গীত’ কাব্যগ্রন্থের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতার ভিতর দিয়ে যেমন তিনি অন্তরের অবকল্প ভাব-রাশির আকস্মিক মুক্তিজনিত এক উদাস উল্লাস অনুভব করেছিলেন, তেমনই এই বইখানি হাতে পেয়ে তার মধ্যে যেন নিজের অন্তরের ভাব এবং ভাবার সন্ধান পেয়ে তেমনই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’এর মতই আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি ‘বাউলের গান’ সম্পর্কে ‘ভারতী’ পত্রিকায় আত্মকথার মতো করেই লিখলেন।

‘এমন কোনো কবির কথা শুনা গিয়াছে, বাহার জীবনের প্রায়স্ত ভাগে পয়ের অনুরণন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয়, যেন তাহা কোনো একটি বাধা রাগিনীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে, চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, সহসা নিজের যেখানে মর্মস্থান, সেইখানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাহার বিনাশ নাই। এ বার তিনি যে গান গাহিলেন, তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম—বাঃ এ কি শুনিলাম! এ কে গাহিল! এ কি রাগিনী! এতদিন তিনি পয়ের বানী ধার করিয়া নিজের গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার সকল স্বর কুলাইত না। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না, যাহা বাজাইতে চাহি, তাহা বাজে না কেন! সেটা যে বানীর দোষ! ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের মধ্যেই একটা বাজ আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন, কহিলেন, এ কি হইল! আমার গান পয়ের গানের মতো শোনায় না কেন? এতদিন পরে আমার প্রাণের সকল স্বরগুলি বাজিয়া উঠিল কি করিয়া? আমি যে কথা বলিব মনে করি, সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে।’^১

এই কথা রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেরই স্বীকারোক্তি, নিজের জীবনেরই কথা। এর প্রথমার্শে যে একজন কবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই কবি তিনি নিজে, এ বিষয় বুঝতে ভুল হয় না। ‘রবীন্দ্র জীবনী’ রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন—‘এই প্রবন্ধের (‘বাউলের গান’) আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা সম্পর্কে যে মন্তব্যটুকু করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই কাব্যজীবনের কথা।’^২ যদি তাই হয়, তবে রবীন্দ্র-কবিমানস বুঝবার পক্ষে তাঁর এই উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো রবীন্দ্র-সাহিত্যসমালোচকই তাঁর এই স্বীকারোক্তির উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ ক’রে—তাঁর সাহিত্যের আজ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের সূত্রপাত থেকেই তাঁর অন্তরের নিজস্ব ভাষা এবং তার ভাবের সন্ধান ক’রে ফিরেছেন। বাইরের সাহিত্য এবং দর্শনের যে প্রভাব তার উপর এসে তখন থেকেই পড়তে

১ ‘রবীন্দ্র রঃনাবলী’ ১০, ৬৪২-৪৩

২ ‘রবীন্দ্র জীবনী’ ১ (১০৬৭), ১০৬

আবিস্তর করেছিল, তা তিনি কিছুতেই নিজের বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রজীবনের মধ্যে এ বিষয়টি গভীর ভাবে ভেবে দেখবার মতো। বাংলার বাউলের গানে যে ভাব এবং ভাবার ব্যবহার তিনি সে দিন দেখতে পেলেন, তার মধ্যেই নিজের ভাব এবং ভাবার তিনি সন্ধান পেলেন বলে এখানে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যসাধনার সূচনাতেই ব্যাকুল হয়ে অন্তরের মধ্যে যে ভাব এবং ভাবার সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছিলেন, বাউলের গানের মধ্যেই তিনি তার প্রথম সন্ধান পেলেন। রবীন্দ্র-সাধনার ধারা অনুসরণ করবার জন্য তাঁর এই স্বীকারোক্তি যে কতদূর মূল্যবান তা বিস্তৃত বিশ্লেষণ ক'রে না বুঝালেও চমুতে পারে। বান্দীকি আদি শ্লোকের মধ্যে যেমন তাঁর ভাব এবং ভাবার প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাধনার পথে অগ্রসর হবার প্রথম পাদক্ষেপেই যেন এই অনুভূতি এবং বিশ্বাস লাভ করেছিলেন। অথচ আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে তখনও কোনো ঔপনিষদিক চিন্তা প্রবেশ করে নি; তখনও কোনো আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা তাঁর তরুণ মনের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় নি; যে কয়টি মাত্র বাউল গান সে দিন তাঁর হাতে এসে পড়েছিল, তার ভিতর থেকেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের যে লক্ষ্য বিশ্বপ্রেম তারও প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিশ্বপ্রেমের চেতনা যে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা লব্ধ নয়, এমন কি আমাদের দেশের নিরক্ষর বাউল ভিখারীর মুখেও যে একদিন তা প্রকাশ পেয়েছিল তা তিনি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। তিনি এই বিষয়ে লিখছেন—

‘...Universal love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভালো শুনার, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের ঘরে ঘরে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইয়াছে।’^৩

বাউলের বিশ্বপ্রেমানুভূতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরাশ্রিত বিশ্বপ্রেমানুভূতির প্রথম স্পন্দন অনুভব করেছিলেন, এ কথা মনে করা ভুল হবে না। বাউলের বিশ্বপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিশ্বপ্রেমের আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে। ঈশ্বরানুভূতির ভিতর দিয়া বাউলের বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শে বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি ঈশ্বর নিরপেক্ষ এবং একান্ত মানবতা-নির্ভর। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের অনুভূতিও আধ্যাত্ম অনুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতির ভিতর দিয়েই সার্থকতা লাভ করেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ যেমন পাশ্চাত্য মানবতাবোধ নয়, ভারতীয় আদর্শের উপরই তার একান্ত নির্ভর, তাঁর বিশ্বপ্রেমের অনুভূতিও তাঁর ঈশ্বর ভাবনার উপর নির্ভরশীল। বাউলের সাধনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপ্রেমানুভূতির প্রথম প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলেই তার মধ্যে অধ্যাত্মভাব-নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য মানবতাবোধের প্রেরণা অনুভব করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ‘বাউলের গান’ সংগ্রহটির ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে বাউলের বিশ্বপ্রেম তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনের আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছিল; তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে বাংলার বাউলের প্রেমতত্ত্বই নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলে অনুভব করা যায়। ভারতীয় উপনিষদ কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের কোনো প্রভাব যখন পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়বার সুযোগ পায় নি, তখনই তিনি বাংলার বাউলের ভাবনা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এই অন্তর্ভুক্তিই সেই প্রভাব সূত্রভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এখানেই বিষয়টির যথার্থ গুরুত্বও প্রকাশ পেয়েছে।

‘বাউলের গান’ প্রবন্ধটির মধ্যোই রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বপ্রথম অধ্যাত্মচিন্তারও প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রমানসে অধ্যাত্মচিন্তার উৎস সন্ধান করতে গেলে উপনিষদ কিংবা কোনো পাশ্চাত্য দর্শনের পরিবর্তে এখানেই তা সন্ধান করতে হবে। এমন কি, তাঁর মধ্যে পরবর্তীকালে উপনিষদের চিন্তা যখনই স্থান লাভ করেছে, তখন তাকে তিনি বাউল সাধনতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বয় সাধন ক’রে নিয়েছিলেন উপনিষদিক তত্ত্বের সঙ্গে যেখানে বাউল তত্ত্বের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি উপনিষদের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন, তিনি সাধারণতঃ উভয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধের সন্ধান পান নি। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভারতীয় অভিজাত দর্শন ও উপনিষদের সঙ্গে নিরক্ষর বাউলের সাধনতত্ত্বের সার্থক তুলনা করেছেন। এ জীবনের গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকে নিরক্ষর বাউল সাধকে এবং ভারতীয় ঋষিদের মতো যে কোনো পার্থক্য নেই, এ কথা তিনি বারবার অমুত্ব করেছেন।

বাউল সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথমদিকেই উক্ত বাউল গানের সংগ্রহটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তা তাঁর জীবনের একটি নিত্যস্থ সাধারণ গতাত্মিক ঘটনা বা passing phase মাত্র নয়। ‘বাউলের গান’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরও রবীন্দ্রনাথ মূহুর্মূহ মনঃকক্ষের বাউল গান সংগ্রহের ডুম্বিকা লিখতে গিয়ে নিজেই স্বীকার করেছেন—

‘আমার লেখা ধারা ধারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অমুগ্ধ আগ্রহ আমি অনেক লেখার প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, বাউলের দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ’ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্তঃস্বরাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে ঐত সহজ হয়ে মিশে গেছে।’^৪

রবীন্দ্র-সাধনার মূল প্রকৃতি এবং তার ভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর এই স্বীকারোক্তির উপর এ পর্যন্ত কেউ ত্রুটিও আরোপ করেন নি। কিন্তু তাঁর এই উক্তি ‘বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে ঐত সহজ হয়ে মিশে গেছে’ অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। ‘সহজ হয়ে মিশে যাওয়ার’ অর্থ এই যে তিনি তাকে নিজের সাধনার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাক্ষরিত ক’রে নিয়েছিলেন এবং সেই স্বাক্ষরিত ঐত সহজ হয়েছিল যে তিনি সে বিষয় অনেক সময় সচেতনও ছিলেন না। তিনি বাউলের কণ্ঠে নিজের জীবনের সূচনাতেই যে বাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে উপনিষদের মধ্যেও তারই সমর্থন পেয়ে বিশ্বয় প্রকাশ করেছেন, বাউলের গানের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় উপনিষদকে দেখেছেন। এই সম্পর্কেও তিনি নিজেই বলেছেন—

‘আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই একটা বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মাতুষ যেহে !
হাওয়ায়, সেই মাতুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু স্বরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে—‘তং বেজং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো—নইলে যে মরণ-বেদনা। অপত্তিতে মূখ্যে এই কথাটিই শুনলুম, তার গৌরো স্বরে সহজ ভাষায়—যাকে সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা—অঙ্ককারে যাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার স্বর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। ‘অন্তরতর যদয়মাত্মা’ উপনিষদের এই বাণী এঁদের মুখে যখন মনের মাতুষ বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল।’^৫

বাংলাদেশের অবহেলিত পল্লী জীবনে সীমাবদ্ধ নিরঙ্কর বাউলের গানের মধ্যে ঔপনিষদিক সত্যের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলকে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে মনে করেছেন, উপনিষদের মধ্যে যাকে ‘বেজং পুরুষং’ বা জানবার পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বাউল গানে তাকেই বলে মনের মাতুষ। উপনিষদে যেমন পুরুষকে জানবার বা চিনবার কথা আছে বাউল গানেও তাকে অন্বেষণ ক’রে নেবার কথা আছে, উপনিষদের পুরুষকেও মনের মধ্যেই জানতে হবে, তাকে না জানা মৃত্যু যন্ত্রণা, বাউলের মনের মাতুষও রবীন্দ্রনাথের মতে তাই, তাকে অন্বেষণ ক’রে না পাওয়ার দুঃখের মতো আর দুঃখ নেই।

বাউল সম্পর্কিত এই ধারণা যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়েছিল, একটি সাময়িক ভাবাবেগ মাত্র ছিল না, তা তাঁর পরবর্তী জীবনের আরও কয়েকটি উক্তি থেকে জানতে পারা যায়।

১৯৩৩ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত কমলা বকুতা মালার ‘মাতুষের ধর্ম’ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং অধ্যাত্ম ধ্যানধারণা সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান হয়ে আছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের জীবন এবং ধর্মবোধ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি এবং বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। কবি যে ভাবে সারা জীবন ধরে মাতুষ এবং তার ধর্মের বিষয়ে উপলব্ধি করেছেন, এখানে তিনি তাঁর অকপট অভিব্যক্তি রেখে গেছেন; শুধু তাই নয়, এ কথাও মনে করা কিছু মাত্র অসঙ্গত হবে না যে, যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের বহিমুখী আচারমূলক কোনো ধর্ম নিজে পালন করেন নি, তথাপি তাঁর নিজের মনে ধর্ম বিষয়ে যে ধারণা ও বিশ্বাস ছিল এবং যা তিনি মনে মনে পালন করেছেন, এখানে তারই অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছে। তাতে দেখা যায়, প্রথম জীবনেই বাংলার বাউল সম্পর্কে যে বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছিল, তা তাঁর পরিণত জীবন পর্যন্তও বিন্দুমাত্র শিথিল হয়ে যায় নি। এই বিশ্বাসের প্রতি তাঁর আত্মগত্য যে তাঁর সমগ্র জীবন ব্যাপী স্থায়ী ছিল এবং তা দ্বারাই যে তাঁর সকল সৃষ্টিকর্ম এবং জীবনের ধ্যানধারণা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এখানে

তারই নিদর্শন পাওয়া যায়। মানুষের আরাধ্য দেবতা কে বা কি? এই সম্পর্কে অসুস্থান ক'রে রবীন্দ্রনাথ যে সত্য পৌঁচেছিলেন, তার বিষয় তিনি স্থম্পট ভাষায় তাঁর উক্ত বক্তৃতায় বলেছেন।

‘মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই, সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর ক'রে দিবে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিরেই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপন-হারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম, পথিক ভিখারীর মুখে,

আমি কোথায় পাব তারে,

আমার মনের মানুষ যেরে।

হারারে, সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে

দেশে-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরঙ্কর গায়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম,—

তোমাই ভিরে অতল সাগর।

সেই গানই গেয়েছিল,—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

এমন কি, রবীন্দ্রনাথ বেদের মধ্যেও বাংলার নিরঙ্কর বাউলের এই ভাবটির সন্ধান পেয়েছিলেন বলে অনুভব করেছেন। তিনি লিখেছেন—সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে: ‘আবিরাবির্ম এধি।’ পরম মানবের বিরাট রূপে ধীর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তার প্রকাশ সার্থক হোক।^৬

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অর্থাৎ বেদের সঙ্গে বাউল তত্ত্বের ঐক্যের অনুভূতি যে বিন্দুমাত্রও অতিরিক্ত তা নয়। কারণ, ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দুই কারণেই বাউলগানের উপর বৈদিক ভাবাদর্শের প্রভাব থাকতে পারে। ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তাধারার মূল উৎস যদি আমরা বেদকেই মনে করি, তা হলে তার ঐতিহ্যের দ্বারা যে যুগ যুগ ধরে কতভাবে কোন কোন পথে ভারতীয় ধ্যানধারণার মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, তা কেউ বিচার কিংবা বিশ্লেষণ ক'রে বলতে পারবে না। নিরঙ্করতা সুগভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির কোনদিনেই অন্তরায় নয় বাউলের সাধনা শুকুমুখী সাধনা, স্তব্ধতা সাধক শুকুর অন্তর্দৃষ্টিতে যে সত্য একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তাই শিথ পবনস্বরায় বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যায়। তা সব সময় জ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে, তা নয়, অনেক সময় অজ্ঞাতেই তা হয়। সেই অল্প নিরঙ্কর বাউলের সাধনার মধ্যে সুগভীর আত্মোপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পায়। শুধু বাউলের মধ্যেই নয়, ভারতের অন্য কোনো সাধকের মধ্যেই তা হয়ে থাকে, কারণ, প্রত্যেকেই এক অথও ভারতাত্মার উত্তর সাধক। সেই অল্প ভারতীয় উপনিষদ এবং দর্শনচিন্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাউলের বাণীর সন্ধান পেয়েছেন।^৭

রবীন্দ্রনাথের জীবনে যখনই কোনো অধ্যাত্ম চিন্তার অবকাশ এসেছে তখনই তিনি তার মধ্যে বাউলের তত্ত্ব এবং ভাবনাকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর জীবনের যে পর্বে তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মচিন্তার প্রবলতম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, সেই যুগে তাঁর মধ্যে বাউল সাধনার স্পষ্টতম প্রকাশ দেখা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'গীতালি' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমালা' রচনা করেন তখনই তাঁর মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার প্রবলতম প্রকাশ দেখা দিয়েছিল বলে সকলেই মনে ক'রে থাকেন। সেই যুগে যে নাটকগুলো তিনি রচনা করেছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই এক একটি ক'রে তিনি বাউল চরিত্রের অবতারণা করেছেন। তার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকেই এই যুগের নূতন নাটকগুলো রচনার সূচনা হয়, এই যুগের নাটকগুলো সাধারণভাবে রূপক এবং সাম্প্রতিক নাটক বলে পরিচিত, তাদের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই বাউল নামেই হোক, কিংবা অন্য কোনো নামেও বাউলের আচরণেই হোক, একটি বাউল চরিত্র অনিবার্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার সংগীতে এবং আচরণে তিনি বাংলার বাউলের রূপটি ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য এই শ্রেণীর চরিত্রগুলোকে সামগ্রিকভাবে খুব খুঁটিয়ে বিচার ক'রে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, প্রকৃত বাউলের যা গুণ, পুরোপুরি তা তাদের মধ্যে রক্ষা পায় নি, তথাপি তাদের আদর্শেই যে রবীন্দ্রনাথ তাদের কল্পনা করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি, বাউল তত্ত্বের উপর তিনি সে যুগের তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন তার নাম 'রাজা'। বৌদ্ধ আখ্যান থেকে তিনি 'রাজা' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাংলার বাউলের ভাবটি তার উপর আরোপ ক'রে নিয়ে তাকে তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি রূপে গড়ে তুলেছেন। একটি বাউলগানে আছে, 'সে যে কথা কয় দেখা দেয় না'; এই ভাবটিকেই তিনি বৌদ্ধ আখ্যায়িকাটির ভিতর দিয়ে প্রকাশ ক'রে তার মধ্য দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম ধ্যানধারণার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। কারণ, সে যুগে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনে যে অধ্যাত্ম বিশ্বাস জরাজীর্ণ করেছিল, তা সে যুগের তাঁর রচিত কাব্যনাটকগুলোর ভিতর দিয়ে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাউল গানের তত্ত্বকথা রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবেই আকর্ষণ করুক না কেন, তার বাক্সালাভাব এবং ভাবের ভাষাই সর্বপ্রথম তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল। আগেই বলেছি, যা কিছু বাংলার এবং বাঙালীর তাই তাঁর সর্বজীবনের আকর্ষণের বিষয় ছিল, কারণ, তার মধ্যে তিনি নিজের চিন্তার স্পন্দন অনুভব করতেন। পাশ্চাত্য জীবনের প্রবলতম প্রভাবের সামনেও রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র এই বিশ্বাসের ফলেই জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা ক'রে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিনকার বাংলা সাহিত্য যে সমৃদ্ধিই সৃষ্টি করুক না কেন, তাতে যে 'বাক্সালাভাব ও ভাবের ভাষার' অভাব ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে এবং যখন তিনি চারিদিকে তারই সন্ধান ক'রে ফিরছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি বাউলগানগুলোর সন্ধান পেলেন। 'বাক্সালাভাব এবং ভাবের ভাষার' ভিতর দিয়ে যখন তিনি তাদের অন্তরলোকে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের সঙ্গে নিজের অন্তরতম যোগ অনুভব করলেন। তাদের সঙ্গে ক্রমাগতই তাঁর যোগ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগল।

বাংলার বাউল সাধনার বহির্মুখী পরিচয়ে একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করা যায়। তার মধ্যে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পূর্ববাংলার যে সকল বাউলগান এবং বাউল সাধকের সংস্পর্শে এসেছিলেন, পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বাস করবার সময় তাদের সঙ্গে আর

কোনো সংযোগ রাখতে পারলেন না। বৌদ্ধদের যে বাউল গান তখন তাঁর গুনবার কিংবা সেখানে যে বাউলের আচার আচরণ তাঁর প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল, তা পূর্ববাংলার বাউল গান কিংবা বাউলের আচারের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র। পশ্চিম বাংলার বাউল সাধনা চৈতন্য ধর্ম দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একদিনে যে বাউলকে তিনি তার মনের মানুষ সন্ধান করবার মধ্যে আত্মহারা হতে দেখেছেন, সেদিন তিনি আর সে বাউলকে তিনি খুঁজে পেলেন না; তার আচার জীবনে কিংবা সংগীতের ভাবে তিনি নতুন রূপ দেখতে পেলেন, তা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করতে পারলে না। সেই জন্ম পরবর্তী জীবনেও যখন তিনি বাউল গানের উল্লেখ করেছেন, তখনও সেই যে প্রথম যৌবনে একদিন পদ্মাতীরে যে বাউলের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার কথা এবং তার বাণীই তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

বাউল সাধনার সঙ্গে কতকগুলো অত্যন্ত জটিল আচার ক্রমে জন্ম লাভ করে; সেগুলো সব বাইরের জিনিস হলেও তা দিয়ে এই সাধনার যে একটি স্বচ্ছ ধারা ছিল, তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আচারের মধ্যেই যে সকল ধর্মের মূল সত্যের সমাধি হয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত বাউল সাধনারও তাই হয়েছিল। কিন্তু তথাপি রবীন্দ্রনাথ এ কথা বুঝতেন যে ধর্মের সত্য তার আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, বরং তার পরিবর্তে মানুষের স্বচ্ছ মানসমুহুরেই তা প্রতিবিম্বিত হয়; সেই বাউলের আচারজীবনের মধ্যে যাই থাক না কেন, তার জন্ম তার বিষয়ে সত্যোপলব্ধিতে তাঁর কোনো বাধা হয় নি। নতুবা আপাত দৃষ্টিতে বাউলের আচার-জীবন রবীন্দ্রমানসে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করবারই কথা ছিল। কিন্তু হংস যেমন জলের মধ্য থেকেও কীটটুকু সংগ্রহ করতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গুণে বাউল সাধনার মূল আচারজীবনকে অতিক্রম ক্রমেও তার শাস্ত সত্যের লোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

স্বীকৃতিস্বৰূপ মানবিকতা

হিৰণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১

মানবিকতা কথাটি দৰ্শনের পৰিভাষা হিচাবে নতুন সৃষ্টি হয়েছে। তা বলে যে তত্ত্ব মানুষের স্বার্থ এবং কল্যাণ কেন্দ্রস্থল অধিকার করে তাই মানবিকতামূলক। কিন্তু তা এত বকম বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে আমাদের বর্তমান আলোচনায় কোন অর্থে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে সে বিষয় আমাদের একটি নিশ্চিত ধারণা ক'রে নেওয়া উচিত। তা না হলে আমাদের বর্তমান আলোচনা ব্যাহত হবে কারণ কি বলতে চাই সে বিষয় অস্পষ্টতা এসে পড়তে পারে।

রিউমস সংকলিত দার্শনিক অভিধানে^১ দেখা যায় সাতটি ভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের প্রয়োগ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কোনোটি পঠনের বিষয়, কোনোটি নীতিশাস্ত্রের, কোনোটি দর্শনশাস্ত্রের, কোনোটি ধর্মের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের বিস্তারিত আলোচনার বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে না। আমরা স্পষ্টতই বর্তমান আলোচনায় তাকে ধর্ম-সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করব। সুতরাং ধর্মতত্ত্বের পৰিভাষা হিচাবে তা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটুকু আলোচনা করলেই চলবে। মানবিকতার এই প্রসঙ্গে অর্থ দাঁড়ায় এই যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ বলে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, তবে এই চিন্তায় ঈশ্বরকে একেবারে বর্জন করার প্রস্তাবও হয় নি। মানুষের কল্যাণই এখানে ধর্ম আচরণের মূল অবলম্বন হিচাবে পরিগণিত হয়েছে। ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদের দ্বারা এই তত্ত্ব প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল।

আমরা এই অর্থেই বর্তমান আলোচনায় এই পারিভাষিক কথাটির ব্যবহার করব। অর্থাৎ সেই তত্ত্বকেই মানবিকতাবাদী বলব যা ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ এবং মানুষের সেবাকে প্রধান মূল্য দেয়। তার অর্থ ধর্ম আচরণের লক্ষ্যবস্তু হবে মানুষ। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, নাও পারে। আমাদের আলোচনায় দেখব যে এই ভিত্তিতে এই তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। এক শ্রেণী ঈশ্বরকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মানবিকতা প্রচার করে; আবার আর এক শ্রেণী আছে যা ঈশ্বরকে বর্জন ক'রে বিসৃঙ্খলভাবে মানবসেবার আদর্শই প্রচার করে। প্রসঙ্গত দুই শ্রেণীর মানবিকতার আলোচনার মধ্যেই আমাদের জড়িয়ে পড়তে হবে।

আমরা প্রথমে ঈশ্বর-বর্জিত মানবিকতার একটু পরিচয় দেব। তার সুন্দর উদাহরণ মেলে ফরাসী দার্শনিক কোন্ট-এর নৈশ্চিন্তিক দর্শনে।^২ কোন্ট-এর মনে হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির একটি সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে মনে হয় তিনি এক দোটারায় মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তার প্রভাব তাঁর দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তি হল আমাদের থেকে এক মহত্তর

১ D. D. Rumes, Dictionary of Philosophy.

২ Positive Philosophy.

সত্যকে প্রজ্ঞা নিবেদন ও সেবার আকৃতি। সেটি হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার। প্রচলিত ধর্ম সাধারণত সেই প্রজ্ঞা ও সেবার পাত্র হিসাবে থাকে আমাদের নিকট স্থাপন করে তিনি হলেন ঈশ্বর। কিন্তু প্রায় সেই ঈশ্বরের বিশ্বাসে কি বৃত্তিবৃত্তির সমর্থন পাওয়া যায়? তিনি এ বিষয় অস্বস্তান ক'রে হতাশ হয়েছিলেন। অস্বস্তানের ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হল এই।

তার ধারণায় মানুষের চিন্তা অগ্রগতির পথে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়। প্রথম হল ধর্মচিন্তার অবস্থা।^৩ এই অবস্থায় মানুষ অপ্রাকৃত সত্যের সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চায়। তা বৃত্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। দ্বিতীয় হল দার্শনিক চিন্তার অবস্থা।^৪ এই অবস্থায় বিশ্বের ব্যাখ্যার বেশি হয় বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কতকগুলি বিমূর্ত শক্তির সাহায্যে।^৫ এটিও তার বিবেচনার সম্ভাবজনক ব্যাখ্যা নয়। এই সব তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সম্ভাবজনক ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। তৃতীয় অবস্থা হল নৈচ্ছিক অবস্থা। এখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে কার্যকারণ সম্বন্ধে বিশ্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তার মধ্যমী নিশ্চিত, নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পাওয়া যায়। এই অবস্থায় মন নিরপেক্ষ শক্তির কল্পনাকে ভিত্তি ক'রে বিশ্বের ব্যাখ্যার চেষ্টা না ক'রে, বা বিশ্বের উৎপত্তি কি ক'রে হল বা তার পরিণাম কি হবে— এই ধরনের সমাধানের তা যোগ্য প্রশ্নের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে দৃশ্যমান জগতের কার্যকারণে সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অস্বস্তানে আত্মনিয়োগ করে।^৬ এই তৃতীয় পথেই নিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে। এই দৃষ্টিগুলি দ্বারা অস্বস্তানিত বলেই তিনি তার দর্শনের নাম দিয়েছেন নৈচ্ছিক দর্শন।

এই সিদ্ধান্ত কোড-কে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হতাশ করেছিল। তিনি তার অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পান নি। সে ক্ষেত্রে ভক্তি ও সেবা গ্রহণের অন্ত ঈশ্বরের পরিবর্তে তিনি কাকে নির্বাচন করবেন? ঈশ্বরের শূন্য আসনে কাকে স্থাপন করবেন এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার সমস্যা। তিনি তার সমাধান করেছিলেন সে আসনে মানুষকে বসিয়ে। বিশ্বের সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকেই তিনি ঈশ্বরের আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। বিশ্ব-মানবকে তিনি অভিবাধন জানিয়েছিলেন 'মহাসত্তা'^৭ বলে। এখন ধর্ম আচরণের দুটি অঙ্গ। একটি হল ঈশ্বরকে সেবা করা আর দ্বিতীয়টি হল তাঁকে প্রজ্ঞা ও ভক্তি নিবেদন করা। কোড বিশ্বমানবকে সেবার পাত্র হিসাবে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন আর ভক্তি নিবেদনের অঙ্গ বিশিষ্ট মানুষদের নির্বাচিত করতে বলেছিলেন। যার মানবের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ ক'রে সকলের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করেছেন তাই প্রজ্ঞা নিবেদন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই অভিনব ধর্ম আচরণের রীতি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে বলে তিনি তার

- Theological State.
- Metaphysical State.
- Abstract forces

• 'In the final, the positive state, the mind has given over the vain search of the Absolute motions, the origin and destination of the universe and causes of phenomena and applies itself to the study of there laws.

The Positive Philosophy.

৭ Grand etc.

বৌদ্ধধর্মের মানবিকতা

নাম দিয়েছিলেন মানবিক ধর্ম।^৮ সুতরাং এই ধর্মের মূল নীতি হল ঈশ্বরের পরিবর্তে মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ঈশ্বরের সেবার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ।

প্রাচীন ভারতের চিন্তায় এই পথে সুস্পষ্ট আলোচনা পরিস্ফুট না হলেও দেখা যায় যে তার অনুরূপ প্রকৃতির চিন্তা প্রাচীন কাল হতেই এ দেশে বর্তমান ছিল। অর্থাৎ বৌদ্ধের আকারে এই চিন্তার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উপস্থিতি আবিষ্কার করা যায়। আমাদের প্রতিপাত্যের সমর্থনে দু'একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। ঈশ উপনিষদে আরম্ভ হয়েছে এমন একটি বাণী দিয়ে যা এই ধর্মের চিন্তার পরিপোষক। তাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে কাউকে বঞ্চিত ক'রে ভোগ করবে না, যা পাবে তা ভাগ ক'রে ভোগ করবে। তার যুক্তি হিসাবে এই তত্ত্বটি উল্লেখ করা হয়েছে যে সকলেই একই ঈশ্বরের প্রকাশ।^৯ অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যা একই পরিবারের মানুষের মত তাদের পরস্পরের আপনজন ক'রে দেয়। সে ক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করলে আপনজনকেই বঞ্চিত করার সমমানীয় হবে।

কাজেই এখানে এমন একটি তত্ত্ব পাই যার মধ্যে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সার্বজনীন মানবিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পরোক্ষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ তার প্রেরণা আসছে ধর্মবোধ হতে। তা বলে সকল মানুষ যে একই ব্রহ্মের প্রকাশ। এখানেই পাশ্চাত্য মানবিকতার সহিত ভারতীয় মানবিকতার পার্থক্য। ভারতীয় মানবিকতা ধর্মবোধ হতে বিচ্ছিন্ন হয় নি, পাশ্চাত্য মানবিকতায় ধর্ম হতে তা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

পরবর্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। মহাসংহিতায় গৃহীতে চারশ্রেণীর যজ্ঞ সম্পাদন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে; দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পশুযজ্ঞ।^{১০} এখানে নৃযজ্ঞের অর্থ হল মানুষের সেবা করা। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণমূলক কাজকে ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির শুধু সাহিত্য কেন, সাধারণ মানুষের চিন্তায়ও অনুপ্রবেশ করেছিল। সাধারণ মানুষকে তারা নরনারায়ণ বলে জানে। অর্থাৎ তাদের মনে এই সংস্কার বর্তমান যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে। গরীব মানুষকে দরিদ্র নারায়ণ বলা হয়, তাও জানে। অবহেলিত মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ সে সংস্কারও তাদের মধ্যে বর্তমান। আধুনিক কালের মানবিকতায় যে দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্নিহিত তার প্রতিধ্বনি এই সচরাচর ব্যবহৃত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের সেবা যে ঈশ্বরের সেবার সমমানীয় এই ধারণা এ চিন্তায় প্রতিফলিত।

এমন কি যেখানে ঈশ্বরের সেবার পরিবর্তে মানুষের সেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানেও ঈশ্বরকে একেবারে অবহেলা ক'রে বর্জন করা হয় নি। যার ঈশ্বরের অন্ত নেই তাঁকে দেওয়া নিরর্থক

৮ Religion of Humanity

৯ ঈশাবাস্তবিকং সর্বং বৎ কিং। অগত্যঃ অগৎ ॥ তেন তাস্তেন ভূতীথা। ঈশ। ১১

১০ ঋষিযজ্ঞঃ দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ ৫ সর্বদা।

নৃযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ ৫ বখাশক্তি ন জাপয়েৎ ॥ যশু ॥ ৪ ॥২

এই ধরনের চিন্তাই সেখানে ক্রিয়াশীল। এর স্বন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় নারায়ণ পণ্ডিত রচিত হিতোপদেশে উদ্ধৃত একটি শ্লোক হতে। তা বলে ঈশ্বরকে ধনদাস করার কোনো অর্থ হয় না, ধন দিতে হয় দরিদ্রকে। কারণ ঈশ্বরের তো কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই, তাঁর প্রচুর আছে। যে বোগী তাকেইত ঔষধ খাওয়াতে হয়, যে নীরোগ তার ঔষধ সেবনের কোনো অর্থ হয় না।^{১১}

এই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবিকতা। কৌত স্থাপিত মানবিকতা হতে তার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছিল একটি হতাশার মনোভাব হতে। তিনি ধর্মের ওপর এবং তথা দর্শনের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন এই ধারণায় যে তারা নিশ্চিত ভাগ দিতে অক্ষম। কাজেই মৌলিক সস্তার প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য ধারণা তারা দিতে পারে না। সেই কারণেই তিনি কেবল বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর ক'রে একটি দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশ্রয় নিশ্চিত হতে পারি সেই মানুষকেই ঈশ্বরের আসনে বসানো হয়েছিল এবং ঈশ্বরের উপাসনার পরিবর্তে মহামানবকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সর্বমানবের সেবাকেই ধর্মাচরণের প্রকৃত রীতি বলে গ্রহণ করা হয়েছিল।

অপরপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তা দর্শনের জ্ঞান অর্জনের শক্তির অপর বিশ্বাস হারায় নি। ঐশ্বর্যবাদীর ঈশ্বর রূপেই হক বা সর্বব্যাপী ব্রহ্ম রূপেই হক এক মৌলিক সস্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস তার অক্ষুণ্ণ ছিল। ঈশ্বরকে স্বীকার করেই তার মানবিকতা গড়ে উঠেছিল। এই চিন্তায় ধর্মের অঙ্গ হিসাবেই মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কারণ তার ধারণা মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। কাজেই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত মানবিকতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ তা ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাস খানিকটা তাঁর পারিবারিক পরিবেশ খানিকটা তাঁর নিজস্ব মতিগতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাঁর শৈশব এবং কৈশোরে তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে একটি নতুন ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পরিবারের সকল মানুষ গভীরভাবে ধর্মে অঙ্গপ্রাণিত ছিল। তার প্রভাব নিশ্চয় তাঁর ওপর বিস্তারিত হয়েছিল। অতিরিক্ত ভাবে তাঁর নিজের মধ্যে যেমন মনীষা তেমন হৃদয়বৃত্তির অনঙ্গসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল। কাজেই স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ ক'রে নিজের মতিগতির পথে তিনি ঈশ্বরকে নিজস্ব রীতিতে ভক্তি করতে শিখেছিলেন।

প্রথমে তাঁর পারিবারিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বরের ভক্ত। তিনি বাল্যে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সন্নিধি লাভ করেছিলেন এবং তাঁর পরলোক গমনের পর সচল স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এই

১১ দরিদ্রানু ভক্ত কৌন্তের বা যদেবরে ধনম্।

যোগিনঃ পথ্যমৌষধং নীরজন্ত কিসৌবধেঃ।—হিতোপদেশম্।

সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেকালের প্রায় সকল গুণী মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ভ্রাতৃগণ এই নতুন ধর্মকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁদের বাড়ী ও পরিবারকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই ধর্মের পরিবেশ যে তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সময় তিনি যে ব্রহ্মসংগীতগুলি রচনা করেছিলেন তার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময় রচিত তাঁর একটি ব্রহ্মসংগীত তাঁর পিতাকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তখন কবিকে আর্থিক পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।

আর এখানেই এ বিষয়টি পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত যে এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তা ও মতিগতিই তাঁর নিজস্ব ধর্ম মতটিকে গড়ে তুলেছিল। পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব সম্ভবতঃ তাঁর ধর্ম-প্রবণতাকে পরিবর্তিত করার মধ্যে সীমিত ছিল। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তিনি স্বাধীন পথে নিজের ধর্মচিন্তার চর্চা করে গেছেন। তিনি বলেছেন—‘আমাদের পরিবারের যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংশ্লিষ্ট ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।’^{১২} ঠিক বলতে কি তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রতি আকর্ষণ এ পথে তাঁকে যেতে দেয় নি। বহির্বিশ্ব হতে যে বার্তা আসে তাকে গ্রহণ করার জন্য তিনি মনের দরজা সব সময় খোলা রাখতেন। তাঁর গভীর মনোবা তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে ক্ষমতা রাখত। তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মন বহির্জগতের সকল আস্থানে সাড়া দিতে পারত। পায়ের তলায় দলিত সামান্ত তৃণখণ্ড যেমন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তেমন সূদূরের ব্যাকুল বাশরীর আস্থানেও তিনি সাড়া দিতেন। তাঁর মনের ব্যাপক গ্রহণশক্তি নানা বিপরীতধর্মী বিষয়কে এক নজরে দেখে নেবার ক্ষমতা রাখত। তিনি একই সাথে আকাশ ভরা সূর্যতারা এবং বিশ্বভরা প্রাণের মিলিত বিশ্বয়কে যুগপৎ বন্ধে অম্লভব করতে পারতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে আনন্দ পেত। এই ভাবে তার ধীশক্তি এবং প্রখর অম্লভূতিশক্তি এবং সর্বোপরি ঐকান্তিক বিশ্বয়বোধ তাঁকে ধর্মতত্ত্ব এবং দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

কাজেই এটা দেখে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই যে তাঁর রচনার এক বিরাট অংশ জ্ঞানজগতের এই মৌলিক প্রশ্নগুলির সহিত জড়িত হয়ে পড়েছে। তাঁর উপস্থাপন ও গল্পগুলি ছাড়া বোধ হয় তাঁর সকল রচনাই অল্পবিস্তর দার্শনিক ও ধর্মসম্পর্কিত চিন্তার সহিত জড়িত হয়ে পড়েছে। তাঁর কবিতার ত কথাই নেই, এমন কি তাঁর নাট্যগুলিতে তার প্রভাব স্পষ্ট। মনে হয় এর ফলে তাঁর রচনায় একটি একটি গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা ধীরে ধীরে তাঁর মনের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে। ঠিক বলতে কি তাঁর ধর্মচিন্তার পরিণত রূপটি তাঁর আজীবন সাধনার ফল। তরুণ বয়সেই তার সূত্রপাত এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তা পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। এই পথে তাঁর চিন্তা গতিশীল।

এই অবস্থা হতে একটা সুবিধা এসে পড়ে। তাঁর রচনায় তাঁর চিন্তাগুলি প্রতিফলিত থাকায় তাদের মধ্য হতে আহরণ করে তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা যে পথে বিকাশ লাভ করেছে তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সম্ভবত গড়ে তোলা যায়। তাঁর রচনার সাহায্যেই তাঁর মনের চিন্তাধারার যে

পরিচয় পাওয়া যায় এ বিষয় মনে হয় তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন। তাঁর একটি মন্তব্য হতে আমাদের এই প্রতিপাত্ত সমর্থিত হবে। মন্তব্যটি ইংরাজিতে লিখিত। স্বতরাং তার বাংলা অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত হল :

‘শুধু দার্শনিক তব হিসাবে নয় একটি ধর্ম-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা রূপেও মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে চেতনা আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। ঠিক বলতে কি আমার অপরিণত তরুণ বয়সের প্রথম রচনা হতে আরম্ভ ক’রে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমার লেখার একটি বিরাট অংশ এই বিকাশের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক পরিচয় দেয়।’^{১৩}

একটু আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর ধর্মসম্পর্কিত তথা দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস অলঙ্কিতভাবে তাঁর কথাসাহিত্য ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সাহিত্যেই অল্পবিস্তর লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় তাঁর কবিতাগুলি সম্পর্কে এই কথা আরও বেশী খাট। তার কারণ সহজেই ধরা যায়। তিনি স্বভাবত কবি ছিলেন। কবির চিন্তা সাধারণ দার্শনিকের মতো নীরস যুক্তির পথে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন ক’রে সংঘটিত হয় না। তিনি ছিলেন অনন্তসাধারণ কবি। বুদ্ধিবৃত্তি হতে তাঁর হৃদয়বৃত্তি ছিল প্রবলতর শক্তি। তিনি যা ভাবতেন তার প্রকাশ ঘটত অমুভূতি আকারে এবং এই অমুভূতিই তাঁর কবিতাগুলির প্রেরণা হয়ে তাঁর রচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করত। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে তাঁর সাধনজীবনের ইতিহাস অতি স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে যায়। এই কারণে কি ভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছিল তাঁর কবিতার মধ্যেই তার একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অন্য রচনার তার সামগ্রিক রূপটি এমন ভাবে ধরা পড়ে না, তবে তার সমর্থন পাওয়া যায়। অবশ্য আমাদের এই মন্তব্য হতে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না, যে তাঁর কবিতা কেবল ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বের এমন জিনিস নেই যার আবেদনে তাঁর সংবেদনশীল মন সাড়া দিত না। তা বহু বিচিত্র পথে প্রবাহিত। আমাদের মন্তব্যের অর্থ এই যে তাঁর কবিতার মূল স্রোতটি প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে।

এই প্রসঙ্গে তাঁর এই শ্রেণীর কবিতা সম্বন্ধে আর একটি অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির চিন্তা এবং অমুভূতি একটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র ক’রে আবর্তিত হয়েছে। তা হল ঈশ্বরের প্রীতিকে ভিত্তি ক’রে তাঁর সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের আকৃতি। তরুণ জীবনেই এই ভাবটি তাঁর মনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক’রে বসেছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁর সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত ক’রে ধীরে ধীরে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই মূল ভাবটির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে তাঁর প্রথম জীবনে রচিত প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে। তখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক সর্বব্যাপী সত্তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন এবং তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আকৃতি মনে অনুভব করেছিলেন। তাঁর মধ্য জীবনের কবিতায় জীবনদেবতা রূপে কল্পিত এক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরের সহিত মিলনের আকৃতি তাঁর কবিতার মূল প্রেরণার ভূমিকা অধিকার করেছিল। পরিণত বয়সে তাঁর কবিতায় যে উপলব্ধিটি পরিষ্কৃত হয়েছিল তা বলে মানুষকে

শ্রীতি ক'রে এবং সেবা ক'রেই এই মৌলিক আকৃতির সর্বাত্মক তৃপ্তিসম্পাদন সম্ভব। মৌলিক সস্তার প্রতি আকর্ষণ এবং তার সহিত শ্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছাই এই ভাবে তাঁর মনে একটি স্থায়ী আকৃতির রূপ নিয়ে আত্মজীবন ক্রিয়াশীল ছিল। বিভিন্ন অবস্থায় শ্রীতি ও সেবার পাত্রে পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু লক্ষ্য একই রয়ে গেছে। তাঁর শ্রীতির আত্মপদ রূপে যিনি গৃহীত হয়েছিলেন তিনি প্রথমে ছিলেন এক নৈব্যক্তিক প্রচ্ছন্ন শক্তি, পরে তাঁর স্থান অধিকার করেছিলেন ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং পরিণত জীবনে তাঁদেরই প্রকাশ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বমানবের মধ্যে। এই ভাবেই তাঁর সাধনজীবনে তাঁর নিজস্ব মানবিকতা তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল।

এই কারণে তাঁর কাব্য একটি অনন্যসাধারণ গুণে মণ্ডিত হয়েছে, কাব্যই তাঁর সাধনজীবনের ইতিহাস রচনা করেছে। তার আত্মবঙ্গিক ফল হিসাবে প্রথমত আমাদের এই সুবিধা হয়েছে যে তাঁর কবিতার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। খুব কম কবির কবিতায় এমন গুণ দেখা যায়। তাঁর মূল চিন্তা বা ভাবনাটি যেমন বিকাশ লাভ করেছে তেমন তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু তার সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষা ক'রে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে তাঁর কাব্য শুধু গতিশীল হয় নি, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ তাঁর কবিতা বিকাশধর্মী হয়েছে।

দ্বিতীয়ত আত্মবঙ্গিক ভাবে তাঁর কাব্য সাধনজীবনে-লব্ধ অভিজ্ঞতার বাহনের ভূমিকা গ্রহণ করায় তার মধ্যে তাঁর কাব্যের সঙ্গে তার ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তার মিলন সংঘটিত হয়েছে। তাঁর কাব্য হতেই তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তার একটি ধারাবাহিক পরিচয় মিলে যায়। তাঁর কাব্য এবং তাঁর সাধনা এই ভাবে পাশাপাশি হাত ধরাধরি ক'রে সমান্তরাল পথে অগ্রসর হয়েছে। এটি প্রথম জীবনে তাঁর অজ্ঞাতে ঘটেছিল, তবে পরবর্তী জীবনে তিনি সে বিষয় সচেতন হয়েছিলেন। এ বিষয়টিকে তিনি তাঁর নিজস্ব মনোহর ভাষায় একটি রূপক প্রয়োগ ক'রে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর কাব্যজীবন এবং সাধনজীবন দীর্ঘকাল তাঁর অজানিতে পরস্পর বাগদত্ত হয়েছিল এবং পরে উদাহ বন্ধনে উভয়ে মিলিত হয়েছিল।^{১৪}

কাজেই এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ হাতে হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার লক্ষ্যবস্তু হল মানুষের ধর্ম-সমস্তার একটি সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বার করা। যে মূল প্রশ্নটি তাঁর মনের দরজায় সমাধানের জন্য আবেদন জানাচ্ছিল তা হল মানুষের আদর্শ ধর্মাচরণ রীতি কেমন হওয়া উচিত। এই প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণেই তিনি নিজস্ব মানবিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং এই অন্বেষণের ইতিহাসই আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তার আগে আরও কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। আমাদের বুঝে নিতে হবে ধর্ম-সম্পর্কিত সমস্তা বলতে কি বুঝি এবং কি পরিবেশে তার উদ্ভব ঘটে, ঈশ্বরকে প্রজ্ঞানিবেদনের ইচ্ছা কেন একটি সর্বজনীন আকৃতি হিসাবে মানুষের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে।

^{১৪} 'My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Some how they are wedded to each other and though their betrothal had a long period of are many it was kept secret to me.'

The Religion of Man. preface.

৩

একটি মহত্তর শক্তির নিকট প্রত্যাশাবোধের আকৃতিই হল মানুষের ধর্মবোধ। মানুষের মনের মধ্যে যেমন একটি শিল্পবোধ আছে যা শিল্প সৃষ্টি করে বা শিল্পের রসগ্রহণ করে তৃপ্তি পায়, ধর্মবোধও তেমন মানুষের মনের মধ্যে প্রোথিত একটি প্রবল আকৃতি। এই ধর্মবোধ গড়ে ওঠে মানুষের মনের দুটি মৌলিক বৃত্তির পারস্পরিক প্রভাবের ফলে। তারা হল বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি। ইতর জীবের মধ্যে ধর্মবোধ নেই, কারণ মানুষের মত তাদের বুদ্ধিশক্তি বা অহুভূতিশক্তি তেমন প্রবল নয়। তারা অতি সীমিত জীবন যাপন করে। পরিবেশ হতে পুষ্টির জন্ত খাদ্য সংগ্রহ করা এবং তার প্রতিকূলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আত্মরক্ষা করা নিয়েই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ। তাদের অনেক মৌলিক সমস্যার সমাধান প্রকৃতিই তাদের মনের মধ্যে গ্রথিত বৃত্তির মাধ্যমে নিশ্চয় করে দেয়। কখন বাসা বাঁধতে হবে, কখন দল বেঁধে দেশান্তরে যেতে হবে ইত্যাদি কাজ সেই বৃত্তির নির্দেশেই সম্পাদিত হয়। কাজেই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাদের হৃদয়বৃত্তিও অহুরূপ কারণে ভালো বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পায় না। তাদের শৈশব মানুষের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়। অতি দ্রুত তারা স্বাবলম্বী হবার ক্ষমতা অর্জন করে। তাদের নাতিদীর্ঘ শৈশবে তাদের মায়ের যেটুকু পরিচর্যার প্রয়োজন তাও অনেকখানি বৃত্তির নির্দেশে সম্পাদিত হয়। মানুষের মনে যে গভীর প্রীতি করবার ক্ষমতা বর্তমান তার সহিত তাদের কোনো পরিচয় নেই।

মানুষের অবস্থাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তার গভীর ধীশক্তি তাকে বহির্বিষে ক্রিয়াশীল এক বিরাট এবং ব্যাপক মহাশক্তির উপস্থিতির সহিত পরিচিত করে। সেই ব্যাপক সত্তার বিস্তার তার কর্মশক্তিকে হার মানায়। প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত শৃঙ্খলা এবং নিয়মিত ক্রিয়াপ্রবাহ তার গভীর ধীশক্তির পরিচয় দেয়। তার শক্তির বিশালত্ব দেখে সে অভিভূত বোধ করে। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের মনে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে একটি মহত্তর শক্তি বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছেন।

এই বিরাট শক্তির পাশে মানুষ নিজেকে নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে। ফলে ভয় ও শ্রদ্ধার একটি মিশ্র অহুভূতি তার মনে ফুটে ওঠে। আশ্রয়ের জন্ত ও বিপদ হতে জ্ঞানের জন্ত সে তার ওপর নির্ভরশীল হতে শেখে। ধর্মের আদিম রূপটির এই ভাবে জন্ম সংঘটিত হয়। এই অবস্থায় শ্রদ্ধা হতে ভয়ের ভাবটাই প্রবল। ধীরে ধীরে মানুষের মনে শ্রদ্ধার ভাবটি প্রবলতর হয়ে ওঠে। যে শক্তির মধ্যে বিশ্ব বিবৃত তা ও শুধু ভয়ঙ্কর নয় কল্যাণকরও বটে। এই উপলব্ধির ফলে মানুষের মনে সেই মহৎশক্তির প্রতি প্রত্যাশাবোধের একটি আকৃতির জন্ম হয়। তখন সময় আসে অহুভূতিবৃত্তির নিজস্ব ভূমিকাটি গ্রহণ করবার। কি ভাবে কোন রীতিতে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হওয়া উচিত সেই প্রশ্নের তখন উদ্ভব হয়। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ধর্মসমস্যার জটিলতা গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিজস্ব মতিগতির পথে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। একাধারে যেমন প্রথম ধীশক্তির তেমন সংবেদনশীল অহুভূতি-শক্তিরও তিনি অধিকারী ছিলেন। কাজেই গভীর ভাবে তিনি এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অপর পক্ষে তিনি নিজের মতিগতির পথে স্বাধীন চিন্তা ও উপলব্ধির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। গতানুগতিক পথে তিনি চলতে চান নি।

এই কারণে তাঁর চিন্তা সর্বতোভাবে মৌলিকত্ব গুণের অধিকারী হয়েছে। অপর পক্ষে তিনি মূলত কবি হওয়ায় কেবল বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে বিশ্বস্তার সহিত পরিচয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে নিবিড় অম্লভূতির মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে মাহুয যে পথে বিশ্বস্তার সহিত পরিচিত হন সে পথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে তাঁকে প্রেমাম্পদ রূপে পেতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা একটি অনন্তসাধারণ ও অভিনব রূপ ধারণ করেছে।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা

উমা রায়

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতাগুলি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রচিত। তাঁর এই গদ্যকবিতাগুলিকে তিনি চারখানি কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই চারখানি গ্রন্থের নাম পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও জামলী। প্রথম গ্রন্থ 'পুনশ্চ'এর প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৩২ (১৯৩২) দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শেষ সপ্তক'এর প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ ১৩৪২ (১৯৩৫) তৃতীয় গ্রন্থ 'পত্রপুট'এর প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩ (১৯৩৬) এবং চতুর্থ গ্রন্থ 'জামলী'র ভাদ্র ১৩৪৩ (১৯৩৬)। এ ছাড়াও 'আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থে 'ময়ূরের দৃষ্টি' ও 'কাঁচা আম' নামে দুটি গদ্যকবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দুটি কবিতার রচনাকাল এপ্রিল ১৯৩২। 'আকাশ প্রদীপ' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৬ (১৯৩৯)। 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে' নামের একটি গদ্যকবিতা আষাঢ়সংখ্যা 'সমসাময়িক' পত্রে প্রকাশিত হয় ১৩৪৭-এ ও রবীন্দ্রনাথের 'খুঁট' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই কবিতাটি চার্লস এ্যাণ্ডসের একটি কবিতার অনুবাদ। 'ছেলেবেলা' ও 'পালকি'-শীর্ষক দুটি গদ্যকবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৬-সংখ্যক খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিবিধ ছন্দের উদাহরণ হিসাবে তিনি তাঁর 'ছন্দোহার'-এ যে তিনটি গদ্যকবিতা উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'ছন্দ' নামক গ্রন্থের পবিত্রীকৃত সংস্করণে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মোট গদ্য কবিতার ভাণ্ডার।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মোট ৩৭টি। এর মধ্যে ২৯টি ছিল গদ্যকবিতা, ১টি ছিল অমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং ৭টি ছিল অমিল স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। পরবর্তী সংস্করণে 'পরিশেষ'-কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে ৬টি অমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা থেকেও ৭টি গদ্যকবিতা এতে সংকলিত হয়। সুতরাং বর্তমান সংস্করণের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ৫০টি কবিতার মধ্যে ৩৬টি গদ্যকবিতা, ৭টি অমিল অক্ষরবৃত্ত ও ৭টি অমিল স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা।

'শেষ সপ্তক'-কাব্যগ্রন্থে মোট ছেচল্লিশটি গদ্যকবিতা আছে। এগুলির মধ্যে ৭টি কবিতা পত্রাবলীর কাব্যরূপ। ১২টি কবিতা পঞ্চকাব্যের গদ্যকবিতারূপ এবং ২৭টি কবিতা মৌলিক। ১৫ থেকে ১৮ সংখ্যক গদ্যকবিতাগুলি যথাক্রমে রাণী দেবী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা। ৪২ ও ৪৩ সংখ্যক গদ্যকবিতা দু'টি যথাক্রমে চারুচন্দ্র দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা। ৪৪ সংখ্যক গদ্যকবিতাটি প্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখা।

'পত্রপুট'-কাব্যগ্রন্থের মোট ১৮টি কবিতার মধ্যে ১ টি গদ্য কবিতা ও ১টি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

'জামলী' কাব্যগ্রন্থের ২১টি কবিতাই গদ্যকবিতা। তা হলে দাঁড়ালো—পুনশ্চের ৩৬টি, শেষ সপ্তকের ৪৬টি, পত্রপুটের ১৭টি এবং জামলীর ২১টি—এই মোট ১২০টি কবিতা এবং এর সঙ্গে আকাশ প্রদীপের ২টি, ঐষ্টকাব্যের ১টি, বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৬ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ২টি এবং ছন্দোহারের ৩টি সবমিলে মোট ১২৬টি গদ্যকবিতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় অগ্ন্যান্ত বিবিধছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য বললেও চলে। এর থেকে পত্রাবলী থেকে

রচিত ৭টি এবং পঞ্চ-কবিতা থেকে রূপান্তরিত ১২টি, অনূদিত কবিতা ১টি ('পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে'-
শীর্ষক The Child থেকে অনূদিত শিশুতীর্থ কবিতাকে ধরা হচ্ছে না—যথাসময়ে তার কারণ আলোচিত
হবে) এবং ফরমাসেসি নমুনাস্বরূপ ছন্দোহারের তিনটি—মোট ২৩টি কবিতাকে আমি বাদ দিতে চাই।
বাদ দিলে মৌলিক গল্পকবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৫টি মাত্র।

পদ্মাবলী ও পঞ্চছন্দ থেকে গল্পছন্দে রচিত কবিতাবলীকে বাদ দেবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে
মনে করি। প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হয় জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের ফলে। বহির্বিদ্রিয়ার মাধ্যমে
বহির্জগৎ অন্তর্বিদ্রিয়ারে গৃহীত হয়ে চিন্তের বিষয়াকারতাপ্রাপ্তি ঘটালে তা স্বতঃস্ফূর্ত ইত্যাদি চিন্তাধর্মের দ্বারা
অনুরঞ্জিত হয়ে জ্ঞানের জনক হয়। এই বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যক্তিসত্তার পরিশ্রুত হয়ে যখন বিশ্বসত্তার উদ্ভীর্ণ
হয় তখনই হয় সাহিত্যের সৃষ্টি। সৃষ্টিকালে অর্থাৎ রূপ পরিগ্রহণ কালে যে তার ভাষা, ছন্দ, পদবিন্যাস-
রীতি, অলঙ্কার ও অন্তঃস্পন্দকে নির্বাচন করেই স্বতঃস্ফূর্ত রূপ লাভ করে। আপন আত্মজ সন্তানের মতোই
তা মাতৃ-অঙ্গে লগ্ন থাকে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে। লালিত পরমসন্তানের মতন তা বহিরাগত নয়। তবে
শক্তিমান কবির হাতে প্রতিভার মায়াদণ্ডের স্পর্শে হয়তো তা সত্যকারের কাব্যমূল্য লাভ করে কিন্তু তবু
মৌলিকের সঙ্গে সমান স্থান দিতে পারি না। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রেখেই কবিতার উৎপত্তি যেমন
যুক্তিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রেখেই মহীকহের শাখা-পত্রপল্লব-ফলপুষ্পের সম্পদ। যে উদ্ভিদ যুক্তিকার
সঙ্গে কোনো যোগ না রেখে পরগাছার মতন আপন জীবনরস অন্য কিছু থেকে গ্রহণ করে তা আলোক-
লতাজালের মতন জীবনকে আচ্ছাদিত ক'রে রাখে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এখানে আপন রচনাকেই আশ্রয়
করেছেন মাত্র কিন্তু তবু তিনি তার প্রথম প্রকাশকালের রূপকে পরিত্যাগ করেছেন বলেই এবং সে রূপ
প্রথম প্রকাশকালে অপগত-রূপ ছিল না বলে এবং পরবর্তীকালের রূপ পূর্ববর্তীকালের রূপের মতো অপরূপ
নয় বলেই শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আমি এই গল্পকবিতাগুলিকে ধরছি না।

একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। ১৩৪০ (১৯৩৩) প্রাচীন সংখ্যার প্রবাসী মাসিক-
পত্রিকায় সমিল অক্ষরবৃত্ত মুক্তকছন্দে রচিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তার প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত
করা যাক—

একদিন কোন তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন অভাবনীয় স্মৃতিহাসে
অন্তমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃতবোধ,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়।

এইটিকেই শেষ সপ্তকের দুই সংখ্যক গল্প কবিতায় তিনি রূপান্তরিত করেছেন—উদ্ধৃতির প্রতিরূপ অংশটি
উল্লেখ করা যাক—

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে

কোন অভাবনীয় স্থিতহাস্তে
 আমার আত্মবিস্ময় যৌবনটাকে দিলে তুমি দোলা ;
 হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে একটি অমৃতবেথা ;
 আর কোনোদিন তার দেখা মেলে-নি।
 জোয়ারে তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
 চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা শতসক ঘটনার সমুদ্রবেলায়।

যদি 'উৎক্ষিপ্ত'-শব্দটিকে চারমাত্রা ধরা যায় এবং 'একটি'-শব্দকে দুইমাত্রা ধরা হয়—তা হলে বলা যেতে পারে যে 'জাতিস্মরণ' এই কবিতাটি তার পূর্বজন্মের পঞ্চরূপের স্মৃতিকে যেন ভুগতে পারছে না।

আর একটি-দুটি উদাহরণ দিয়ে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি দুটি যেমন পঞ্চকবিতা থেকে গণকবিতার রূপান্তরের উদাহরণ, তেমনি গণকবিতা থেকে পঞ্চকবিতার রূপান্তরের অন্তিম মূল উদাহরণ হচ্ছে 'পত্রপুট'-এর ১৬ সংখ্যক গণকবিতাটি। পত্রপুটের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে। ১৬ সংখ্যক কবিতাটি রচিত হয় ১৩৪৩-এর ২৮শে মাঘ তারিখে। সুতরাং পত্রপুটের প্রথম সংস্করণে এই কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয় নি। পত্রপুটের ১৩৪৫ সালের ২৫শে কার্তিক তারিখে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাটি গৃহীত হয়। আফ্রিকার উপর লিখিত সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি প্রথমে গণকবিতারূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৩৪৪ সালের (১২৩৭) 'কবিতা'-পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় এই কবিতাটির একটি ছন্দোবদ্ধরূপ প্রকাশিত হয়। আবার ১৩৫১ সালে (১২৪৪) শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় এই কবিতাটির আর একটি ছন্দোবদ্ধ রূপ প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি রেখে কবিতা তিনটির বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রথম গণকবিতার রূপটিই শ্রেষ্ঠ। একটু নমুনা দেওয়া যাক।

পত্রপুটের ষোল সংখ্যক গণকবিতা থেকে—

'উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
 অষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
 নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
 তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
 রক্ত সমুদ্রের বাহ
 প্রাচী ধরিজীব বৃকের থেকে
 ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
 বাধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
 রূপণ আলোর অন্তঃপুরে।'—ইত্যাদি।

কবিতা-পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৪৪) এটি রূপ নিয়েছে—

'উদ্ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন
 আপনাতে অষ্টার আপন অসন্তোষ,

বিক্ষিপ্ত করিতেছিল, তাঁর নূতন সৃষ্টিরে
সেইদিন

কুঙ্গ সমুদ্রের বাহু ভোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে—

‘বে আফ্রিকা !’ —ইত্যাদি ।

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১ বিজয়দশমী পত্রিকায় এর রূপ—

‘উদ্ভাস্ত আদিম যুগে

কুঙ্গ সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল ভোরে

প্রাচী ধরিত্রীর বুক হতে

বে আফ্রিকা যেখেনিলা নির্বাসনে মহাঅরণ্যের অন্ধকারে ।’—ইত্যাদি

এখানে পরিবর্তিত পদ্যরূপের চেয়ে যে মূল গদ্যকবিতার রূপটি অনেক ভালো ছিল তা সহস্রর মাঝেই
অনুভব করবেন । শেষ সপ্তকের প্রথম প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ ১৩৪২ এবং প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের প্রথম
প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩ ।

শেষ সপ্তকের চৌত্রিশ সংখ্যক গদ্যকবিতা—

‘পথিক আমি ।

পথ চলতে চলতে দেখেছি

পুরাণে কীৰ্তিত কত দেশ আজ কীৰ্তি-নিঃস্ব ।

দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের

অবমানিত ভগ্নশেষ,

তার বিজয় নিশান

বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো

গেছে উড়ে ;’—ইত্যাদি

এর পদ্যরূপে ‘প্রান্তিক’এর ১৬ সংখ্যক কবিতায়—

‘পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীৰ্তিত কত দেশ

কীৰ্তি-নিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ

দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অস্তহিত বিজয়নিশান

বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি ;’—ইত্যাদি

এখানেও মূলরূপটিই অধিকতর চিত্তগ্রাহী ।

এই সব থেকে মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, রসোচ্ছল চিত্ত আপন প্রকাশ
যখন খোজে তখন সে প্রকাশের আঙ্গিককেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গ্রহণ ক’রে থাকে, বাইরে থেকে তা
আরোপিত হতে পারে না—তাই শ্রেষ্ঠের বিচারে রূপান্তরিত সাহিত্যকর্মকে গ্রহণ না করাই উচিত ।
তবে ব্যতিক্রম সর্বত্রই থাকতে পারে—সেটি জাগতিক নিয়ম । পৃথিবীর ইতিহাসে সাহিত্যকর্মের পরিপূর্ণ
দর্পণ নিঃসর্তে কার হাতেই বা এসে পৌঁছেচে ।

আমি শ্রেষ্ঠনির্ণায়ক আলোচনার কাহিনীমূলক কবিতাগুলিকেও বাহ দিতে চাই। ওরা যেন সব ছোট গল্পের আসর থেকে উঠে আসা কিশোর বাহিনী ; একটু অলংকার দিয়ে সাজিয়ে শুছিয়ে ব্যক্ত্যের এক সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনে মুখখানি আধা ঢাকা ক'রে দিলেই, ললিতাক্ষী ললনারূপে তাদের প্রতীত হতে বিলম্ব ঘটে না। কাহিনীমূলক কবিতা—তা সে গল্পকবিতাই হোক আর পঞ্চকবিতাই হোক, বিত্তক কবিতা নয়। তাতে গল্পাংশের যে সংমিশ্রণ থাকে, চরিত্র সৃষ্টির যে প্রয়াস থাকে তা আসে সাহিত্যের অন্তর বিভাগ থেকে। গল্পটিকেই প্রত্যয়গ্রাহ্য ক'রে তোলবার জন্যই যেন লেখকের একটা ঝোঁক থাকে এবং পাঠক চিত্তকে অনেকাংশেই অধিকার ক'রে থাকে ঐ কাহিনীর অংশ। কথা ও কাহিনীর পঞ্চকবিতাগুলিকে এবং পুনশ্চের গল্পকবিতাগুলিকে স্মরণ করলেই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। অবশ্য শোর্ধ-বীর্ধাদি ওজোপুণ পুরুষের এবং দাক্ষিণ্য নম্রতা-ললিত গুণ নারীর হলেও যেমন ঝাঁসির বানী, জোয়ান অব আর্ক প্রভৃতি বীর্ধবতী শোর্ধবতী মহিলার ঐতিহাসিক সত্যতা আছে তেমনি ললিত-দাক্ষিণ্য বিনয়ী নায়ক পুরুষেরও অভাব নেই। তেমনি যদিও গল্পের ও পল্পের আত্মদ সাধারণত বিভিন্ন, কিন্তু তা হলেও পারস্পরিক মিশ্রণেও বাধা নেই। কবিতার প্রাণ যেন ফুলের সৌরভ আর কাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ যেন ঐ ফুলের শরীর। কিন্তু সম্মুখে একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখলে যেমন তার সৌরভেই শুধু ভ্রাণেন্দ্রিয় পুলকিত হয় না, চক্ষু-বিস্ময় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ও পুলকিত হয়ে ওঠে তেমনি কবিতার বিমূর্ত ভাব আমাদের আত্মাকে যেভাবে উদ্দীপিত ক'রে তোলে, চিত্তকে যেভাবে বিজ্ঞত ক'রে থাকে কাহিনীকবিতা তা পারে না। আমার মনে হয় কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে বিত্তক কবিতাকেই গ্রহণ করা উচিত।

এই কাহিনী জাতীয়-কবিতা 'পুনশ্চ' এই অন্তত ২২টি আছে, 'শেষ সপ্তকে' ৩টি এবং 'শ্রামলী'তে অন্তত ৮টি আছে, 'পত্রপুটে' নেই। কাজেই অন্তত ৩৩টি কবিতা, ১০৫টি মৌলিক কবিতা থেকে বাহ পড়ছে। প্রসঙ্গত আমি বলতে চাই যে এই কাহিনীমূলক কবিতাগুলির আবেদন বিক্ষিপ্ত বটে কিন্তু কলাকুশলতা বা আঙ্গিকের দিক দিয়ে এগুলি কম উপভোগ্য নয়। 'পুনশ্চ' 'ছেলেটা'-'অপরাধী'-'বালক' কিংবা 'ক্যামেলিয়া'-'রংয়েজ্বলী'-'সাধারণ মেয়ে', শেষ সপ্তকের ৩১ সংখ্যক কবিতা ('পাড়ার আছে ক্লাব'), শ্রামলীর 'কনি', 'অমৃত' ইত্যাদি কবিতা অবশ্যই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

আত্মস্মৃতিমূলক কবিতাগুলিকেও আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিক উপাদানরূপে গ্রহণ করতে আমি নারাজ। কারণ এই কবিতাগুলি 'ব্যক্তি'-রবীন্দ্রনাথ—বিশেষ একটি পরিবারের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই পাঠকের ঔৎসুক্য জাগায় বেশি। সে ঔৎসুক্যের নেশা বড় কম নয়। যেন ঘরের মাহুট দাঁড়ায় বসে কথা কইছে।

এই আত্মস্মৃতিমূলক কবিতা 'পুনশ্চ' অন্তত দুটি, 'শেষ সপ্তকে' অন্তত ৭টি আছে এবং 'পত্রপুটে' ও 'শ্রামলী'তে যথাক্রমে অন্তত ৪টি ও ২টি—এই মোট ১৫টি কবিতা নির্দেশ করতে পারি। 'আকাশ প্রদীপ'এর 'স্বপ্নের দৃষ্টি' আর 'কাঁচা আম' কবিতা দুটি এবং 'পালকি' ও 'ছেলেবেলা' নামে আরো দুটি যোগ ক'রে মোট ১৭টিকে অন্তত আত্মস্মৃতিমূলক কবিতা হিসাবে ধরতে পারি। মাহুট মাহুট হিসাবেই এত চিত্তাকর্ষক যে তার যে কোনো সার্থক রূপায়নেই আমাদের মন ভোলে। 'আর সেই মাহুট যখন বরীয়ান, মহীয়ান ও গরীয়ান হন তখনকার কথা সহজেই অনুভবনীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের প্রীতি, ভালোবাসা এবং সর্বোপরি বিশ্বাস—তাকে জানতে এক তীব্র আগ্রহের সঞ্চার করে। তখন তাঁর বিশেষ সীমিত রূপটিই

হয় লক্ষণীয়। হয়তো রবীন্দ্র-কবিমানস বোঝবার পক্ষে এই কবিতাগুলিই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিস্তৃত কবিতার আবেদন এতে নেই বলেই আমার উপলক্ষি।

কাহিনী জাতীয় ৩৩টি কবিতার সঙ্গে এই আত্মস্মৃতিমূলক ১২টি কবিতা যোগ করলে দাঁড়ায় ৫২টি কবিতা। রবীন্দ্রনাথের মৌলিক গদ্যকবিতা ১০৫টি থেকে এই ৫২টি কবিতা বাদ দিলে থাকে ৫৩টি আলোচ্য বিষয়ের উপযোগী গদ্যকবিতা।

মনে রাখতে হবে এই ৫৩টি গদ্যকবিতা ছড়িয়ে আছে ৪টি কাব্যগ্রন্থে এবং এগুলির বিষয়বস্তুও বিচিত্র এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনব যেমন 'শালিখ' ও 'কৌটের সংসার' নামে দুটি কবিতা। কতকগুলি কবিতায় তিনি শুধু মেজাজটি ধরে দিয়েছেন—শরৎমেঘের মতো লঘু ও লীলাময়—প্রান্তের মেঘমণ্ডলের মতো যা অবিরাগ গভীর ভাবধারা বর্ষা নয়, যেমন 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'খোয়াই', 'পুকুরধারে', 'ফাঁক', 'ছুটি' ইত্যাদি কবিতা, শেষ সপ্তকের ১১, ১৪ সংখ্যক কবিতা, পত্রপুটের ১ সংখ্যক কবিতা ও শ্রাবণীয়া 'অকাল ঘুম'। এগুলির মধ্যে আরো কতকগুলি কবিতা আছে যা গদ্যকবিতার সৌন্দর্যবিশ্লেষক বা মর্মোদ্ঘাটক বা সমার্থক যেমন পুনশ্চের 'কোপাই', 'নাটক' ও 'নূতন কাল' এবং শেষ সপ্তকের ২০, ২৪, ২৫ সংখ্যক কবিতা (সংগীতসম্বন্ধীয় ও চিত্রবিষয়ক কবিতাও আছে কিন্তু তা পত্রকাব্যে)। এইসব কবিতা থেকে বিশেষভাবে কতকগুলি কবিতাকে আমি বিছিন্ন ক'রে নিয়ে অর্থাৎ নির্বাচন ক'রে নিয়ে আলোচনা করছি।

কেন বিশেষভাবে কতকগুলি কবিতাকে নির্বাচন করব তার কারণ বলছি।

যে কোনো সৃষ্টিতেই দু'টি অংশ—একটি ভাবের দিক ও অন্যটি রসের দিক। সাহিত্যরসের বিচারের দিকটি অবশ্যই নির্ভর করে পরিবেশন পাত্রের অচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতার উপর অর্থাৎ আঙ্গিকের নৈপুণ্য ও ভাববস্তুর ব্যাপকতার উপর। রস প্রকৃতপক্ষে নিকৃপাধি নির্বিকল্প ও নির্বিশেষ—উপনিষদের ব্রহ্ম—থাকে বলা হয় 'রসো বৈ সঃ'। কিন্তু সেই ব্রহ্মও এই জগৎ সৃষ্টি ক'রে তাতে অল্পপ্রবিষ্ট হলেন—'তৎসৃষ্টো তদেবাত্মপ্রাবিশৎ'—এবং হয়ে উঠলেন বহুবিচিত্র।

অনুরূপ ভাবেই সাহিত্যরসের উপাধি হয় যখন এই জাগতিক বস্তুব্যাপার তখন সেই রসও হয়ে ওঠে বহুবিচিত্র। তবে এতে জড়বস্তুর সংমিশ্রণ থাকে বলে একে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মবাদসহোদর' অর্থাৎ ব্রহ্মবাদ নয় তবে তৎসদৃশ। অবশ্য সদৃশ বলতে কি বোঝায় তা বুঝিয়ে বলতে অনেক কাঠ-খড়ের প্রয়োজন—আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নয়োজন। মোট কথা—রসনার রসকোষগুলি যেমন বিশেষ বস্তুর সংযোগে বিশেষ আত্মাদের আত্মাদয়িতা হয়ে ওঠে তেমনি নিকৃপাধি রসও সাধারণীকৃত ভাববস্তুর উপাধি সংযোগে বিশেষ আত্মাদের জনয়িতা হয়ে ওঠে। তাই রসের বিচারে এই ভাবের বিচারও একটি বড় কথা। রসোত্তীর্ণ না হলে তা সাহিত্য পদবাচ্যই নয়—একথা ঠিক কিন্তু এটি হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টির ন্যূনতম স্তর। 'প্রকাশ'—সাহিত্যের গোড়ার কথা কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—'কিসের প্রকাশ' ? রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যগ্রন্থে 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে বলেছেন—'সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তাঁর পরিণাম সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। এখন আমরা আদিম আদর্শ দিয়ে সাহিত্যের বিচার করিনে, পরিণাম আদর্শ দিয়েই তার বিচার করি। এখন আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কিনা, দেখি কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না ইন্দ্রিয়,

বুদ্ধি এবং কল্পনের তৃষ্ণা হয়।...প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্য মাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ, কিন্তু বীজ গাছ নয়।'

বোধ হয় উদাহরণ দিলেই বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। আমি রবীন্দ্রনাথের গল্পকবিতা থেকেই টুকরো টুকরো উদাহরণ দিচ্ছি।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-বস-গন্ধের পশরা যেখানে সাধারণ-ভাবেই সাজিয়ে আনা হয়—থাকে না ভ্রব্য-ভুগ-ক্রিয়া-জাতির পারস্পরিক সৌন্দর্যময় সম্বন্ধ-নির্ণয় যা অর্থালংকারে পাওয়া যায়—তার একটু নমুনা দেওয়া যাক 'পুনশ্চ'এর 'রঙেরজিনী' থেকে—

কুহুমফুলের ক্ষেত, মেহেন্দিবেড়ায় ঘেঁরা
প্রান্তে থাকে জসীম রঙেরজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রঙ বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রঙ মেলার।
বেণীতে তার লাল সূতোর কালর,
চোলি তার বাদামি রঙের,
শাড়ী তার আসমানি।...

কুলকুল করে জল আসে নালা বেয়ে কুহুমফুলের ক্ষেতে ;
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ার বসে।
ফাগুনের বৌত্র বলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে।
খোওয়ার কাজ হল, গ্রহর গেল কেটে।

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির পরিচয় যেখানে তীব্র হয়ে ধরা দিয়েছে—তারই একটু নমুনা শেষ সপ্তকের 'চার'-সংখ্যক কবিতা থেকে—

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল বৌত্রপাতুর হৃদর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাবরের প্রান্তে
বেগনি রঙের আঁচলা।
গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।

মাছরাঙা শুক বলে আছে বাঁশের খোঁটার,
তার স্থির ছায়া নিস্তব্ধ জলে ।
ভিজে বাতাসে শ্রাওলার ঘন স্রিষ্ট গন্ধ ।
চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাজে ।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ,—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙনগড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা ।

এখানে অস্তিত্বের সহজ আনন্দকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বুদ্ধির দীপ্ত আলোকে তাকে
উদ্দীপ্ত করেছেন ।

আর যেখানে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও হৃদয় এক হয়েছে—যেখানে রস পরিবেশিত হয়েছে কানায় কানায়
ইন্দ্রিয়ের উন্মাদে, বুদ্ধির দীপ্তিতে আর রসের গভীরতায়—সেখানে একটি নিবিড় আবেদন নিটোল হয়ে মূর্ত
হয়ে উঠেছে—যেমন ‘পত্রপুট’এর পাঁচ সংখ্যক কবিতায়—

‘সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি,
খোলা ছাদে গান গাইছে একা ।...
ওর গানে বলছে সিন্ধু কাফির স্বরে—
‘চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না ফিরে ডাকব না,
ডাকি নে তো স্বকালবেলায় শুকতারাকে ।’—

তনতে তনতে সবে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;
তার লবু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;
অপ্রাপনীর সে দীর্ঘনিশ্বাস,
দুরূহ দূরশার সে অসুচ্চারিত ভাষা ।
একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
পৃথিবীর ধূলি মধুময় ।
সেই স্বরে আমার মন বললে—
সংগীতময় ধরার ধূলি ।

আমার মন বললে—

মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমাকে নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাথায়।

আমি ওকে দেখলেম—

যেন নিকষবরণ ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অক্লষবরণ পা-ছ'খানি ডুবিয়ে বসে আছে অঙ্গরী,
অকূল সরোবরে স্বরের ঢেউ উঠেছে মৃদুমৃদু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা ছাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে।...

আমি ওকে দেখলেম—

ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়।
সে যুগের পালানো বাণী ধরবে বলে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
স্বরের ছোঁওয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে।'

এই কবিতায় এক মানবীপ্রেমের চেতনা প্রকৃতির প্রগাঢ় সৌন্দর্যসাগরে অবগাহন ক'রে এক বিশ্বস্বপ্নায়—এক অতীন্দ্রিয় জন্মান্তর সংবেদনার মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই নিকষেই আমাদের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ববিচার পরখ ক'রে নিতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলতে কি বুঝি তা নিয়ে নানা মত আছে। কেউবা বলবেন 'আঙ্গিকের উৎকর্ষেই সৃষ্টির উৎকর্ষ কেন-না চিরন্তন ভাবকে নবীন ক'রে তোলে এই আঙ্গিক। কেউ বা বলবেন—আঙ্গিক তো বাহন মাত্র—প্রশ্ন হচ্ছে বহন ক'রে আনে কাকে? কেউ বা বলবেন আঙ্গিক বা উপাদান—প্রকার ও রস—এ বড় কথা নয়—কবিতায় যা চাই তা হচ্ছে কবিকে আমরা কতখানি মূর্ত হয়ে উঠতে দেখছি। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মতে যে কোনো কবিতাই বিষয়বস্তু-নির্বাচননিরপেক্ষ হয়ে আঙ্গিকের গুণের শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য হতে পারে। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর মতে আঙ্গিক যেমনই হোক রসসৃষ্টি করতে পারলেই হল—যদিও এই মুহূর্তে যা এক শ্রেণীর লোকের মনে রসসৃষ্টি করছে, সেই মুহূর্তেই অন্য শ্রেণীর লোকের মনে করছে না। তৃতীয়োক্ত শ্রেণী বলবেন—মাহুষটাকেই তার সৃষ্টির মধ্যে দেখতে চাই।

যাই হোক কবিতা বিচারে এ স্থলে প্রাচীনের মতটা প্রসঙ্গত উত্থাপিত করা যেতে পারে। 'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি'—উপনিষদের এই উক্তিকে যদি সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়—তা হলে প্রকাশ-মাত্রকেই উৎকৃষ্ট বলে ধরতে হয়। তা হলে সন্দেশ খাবার আনন্দ আর স্বপ্নানন্দ একই পর্ধায়ে পড়ে। তাই শুধু 'প্রকাশ' চরম কথা নয়—কিসের প্রকাশ সেটাও বড় কথা বলে ধরতে হবে। মধুসূদন সরস্বতী যিনি সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিরসায়নের রচয়িতা—তিনি বলেন যে অলৌকিক

ও লৌকিক রসের স্বরূপত আনন্দাংশে কোনো প্রভেদ নেই—‘ন লৌকিকরসস্তাপি পরমানন্দরূপতানুপপত্তিঃ’। ভগবান্ স্বয়ং পরমানন্দ স্বরূপ—মনোগতবিষয়াকারতা প্রাপ্ত হয়ে তিনি রসপদবাচ্য—‘মনোগত স্তম্বাকাররসতামেতি পুঙ্লম্’। তিনিই চিন্তে প্রতিবিম্বিত হয়ে স্থানিতাবরূপে জড়বস্তুর ন্যূনাধিক মিশ্রণে কিঞ্চিং ন্যূন রসরূপে আত্মদ্বিত হন—‘কিঞ্চিং ন্যূনাক রসতাং যাতি জাত্যবিমিশ্রণাৎ’।

স্বর্ধালোক যেমন প্রতিফলিত হয় হীরকে বা কাচখণ্ডে—যেমন প্রতিফলিত হয় দর্পণে, তব্বাবিহিত্তে, অঙ্গপ্রাণিতে এবং প্রত্যেকটি প্রতিফলন এক একটি বিশিষ্টরূপে অভিনব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি একই আনন্দ প্রকৃতি, প্রেমিক ও আত্মার আধারে উপেয় রূপে আত্মত হয়ে বিচিত্র স্বাদ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। অতএব ভাববস্তুর ব্যাপকতা ও রসবস্তুর গভীরতার উপরেই সৃষ্টির চরম চরিতার্থতা নির্ভর করে। দুটির উপরেই জোর দিচ্ছি এই কারণে যে ভাববস্তু ব্যাপক হলেই যে আপনা থেকেই রসের গভীরতা এসে পড়বে তা নয়, যেমন রস গভীর হলেই যে ভাববস্তু ব্যাপক হয়ে পড়বে তা নয়। একটু ক্ষুদ্র শ্লোকের রস গভীরতা হয়তো একটি উপন্যাসের ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে অনেক চিন্তামননকারী, চিন্তাশ্রুতিকারক। একটি কূপের গভীরতা যেমন একটি নিখবঁদের গভীরতা থেকে অনেক বেশি, যদিও নিখবঁদ বহুদেশসম্বন্ধী বলে অনেক বেশি ব্যাপক।

শুধু মাত্র রসাস্বাদের দিক থেকে বিন্দুতে ও সিদ্ধান্তে ভেদ না থাকলেও ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সৃষ্টি কর্মের ভেদ অবশ্যস্বীকার্য।

এটি সাহিত্যের বিচারের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি, রসের পারমার্থিক বিচার নয়। বিশেষতঃ রসের উৎকর্ষগত পার্থক্য না থাকলেও বিশেষণ-অংশের পার্থক্যকে স্বীকার ক’রে নিয়ে আপেক্ষিকভাবে রসের অবস্থাগত উৎকর্ষ ও নিকর্ষের অবশ্যই বিচার হতে পারে। এই কথা মনে করেই যদুন্দন সন্দেহভী বলেছেন যে—‘লৌকিক রসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্তেব চিদানন্দাংশস্ত ক্ষুরণাং তজ্ঞানন্দস্ত ন্যূনতৈব’।

তাই কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অবশ্যই রসের প্রকাশ শুধু নয় কোন উপাদানকে গ্রহণ ক’রে সেই রসের প্রকাশ—তা অবশ্যই বিচার করতে হবে।

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গদ্যকবিতায় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের যুক্তপথে কোন পরমা উপলব্ধি বিচিহ্নরূপ লাভ করেছে তাঁর চারখানি গদ্যকবিতার গ্রন্থে। আমি তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতাকে বেছে নেব—আলোচনার উপাদানরূপে।

কিন্তু তারও আগে আরো একটু বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই গদ্যকবিতাগুলি রচনা করেন তখনকার পটভূমি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ যে ছন্দকে আশ্রয় ক’রে তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত করলেন, সেই অভিব্যক্তির পশ্চাৎপট কি ভাবে তাঁর জীবনদর্শনকে একটি বিশিষ্ট পথে নিয়ে গিয়েছিল তা জানা নিতান্তই প্রয়োজন।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে কবি পাশ্চাত্য দেশের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ হন। ১৯৩১এ তাঁর ‘রাশিয়ার চিঠি’ প্রকাশিত হয় এবং এতে তিনি ‘সাধারণ লোক’ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ও মহাহুঁড়ুতি প্রকাশ করে গেছেন। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে এমন ভাবে বিচলিত করেছিল যে তিনি এ কথাও বলেছেন—‘আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। হুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।’ (রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র—৩১ অক্টোবর ১৯৩০)

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও অশান্ত হইতে উঠছিল। ১৯৩১ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি যোগদান করেছিলেন মওনে। ফলাফল ব্যর্থ হলে তিনি ঐ বছরেই ২৮শে ডিসেম্বর স্বদেশে ফেরেন। ১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারি তিনি কারাকুদ্ধ হন। তখন লর্ড উইলিংডন ভারতের বড়লাট। ১৯৩২-এ কবির সম্ভব বছর পূর্তির জয়ন্তী-উৎসব কবি স্বয়ং বিস্মৃত হয়ে বসে করেন এবং গান্ধীজির কারাবোধের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে কেবল করেন। এই বছর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁচোরাবার প্রস্তাব দেন। ফলে তফসিলী ও বর্ণ হিন্দুতে বিভেদ সম্ভাবিত হয়। ইতিপূর্বে ব্রিটিশের কুর চালে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ দেখা দিয়েছিল। ম্যাকডোনাল্ডের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধীজি অনশন করেন পুনরায় যাববেদা জেলে। কবি বিচলিত হয়ে পুণায় যান। পুণায় তখন তফসিলী ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়—এইটিই সুপ্রসিদ্ধ পুণাচুক্তি। এর পরে গান্ধীজি অনশন ত্যাগ করেন এবং কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৩১-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর যেদিনোপুরের হিঙ্গলী জেলের ব্যাপার নিয়ে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয় কবি তাতে মহাহুতুভিত ছিলেন এবং এই নিয়ে কলকাতার সম্মেলনের পাদদেশে যে বিরাট সভা হয় কবি স্বয়ং তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্য তার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

ইতিপূর্বে ১৯২৭-সালে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হবার পর থেকে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-কষ্ট এই পার্টির সহায়তার প্রকাশ পেতে থাকে এবং এর সঙ্গে কংগ্রেসের আন্দোলনেও এদের অংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওদিকে ১৯৩৬ সালে মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট ইতালি কর্তৃক আভিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ এবং স্পেনে জেনারেল ফ্রান্সিস্কোর বিদ্রোহ ১৯৩৭-সালের চীন-জাপানের যুদ্ধ মাদ্রিগাকে উপলক্ষ্য করে এবং জার্মানিতে হিটলারের ন্যাসি সম্প্রদায়ের অমানবিক নিষ্ঠুর কার্যাবলী এই সবই কবির হৃদয়বিরোধী মনোভাবকে একটি বিশিষ্ট রূপদান করেছিল—যার রূপায়ন পাই ‘পত্রপুট’এর ১৭ সংখ্যক ‘বুকের দামামা উঠল বেজে’ ইত্যাদি কবিতায়।

আবার সাহিত্যক্ষেত্রেও কল্লোল (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩), কালিকসম (প্রথম প্রকাশ ১৯২৬), প্রগতি (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭)—এই তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্যগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। এদের লেখকেরা সাধারণ মানুষের, দুর্বল মানুষের, পীড়িত মানুষের, অসহায় মানুষের কথাকে সাহিত্যের উপজীব্য করে তোলেন। এর পর ‘পরিচয়’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৩১), কবিতা (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫) এবং তার সঙ্গে বিরোধী পত্রিকা ‘শনিবারের চিঠি’ সাহিত্যের আসরকে বেশ সরগরম করে তোলে। রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে আধুনিক লেখকদের অনেকেই পাশ্চাত্যের অহঙ্করণে ও অহুসরণে সাহিত্যে বাস্তবতার নামে কর্ণভার সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে এই সব সাহিত্য এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে যার ফলে ‘সাহিত্যের পথে’ সমালোচনা গ্রন্থ (১৯৩৬) এবং ‘সাহিত্যের স্বরূপ’-এর অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৩৮), সাহিত্যের মাত্রা (১৯৩৪), সাহিত্যে আধুনিকতা (১৯৩৫) ইত্যাদি প্রবন্ধের আবির্ভাব ঘটে।

স্বদেশে ও বিদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপের ফলে সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার রূপটি এবং সাহিত্যের আধুনিকতার হজুগের ফলে সত্যকার আধুনিকতার স্বরূপটি যেন তিনি তাঁর চারখানি গদ্যকবিতার গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। জীবনের সহজ আনন্দকে—তুখুয়া এই লীলার অগতে বেঁচে

ধাকবাব—অর্থাৎ অস্তিত্বের সহজ আনন্দকে তিনি এমন ক'রে আর কোথাও প্রকাশ করেন নি। এমন ক'রে মনীষার দর্পণে আত্মস্বরূপের বিশ্লেষণ ও সর্বাঙ্গীন উপলব্ধির প্রকাশ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। এমন ক'রে গভীরের বহুধা বিচিত্র অভিব্যক্তি আর কোথাও ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের গোখুলি বেলায় এই কবিতাগুলিতে ভাবৈবর্যের সঙ্গে রসমাধুর্যের এই সমন্বয় এমন একটি গভীরতার গিয়ে পৌঁছেছে যার আবাদ অল্প কিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়।

অবশ্য এখানে আরো একটি কথা বলবার আছে। কবিতার আবাদ ঋতুতে ঋতুতে ফুল-কল-ফসলের মতন বদলে বদলে আসে। আমাদের হৃদয়েরও সেই ঋতু বদলের পালা আছে। এক একটি বিভিন্ন বয়সে এক এক পালাবদলের কবিতার ডালি বেছে নিই। কিন্তু নারী যে ফুল অল্পবয়সে কবরীর প্রসাধনে ব্যবহার করে, বেশি বয়সে তাই দিয়ে দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করে। এক বয়সে গারে ধূলো মেখে আনন্দ, অল্প বয়সে অঙ্গে তখন প্রসাধন কলারসের বিহীনতা। কোন বয়সটা সত্য? এমন কথা কি বলতে পারি ধূলো মাথার বয়সটা মিথ্যা? আবার যখন বিরলভূষণ প্রশান্তির নিরাসক্তি নামে জীবনে—তখন কি তারুণ্যের প্রগলভ অলংকৃত সৌন্দর্য মিথ্যা হয়ে যায়? প্রকাশের সৌন্দর্য যখন সত্য হয়ে দেখা দেয় তখন সবটা মিলিয়েই সে সত্য।

পূর্ববীর তপোভঙ্গে কবি যখন বলছেন—

দেখেছিহু হৃদয়ের অন্তর্লীন হানির রক্তমা—

দেখেছিহু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ডিত ডঙ্কিমা,

রূপ-তরঙ্গিমা।

এই যে অলংকৃত হৃদয়ের বিলম্বিত অলঙ্কার আন্দোলন—‘চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবানুরাশি’—এর সৌন্দর্য কি কম—তার চাইতে—যখন বলি

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে

আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিলোল ;

তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে

কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।

জীবন যখন বদলাতে থাকে তখন, তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে থাকে এবং তার প্রকাশও হয় বিভিন্ন। শিশুর হাতে একমুঠো ধূলো আর একমুঠো মুক্কা দিলে অস্তিত্বের সহজ আনন্দে সে ছটোকেই ছুঁড়ে ফেলে খেলা করে। আর একটু বয়সে সেই মুক্তার মালা গাঁথে গলার পরা হয়। আরো বেশি বয়সে হয়তো সে কোটোর সঞ্চয় করে সম্পদ হিসাবে। এক হিসেবে প্রত্যেকটাই সত্য, কোনোটাই মিথ্যে নয়, অসম্পূর্ণ নয়।

সাহিত্যে জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও সেই একই কথা। জীবন পথে চলতে চলতে ‘পলকে ঝলকে’ যাকে দেখা যায় তাকেই তো রূপ দেয় শিল্প। সেই একপলকের দেখা কি কম সৌভাগ্যের কথা! এক পলকের বলে তো সে ত্রাত্য নয়—সেও শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠত্ব সত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশে।

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে

দেখা দেয় মিলার পলকে।

বলে না আপন নাম পথেয়ে শিহরি দিয়া স্ববে
চলে যায় চকিত নৃপুবে ।...

{ বহু সেখা হতে তুমি আপনার ভাবে
আপনি যা পাবে—

না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার—
সেই তো তোমার ।

কত জন্মজন্মান্তরের তপস্তায় সেই এক পলকের দেখা মেলে—সেই এক বিন্দু স্বধার স্বাদে
জন্মজন্মান্তর স্বধার মিত্র হয়ে ওঠে । সেই স্বধামিত্র হওয়াটাতেও অবশ্য সংস্কারের ছাড়পত্র চাই । তাই
বৈষ্ণব বলেন—

‘কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম । তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তার তম ॥’

যে কবিতার যে রস—প্রকাশের দিক দিয়ে মতোয় পরিপূর্ণতার সে চরিতার্থ । কিন্তু ব্যক্তি
বিশেষের কাছে আত্মাধনার ভাববস্তুর দিক দিয়ে তার একটি তারতম্যের বিচার থাকতে পারে । তবে সে
বিচার স্বরূপের বিচার নয় । আপেক্ষিক বিচার—এটা মনে রাখতেই হবে ।

মাহুকের ক্ষয়বৃষ্টি সাহিত্যে ও শিল্পে বিধৃত হয়—বিচিত্র তার রূপ—গভীর তার আকৃতি, অভিনব
তার প্রয়োগ শিল্প । জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত কি অলৌকিকী ভাগবতী সংবেদনা ? কিন্তু সেখানেও তো
‘ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দাতে’—জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক ও প্রেমাত্মক—এই ত্রিবিধা বৈচিত্র্য ।
পুষ্পোদ্ভানে অজস্র পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত—সেগুলির মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ বলে কোনো একটিকে নির্দেশ করা যায় ?
‘সজ্জল চল চল শুভ্র শতজল’ কিংবা ‘মূর্ত সূর্যালোকপ্রতিম চম্পককল’ অথবা ‘হৃদয়ের নিভৃত গুহানিবাসী বস্ত্রিম
বাসনার তুলনা পর্যাপ্ত বস্তু গোলাপের স্তবক’—কোনটি সবচেয়ে সুন্দর ? গোলাপি চূনির মালা-গাথা বেদানা,
রাঙা রসাল ধানায় ঠাসা ডালিম, সোনালি শাঁসে-ভরা মধুঝরা আম কিংবা কলসমাজের মোচাক কাঁটাল
কোবে কোবে যার স্বর্ণাভ ঘনবসের ‘জয়ানা’—কোনটি শ্রেষ্ঠ ! চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবিতা
কত তুলনাই না দিয়েছেন—কিন্তু কোন তুলনাটি শ্রেষ্ঠ এ নির্ণয় করতে না পেরে স্বয়ং বিজ্ঞাপতির মতন
কবিও পাঠকের সামনে সবগুলিই তুলে ধরেছেন—

‘নলিনি, চকোর, সফরি, বর মধুকর যুগী খঞ্জন জিনি আখি ।’

—নলিনী পর্ণের আকৃতি, চকোরের চকুর মধুরিম বর্ণ, সফরীর উজ্জল চিকণতা, মধুকরের কৃষ্ণ, যুগনয়নের
সজলতা ও খঞ্নের নৃত্যচাপল্য—সবই সুন্দর—সবই কাব্য ।

কোনো কবির গীতিকবিতাবলীর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এও নির্ণয় করা যায় না । যেমন যায় না
ছোট গল্পের । যেমন যায় না গানের । কাবুলিওয়ালা, খোকাবাবুর প্রত্যাভর্তন, ক্ষুধিত পাখান, মশিহারা,
ককাল, তুয়াশা, এক রাজি, নিনীথে, অতিথি, মেঘ ও বৌদ্ধ—কোন গল্পটি শ্রেষ্ঠ এ কি বলা যায় ? কবিতা
বা ছোট গল্প—এ সব হচ্ছে বিভিন্ন মেজাজের কারুকাজ, বিভিন্ন মর্জির সৃষ্টি—একটি সম্পূর্ণ উপলব্ধির
অরূপ বৈভব বা রূপের বিমুক্তি । জীবনের পল-কাটা হীরের উপর যখন যেদিক থেকে আলো পড়ছে তখনই
সেই দিকটি বলমলিয়ে উঠছে । কে নির্ণয় করবে কোনটি শ্রেষ্ঠ ! অরসিকের দুল হস্তাবলোপন
এখানে নিবৃত্ত ।

ঈশ্বর আপন আনন্দস্বরূপকে প্রকাশ করেছেন বিধে, সাহিত্যেও মানব আপন আনন্দস্বরূপকেই প্রকাশ করেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে আছে—

আনন্দাক্ষেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—আনন্দং প্রযন্তি অভিসং-
বিশন্তীতি।—আনন্দ থেকেই এই ভূতজগৎ জাত, আনন্দেই বিধৃত এবং আনন্দেই প্রলীন।

আনন্দের কোনো জাত নেই—নেই পরিমাণ। লীলাময়ের সকল সৃষ্টিই আনন্দে গুতঃপ্রোত।
সৃষ্টির উচ্ছ্রিত লীলার এই আনন্দময়ত্বকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্র হীন ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন,

ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই সূর্য উঠি বলে তারে—ভালো আছ ভাই ?

যে আনন্দসত্তা ঐ ক্ষুদ্র তৃণপুষ্পটিতে হিল্লোলিত, সেই আনন্দসত্তা ঐ বৃহৎ জ্যোতিঃপিণ্ডে সূর্যমণ্ডলেও
কম্পমান।

মহাকাব্যে কল্পনার বিরাটত্ব মহামহোকহের মতো জাতীয় জীবনে সুপ্রোথিত থাকে কিন্তু
গীতিকাব্যের প্রাণস্ফূর্তি শাখায় শাখায় পড়ে পুষ্পে ফুলপল্লবে জীবন আকাশে বহধা উন্নত। বহু শাখাতেই
তার সমান দীপ্তিমান, সমান সুন্দর, সমান রসাল ফলসম্ভার বিধৃত। তাই বলছিলাম যে গীতিকবিতার মধ্যে
কোনটি শ্রেষ্ঠ এ বলা সম্ভব নয়। কোনটি অকৃত্রিম শ্রেষ্ঠ বরঞ্চ বলা যেতে পারে কিন্তু সে বলাও রসের
সত্যতার দিক দিয়ে নয়, ভাবের ব্যাপক বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে। এ সত্যতা বা শ্রেষ্ঠত্ব তাই পারমার্থিক
নয়—আপেক্ষিক মাত্র।

আরো একটা কথা এই যে মহাকাব্যের কল্পনার বিরাটত্ব যে কোনো একটি গীতিকবিতার থাকা
সম্ভব না হলেও কোনো একটি যুগের বা দেশের কিংবা ব্যক্তির একক নির্মিতির মধ্যে সাক্ষাৎকৃত হতে পারে
অজস্র ছিন্নস্বত্র মুক্তাবলীর মতো যা ছড়িয়ে থাকতে পারে। এই জন্তই ধারা গীতিকবিতার রসমূর্তিকে
মহাকাব্যের রসমূর্তি থেকে ন্যূন বলে মনে করেন তাদের প্রতি বন্ধি কটাক্ষপাত করে রবীন্দ্রনাথ
কণিকা-কাব্যে সর্কোতুকে বলেছেন—

আমি নাব্ব মহাকাব্য সংরচনে

ছিল মনে,—

ঠেকল কখন তোমার কঁকন-কিকিনীতে

কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে,

মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনার

পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।

তাই আমার কাজ হবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতার উল্লেখ করে যে কোনো একটি
গদ্যকবিতার স্মরণে আলোচনা করা।

গদ্যকবিতার আঙ্গিক সৌন্দর্য প্রধানভাবে তার ছন্দ। ছন্দের কথাটি সর্বাগ্রে সাধারণ ভাবে বলে
নেওয়া ভালো। অবশ্য আমি গদ্যকবিতার ছন্দকে এখানে তার ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপস্থাপিত করছি
না। রবীন্দ্রনাথ কেন তার গৌণুলি পর্ষায়ের কাব্যে গদ্যকবিতার ছন্দকে আশ্রয় করলেন তা তাঁর বলা কথা
'দিয়েই তুলে ধরব। জীবন সায়রাছে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই জগৎ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতিকে দেখলেন

তা হচ্ছে সৃষ্টিবহুস্তর অত্যাতিশায়ী আনন্দিত অস্তিত্বকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় সেই দেখা। যেমন অতি উচ্চস্থান থেকে নিম্নভূমির ভূ-মহীকহ কেবলমাত্র বর্ণবিভূতিকেই প্রকাশ করে মাত্র তেমনি সৃষ্টিবহুস্তর অস্তিত্বের আনন্দের উপলক্ষিতে 'আমি আছি' এই চেতনাই সর্বাতিশায়ী। যেখানে কোনো নির্বাচন নেই বস্তুর, নেই নির্বাচিত মুহূর্তের গ্রহণ—সেখানে যে সব কথাই কথা—সব স্বরই গান। সেখানে জীবন ধরা পড়েছে তার সহজ স্বরূপে, গভীরতম সত্তায়। তাই সেই উপলক্ষের প্রকাশের ভাষাও—সহজ স্বন্দর। কি আশ্চর্য বিমিশ্রণ সেই ভাষায়—সংস্কৃত গানের অস্তঃস্পন্দের সঙ্গে যুক্ত ছড়ার চলতি শব্দের মিছিল। তথা কথিত নির্বাচিত প্রতিম্বুর শব্দের মালা এতে গাঁথা হয় নি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর এই গল্পকবিতার জগৎ হচ্ছে—‘উচুনিচু বিচিহ্ন বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো—কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাকের উপর দিয়ে।’

গল্প-কবিতার ছন্দ কিন্তু গল্পছন্দ নয়। ভালো গল্পে যে এক একটি বাক্যাংশের ছোট ছোট বাধুনির মধ্যে একটি স্থিতি পাওয়া যায়—সেইটেই হচ্ছে গল্পছন্দ। এর প্রধান ব্যাপার হচ্ছে বাক্পর্ব যার পরিণতি ছেদে এসে। রবীন্দ্রনাথ জাবালা সত্যকামের কবিতাটি লিখেছিলেন গল্পছন্দে, আবার তাকে গল্পকবিতাতেও রূপ দিয়েছিলেন এবং প্রসঙ্গত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন উপনিষদের গল্পছন্দের। গল্পছন্দে আমরা পাই ধ্বনিপর্ব। গল্প কবিতার ছন্দ হচ্ছে—গল্পছন্দের বাক্পর্ব ও গল্পছন্দের ধ্বনিপর্বের সমাহার। এতে বেড়াভাঙা গানের ক্ষেত্রে কাব্যকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এ ছন্দের চলন ‘নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ ক’রে রাত্রাঘর বাসরঘর পর্যন্ত, তার অন্ত নানা স্থিতি পর্বের মালমসলা বাছাই-করা-শব্দসংযোজনার বিশেষ ঠাঁট বানাতে হয় না। অবশ্য ভালো গল্পের যে উদ্দেশ্য, ভালো গল্পের যে উদ্দেশ্য—গল্পকবিতার উদ্দেশ্যও তাই—তা হচ্ছে রসসৃষ্টি। গল্পের পেলবতার সঙ্গে গল্পের কঠিনতার অপূর্ব মিশ্রণ—কবির কাম্য ছিল—তাই তিনি ‘শেষ সপ্তকে’ বিশ সংখ্যক কবিতার গল্পকবিতাকে তুলনা করেছেন অরিতে সোনাতে সাজানো বহু সম্মানে বন্দিনী বরবর্ণিনী অস্তঃপুরিকাদের সঙ্গে আর গল্পকবিতাকে তুলনা করেছেন তাদের সঙ্গে—যাদের ‘কোনো দ্বার নেই কারো মন জুগিয়ে চলবার।’ শেষ সপ্তকের চব্বিশ সংখ্যক কবিতাতেও তিনি শব্দসম্ভারকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করে ধ্বনিপর্বিক শব্দকে তুলনা করেছেন তোড়ার সঙ্গে আর ছন্দ-অলংকারকে বঙবেরঙের সূতো ও জবির ঝালরের সঙ্গে এবং সমস্তে ঘোষনা করেছেন—

‘আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে বাঁধব না আজ তোড়ায়’।

পঁচিশ সংখ্যক কবিতাতেও ঐ একই প্রসঙ্গে বলেছেন—গল্প কবিতার ছন্দকে উদ্দেশ্য ক’রে—

‘আজ হঠাৎ চোখে পড়ল ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ ;
সংঘম আছে ওদের মজার মধ্যে
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাধি।
ওদের আছে শাখার দোলন দীর্ঘ লয়ে ;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেলালের ;
মর্মরধ্বনি হাওয়ার ছড়ানো।’

‘সৌন্দর্যের স্বর্ষাদা আপন যুক্তিতে’—এর অর্থ তিনি নিজেই করেছেন ‘পঞ্চছন্দবোধের চর্চা বাধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না।’ এই কথাই পুনশ্চ কাব্যের ‘নাটক’ কবিতার বলেছেন—

পঞ্চ হল সমুদ্র,

সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।

তার বৈচিত্র্য ছন্দভরণে,

কলকল্লোলে!

গদ্য এল অনেক পরে।

বাধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।

স্বপ্নী-কুপ্তী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল ঠেলাঠেলি করে।

ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা এল জড়িয়ে মিশিয়ে।

স্বরে বেহুসে বনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল।

গর্জনে ও গানে, তাওবে ও তরল তালে

আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।

কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস, কখনো ঝরালো জলপ্রপাত।

কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;

কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মকুভূমি।

‘একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ;

পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে

এর নানাবকম গতি অবগতি।

বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না শ্রোতের বেগে,

অস্তরে জাগাতে হয় ছন্দ

গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।’

জীবনের রূপ-কে যে সমগ্রতায় দেখেছিলেন তিনি সৃষ্টির আদিম সত্তার রহস্তে তারই উপযুক্ত ভাষা ও ছন্দে তিনি তাকে সাজিয়ে দিলেন—‘আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে তোমাদের বাণীর অলংকারে।’

ইতিপূর্বে বাছাই করে যে ৫৩টি গদ্যকবিতার উল্লেখ করেছি শুধু ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-হৃদয়ের অভিব্যক্তির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে কবিতার ক্রমোৎকর্ষ নির্ণয় করেছেন সেই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে জীবিত সংযুক্তিমূলক কবিতাও গদ্যকবিতার চারিটি গ্রন্থে বড় কম সংখ্যক নয়। তিনি সেখানে বলেছেন—‘স্বাস্থির দশটার পরে খালি হয়ে যায়

উপু-করা একটি উচ্ছিন্ন অবকাশ।’

সেখানে ঐ ‘উচ্ছিন্ন’ শব্দের মধ্য দিয়েই বুদ্ধি ও হৃদয় এসে যোগ দিয়েছে। সব অলংকারের পিছনেই আছে বুদ্ধির যোগ আর অলংকার নির্বাচনের মধ্যে আছে হৃদয়ের সংযোগ। যেমন যেখানে বর্ষার বর্ণনায় কবি বলেছেন পত্রপুটের নয় সংখ্যক কবিতায়—

‘মেঘের গায়ে গায়ে দগদগ করছে লাল আলো, তার ছিন্ন অকের বস্তুরেখা।’

তখন সেই হৃদয়ের ভয়ঙ্করের অহুভূতিকেই তিনি প্রকাশ করেছেন ক্ষতবিক্ষতদেহ হাতীর সঙ্গে বিদ্যায়, খণ্ডিত মেঘের তুলনায়।

কিন্তু হৃদয় যখন বৌদ্ধবসের পিয়ামী—তখন রূপকল্প গেল বদলে। অসহায় মানবজীবন যখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ শক্তিপ্রয়োগ করছে কিন্তু পেরে উঠছে না, তার বর্ণনা—

‘দিক হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,

বিশ্বজোড়া অদৃষ্ট খাঁচার মহাকায় পাখি চারিদিকে ঝাপট মারছে পাখা।’

আসলে কবিতাকে বিশ্লেষণাত্মক ভাবে আশ্বাধ করা যায় না। হৃদয়ের যোগ না থাকলে কবিতাই হয় না। আনন্দবর্দ্ধন যেখানে বস্তুধ্বনির কথা বলেছেন—যা ঐ সীমাতে বুদ্ধিগত সেখানেও এই কথাই বলেছেন যে অবসানে সেই বস্তুধ্বনি রসেরই উপকার সাধন ক’রে থাকে।

তবু শব্দের বিকল্পবৃদ্ধি-আশ্রয় ক’রে যেমন অভেদে ভেদ দেখানো যায়, তেমনি ভাবেই কবিতার বিচারে ছন্দ, অলংকার, ভাববস্তু ও রসের বিশেষণ চলতে পারে। কাব্যগত রসকে পানকরসের সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা। পানকরসে নানা বস্তুর মিশ্রণ অবশ্যই থাকে কিন্তু আশ্বাদকালে সেই নানা বস্তুর পৃথক পৃথক আশ্বাদন ঘটে না, রসের বৈচিত্র্যঘটক রূপে তাদের আশ্বাদনা হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি রসের দিক দিয়ে সীমার সত্যে যখন অসীমের স্পর্শ ঘটে তখন সব কিছুই তুল্যমূল্য। কিন্তু ভাববস্তুর মহত্বের উপর আপেক্ষিক মহত্ব স্বীকৃত হতে পারে শিল্পক্ষেত্রে। এই হিসাবেই আমি চারটি গদ্যকবিতাগ্রন্থের ৫৫টি কবিতা থেকে কয়েকটির মান উল্লেখ করছি।

‘পুনশ্চ’-এর ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। যদি এটিকে অনূদিত কবিতা বলে ধরা যায়—তা হলে এই কবিতাটি মৌলিক কবিতার স্বর্বাঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এর ভাষার অনাবিল প্রবাহমানতা, এর ছন্দের ভাবানুযায়ী ওজস্বিতা-কোমলতা ললিতে-কঠিনে কোমলে-কঠোরে অপূর্ব। এর ভাববস্তুও গম্ভীর এবং বিরাট। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কাল নিয়ে মানুষের যে ইতিহাস তাই হচ্ছে এই কবিতার বিষয়বস্তু। এক ভয়াবহ অন্ধকার গুহামুখ থেকে তরঙ্গসঙ্কুল মানবজীবন-প্রবাহধারা কেমন ভাবে নির্গত হয়ে বিচিত্র সভ্যতা ধারার পথ বেয়ে কেমন ক’রে তার চরমতীর্থে গিয়ে পৌঁছল তারই বিবরণ এবং দর্শন এই শিশুতীর্থ কবিতাটি।

‘শেষ সপ্তক’ কবির উজ্জ্বল চৈতন্য আলোকদীপ্ত এক অগ্নিবীণার মহাসংগীত। এর কোন কবিতা বাছব? এ গ্রন্থে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় এক ঋষি-হৃদয়ের নামকালন পবিত্র অন্ধকারে অবগাহন ক’রে স্বকৃমন্ত্রের মতন পূতঃপবিত্র হয়ে উঠেছে। মন্ত্রের মতন নিরলংকার আত্মার বাণী এই কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

‘বহু বিচিত্রের কারুকলার চিত্রিত

এই আমার সমগ্র সত্তা

তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে

কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে

পরিপূর্ণ অব্যবহৃত হবে ?

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে গোচরতাকে
বলেছে যেমন ক'বে বলে গোপ্লির অফুট তারা—
বলেছে—যেমন বলে নিশাস্তের অরুণ আভাষ
'এসো, প্রকাশ এসো ।'

আলোর প্রেমিক কবি প্রাণরক্তভূমিতে বাঁশি বাজিয়ে গেছেন ।

শেষ সপ্তকের 'আট'-সংখ্যক কবিতায় তিনি সস্তার সহজ আনন্দকে প্রকাশ করেছেন । 'নাম-
কালন পবিত্র অঙ্ককায়ে ডুব দিয়ে' যারা শিল্পসাধনাকে করেছিল নির্মল তাদেরই স্বরণ ক'বে মাহুঘের
খ্যাতিমোহকে নিন্দিত করেছেন । অনুপম উপমা দিয়েছেন—

'নামের পূজার অর্ঘ্য—ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন ;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা ।
তার পিছনে ছুটে
সত্য বর্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ন ।'

নয় সংখ্যক কবিতাও একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা । এই জীবনের শেষ পরিণতি কোন রূপ নেবে—বলাকা
কবিতায় যে কথা এক ভাবে বলেছেন—এ কবিতায় সেই কথাই অন্য আর এক ভাবে বলেছেন—

'অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী :
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুষ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;...
আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেঁটন করে এতখানি নিবিড় নিস্তরতা ।
তাই আমি অগ্রাণ্য, আমি অচেনা ;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁর হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি,
সবাই রইল দূরে,—
যারা বললে "জানি", তারা জানল না ।'

শেষ সপ্তকের বাইশ সংখ্যক কবিতায় ক্ষুদ্র অহংতা ও বৃহৎ অহংতার স্বরূপগত পার্থক্য কি নিটোল একটি
উপলব্ধির মুক্তার রূপ গ্রহণ করেছে—

ঐ বৃদ্ধ, ঐ বৃদ্ধ ।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,
তালি দিক বসে বসে ছেড়া চাদরখানাতে ;
অন্নমরণের মাকখানটাতে যে আল-বাধা ক্ষেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উৎসব ।

আমি দেখব ওকে জানলার বসে, ...
 দেখব যেমন করে পুতুল নাচ দেখে ; ...
 মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
 নিত্যকালের আলো আমি,
 সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি
 অকিঞ্চন আমি,
 আমার কোনো কিছুই নেই
 অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা ।'

যত্নাচেতনাও কি অপূর্ব রূপকল্পে প্রকাশ পেয়েছে উনচল্লিশ সংখ্যক কবিতায়, সেখানে বলছেন—

‘আমি যত্ন-বাখাল,
 সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলছি
 যুগ হতে যুগান্তরে
 নব নব চারণ ক্ষেত্রে ।’

শেষ সপ্তকের কোন কবিতাই বা বাছব ! এ যেন ঋক্মন্ত্রের অক্ষর—উদাস্ত-অহুদাস্ত-স্বরিতেও তরঙ্গচূড়ায়
 বলমলিয়ে উঠছে হিরণ্য পুরুষের দৃষ্টি আলোকে—যার একটি অক্ষরও ক্ষর নয় ।

‘পত্রপুট’ কাব্যগ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই চারটি কবিতার—তিন সংখ্যক—‘আজ আমার
 প্রগতি গ্রহণ করো পৃথিবী’, পাঁচ সংখ্যক—‘সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে’, তেরো সংখ্যক—‘হৃদয়ের অসংখ্য
 অদৃশ পত্রপুট’ এবং বোলো সংখ্যক—‘উদ্ভাস্ত সেই আদিম যুগে ।’

প্রথমটির বিষয়বস্তু অচিন্ত্যগুণা পৃথিবী—এই পৃথিবীর বন্দনা গুনতে গুনতে মনে হয় যেন পুরাণ
 কণ্ঠে গুনছি সেই বন্দনা—গগচ্ছন্দে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতিতে ধ্বনিসংঘর্ষে সৃষ্ট এক উত্তাল শব্দ সমুদ্রের উত্তাল-
 পাতাল প্রাণশক্তি—যেমন তার কল্পনাও মহীয়সী, তেমনি তার রূপের লহরী—

‘আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
 আমার সমস্ত স্বধ্বংসের শেষ পরিণাম,
 রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী
 নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে ।
 অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
 গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
 নীলাদুরাশির অতন্ত্রতরঙ্গে কলমজ্জগুধরা পৃথিবী,
 অরূপা তুমি হৃদয়ী, অরূপিতা তুমি ভীষণা ।
 এক দিকে আপকথান্তভারনয় তোমার শস্তক্ষেত্র,
 সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
 কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে ।

অন্তগামী স্বৰ্ণ শ্রামলশস্ত্রহিমোলে বেথে যায় অকণ্ঠিত এই বাণী—

‘আমি আনন্দিত’।

পাঁচ সংখ্যক—‘সন্ধ্যা এস চুল এলিয়ে’ কবিতাটি পড়তে পড়তে সত্যই মনে হয়—‘স্বপ্নের ধূপ উঠছে নক্ষত্র লোকের দিকে’। এর কিছু অংশ নমুনা হিসাবে—ইজিয়-বুদ্ধি-হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রকাশের নমুনা হিসাবে আগেই দিয়েছি। সাধারণত নর-নারীর প্রেমকে সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ক’রে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে তাতে অবলুপ্ত ক’রে পরিবেশন করা হয় কথার ফুল-কাটা পেয়ালায়। কিন্তু এই কবিতায় সমস্ত জগতের ‘মধুমৎ পার্শ্বিং বজঃ’ স্বীকার ক’রে জীবনের পূর্ণোপলব্ধির মধ্যেই প্রেমের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে—যেখানে—

‘হাট করতে এলাম আমি অধরার সন্ধানে,

সবাই ধরে টানে আমার এই যে গো এইখানে।’

কোনখানে?—যেখানে আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তার আলো-নেবা বাসর ঘরে নব বধূর প্রতীক্ষাটি যেন আকাশে ধ্রুব তারার অনিমেষ দৃষ্টি, যেখানে অন্ধ বৈরাগীর গানে গোলমালের জমিনে স্রবের শিল্পে বুনে উঠছে বিশ্বের একটা উৎকর্ষার মন্ত্র—‘তাকিয়ে আছি’, যেখানে বেদমন্ত্রের ছন্দে মন বলছে—‘মধুমৎ এই পার্শ্বিং ধূলি।’

ভেবে সংখ্যক কবিতা ‘হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট’—একটি আশ্চর্য উপলব্ধির তাজমহল। কত স্তম্ভ কারুকাজ এর তন্তুর অন্তরে অন্তরে, কত রসের অতল কূপ এর লোমরোমাকে—এই জীবনের গূঢ়তম মন্দির মধ্যে—

‘হৃদয়ের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা

ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,

প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,

আত্মনিবেদনের অশ্রুগদগদ আকৃতি থেকে,

মাধুর্যের কত স্বতরূপ কত বিশ্বতরূপ

ধিরে গেছে অমৃতের স্বাদ।’

কিন্তু হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট তো চিরদিন থাকে না—একদিন এর স্মরণের সময় হয়—কিন্তু কবি সেজন্য প্রস্তুত থাকেন, শুধু জিজ্ঞাসা করেন অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে—

—‘কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,

জীবনের অলক্ষ্য গভীরে

আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়

অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়

যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার স্বাক্ষরূপে,

যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,

তাকে বেথে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্যের দৃষ্টির সম্মুখে।’

এই মনুজীবনকে কোন অভাবনীয় মহিমায় তিনি দশ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ করেছেন—

‘হে পূষণ, তোমার হিরণ্ময় পাতে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,

উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।...

হে সবিভা,...আমার অন্তরতম সত্য
 আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
 তোমার বিরাটে ছিল বিলীন
 সেই সত্য তোমারই।
 তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
 আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
 কখনো নীল মহানদীর তীরে,
 কখনো পারস্যমাগরের কূলে,
 কখনো হিমালয়গিরি ভেঁটে—
 বলেছে 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র',
 বলেছে 'দেখেছি অঙ্ককারের পার হতে
 আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব।'

এই সব কবিতায় জীবনের মহত্তম আকৃতি রূপলাভ করেছে ভ্রষ্টা ঋষির আত্মনেত্রে ঋক্মন্দের মতন।
 এক একটি কবিতায় এক একটি ভাবের মহত্তম উদ্ভাসন, বীৰ্যবস্ত্র প্রকাশ।

পত্রপুটের বোলো সংখ্যক 'উদ্ভাসন সেই আদিম যুগে' ইত্যাদি কবিতাও রবীন্দ্রনাথের একটি
 শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা। আফ্রিকার দলন-ইতিহাসে সমস্ত মানুষের হয়ে তিনি তীব্র কোড প্রকাশ করেছেন—
 তাঁর সমস্ত অন্তরাত্ম প্রাচ্যের চিরস্তনী বাণীকে তবু ভোলে নি যখন বলেছেন—'কমা করো'—

‘আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
 প্রদোষকাল ঝঞ্জাবাতাসে কুঙ্করাস,
 যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এস,
 অন্তত ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অস্তিমকাল,
 এস যুগান্তরের কবি,
 আসন্ন সন্ধ্যার শেষ বশ্মিপাতে
 দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
 বোলো 'কমা করো'—
 হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
 সেই হোক তোমার সত্যতার শেষ পুণ্যবাণী।’

পত্রপুটের আফ্রিকা ও পৃথিবী কবিতায় নানা জ্ঞানের সমাহার আছে বলে কবিতা দুটি মহতী—এমন
 কথা বলা চলবে না। পৃথিবী কবিতায় ডার্বিনের The Origin of Species by means of Natural
 Selectionএর 'Survival of the Fittest'—মতবাদের কতখানি প্রভাব আছে, কিংবা এতে বার্গসের
 Creative Evolutionএর Vitalism তত্ত্ব কতটা নিহিত আছে কিংবা নানা বিধর্মের সংমিশ্রণ ও সাময়িক
 বিধানের মধ্যে হেগেল-এর Dialectical Movementএর অস্তিত্ব কতটা বিরাজমান—এসব প্রশ্ন
 ঐতিহাসিকের—রসজ্ঞের নয়। ঐতিহাসিক যে রসজ্ঞ হতে পারেন না এমন কথা আমি বলছি না—কিন্তু

তিনি যখন শিল্পের মর্মস্পর্শ করেন তখন রসজ্ঞ সস্তায় করেন। সাহিত্যের স্বাদ হচ্ছে সমগ্রতার স্বাদ। তা সমস্ত জ্ঞানের ও সমস্ত অভিজ্ঞতারূপ কর্ণের জীবনবোধে—যাকে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলেছেন—‘নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাত্তবেক্ষণাৎ’—পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাই জোগাতে পারে না।

শ্রামলী—কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতাকে শ্রেষ্ঠ কবিতার নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে—একটি ‘আমি’ ও অপরটি ‘বাণিওয়াল’। ‘আমি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলতে চান সৃষ্টির একটি নিগূঢ় তত্ত্ব—রহস্যময়তায় যা সুন্দর, ব্যঞ্জনাময়তায় যা বাচ্যাতীত। সমস্ত মাহুষের হয়ে তিনি অহংকার প্রকাশ করেছেন—এই অহংকার হচ্ছে অসীম যেখানে সীমায় সংহত হয়েছেন—সেই অহংকার। যে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ বহু সস্তায় বিকশিত হয়ে লীলাময়—সেই ‘আমি’র কথা। প্রসঙ্গত এই কবিতায় বক্তব্যের সঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিক ভোজের রসবাদের সাদৃশ্য আপনা থেকেই স্বরূপ পথে উদ্ভিত হয়।

ভোজের মতে আত্মব্রতি বা আত্মশৃঙ্খার প্রধান রস। ‘অহং’ ভাব-এর প্রধান কথা এবং পূর্বা কোটি। এর মধ্যমা কোটিতে দেখি অহং-ভাব থেকে উৎপন্ন বিচিত্র রসের আবির্ভাব এবং তৃতীয় বা শেষ কোটিতে বহুরসের পুনরায় একমাত্র রসে পরিণতি। পূর্ব কোটি থেকে এই শেষ কোটির পার্থক্য হচ্ছে মহীকহ জীবনে বীধকোটি থেকে ক্ষকোটির পার্থক্য। অর্থাৎ রসের তিনটি অবস্থা—প্রথমেই ‘ক্কাহংকারতা’—বা অহং অভিমান যার অন্ত সমস্ত কিছুই রসনীয় হয়ে ওঠে—যে কথা পাচ্ছি ‘আমি’ কবিতায়—

‘আমারই’ চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ—

চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

আমি চোখ মেলনুয় আকাশে

জলে উঠল আলো

পূবে পশ্চিমে।

গোলাপের দিকে চেয়ে বলনুয় সুন্দর

সুন্দর হ’ল সে।...

মাহুষের অহংকার পটেই ‘বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।’

প্রথমা কোটির ক্কাহংকারতা বা আত্মাভিমান দ্বিতীয় অবস্থায় বিচিত্র বস্তুর সংস্পর্শে এসে বিচিত্র ভাবের আত্মদানে প্রকর্ষ লাভ করে—

‘অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা

মাহুষের সীমানায়,

তাকেই বলে ‘আমি’।

সেই আমির গহনে আলো-আধারের ঘটল সংগম

দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।

‘না’ কখন ফুটে উঠে হল ‘হা’, যারায় মত্তে

রেখায় রঙে স্থখে দুঃখে।’

ভোজদেবও বলেছেন তাঁর ‘শৃঙ্খারপ্রকাশ’ গ্রন্থে—‘অভিমানোহংকারঃ স্বং খলু আলোচিত্তং মতক্ অত্র ‘অহম্’-অধিকৃতঃ, শক্তঃ খলু অহম্ অত্র, মদর্শা এব অসী বিষয়াঃ, যন্তো ন অন্তঃ অত্র অধিকৃতঃ,

কশ্চিৎ অস্তি অতঃ অহম্ অস্মি ইতি যোহভিমানঃ সঃ অসাধারণব্যাপারবস্থাৎ অহংকারঃ ।’—‘অভিমানই অহংকার । যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সেখানে আমিই আছি । যা কিছু করা হয় তা আমিই করি—সমস্ত বিষয়বস্তু আমারই জন্ত । আমি ছাড়া কিছুতে কারো অধিকার নেই, কিছু যদি থাকে তো আমি আছি বলেই থাকে—এই যে অভিমান বা অসাধারণ ব্যাপার—একেই বলে অহংকার । এই যে অহংকার বা অভিমান—একেই ভোজদেব বলেছেন শূকার বা আত্মরতি । ভোজদেবের মতে বিচিত্র রসের স্থায়িতাব হচ্ছে এই আত্মরতি বা অহংকার ।

তিনি একথাও বলেছেন—এই অহংকার আছে বলেই সমস্ত বস্তুর বা ভাবের রসনীয়তা সম্ভব—‘ন রত্যাঙ্গিতুমা রসঃ । শূকারো হি নাম আত্মনঃ অহংকার বিশেষঃ— রত্যাঙ্গীনাং অরম্ এব প্রভবঃ ।’ ‘শূকারিণো (অহংকারিণো) হি রত্যাঙ্গয়ো জায়ন্তে ন অশূকারিণঃ ।’

আত্মরতিবান্ পুরুষেরই রতি প্রভৃতি ভাব অহুভূত হয়—অনহংকারী ব্যক্তির হয় না—

বিধাতাও—‘একা রবেন বলে নীলিমা হীন আকাশে
ব্যক্তির হারা অস্তিত্বের গণিত তত্ত্ব নিয়ে ।’

‘শূকারী হি রমতে, শ্রমতে, উৎসহতে, স্নিহতি ইতি’—অহংভাবাবৃত্ত ব্যক্তিই রমন করে, হাসে, উৎসাহী হয়, প্রেমমগ্ন হয় । এই অহংভাব না থাকলে কোনো রসেরই প্রকাশ ঘটবে না—‘আমি’ কবিতাতেও পড়ি ।

‘দূর দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনো খানেই
‘তুমি সুন্দর’—‘আমি ভালোবাসি ।’

অনহংকার—অবস্থাই প্রলয়ের অবস্থা—লীলাহীন প্রলয়ের রূপ—

‘মর্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাণ্ডায় পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ; যাহুকের কীর্তি হারায়ে অমরতার ডান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে অনন্ত রাত্রির কালি...
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ ছানিয়ে নেবে রস ।

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে—জলবে না কোথাও আলো ।’

কিন্তু অহংকারের পরমা কোটি প্রেমরসে—কিন্তু তাও প্রকৃতিবিকার—কারণ তাও অহং-ভাবমুক্ত নয়—‘প্রেমরূপেণ রসস্ত পরমা কাষ্ঠা’—সৃষ্টিসম্পর্কবিরহিত অনহংসত্তা তা নয় । তাই রবীন্দ্রনাথের ‘আমি’ কবিতাতেও শুনি—

বিধাতা কি আবার রসবেন সাধনা করতে যুগযুগান্তর ধরে ।

প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন—‘কথা কও, কথা কও’

বলবেন—‘বলো—‘তুমি সুন্দর ।’—বলবেন—‘বলো—‘আমি ভালোবাসি’ ।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি একটি দুর্লভ দার্শনিক তত্ত্বকে কত সহজে কবি আপন হৃদয় শোণিতে আবর্তিত ক’রে নিয়ে কত সুন্দর রূপ দিয়েছেন । সত্যের প্রকাশ ঘটেছে—বলেই তা সার্থক হয়েছে—

‘তুমি বলবে—এ যে শুদ্ধকথা—এ কবির বাণী নয়
আমি বলব—এ সত্য, তাই এ কাব্য।’

আর একটি অনবদ্য গদ্যকবিতা শ্রীমতীর ‘বাশিওয়ালা’ সেই যে ঘরের কোণের একটি নিরীহ
সহিষ্ণু মেয়ে—যার মিল হয় নি বাধায় আর বুদ্ধিতে—শক্তিতে আর ইচ্ছায়—প্রথম আলোর কাপসা দূরের
জগৎ দেখে যার মনে হয় ‘মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে বয়ে চলেছে দরদরিয়ে প্রাণের বেগ’—বাশিওয়ালার
বাশি শুনে তার মনে হয়—

‘যে ছিল পাহাড় তলির ঝিরঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে প্রাণের বাদলরাতি।
সকালে উঠে দেখা যায়, পাড়ী গেছে ভেসে,
একণ্ঠে পাখরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে অসহ শ্রোতের ঘূর্ণিমাতন।
আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার স্বর ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপর আছাড়-খাওয়া মরণ-মাগরের ডাক
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে পূর্ণ শ্রোতের ডাকাতি—
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুদ্ধি।
অন্ধে অন্ধে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া অরণ্যের বকুনি।
জানা দেন নি বিধাতা—
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।’

এমনি করেই কবিতাজীবনের চরম বাণীকে পরম রূপ দান করেন। এই ‘পলকের ধন’ই তো শ্রেষ্ঠ
ধন—প্রাণের কথা তো সাজানো কথা নয়—সে হচ্ছে গানের পাখা।

কিন্তু এ গানের পাখা সকলের জন্ত নয়। সকলের হয়ে এবং সকলের জন্ত রবীন্দ্রনাথের আর
একটি কবিতার কথা উল্লেখ করব। সেটি পূর্বেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে—শিশুতীর্থ।

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে—সভ্যতার আদিম যুগে মানুষ পশুশক্তিকেই শক্তি বলে জানত—তার কাছে
সেই শক্তিই আত্মশক্তি। তার চেয়ে বড় কিছু মনে সে জানতে চাইতো না, বলতো—এ হচ্ছে ভয়ানকের
মায়ামুষ্টি। কিন্তু জীবনস্বপ্নের নির্দেশক ধর্মচেতনা প্রথম তার হৃদয়ে সংবেদিত হ’ল, সে বলে উঠল—

‘যাত্রা করো, চলো সার্থকতার তীর্থে।’

এইবার শুরু হয় বুদ্ধির আলোকে তরঙ্গ-জাগা, হৃদয়-সমুদ্রে তরঙ্গ-জাগা মানুষের চলার প্রবাহ।

পৃথিবীর দ্বিগবিদিক থেকে অসংখ্য ও বিচিত্র জনপ্রবাহ এসে যোগ দেয় তারা এল—

‘সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ভিড়িয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে,
এল নীল নদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের নিমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,

প্রাকার রক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
 লতাজাল জটিল অরণ্যে পথ কেটে।
 কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতীতে
 কেউ রথে চীনাংগুরের পতাকা উড়িয়ে।
 নানা ধর্মের পূজারি চলন ধূপ জালিয়ে মন্ত্র পড়ে।
 রাজা চলল—অনুচরদের বর্ধাকলক রোদ্রে দীপ্যমান,
 ভেঁরি বাজে গুরু গুরু মেঘমস্ত্রে।
 ভিক্ষু আসে ছিন্ন কস্মা পবে,
 আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
 জ্ঞান গরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
 চটুল গতি বিজ্ঞার্থী যুবক।
 মেয়েরা চলেছে কলহাস্তে—কত মাতা, কত কুমারী কত বধু—
 মাথায় তাদের খেতচন্দন, কাষিতে গন্ধসলিল।
 বেস্তাও চলেছে সেই সঙ্গে—তীক্ষ্ণ তাদের কর্ণধর,
 অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।
 চলেছে পশু খণ্ড অঙ্ক আতুর—
 আর সাধুবেনী ধর্মব্যবসায়ী
 দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।

কিন্তু চলার সার্থকতার সংশয় জাগে—মহিনায়ককে তারা হত্যা করে। তখন দেখা দেয় সংকট—
 অবিশ্বাস—দ্বিধাংশা। ভয় বিহ্বল চিন্তে জিজ্ঞাসা করে—কে আমাদের পথ দেখাবে? পূর্বদেশের বৃদ্ধ
 বলেন—যাকে আমরা মেরেছি—তিনি মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমাদের পথ দেখাবেন।

ক্রোধে আমরা তাঁকে হনন করেছি—

প্রেমে আমরা তাঁকে গ্রহণ করব।

কেননা—মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের

সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,

সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে এই দুঃখবরণ ও মৃত্যুচেতনা একটি বড় স্থান অধিকার ক'রে আছে।
 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'মৃত্যুর প্রকাশ', 'মৃত্যু ও অমৃত', 'অমৃতের পূত্র' ইত্যাদি রচনায়, 'বিচিত্রপ্রবন্ধ'-
 গ্রন্থে 'কঙ্কগৃহ', 'মাঠে' ইত্যাদি প্রবন্ধে, আত্মপরিচয় গ্রন্থে, ফাল্গুনী নাটকে, চিত্রায় 'মৃত্যুর পরে' কবিতায়,
 চৈতালিতে 'মৃত্যুমাধুরী' কবিতায়, প্রভাতসঙ্গীতে 'অনন্তমরণ' কবিতায়, সোনার তরীতে 'ঝুলন' কবিতায়,
 ভানুসিংহের পদাবলীতে ১২ সংখ্যক গানে, শেষ সপ্তকের ৩২ সংখ্যক কবিতায়, বলাকায় চঞ্চলা কবিতায়,
 তা ছাড়া জয়দিনে, শেষলেখা ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থে গদ্য ও পদ্যে তিনি মৃত্যুর একটি গূঢ় বহুস্তমর তথ্যকে
 সৃষ্টির অঙ্গীভূত ক'রে দেখিয়েছেন। শেষ সপ্তকের ২৩ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন—

‘সহস্রবর্ণের বধু বৃক্ষি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে নূতন চোখে চিরজীবনের অমান স্বরূপ।’

হৃৎকণ্ঠ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ এসে পৌঁছল একদিন সেই তীর্থে—শিশুতীর্থে—যেখানে
‘তালীকুণ্ডলে একটি পর্ণকুটির অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।’
যেখানে—‘দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে চলেছে—
‘মাতা দ্বার খোলো’।.....

‘সন্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনে পেল—
সৃষ্টির সেই প্রথম পবন বালী—‘মাতা দ্বার খোলো’।
দ্বার খুলে গেল। মা বসে আছেন ভূগণ্যায় কোলে তাঁর শিশু,
উদার কোলে যেন শুকতারা। সকলে জাহ্নু পেতে বসল—উচ্চারিত হ’ল—
‘জয় হোক মাতৃধের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।’

মানুষ অরাজক্যাস্তরের মধ্য দিয়ে রূপ পেতে পেতে চলেছে একটি পরম বিকাশের পথে, ঐ নবজাতকের
মধ্য দিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরন্তন জীবনে সে অমরতা লাভ করতে।

শিশুর মধ্য দিয়েই সৃষ্টির নবরূপারন—এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতাতেই বলেছেন। বস্তু-
বিষয়বস্তু এই কবিতায় বিশাল, গভীর এর আকৃতি, ব্যাপক এর পটভূমি। অলঙ্করণও অপূর্ব—

‘পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মত’,
‘পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা নিশীথবাতের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।’
‘ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে—
বিশ্বস্তার শিকড়ে শিকড়ে কৈপে উঠল প্রাণের চাকলা’,
‘উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে—যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুজ্জল।’ ইত্যাদি।

ভাবার ধ্বনিবাহকও অপূর্ব—অলঙ্করণের সঙ্গে সঙ্গে

‘অকস্মাৎ উচ্চ ও কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে,
ও কি বন্দী বারিষাশির গুহাবিদারণের কলরোল !
ও কি ঘূর্ণতাওরী উন্মাদ সাধকের ক্রমশঃ উচ্চারণ !
ও কি দ্বাব্যবেষ্টিত মহাবল্লভে আশ্রয়দাতী প্রলয়নিদাদ !’

রসের গভীরতা, তত্ত্বের উপলব্ধি, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এবং এর সঙ্গে অলঙ্করণের স্মৃতি প্রয়োগ এবং
গদ্যচ্ছন্দের প্রবহমান কাব্যিক প্রয়োগ—সব দিক দিয়েই শিশুতীর্থকে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতারূপে
নির্দেশ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরসূরীদের গবেষণা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারতপথিক' বলে। কথাটি তিনি গ্রহণ করেন মধ্যযুগের সন্ত কবি কবীরের 'ভারতপথ' থেকে। ভারতপথের প্রাণবন্ত হল সন্তাতি (Race), ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক ভেদাভেদের উর্ধে উঠে সমস্ত মানুষকে এক বলে দেখার সাধনা। তিনি রামমোহন বায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে ঐ সাধনাকেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে দেখেছেন। আমাদের জাতীয় জাগরণের সেই উষাকালে ভোরের আলো যখন ভালো ক'রে ফুটতে শুরু করে নি, সেই সময়ে রামমোহন ভারতীয় ঐক্যের নবীন উদগাতারূপে আবির্ভূত হন। রামমোহনের সমগ্র জীবন ও কর্মের মূলস্রটিকে বোধহয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম এত সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক ভাবে প্রকাশ করেন।

মানব-ঐক্যের তীর্থভূমিরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের যে ভাবমূর্তিটি কবির মানস-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাকেই তিনি কাব্যের ভাষায় 'মহামানবের সাগরতীরে' বলে চিত্রায়িত করেছেন। সমস্ত বিরোধ ও পার্থক্যের মূলে রয়েছে ভারত ইতিহাসের যে ঐক্যের স্রটি অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তাকেই প্রকাশ করেছেন গানের স্বরে 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' বলে।

'ভারতপথ' সম্বন্ধে কবিগুরু চিন্তা শুধু মাত্র গান ও কবিতায় অভিব্যক্তিতে সীমিত নয়। তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে সেই চিন্তাকে আরো মূর্তরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁদের উৎসাহিত করেছেন ঐ বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগের জন্যে। কবির মতে ভারতে উপনিষদীয় চিন্তা থেকে শুরু ক'রে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, মধ্যযুগের নানা সন্ত সম্প্রদায়, পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবি, নানা সহজিয়া সম্প্রদায়, আউল-বাউল ইত্যাদির সাধনার মধ্য দিয়ে ঐ মূল ধারাটিই ক্রমে পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। স্বভাবতই উপরোক্ত চিন্তাপ্রবাহের উপরে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব খুব বেশি। কবির নিজের বিশ্বদৃষ্টিও অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বাস্তবমুখীন মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি ঐ প্রবাহে আধ্যাত্মিকতার আবরণের নীচে অবস্থিত সমাজসত্যটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে স্বীকৃতিলাভ করেছে ভারতপথের প্রাণবন্তটি অর্থাৎ যে সব বিধিনিষেধ, অহুষ্ঠান, ভেদবুদ্ধি মানুষকে মানুষে দুর্লভ্য ব্যবধান রচনা করে তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানবসত্যের পূজারীদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথ যে এই জিনিসটিকে বিমূর্ত তত্ত্বরূপে মাত্র উপস্থিত করেন নি এবং ভারত-ইতিহাসের মূলস্রটিকে সংগ্রাম বিগুণ তথা সামাজিক স্বন্দের সত্যের দিক থেকে মুখ ফেরানো উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত করেন নি সে কথা পূর্বে একটি প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

ভারতপথের সর্ববাণী

ভারতপথের মূলস্রটিকে সূত্রায়িত রূপ দিয়ে কবি বলেছেন—

'পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুলভ

করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি, দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অম্লভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিনুগ্ন হইবে।

বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্মাণ করিবেন তিনি আমাদের রক্ষা করিবেন।’

(ভারতবর্ষের ইতিহাস। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ১০২ পৃঃ)

কবির মতে রামমোহন সেই সেতু রচয়িতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

নানাকে এক করার প্রয়াসটি ভারতবর্ষে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে, এখানে বহু ধরনের মানবিক উপাদানের সমাবেশের ফলে। সেই প্রসঙ্গে কবি বলেন—

‘মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? যেখানে কোনো অঙ্কতায় কোনো মৃত্যুর মাহুবে মাহুবে বিচ্ছেদ ঘটায়।—মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মাহুবে ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মাহুবে একত্র হবার অমূল্যতা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস যাদেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে ‘সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্’—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দূরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দূরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।’

(ভারতপথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৩৮৪-৩৮৫ পৃঃ)

উক্ত প্রবন্ধেই গোড়ার দিকে কবি লিখেছেন যে, এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত করা। এর বিকল্পতা ভারতে এত প্রবল বলেই সেই সাধনার পথ কুহুমাস্তীর্ণ নয়, সংঘাত সঙ্কুল। সংঘাতের মধ্য দিয়েই জাতির জয়যাত্রার রথ এগিয়ে চলে, প্রত্যেক দেশকে তার বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে হয়।

ভারতবর্ষ যতদিন সেই সমাধানের চেষ্টা ক’রে চলেছে ততদিন এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস। যখন সে চেষ্টা স্তব্ধ হয়েছে তখন তার ইতিহাস স্তব্ধিত হয়ে থেকেছে। রামমোহন ঐ স্তব্ধিত অচলায়তনে আঘাত ক’রে প্রাণের উৎসমুখ খুলে দেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে রামমোহনের ভূমিকার বিস্তৃত অবতারণা প্রাসঙ্গিক নয়। সূত্রাং কবি-বর্ণিত ভারতপথের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

উপনিষদের ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

‘ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, ‘বিদ্বান ইতি সর্বাঙ্গবন্ধঃ স্বসংবিদরূপবিদ বিদ্বান্’—নিজেরই

চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং একথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্য স্থলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্যাদাসিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।' (ভারতপথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৩৮৬ পৃঃ)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন—

‘বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—

অথ যোহিষ্ঠাং দেবতাম্ উপাস্তে

অন্তোহসৌ অন্তোহহম্ অস্মীতি

ন স বেদ, যথা পশুবেবং স দেবানাম।

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই। অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী ক’রে রাখে; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত।

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে, আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, ‘মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।’

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ-পাথর-পূজাকে বলেছে হীনতা এবং তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটো। স্বীকার করি কাঠ-পাথর বাইরের জিনিস, সেখানে সর্বকালের সর্বমানুষের পূজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রধায় প্রধায় সেই পূজা বিচ্ছিন্ন করে, তার ঐতিহাসিক গতিগুলি সংকীর্ণ।

কিন্তু, তাদের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, নানা প্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত—শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতির ঐতিহাসিক কার্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈনিক ও কালিক বিশেষ গ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন।’

(মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী আদ্যশ খণ্ড ৫০৫ পৃঃ)

বৃহদারণ্যকের উপরোক্ত উক্তির অর্থ এই নয় যে মানুষ নিজেকে নিজেকে পূজা করবে। কবি সেই অর্থকে যে ভাবে বুঝেছেন তা কিছু পরেই ব্যাখ্যা করেছেন।

‘আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।

একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বটাই।

সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন : যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন : ত্যং বেঙ্গং পুরুষং

বেদ। যিনি বেদগীর্ণ সেই পূর্ণ মাতৃষকে জানো ; অন্তরে আপনার বেদনার ঠাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনার জানো, জানে নয়, বাইরে নয়।' (মাতৃষের ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী ষাটশ খণ্ড ৫২৬ পৃঃ)

ভারতপথ গবেষণায় বৌদ্ধশাস্ত্রের স্থান

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের বাণীর মানবতাবাদী দিকটিকেই বড় ক'রে তুলে ধরেছেন। কোন দৃষ্টিতে এবং কোন পদ্ধতিতে বিচার করলে সেই দিকটি প্রাধান্য লাভ করে মেন্দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন—

'বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্য যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ দুঃখই চরম কথা হয় তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মিত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুওই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য—আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে—বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়—এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে।... সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তাও যে ওই প্রকৃতি—সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মাতৃষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তথ্যকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না।'

(বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৪২০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে জাতক-কাহিনীর মূল কথাটি এই যে যুগ-যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে এসেছেন। প্রাণিজগতে নিত্যকাল ধরে যে দ্বন্দ্ব চলেছে ভালো-মন্দর ভিতরে, তারই চরম বিকাশ হচ্ছে বুদ্ধের প্রচারিত অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ।

আর্ধ-ভাষাভাষী এবং এদেশের অনার্য আদি অধিবাসীদের মধ্যে যে বিরোধ চলেছিল তার মাঝখানে মাতৃষে মাতৃষে মিলনের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয় বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধযুগে শুধু যে সেই সব বিকৃত মানবগোষ্ঠীর বেড়াগুলিই একধর্মের বস্তায় ভেসে যায়, তাই নয়। বাইরের নানা মাতৃষও সেই বস্তার প্রবাহে ভেসে ভারতবাসীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বা ভারতের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মিলনের সেত্বরচয়িতা হিসাবে বৌদ্ধধর্ম যে ভূমিকা পূরণ করে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই কান্স হন নি। বৌদ্ধধর্মের উক্ত ভূমিকা সম্বন্ধে গবেষণার এবং সেই গবেষণায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অহুস্ত পথের থেকে ভিন্নপন্থা অনুসরণের প্রয়োজন সম্বন্ধে যে সব বক্তব্য উপস্থিত করেন তা ভারতবিজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া অসম্ভব হবে না।

'বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্ধ-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্ধযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিয় অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল।

বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিকৃত জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি একধর্মবল্লয় ভাঙিয়াছিল—তুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আশ্রানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানস-প্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদানপ্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ স্তম্ভগত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্ত আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদের চোখে চলিতে হয়—যাহা-কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মানাইয়া লওয়া নহে, অজ্ঞানের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোমত পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ঐতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। জাপান, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মস্ততত্ত্ব পূজার্তনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্বনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিস্তৃত স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ইহারা আবার-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনাধ তাহাকে আর্ঘবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

(বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৪২১-৪২২ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রত্যেকটি অংশই সঠিক কিনা সে প্রশ্ন এখানে বড় নয়। বরং পূর্ববর্তী গবেষকদের অসুস্থতার ফলে কিছু কিছু অংশ সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের অবকাশ আছে। যথা, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এবং পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়া যে বৌদ্ধযুগের অনেক আগেই শুরু হয় সে কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বৈদিক সাহিত্যেও মানবমনের শিশুকালের সৃষ্ট অনেক উপাদানের দেখা মেলে। জার্মান পণ্ডিত ডঃ ভিস্তেরনিংস এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা

করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল উপপাদ্য অর্থাৎ আর্গ ও অনার্বভাবী মানবগোষ্ঠিকে একই সমাজের মধ্যে টেনে আনাও বৌদ্ধধর্মের বিরাট ভূমিকা সন্দেহে দ্বিগত নেই।

গবেষণার সহকর্মীদের উৎসাহদান

কবি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সহকর্মীদের কিভাবে ভারতপথ সন্দেহে ঐতিহাসিক গবেষণায় উৎসাহদান করতেন তার একটি সুন্দর ও জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় আচার্য ক্ষিতিমোহন দেন লিখিত 'বাংলার সাধনা' নামক পুস্তকটির 'নিবেদন' শীর্ষক অংশটিতে। তার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হল।

'মানবতত্ত্ব সন্দেহে ব্রজেননাথ শীল মহাশয়ের একটি গভীর আলোচনার পরে কবিগুরু বলছিলেন, 'আমাদের দেশে সব কথাতেই স্থান-কাল পাত্রের বিচার। এর মধ্যে মানুষই হল পাত্র। প্রত্যেকটি পাত্রেরই আপন আপন বিশেষত্ব আছে। বিশেষ বিশেষ স্থান ও কালেরও কি এইরূপ এক একটি বিশেষত্ব নেই? আমার তো মনে হয় এক যুগ অল্প যুগ হতে রীতিমত বিভিন্ন। বিচার ক'রে দেখলে পৃথিবীর সর্বদেশেই সেই সেই যুগের কালগত একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। আবার প্রত্যেকটি যুগেরও দেখা যায় দেশগত একটি বিলক্ষণতা। নতুন পুরাতন সব যুগেই সেই দেশের সেই বৈশিষ্ট্যটিকে এড়িয়ে যাবার জো নেই।'

ব্রজেন শীল মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মতে ভারতের এই বৈশিষ্ট্যটি কি?'

কবিগুরু বললেন, 'বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম। আমার 'ভারতের ইতিহাসের ধারা'তে আমি এ কথা ভালো করেই বলেছি। ভারতের উঁচু নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায় নি। এইটি আর কোথাও কি দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে ঘেঁষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতে কিন্তু কখনোই সেটি ঘটে নি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্বরসংগতির (harmony) সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা। নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধনই ভারতের ব্রত। যে সব সাধক এই সাধনাতে সিক্কিলাভ করেছেন তাঁরাই আমাদের দেশের মহাপুরুষ। তাঁদের নামই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বড় বড় যুদ্ধে রণজয়ীদের কথা আমরা ভুলে যাই, কিন্তু রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ কবীর রবিদাস নানক চৈতন্য প্রভৃতির কথা আমরা কখনও ভুলতে পারি নে। বিরোধের মধ্যে যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় ভারতপন্থ, এবং এই সাধনার সিদ্ধ ভারতপন্থিকেরাই হলেন ভারতের মহাপুরুষ।

ভারতের পরই এল বাংলাদেশের বিশেষত্বের কথা। কবিগুরু বললেন, 'নদীর পলিমাটিতে তৈরি এই বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে।

নানা ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাস দেখলে আমার এ-সব কথাই সত্যতা বোঝা যাবে। মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভৃতি মত এই দেশে বা তার আশেপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন যুগধও বাংলার সঙ্গেই ছিল একঘরে অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যেও দেখা যায় সেই স্বাধীনতা। তাদের

সাহিত্যে ও গানে অসঙ্খ্য বা শাস্ত্রের গুরুত্ব তার কখনও সইতে পারে নি। শাস্ত্রের বিপুল ভাষা নেই অথচ কি গভীর কি উদার তার ব্যঞ্জনা। এদেশের কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলেন যে কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে না। অপার মানবীয় ভাবের কোথায় সীমা কোথায় শেষ? প্রাণের মতোই তা সর্বভাবমুক্ত ও সহজতার অতল অপারতার রহস্য।

‘গঙ্গা ও সাগরের সংগম ঘটেছে এই দেশে। উত্তরের আর্ষ ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনক্ষেত্রে। এদেশ তাই নানা দিক দিয়েই মিলনের ক্ষেত্র।

ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় মানবতত্ত্বের খুব বড় পণ্ডিত। তিনি বললেন, ‘বাংলাদেশে কত জাতীয় মানুষের যে মিলন ঘটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আর্ষ-অনার্য ভোট কিরাত প্রভৃতি মঙ্গোলিয়ন জাতি মিলেছে। মণিপুর দিয়ে শানবাসী চীনেরা এসেছে। গারো-খাসিয়া-কাছাড়ী কোচ প্রভৃতি জাতি এখানে আছে। সাঁওতাল ভীল কোল প্রভৃতির রয়েছে। দ্রাবিড়দের তো এটা একটা মূল আস্তানা। বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাঙালিয়া এত সচেতন।’ এই বিষয়ে তিনি একটি চমৎকার আলোচনা করলেন।

এই বকম নানা আলোচনা চলছিল নানাভাবে এই সব বিষয়ে। কবিগুরু নতুন নতুন আলোকপাত করেছিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ‘ভারতের ইতিহাসের ধারায় তবু কিছু লিখেছি সে বিষয়ে। আরও অনেক কথা লিখবার আমার ইচ্ছা ছিল। বিশেষত মহাভারতের মর্মসত্যটি ভালো করে দেখিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার ছিল। মহাভারতের চরম কথা বড়ই মর্যাস্তিক। অনেকবার তা বলতে গিয়েছি। বলা আর হয় নি। এখন আর শক্তিতে কুলোবে না। বাংলার কথাও কিছু লেখা দরকার। কিন্তু এখন অবসর একেবারেই নেই। আর বার্ষিকের প্রভাবও তো রয়েছে। সে কথা ভুললে চলবে কেন? এ কাজে আপনারা কেউ হাত দিলে ভালো হ’ত।’ (বাংলার সাধনা ৫-১২ পৃঃ)

আচার্য ক্রিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতপথ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নীচে দেওয়া হ’ল।

তিনি লিখেছেন—‘পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখি, যেখানে সে গিয়েছে সেখানে স্থানীয় পুরাতন সভ্যতাকে ধ্বংস ও নিমূল না করে সে তৃপ্ত হয় নি। এই ধ্বংসের ব্যাপারে শুধু যে সংস্কৃতিতে অনগ্রসর অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে ঘটেছে, তা নয়; আমেরিকার মূল সভ্য ‘মায়ান’ ও ‘আজতেগ’ সভ্যতারও উচ্ছেদ না করে সে নিবৃত্ত হয় নি। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস অন্য রকমের। এখানে হয়তো সেবকম করে অন্তদের উচ্ছেদ করা সম্ভবও হয় নি, আর ভারতের ইতিহাস-বিধাতার গুণ অভিপ্রায়ও হয়তো অন্তরূপ।

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্ষদের আসার আগে আর্ষপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতাকে আর্ষেরা নষ্ট করেন নি। দ্রাবিড়েরাও তৎপূর্ব সব সভ্যতার উচ্ছেদসাধন করেন নি। এই ভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে ভারতের সংস্কৃতিলোকটি গড়ে উঠেছে।’

(ভারতের সংস্কৃতি ৭-৮ পৃঃ)

আর্থ ও অনার্থ সংস্কৃতির মিলনের ফল

আর্থ ও অনার্থ উভয় সংস্কৃতির উন্নত দিকগুলির সংমিশ্রণের ফলে কিরকর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি হতে পারে সে সম্বন্ধে ক্ষতিমোহনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

‘আর্থ-অনার্থ সম্মেলনের ফল যে কী অপূর্ব হতে পারে তার অস্তিত্ব একটি দৃষ্টান্ত এখানে না দিয়ে পারি নে। যদিও এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু একটির বেশি এখানে বলা হবে না, কারণ বেশি বললে হয়তো পাঠকের ধৈর্য না থাকতে পারে। এক ঋষির ব্রাহ্মণী পত্নী ছিলেন, শূদ্রা পত্নীও ছিলেন। তখনকার দিনে যজ্ঞস্থানে বসেই শিক্ষা দেবার চমৎকার সুযোগ মিলত। যজ্ঞ উপস্থিত হল, মায়েরা শিক্ষালাভ করবার জন্য ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন যজ্ঞস্থলে তাদের বাপের কাছে। সেই মহর্ষি আপন ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত ছেলেকে কোলে বসিয়ে আদর করে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু শূদ্রা পত্নীর সন্তানকে যজ্ঞস্থলে উপেক্ষা করলেন। ছেলে এসে সেই দুঃখে মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল। বললে, ‘মা, বাবা আমাকে যেন চিনতেই পারলেন না।’ মাও চোখের জল রাখতে পারলেন না। ছেলে তখন বললে, ‘মা, আমার শিক্ষার তবে কী উপায় হবে।’ মা বললেন, ‘তোমার বাপই যখন তোমাকে উপেক্ষা করলেন তখন আর কার কাছে যাব। আচ্ছা, আমি তো শূদ্র-কন্যা অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান (Child of the soil), আমার মা পৃথিবীকে ডেকে দেখি।’ এই বলে তিনি পৃথিবীকে ডাকলেন।

মাতা বহুদূর এসে বললেন ‘ভয় নেই, সব জ্ঞানই তো আমার মধ্যে নিহিত, এই ছেলেকে দাও আমার হাতে, আমি একে শিক্ষা দেব।’ পৃথিবী-মাতা ছেলেকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তখন সেই ছেলে তাঁর বাল্যকালের অপমানের শোধ তুললেন। তিনি ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখলেন। আজ যিনি যত বড়ো বিদ্বৎ ব্রাহ্মণই হোন না কেন, সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থখানি না পড়লে ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করাই অসম্ভব। তার পর তিনি নিজের যে শূদ্রার অর্থাৎ ইতরার ছেলে এইটে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি নিজেকে ইতরার পুত্র ‘ঐতরেয়’ নামে খ্যাত করলেন, তাই সেই ব্রাহ্মণের নাম হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই শূদ্রা মায়ের ছেলের আসল নামটি ঐ ঐতরেয় নামের তলে চাপা পড়ে আছে। মহীর শিষ্য বলে তাঁকে মহীদাসও বলে। তাই ঐতরেয় মহীদাসই তাঁর পরিচয়। এই ঋষির সব কথা ‘ঐতরেয়ালোচনম্’ নামে গ্রন্থে স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমৌ মহাশয় লিখেছেন।’ (ভারতের সংস্কৃতি ১১-১২ পৃঃ)

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিধায় পুরোপুরিই দেওয়া হল। ক্ষতিমোহন বলেছেন যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থটিতে বড় বড় চিরন্তন সত্য এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, এখনও তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ‘একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, এগিয়ে চলাই এখনকার ধর্ম। আমরা মনে করি পুরোনো যুগে স্থিতিশীলতাই ছিল ধর্ম। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭, ১৫, ১-৫) একটি গল্পে বোহিওকে যে উপদেশ দেবতা দিচ্ছেন তার চেয়ে গতিশীল ধর্মের উপদেশ কোথাও শুনি নি। রাজপুত্র বোহিত দীর্ঘকাল চলে চলে প্রান্ত হয়ে বিজ্ঞানের জগৎ যখন ঘরের দিকে চলেছেন তখন তাঁকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেনী ইন্দ্র পর পর পাঁচবার বললেন—

নানা প্রাস্তায় শ্রীরতি ইতি বোহিত শুশ্রুম।

পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্ছতঃ সখা। চঠৈবেতি, চঠৈবেতি।

চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীৰ অস্ত নেই, হে যোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চল, দোতা ইন্দ্রও মথা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ ঘন হলেও ক্রমে নীচ (পাপ) হতে থাকে অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্ত আপরঃ।

উত্তিষ্টঃ স্নেহতা ভবতি কৃতং সম্পত্ততে চরন্। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

ঘুমিয়ে থাকাটাই কলিকাল, জাগলেই হল আপর, দাঁড়ালেই হল ত্রেতা, এগিয়ে চলাই সত্য যুগ। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

চরণ, বৈ মধু বিন্দতি চরণ, স্বাহ্মমুহুরম্

স্বর্ষস্ত পশু শ্রেমাণং যৌন তদ্রমতে চরণ,। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাটাই হল অমৃতলাভ, চপাটাই তার স্বাহ ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের অন্ত ও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অতএব এগিয়ে চলো।

(ভারতের সংস্কৃতি ১২-১৩ পৃ :)

আচার্য সেনের মতে বৈদিক সভ্যতা ভারতে এসে যে সংস্কৃতিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল তার কেন্দ্র ছিল যজ্ঞবেদী। কিন্তু ভারতে বেদবাহু সভ্যতা ছিল তীর্থগুলিকে আশ্রয় ক'রে এবং সেই অস্ত্র তা 'তৈথিক' নামে পরিচিত। তৈথিক সভ্যতার মধ্যে এমন অনেক উন্নত ভাব ছিল যা ক্রমশ বৈদিক সভ্যতাকে ঐশ্বর্যময় ক'রে তোলে। তাঁর মতে অথর্ববেদেই প্রথম উচ্চারিত হয় মানুষের জয়গান। সেখানে স্বর্গের বদলে পৃথিবীর এবং দেবতার বদলে মানুষের প্রতি অহুবাগেই প্রাধান্য। অথর্বের দশম কাণ্ডের সপ্তমে ৪৪টি ঋকে বিশ্বরহস্যের সঙ্গে মানুষের যোগের মহিমাই প্রচারিত হয়েছে।

'অথর্বে দেখতে পাওয়া গেল, পৃথিবী জ্যোঃ অন্তরীক্ষ সবই এই মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার শিয়ার শিয়ার স্পন্দিত হচ্ছে সব সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। উপাস্তা, প্রজ্ঞা, সাধনা সবই এই মানুষের মধ্যে। ঋক্, যজু, সাম সবই এই মানুষের মধ্যে। ভূত ভবিষ্যৎ সর্বকাল সর্বলোক সবই এই মানুষের। ব্রহ্মও মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মকে দেখল সেই তাঁকে ঠিক জায়গাটিতে সংস্থিত দেখল।'

(বাংলার সাধনা ২২ পৃ :)

অথর্বের পঞ্চদশ কাণ্ডটি সম্পূর্ণভাবে ব্রাত্য অর্থাৎ ধর্মকর্মহীন সহজ মানুষের জীবনানে ভরা। সেকালের বেদপন্থীরা অথর্বকে বিশেষ আমল দিতে চান নি। এই ঘটনার উপরে কিত্তিমোহন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষের ও জগতের মাহাত্ম্যের তত্ত্ব বৈদিকদের নিজস্ব জিনিস নয়। তাঁরা এদেশে এসে তা পেয়েছেন আর্যপূর্ব সংস্কৃতির কাছ থেকে ক্রমে এই সব কথা উপনিষদে স্থান পেয়েছে। পরে মহাযান বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম থেকে গুরু ক'রে মধ্য যুগের সন্ত এবং বর্তমানের বাউলদের মধ্য দিয়ে সেই ধারাই প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

অথর্ববেদে প্রাকৃত সংস্কৃতির স্বাক্ষর, তার ময় অভিচার ইত্যাদিও রয়েছে। অন্ত্যস্ত পতিতেরা সাধারণত এই দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নানা গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু যতদূর মনে হয় অথর্ববেদের মানবতাবাদী বা মানব-কেন্দ্রিক মর্মবস্তুর প্রতি আচার্য সেনই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রাচীনকালের সমৃদ্ধি

যাগ-যজ্ঞ পূজার্চনা প্রভৃতি বিশেষভাবে যে সব যজ্ঞ আচার অনুষ্ঠান এক ধরনের যাজ্ঞকে অন্য ধরনের যাজ্ঞের থেকে পৃথক ক'বে রাখে তার উর্ধ্বে উঠে একটা বড় বকমের মুক্ত মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে উপনিষদীয় চিন্তায়। কবিগুরু এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ ক'বে আচার্য সেন উপনিষদগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে এমন অনেকগুলি উপনিষদের উল্লেখ করেছেন যেগুলি বহুল পরিচিত নয় অথচ ভারতের মানবতাবাদী চিন্তাধারার বিকাশে সেগুলির স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

‘উপনিষদের মধ্যে একটা খুব বড় বকমের মুক্ত আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধান উপনিষৎগুলির বড় বড় কথা অনেকই শুনেছেন। কিন্তু অনেক উপনিষৎ আছে যা সাধুসন্ন্যাসীরাই ব্যবহার করেন গৃহস্থদের মধ্যে তার বেশি প্রচলন নেই। সেগুলি হয়তো প্রধান প্রধান উপনিষৎগুলির অনেক পরে রচিত; কিন্তু তার মধ্যে যে সব নির্ভীক সত্য রয়েছে তার সঙ্গে আর মধ্যযুগে কবীর রবিদাস প্রভৃতির বাণীর সঙ্গে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নেই। (ভারতের সংস্কৃতি ৪৫ পৃঃ)

এই প্রসঙ্গে তিনি যাত্রাজের Adyar Library থেকে F. Otto Schrader কর্তৃক প্রকাশিত ‘Minor Upanishads’ এবং ঐ সংস্থা হতে প্রকাশিত Unpublished Upanishads নামক গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করেছেন।

তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে যথাক্রমে ‘শাট্যারনীরোপনিষৎ’, ‘অশ্বোপনিষৎ’, ‘নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ’, ‘মৈত্রেয় উপনিষৎ’, ‘শাখরহস্তোপনিষৎ’, ‘বহ্ন্যুচ্চিকোপনিষৎ’ প্রভৃতির উল্লেখ এবং তা থেকে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নমুনা হিসাবে এখানে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

‘মৈত্রেয় উপনিষৎ’ বলেন বর্ণাশ্রমচারবৃত্ত বিমুক্তগণ কর্মাক্রমারে কল পেয়ে থাকেন, আর বর্ণাধি ধর্ম ত্যাগ করে মানব স্বানন্দতৃপ্ত হতে পারেন।’ (ভারতের সংস্কৃতি ৪৭ পৃঃ)

‘এব চেয়েও প্রচণ্ড বৃত্তি তর্কে জাতিভেদ খণ্ডন করেছেন এ বহ্ন্যুচ্চিকোপনিষৎ।’ (ঐ ৬৭ পৃঃ)

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন নৃ-কুল গোষ্ঠীভুক্ত ও বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগণের মধ্যে ঐক্যবাদের প্রচেষ্টার ভাগবত অর্থাৎ ভক্তিদর্শনের অনুসরণকারীদের অবদান সম্বন্ধে উক্ত পুস্তিকায় যে আলোকসম্পাত করা হয়েছে তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—‘ভগবানের আরাধনার সবারই অধিকার আছে এই কথা ভাগবত খুব জোরের সহিত প্রচার করলেন—কিষাভ, হুণ, অন্ধ, পুলিন্দ পুন্ড্র, আভীর, শুদ্র, বন, খস—ভগবানের শরণে শুদ্ধ হন।

তাই অন্ধ্র যাজ্ঞ প্রভৃতি সব জীবনের সঙ্গেই ভাগবতেরা ভগবানকে শরণ করেন।

ভাগবতেরা ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার করেছেন। ধর্মব্যবস্থা ছাড়া সমাজ ও অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতেও ভাগবতেরা খুব উদার। অস্বাধীন বিভাগ-ব্যবস্থাতে ভাগবতের সমৃদ্ধি সকল যুগের পক্ষেই প্রশংসনীয়। সর্বজীবে বখাযোগ্যভাবে অস্বাধীন সংবিভাগও ধর্ম।

ভাগবতের যতে সকলেই ক্ষমার ও প্রয়োজনের অনুকূলে অন্ন পেতে পারে। তার বেশি যে ছলে-বলে অধিকার করে সে চোর, সামাজিকভাবে সে দণ্ড্য।

যাবদ্ব্যজ্ঞৈতজ্জয়িং তাবৎ সত্যং হি বেহিনাম্।

অধিকং যোহতিয়ন্তেত ন তেনো হতমর্হতি।’

(ভারতের সংস্কৃতি ৪৩ পৃঃ)

ভবিষ্যপূরণের কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন—‘ভবিষ্যপূরণ বলেন, যেদিক দিয়েই দেখি না কেন ষিজে-শূদ্রে কোনো ভেদই তো দেখা যায় না। না বাহিরে না ভিতরে, না স্থখে না ঐশ্বৰ্যে, না আচ্ছাদে না ভয়ে, না বীৰ্যে না আকৃতিতে, না জ্ঞানদৃষ্টিতে না ব্যাপারে, না আয়ুতে না অঙ্গপুষ্টিতে, না দৌৰলো না শৈবর্ষে, না চপলতার না প্রজ্ঞায়, না বৈরাগ্যে না ধর্মে, না পরাক্রমে না জিবর্গে, না নৈপুণ্যে না রূপে, না ভেষজে না স্ত্রীগর্ভে, না গমনে না দেহমলসংগ্ৰবে, না অস্থিরক্লে না প্রেমে, না প্রমাণে না লোমে কোথাও ভ্রান্ত্যে শূদ্রে একটুও ভেদ দেখা যায় কি ?

সব দেবতা যদি সমবেত হয়েও ভ্রান্ত্য-শূদ্রের প্রত্যেক ধর্ম অতি যত্নেও তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেন, তবু শূদ্র-ভ্রান্ত্যের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ পাওয়া যাবে না।

এই সব কথাই পর, সব কথাই সার কথা বলেন ভবিষ্যপূরণ, ‘চার বর্ণই যখন এক পিতামাতার পুত্র কন্যা, তখন তাদের সবারই এক জাতি। সব মানুষের পিতা যখন এক তখন এক পিতার সম্মানদের মধ্যে জাতিভেদ হতেই পারে না।’ (ভারতের সংস্কৃতি ৬৬-৬৭ পৃঃ)

প্রাচীন ভারতে এই মানব-ঐক্যের দৃষ্টি বৃদ্ধির মৈত্রীভাবনা থেকে শুরু করে মহাযান বৌদ্ধদের দোহাকোষে, জৈনদের ‘পাহড় দোহার’, শৈবদের মতামতে ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে কি ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে সে সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা করেছেন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁর উল্লিখিত দুইটি পুস্তিকায়।

তাঁর মতে ঐ ধারাটি বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে। বাংলা বহুকাল পর্যন্ত আর্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আওতার বাইরে ছিল। কিন্তু আর্থ-পূর্ব সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণে এখানে প্রাচীন কাল থেকেই বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, চিন্তা ভাণ্ডার ও মনন ভঙ্গি গড়ে ওঠে। অর্থবোধে যে ত্রাত্য মানুষদের স্ববর্গান করা হয়েছে বাংলা ছিল সেইরকম মানুষদের দেশ। এখানকার নানা চিন্তা-উপাদান জৈনধর্মের সঙ্গে মিলে পাহড় দোহা প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি করে। এখানে বৌদ্ধধর্মের হীনযানের তুসনার মহাযানই সমধিক জনপ্রিয় হয়েছে। এখানকার নাথধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম, অনেক মলিনতা প্রবেশ করেছে সত্য। কিন্তু সেই মালিন্যের পাশাপাশি দেখা যায় মানবসত্যেরই প্রাধান্য। নাথধর্ম, মহাযানধর্ম, তান্ত্রিকধর্ম, বাউলধর্মে বিভিন্ন ভাবে বলে—সব সত্যই মানুষের মধ্যে, বিশ্ব ও বিশ্বের সব সত্য মানবকার্যেরই ভিতরে।

বধ্যযুগে ভারতপন্থের সাধনা

রবীন্দ্রনাথ ভারতপন্থ সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যযুগের সম্ভদের সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর খুব সঙ্গত কারণ আছে। অতীতে নানা সংঘাত ও বিকলতার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা চলে আসছিল তার সামনে এক কঠিনতর পরীক্ষা উপস্থিত হয় মধ্য যুগে মুসলমানদের আগমনের পরে। সমস্ত সাধকেরা হুঃসাহসিক উদারতা ও ঐক্যদৃষ্টি নিয়ে সেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

এই প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—‘ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন মুসলমান বাহির থেকে এল তখন সেই সংঘাতে দুই ধর্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্মের মধ্যেই এমন কিছুছিল যাতে মানুষের

মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করে নি, তাকে শতধা বিভক্ত করে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ নির্দয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতর ঐক্যকে উপলব্ধি করে নি। বাইরের দিক থেকে আঘাত করে মুসলমান মানুষের বাহ্যরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্মের বাহ্যরূপের বেড়াকে বহুগুণিত করে হিন্দু, মানুষে মানুষে যে বাহ্যভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্মের স্বাক্ষর দিয়ে, তাকে নানা বিধি বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই দুই পক্ষে ধর্মবিরোধের অস্ত ছিল না—আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।'

(ভারতপথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৪০৩ পৃঃ)

কবি বলেছেন যে সেদিনের ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মধ্যে এমন সব সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল যারা ভেদবুদ্ধির সেই নিদারুণ প্রকাশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। মানুষের চিরকালীন সমস্তার সমন্বয় করার জন্য তাঁদের মন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কবির মতে সেই সমস্তা হচ্ছে, ধর্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু কেমন ক'রে স্থাপন করা যায়। মধ্যযুগের সন্ত সাধকেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে 'সকল ধর্মের বাহিরে দেশকালের আবর্তনা জন্মে উঠে তার সাম্প্রদায়িকরূপকে কঠিন করে তোলে, সে দিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধা নেই।'

(ভারতপথিক রামমোহন রায়)

উক্ত প্রবন্ধেই অন্তত কবি লিখেছেন—'মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঙ্কর দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যাষের অতন্ত্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের উর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'ব্রাত্যঙ্ক প্রাণ'—হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্বাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা স্রষ্টা জগলের মধ্যে এই ভারতপথকে ধারা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন দাদু।'

(ভারতপথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৩৮৬ পৃঃ)

কবিগুরু নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের সাধনার দ্বারা সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'ভারতের সংস্কৃতি' পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে হলেও ঐ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্যের উপরে আলোক-সম্পাত করেছেন। তিনি বলেন যে ভারতের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ধর্মসংঘাতে বিপদটা বেশি হয়েছিল পণ্ডিতদেরই। সাধারণ মানুষ যারা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পাশাপাশি বাস করত তারা পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবহারিক সমন্বয় ক'রে নিয়েছিল। রামানন্দ ও তাঁর শিষ্য কবীর প্রমুখ সাধকের দল সাধনার স্তরে সেই সমন্বয়ের কাজ শুরু করেন।

রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যদের মতামত এবং চিন্তাধারার কথা সুপরিচিত। তবু এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের বক্তব্যের উল্লেখ করা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না। রামানন্দ নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পূর্বকার সম্প্রদায় ছিল আচারনিষ্ট রামানুজ পন্থী। রামানন্দ সেই সবের বাধন কেটে বেরিয়ে এলেন সাধারণ মানুষের মাঝখানে, সংস্কৃত ত্যাগ ক'রে চলতি ভাষায় উপদেশ দিতে শুরু করলেন। এতদিন সাধনা

প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমিত ছিল। রামানন্দের প্রধান বারোজন শিষ্যের মধ্যে রবিদাস ছিলেন মূর্খি, কবীর জোলা, সেনা নাপিত, ধরা ছিলেন কৃষিজীবী জাঠ, পীপা ছিলেন রাজপুত। রামানন্দ আচার্যের ধর্মের বহলে প্রচার করলেন ভক্তির ধর্ম। ভক্তির ধর্ম প্রচারে নামদেব ও সদনার নামও স্মরণীয়। আদি নামদেব ছিলেন দরজী। সদনা ছিলেন কসাই। কবীরের প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করেন দাদু, রজ্জব, সুন্দরদাস। এঁদের মধ্যে এক সুন্দরদাস ছিলেন বৈষ্ণবকুলোদ্ভব। দাদু ও রজ্জবের জন্ম তুলা-ধুনকরদের বংশে। অর্থাৎ রামানন্দের প্রধান শিষ্যদের ও সেই পথের অনুগামীদের বেশির ভাগই ছিলেন সমাজের নীচের তলার খেটে খাওয়া মানুষ। মধ্যযুগে ভক্তির ধর্ম যে সামাজিক অত্যাচার বিচারের বিরুদ্ধে সমাজের নীচের তলার মানুষদের প্রতিবাদের অভিব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই সত্যটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি প্রবন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কবীরের মতামতের যে সব নিদর্শন কিত্তিমোহন সেন তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে উপস্থাপিত করেছেন তা থেকে কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

‘সংস্কৃত জ্ঞানহীন কবীর কান্ধিতে বসে চারিদিকে পতিতদের মধ্যে নির্ভয়ে মনের কথা চলতি ভাষায় সমাজে প্রচার করতে লাগলেন—সকলে বললেন, ‘কবীর, এ কী কাণ্ড!’ কবীর বললেন ‘সংস্কৃত হল কূপজল, ভাষা হল বহতা জলধারা’।

সংস্কৃত হি কূপজল ভাষা বহতা নীর।

কবীর ছিলেন চিরদিনই সচল জীবন্ত ভাবের উপাসক। অচলতার অন্ধকারকে তিনি কোনোদিন পূজা করেন নি। তিনি বলতেন—বহতা জল থাকে নির্মল, বন্ধ জলই হয়ে ওঠে দূষিত দুর্গন্ধ। সাধকরাও সচল হলেই ভালো। তাতে কোনো দোষই পারে না তাঁদের ছুঁতে।

অচলতার প্রতি কবীরের ভক্তি ছিল না। তাঁর প্রেম বলিষ্ঠ প্রেম, তাই প্রেমের সাধনায় বীরত্বের সাধনা তিনি চেয়েছেন। এই সংসারে প্রবেশ করেই শোনা গেল আকাশে বাজছে বণ-দামামা, যুদ্ধের নাগড়া বাজছে—তার তালে তালে মৃত্যুপণ করে হবে এগিয়ে চলতে।’ (ভারতের সংস্কৃতি ৭৪-৭৫ পৃঃ)

সমস্ত সাধকদের চিন্তাধারার উপরোক্ত দিকটি সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়ে আসছে। অথচ এগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় যে তাঁদের মতামত ও কর্ম শুধুমাত্র সম্প্রদায়-ভেদ সত্ত্বেও মানবের অভেদদর্শনের তত্ত্বপ্রচারেই সীমিত ছিল না। তাঁরা ছিলেন সেই যুগের সামাজিক বিজ্রোহের প্রথম পথিকৃৎ।

গবেষণার নতুন দিগন্ত

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আচার্য কিত্তিমোহন সেন ভারতপথ সম্বন্ধে যতটুকু অনুসন্ধান করেছেন তা ভারতবিজ্ঞান গবেষণার নতুন সম্ভাবনার ও নতুন পথের দিকনির্দেশ করেছে। ধার্ম প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানের বিশেষত পুরাতন ও নূতনের শক্তির স্বন্দেহ মধ্য দিয়ে সমাজের অগ্রগতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারত-ইতিহাসকে অধ্যয়ন করতে চান, তাঁদের কাছে অবশ্য ঐ বিবরণ অসম্পূর্ণ মনে হবে। তাঁরা ঐ সমস্ত মত ও চিন্তাকে বিচার করে দেখবেন সমাজবিকাশের ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে, বিকাশের প্রত্যেক স্তরে অর্থনৈতিক-সামাজিক সম্বন্ধ এবং সামাজিক স্বন্দেহ আলোকে। কিন্তু কবিগুরু ও তাঁর স্বেয়োগ্য সহকর্মীর অবদান এই ধরনের অনুসন্ধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন তাঁদের আলোচনায় ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার উপরই প্রধানত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভারতপথ ও ভারতবিজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি তথা অধ্যয়নকে এক বিমূর্ত আধ্যাত্মিক জগতে আবদ্ধ ক'রে রাখার বদলে সমাজের ইতিহাসের পটভূমিতেই বোঝার চেষ্টা করেছেন তা বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে বলে আশা করি। এই দিকটি এযাবৎ রবীন্দ্রচর্চায় নিমুক্ত স্বধীজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এসেছে বলা অস্বাভাবিক হবে না। সাধারণত দেখা যায় রবীন্দ্রানুসারী স্বধীজন যখন ভারতপথের কথা বলে থাকেন তখন তাঁরা ঐ ধারণাকে আকাশচারী আধ্যাত্মিক বহুশ্রমরূপে উপস্থিত করেন। অথচ ভারতের সুপ্রাচীন সুদীর্ঘ ইতিহাস তো নিছক আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন ক'রে নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে নি। তা পরিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবের নানা ঘট-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানা ক্ষেত্রে অবদান সৃষ্টি করেই এগিয়ে এসেছে। অন্তর্দিকে প্রগতিশীল সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণত ধর্মীয় চিন্তার বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া অধ্যয়ন সম্বন্ধে উপেক্ষার মনোভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু এই মনোভাবও ইতিহাস-বিজ্ঞান সম্মত নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস 'German Ideology' নামক বইটিতে লিখেছেন যে : ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার করণীয় হল প্রত্যেক সমাজের প্রকৃত উৎপাদন-পদ্ধতি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্বন্ধ সমষ্টি, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক, রাষ্ট্রগত কার্যকলাপ ইত্যাদির বিশ্লেষণ এবং চেতনার সমস্ত রূপ, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি তৎসংগত সিদ্ধান্তগুলিকে সমাজের সাহায্যে ব্যাখ্যা তথা তাদের উদ্ভবের প্রক্রিয়া নির্ণয় করা। এইভাবেই সমাজ-বিকাশের প্রবাহ এবং তার বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চিত্রটি সামগ্রিকরূপে পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে স্বর্গত অধ্যাপক দামোদর ধরানন্দ কোশাঙ্গীর মত বিশেষ মূল্যবান। তিনি বলেছেন—ধর্ম, কুসংস্কার, আচার-সমুচ্চান ইত্যাদির উপরে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলে তা আমাদের ইতিহাসের থেকে অনেক দূরে বিপথে সরিয়ে নিতে পারে। অন্তর্দিকে ঐসব বিষয়ের অধ্যয়নে একেবারে উপেক্ষা করার ফল হবে সমাজ-সৌধের এমন অনেক মূল্যবান দিককে অবহেলা করা সেগুলি সমাজের ভিত্তিতে প্রকৃত পরিবর্তনের নিদর্শন স্বরূপ।...

রাজবংশে পরিবর্তন, বিরাট ধর্মীয় আলোড়ন ইত্যাদি সাধারণত উৎপাদন-ভিত্তিতে শক্তিশালী পরিবর্তনেরই নিদর্শন। সুতরাং সেগুলিকে সেই ভাবেই অধ্যয়ন করতে হবে, পরিবর্তনহীন সৌধে অর্থহীন চাকলা বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। (Introduction to the Study of Indian History)

অধ্যাপক কোশাঙ্গীর মতামতের উল্লেখ করা হল একটি বিশেষ কারণে। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাস অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি তৎসংগত দিক থেকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না তবে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নে মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসরণকেই একমাত্র সঠিক পথ বলে মত পোষণ করতেন। উপরোক্ত পদ্ধতিতে রচিত তাঁর দুটি গ্রন্থ Introduction to the Study of Indian History এবং Culture and Civilisation in Ancient India in Historical Outline প্রাচীন ভারতের সমাজ সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসকে শুধু নতুন ভাবে ব্যাখ্যাই করে নি, বহু দিকের উপর নতুন আলোকপাত করেছে এবং গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে।

উপযুক্ত গ্রন্থ চুটিতে সংক্ষেপিত সিদ্ধান্তগুলি স্বাধীনভারতী ভাষান্তরিত মূল গ্রন্থবস্তুকে খণ্ডন ভেদ করেই না, বরং সমর্থন করে এবং নতুন ভাষণে উপস্থাপিত করে।

অধ্যাপক কোশাঘী সিদ্ধান্তগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে উপরে যে যত্ন করা হয়েছে তার সমর্থনে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া অগ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতে আর্ষভাষী এবং অনাৰ্ষভাষীদের একই সমাজের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত ও সংস্কৃতি সন্নিবেশের প্রক্রিয়াটিকে অধ্যাপক কোশাঘী অধ্যয়নের চেষ্টা করেছেন উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের পটভূমিতে। তাঁর মতেও কৃষি-বিস্তারের ভাগিদেই ছিল উক্ত প্রক্রিয়ার মূল। এই প্রক্রিয়া যেমন সংঘাত ও শোষণ তথা শ্রেণী শোষণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে তেমনি তার মধ্যে কাজ করেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিভিন্ন মানবিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উন্নততর সংস্কৃতির অধিকারী বিদেশী আগন্তুকরা যে ভাবে আদিম অধিবাসীদের উৎসাহন করেছে, তাদের অন্তিমকে নিষ্কিহ বা প্রায় নিষ্কিহ করে দিয়েছে, ভারতবর্ষে সে বকমটি ঘটে নি। ঘটে নি ভারতবর্ষে কতকগুলি মানবিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দৃশ্য যথা, আর্ষপূর্ব নৃকুল-গোষ্ঠীগুলির বিপুল সংখ্যা, ভারতের বিরাট আয়তন, বিশাল বিশাল অরণ্যের অস্তিত্ব এবং সেগুলিকে পরিভ্রমণ করে কৃষি সম্প্রসারণে বিপুল জনবলের প্রয়োজন, অহম্যাকৃষির প্রাচুর্য, খাদ্য-সংগ্রহের অপরিপূর্ণ সুযোগ ইত্যাদি। কৃষি বিস্তারের ভাগিদেই আর্ষভাষীদের পক্ষে অনাৰ্ষ খাদ্য-সংগ্রাহকদের একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই প্রক্রিয়ায়ই পর্যায়ে হয় Caste বা বর্ণের উৎপত্তি।

ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী মানুষেরা যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন কোনো না কোনো ভাবে একে অপরের দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হতে বাধ্য। যখন কোনো অপেক্ষাকৃত অদ্বন্দ্বিত সংস্কৃতির অধিকারী মানুষেরা উন্নততর সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তাদের পুরাতন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি ইত্যাদি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে হলেও তা নতুন সমাজ সৌধে নিজের অস্তিত্বের স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দেয়। ভারতবর্ষে এই সংস্কৃতি-সন্নিবেশের প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষরূপে অর্থাৎ সচেতনভাবে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অধ্যাপক কোশাঘী বলেছেন—

‘সংস্কৃতি সন্নিবেশের প্রক্রিয়াটি ভারতবর্ষে চলে এসেছে হাজার হাজার বৎসর ধরে। তার তারিখ নির্ণয় করা সে অসম্ভব কঠিন। সমাজের ভিত্তি মূলে ঐ প্রক্রিয়াটি হিংসাত্মক ছিল না, কেন না অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অদ্বন্দ্বিত উভয় উপাদানই পরস্পরের নিকট থেকে স্বয়ং গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঘটনা ও তথ্যকেই সঠিক ঐতিহাসিক পরিবেশে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয় কিন্তু সেগুলিকে দারিদ্রবীল ঐতিহাসিকের যনোযোগের অযোগ্য বলে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করাও ভুল হবে। কারণ সেক্ষেত্রে ইতিহাসকে এখানে যে ভাবে দেখান চেষ্টা হয়েছে তার অনেক উৎস ও উপাদান থেকে বঞ্চিত করা হবে।’

(Introduction to the Study of Indian History)

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রচেষ্টা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে কি ভাবে অগ্রসর হয়েছে তার একটি রূপরেখা তিনি উপস্থাপিত করেছেন Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline নামক বইটিতে। তার মর্দার্থ নিম্নরূপ—

নিম্নতম বর্ণগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে নিজেদের উপজাতীয় রীতিনীতি অনুষ্ঠান এবং অতিকথা (Myth) বজায় রেখেছে। সমাজের আর একটু উপরের স্তরে উঠলে ঐ সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অতিকথা, উপকথা প্রভৃতির রূপান্তরের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে উক্ত রূপান্তর ঘটেছে সমাজবাল ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্মিশ্রণের ফলে। আরো উপরের স্তরে দেখা যায় যে ঐগুলিকে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের পুরোহিত হিসাবে আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন ভাবে ঢেলে সেজে লিখিত রূপ দিয়েছে। তার উচ্চতর স্তরে দেখা যায় 'হিন্দু' সংস্কৃতির লিপিবদ্ধ ঐতিহ্য, যা স্বাধীনতা কাল থেকে চলে আসছে বলে বলা হয়। কিন্তু দেবদৈত্যাদি সম্বন্ধে ঐসব লিপিবদ্ধ কাহিনীতেও এমন অনেক কিছু রয়েছে যা মূলত নিম্নতম সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীর বিবরণস্বরূপ সঙ্গে অভিন্ন। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রধান কাজ হয়েছে বিভিন্ন অতিকথাগুলিকে সংলিখিত করে একই ধারাবাহিক কাহিনীমালার অংশরূপে চিত্রিত এবং উন্নততর সামাজিক কাঠামোর পটভূমিতে উপস্থাপিত করা। অতীতের পৃথক পৃথক দেবতা ও মতবাদগুলিকে একসঙ্গে মিলিয়ে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে অথবা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের পরিবার ভুক্ত বা কোনো দেববংশের সভাসদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ারই পরিণতির সর্বোচ্চ স্তর হল ভারতীয় সমাজের মহান ধর্মীয় চিন্তানায়কদের প্রবর্তিত বিভিন্ন মতবাদ। সেগুলি ছিল সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের পক্ষে বিরাট অগ্রগামী পদক্ষেপ। কারণ তা নানা দিক থেকে সামাজিক অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে যখন সমাজের বিকাশের ধারা আরো এগিয়ে গিয়েছে তখন ঐ সব মতবাদের অনুগামীরা পুরাতন রূপকেই অনড় অটল ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখে সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। সে ক্ষেত্রে আবার তার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে নবীনের বিদ্রোহ। অধ্যাপক কোশাঘী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

ধর্মীয় মতবাদগুলি নিয়েই ভারতের ইতিহাস গঠিত নয়, কিন্তু সেগুলির অভ্যুদয় ও ভূমিকা পরিবর্তনের ঘটনাবলী হল ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান সামগ্রী।

অবশ্য সেগুলিকে তৎকালীন সমাজের কাঠামো এবং সামগ্রিক ভাবে সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার না করলে তাদের সঠিক ইতিহাস-সম্মত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

উপনিষদীয় ধ্যানধারণা, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, ভক্তিদর্শন এবং অন্ত্যান্ত বেদ-বিরোধী মতবাদ মানুষের মনকে বৈদিকদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত ও কৌলিক আচার-অনুষ্ঠান প্রধান ধ্যানধারণার শৃঙ্খলমুক্ত করে বৃহত্তর মানব-সত্য ও মানব-ঐক্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস পায়। এই সব চিন্তাধারার অভ্যুদয়কে অধ্যাপক কোশাঘী বোঝার চেষ্টা করেছেন অর্থ নৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে।

তার বক্তব্য অনুসারে ষষ্ঠপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডে একই সময়ে এতগুলি নবীনপন্থী সমাজদায়ের অভ্যুদয়, গণমনে তাঁদের বিরাট আবেদন ও প্রাধান্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের মূলে কারণ হিসাবে কাজ করেছে কোনো নতুন সামাজিক প্রয়োজন। পুরাতন মতবাদগুলি সেই প্রয়োজন পূর্ণ করার উপযোগী ভূমিকা নিতে সমর্থ ছিল না। সেই প্রয়োজনটি কি ছিল তা বোঝা যাবে নতুন মতবাদের প্রচারকদের চিন্তায় যে সব অভিন্ন উপাদান রয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ এবং নতুন শিল্পকুলের সমীক্ষার সাহায্যে।

এটুকু স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে তৎকালীন সমাজের অগ্রগতির সর্বাত্মক তাগিদেই প্রতিফলন হয়েছে ঐ সব চিন্তানায়কদের দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদে।

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি

অজিতকুমার ঘোষ

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নানা প্রকার আলোচনা ও গবেষণা চলছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে-সব মনীষী লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা প্রকার অহুসঙ্কান ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং উপেক্ষিত, ধূলিচর্চিত লোকসংস্কৃতির প্রতি শিক্ষিত লোকদের মশ্রু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—তাঁরা হয়তো কোনো স্বপ্নময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অহুসরণ না করে ব্যক্তিগত কৌতুহল ও মাহুবাগ আবেগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই লোকসংস্কৃতির চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমলব্ধ সংগ্রহ ও মশ্রু আলোচনা পরবর্তীকালের লোকসংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণার পথ বিশেষভাবে সূগম করেছে। এইসব পূর্ববর্তী পথিকৃৎদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামেন্দুসুন্দর জিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, হরিদাস পালিত, গুরুসদয় দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে রবীন্দ্রনাথের দান তিনদিক দিয়ে স্বর্ণীয়। প্রথমত, তিনি দীর্ঘকাল ধরে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা প্রকার নিদর্শন সম্বন্ধে সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অপূর্ব রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি তাঁর বহু গল্প, কবিতা, গান প্রভৃতি রচনা করেছেন। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত জীবনচর্চায়, ব্যবহার্য বস্তুতে, কুচি ও সৌন্দর্যবোধে তিনি লোকসংস্কৃতিকে মাহুভূত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার আলোকচ্ছটা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রায় সকল দিক দীপ্ত করে তুলেছেন। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া, রূপকথা, কবিগান, রাধাকৃষ্ণ ও শিব-পার্বতীয় গানের প্রতি তিনি যেমন আকৃষ্ট হয়েছেন, তেমনি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকসংগীত সংগ্রহ ও আলোচনায় উৎসাহী হয়েছেন, লোকনৃত্যের দ্বারা নিজস্ব নৃত্যধারার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন, লোকনাট্যরীতি সমর্থন করে সেই নাট্যরীতি স্বরচিত নাটকে প্রয়োগ করেছেন, লোকশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সমস্ত চর্চায় আগ্রহ দেখিয়েছেন।

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে আগ্রহ এর মূল কোথায় তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। এ-কি শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতুহল। দূরবর্তী রসলোক ও সৌন্দর্যলোকের প্রতি রোমাঞ্চিক কবির সহজাত অহুবাগ, না এ-তাঁর জীবনপটভূমি ও প্রত্যক্ষ জীবন-অহিজ্ঞতা থেকে উৎসাহিত? এ-প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক এ-কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ নাগরিক সমাজের অভিজাত পরিবারে এবং কঠোর নীতিনিষ্ঠ ব্রাহ্ম পরিবেশে মাহুব হয়েছিলেন। স্মরণ্য তাঁর পক্ষে বাংলার অবজ্ঞাত পল্লীর ধূল্যামাটির সম্পদ লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আস্বরণযোগ অহুভব করা কিতাবে সম্ভব? যা খুল, অমার্জিত, অবারিত তাই তো লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রী। এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, কথাবার্তা, আচার-অহুষ্ঠান এবং কুচি ও নীতিবোধে রবীন্দ্রনাথ নাগরিক সংস্কৃতির ধারক ও পোষক ছিলেন, আবার মাটি ও গ্রামের প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণের জন্ত গ্রামের মাটিতে উদ্বৃত্ত লোকসংস্কৃতির প্রতি একটি

স্বতঃস্ফূর্ত মমত্বও অমুভব করেছিলেন। এই মমত্ব যেন কচির শাসন ও সম্মানের নির্বাসনে আবদ্ধ বিরহী কবির স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবিলাস। 'ও পাড়ার প্রাক্ষণের ধারে' মাত্র তিনি গেছেন, ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন নি, তাই প্রাক্ষণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর রোমাণ্টিক দৃষ্টি দিয়ে ধুলোমাখা প্রাক্ষণে মাটির সম্মানদের জীবনলীলা নিরীক্ষণ করেছেন। 'পল্লীর উন্নতি' নামে প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে'। মাটির প্রতি এই দৃষ্টি নিয়েই তিনি মাটির সংস্কৃতিকে দেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য, রস ও আনন্দ-বেদনার লীলাই বিশেষভাবে সম্মান করেছিলেন। কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে যে কৃত্রিমতা মিশে আছে। নির্মল রসের পাশে যে কলুষিত রসের প্রবাহ রয়েছে, এবং আনন্দবেদনার সঙ্গে জীবনের যে কুটিল ও কদম্বরূপ ও পাশাপাশি আছে তা তিনি দেখতে চান নি। তাঁর রোমাণ্টিক কবিচেতনায় লোকসংস্কৃতির বাস্তব, স্থূল ও অস্থূল রূপ ধরা পড়ে নি। গ্রাম্য জীবনের পরিনীলিত রস ও সুরভিত নির্ধাস তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার অস্থূল ও কুসংস্কার, তার ঈর্ষা ও অস্থায়িষ জর্জরিত রূপ, তার কচি ও নীতিশাসন-যুক্ত উদাম প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি তিনি পরিহার করেছেন। 'বন্ধিমচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর হান্তরসের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রের কচিবোধের প্রশংসা করেছিলেন। দীনবন্ধুর কচি গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিল। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রের কচি ছিল নাগরিক বৈদম্ব্যে উজ্জল এবং সংযম ও শালীনতার কঠিন বর্ষে আচ্ছাদিত। রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দ্রকে প্রশংসা করেছিলেন এই জন্য যে, তাঁর কচিও নাগরিকতার শাণে ক্ষুব্ধ এবং ত্রাঙ্ক নীতির শাসনে অতিমাত্রায় সংযত। মেজন্ত লোকসাহিত্যের সম্মান করতে গিয়ে তিনি গ্রাম্যজীবনের স্থূল, অসংস্কৃত ও অনাচ্ছাদিত রূপ দেখে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়েছেন। ছেলে ভুসানো ছড়ার আলোচনা কালে এক জায়গায় তিনি 'ভাতারখাকী' কথাটা কিছুতেই ব্যবহার করতে পারলেন না। লিখলেন—'স্বামীখাকী'। এইভাবে যদি কেউ নিজের কচি অমুসারে লোকসাহিত্যের বিচার করতে যান, তা হলে লোকসাহিত্যের স্বাভাবিক বিত্ত্বি আর বজায় থাকে না। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি হ'ল কাদামাটির সামগ্রী। সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি যিনি আলোচনা করতে চান তাঁর গায়ে তো কাদা একটু লাগবেই। মাটিতে একটু মলিন হবে তাঁর বস্ত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাদামাটিকে সুরভিত কুমুম ও চন্দনে রূপান্তরিত করেছেন।

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লোকধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা দেশের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং দেবদেবীর পূজাপার্বন থেকে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা শাখা উদ্ভূত হয়েছে। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ওই সব নিদর্শন আলোচনা করতে গেলে গ্রাম্য লোকসাধারণের ধর্মবিশ্বাস, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি সম্মান করতে হয়। কিন্তু বাংলার লোকধর্ম, পূজাপার্বন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারে নি। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির মানবিক দিকই শুধু তাঁকে মুগ্ধ করেছে। গ্রাম্যসাহিত্যের অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর ছড়ার মানবীয় রস তিনি চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু ওই সব ছড়ার অধ্যাত্মরস সম্পর্কে তিনি উদাসীন। যাত্রার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু যাত্রার প্রেরণা যে অধ্যাত্মচেতনা

থেকে এবং যাত্রার উদ্দেশ্যে যে অলৌকিক শক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠায় সে-সব তিনি সন্ধান করেন নি। তিনি বৈষ্ণব কবিতার রস ও মৌন্দর্ঘ্যে চমৎকৃত হয়েছেন, কিন্তু যে বৈষ্ণব সাধনার ধারা গ্রামের মাটির মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়েছে তা তাঁর শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি। লোকধর্মের স্থূলত্ব এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে ঘেরা ব্যবহারিক রূপ তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করেছে। হরগৌরীর গীত তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু শক্তি ও শক্তিপূজার বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় তিনি তাঁর বিরূপতা প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখনও কলকাতা বিগুল শহর হয়ে ওঠে নি, তখনও সেখানে শহর ও পাড়ার যেন হাত ধরাধরি ক'রে বাস করছিল। 'ছেলেবেলা'য় তিনি বলেছেন, 'ছাদে মেলে দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়ারগায়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, তখন হ'ত নাড়ুকোটা, যখন দাসীরা সন্ধ্যাবেলায় বসে উকুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকোড়ির নেমস্তনে।...পাড়ারগায়ের আরও একটি ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ওইখানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়া প্রতিবেশীর ছেলেদেরও ওইখানেই বিত্তের প্রথম আঁচড় পড়ত তালতলায়।' এই আধা শহর আধা পাড়ারগায়ের আলো ও ছায়ায় মেশানো পরিবেশে কবির ছেলেবেলা কেটেছিল। তখন বিলম্বিত জন্মের জীবন ছিল ছড়ায় ও ছন্দে ঝংকৃত এবং তখনকার রাত ছিল রূপকথার স্বপ্নে বিভোর। সেই সোনালি রঙে আঁকা জীবন প্রত্যবে কবির অন্তরে লোকসাহিত্যের আলো ঝলমল আসর জমে উঠেছিল। তখন—

'কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—

বা হাতে তার খেলো হ'কো, চাদর কাঁধে ঝোলে।

জুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—

ধাকত আমার খাতা লেখা, প'ড়ে ধাকত পড়া ;

মনে মনে ইচ্ছে হ'ত, যদিই কোনো ছলে

ভরতি হওয়া সহজ হ'ত এই পাঁচালীর দলে।

আবার—

স্থলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে

হঠাৎ দেখি, যেহ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁসে,

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে—

ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।

অন্ধকারে শোনা যেত রিমঝিমিনি ধারা,

রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ-হার।

শৈশবের এই ছড়া ও রূপকথার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর মনে স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে গড়া এক রোমাঞ্চের জগৎ গড়ে উঠেছিল। কবিতার অদৃশ্য ডানায় ভর দিয়ে তিনি সেই জগতে যাতায়াত করেছেন। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতায় তিনি ছড়ার জগৎকেই নতুন রসে ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপকথার রহস্য ও মৌন্দর্ঘ্যজগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন 'বিশ্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিমিত্তা', 'স্বপ্নোখিতা', 'হিংটিংছট' প্রভৃতি কবিতায়। 'সোনার তরী'-'চিত্রা' পর্ব রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনার দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'সোনার তরী'তে রূপকথা জাতীয় কবিতাগুলি রচনা করা ছাড়াও, রূপকথার

প্রভাবে গল্পও রচনা করেছেন, যথা—‘একটি আঘাতে গল্প’। এই সময়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে তিনি ছড়া সংগ্রহ শুরু করলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এই সেপ্টেম্বর মাসাদপুর থেকে ‘ছিন্নপত্রাবলী’র একটি পত্রে তিনি লিখেছেন—‘আজ সকালে ব’সে ছড়া সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণনিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। ছড়ার একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন কাছন নেই—যেঘরাজ্যের মতো।’ শুধু লোকসাহিত্য নয়, লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহেও তিনি এই সময়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর ‘রবি-প্রদক্ষিণ’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি একবার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের বোটের কক্ষে মাটির ঘরের মডেল, কাঁথা, রিকা প্রভৃতি গ্রামাশিল্পের নানা নিদর্শন দেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি বাল্যরসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই বাল্যরসের আশ্বাসনা কবির বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই বেড়েছে। বলা যায়, তাঁর বয়স যত বেড়েছে ততই তিনি শিশুমনের সঙ্গে অধিক থেকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। যৌবনে তিনি ছড়া ও রূপকথার ভাব ও রসের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু মধ্যবয়স থেকে তিনি ওই ছড়া ও রূপকথার বিষয়, চরিত্র, আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গি অবলম্বনে মৌলিক সাহিত্যরচনা করেছিলেন। তাঁর ওই সাহিত্যকে কিন্তু লোকসাহিত্য বলা চলে না, কারণ তাঁর সাহিত্য তাঁর নিজস্ব শিল্পীমন থেকে উৎসারিত এবং তাতে তাঁর স্বন্দ ও মার্জিত শিল্পচেতনার রূপ পরিস্ফুট। তাঁর ‘শিশু’, ‘শিশুভোলানাথ’ প্রভৃতি কাব্যে শিশুর অবোধ ও অনভিজ্ঞ মনের অস্ফুট প্রতিফলন নেই, ওই সব কাব্যে শিশুমনের মধ্য দিয়ে কবির শৈশববিলাসী মনই আত্মপ্রকাশ করেছে। ছড়ার ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি অবলম্বনে তিনি লিখলেন ‘থাপছাড়া’, ‘ছড়ার ছবি’ ও ‘ছড়া’। ছড়ার মধ্যে সাধারণত শিশুর মনোরঞ্জক যে কৌতুকরস থাকে এই কাব্যগুলিতে তা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ‘থাপছাড়া’র ছড়াগুলি আকৃতির দিক দিয়ে ছেলে ভুলানো ছড়ার সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। গ্রাম্য ছড়ার ন্যায় এই ছড়াগুলিও সংক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্তগতি ও স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে রচিত। ‘থাপছাড়া’র কতকগুলি কবিতা হ’ল বহু প্রচলিত কোনো কোনো ছড়ার প্যারডি (যথা, যাহু এত বড় রঙ্গ)। আবার কোনো কোনো কবিতা জনপ্রিয় ছড়ার দু’একটি পঙ্ক্তি নিয়ে শুরু হয় (যেমন, ফাস্তবুড়ির দিদিশান্তুড়ির ইত্যাদি। ‘ছড়ার ছবি’র মধ্যে শিশুর মনোরঞ্জক কতকগুলি গল্পচিত্র স্থান পেয়েছে। কিন্তু ছড়ার মধ্যে চিত্র নয় চলচ্চিত্রের শোভাযাত্রা আমরা দেখেছি। ছেলে ভুলানো অনেক ছড়ার মধ্যে একরূপ বহু বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমারোহ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ‘নোটন নোটন পায়রাগুলি কোটন বেঁধেছে’ কিংবা ‘ওপাড়েতে যন্তি গাছটি যন্তি বড় ফলে’ ইত্যাদি ছড়ার নাম করা যেতে পারে।

রূপকথার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ অনেক গল্প লিখেছেন। তবে রূপকথার অন্তর্গত রোমাটিক স্বপ্ন ও কল্পনাজড়িত প্রেম এবং মুক্তি অভিযানই কবির কল্পনাকে বিশেষ আকর্ষণ করেছে! রূপকথার কুলী ও ডয়লর ঘটনা ও চরিত্র তিনি পরিহার করেই গেছেন। ‘লিপিকা’র অন্তর্গত ভুলস্বর্গ, রাজপুত্র, স্বয়ংরাণীর সাধ, পরীর পরিচয় প্রভৃতি গল্পগুলি রূপকথায় প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রচিত হয়েছিল। তবে এ-গল্পগুলির মধ্যে রূপকথার চরিত্র ও পরিবেশ রূপক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, ওদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বই হ’ল আসল কথা।

লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং লোকসাহিত্যের প্রভাবে সাহিত্যরচনার কবির আগ্রহ যেমন অল্পবয়স থেকেই দেখা গিয়েছিল তেমনি লোকসংগীত সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ এবং লোকসংগীতের আদর্শে সংগীতরচনার

প্রয়াস তাঁর প্রথম যৌবনেই দেখা গিয়েছিল। বাইশ বছর বয়সে তিনি তাঁর 'ভারতী' পত্রিকায় 'বাউলের গান' নামে একটি প্রবন্ধে জাতীয় লোকসংগীত সংগ্রহের ক্ষমতা বাঙালিকে অমুরোধ করেন এবং প্রবন্ধ শেষে তিনি নিজের সংগৃহীত তিনটি লোকসংগীত উদ্ধৃত করেন। লোকসংগীতের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে উত্তরবঙ্গে আসবার পর। বাউল ও অমৃত্যু লোকসংগীতের প্রভাবে তিনি নিজেও গান রচনা ক'রে চললেন। শ্রীশাস্তিদেব ঘোষের মতে 'তোমরা সবাই ভালো' ও 'খাপা তুই আছিস আপন' এট দুটি হ'ল তাঁর প্রথম বাউল সুরে গাওয়া গান। তাঁর 'আমার সোনার বাংলা', 'ও আমার দেশের মাটি,' 'ছি ছি চোখের জলে', 'যে তোরে পাগল বলে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান বাউল সুরে রচিত। কবি বাউলের গানের দ্বারা কতখানি অমুরাগিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে স্বীকার ক'রে গেছেন, 'আমার লেখা দ্বারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অমুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি।' শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ কবির জীবনের শেষভাগে কীর্তন ও বাউলের মিশ্রিত সুরে রচিত এক প্রকার গানকে 'স্বাবৌদ্ধিক কীর্তন' বা স্বাবৌদ্ধিক বাউল বলেছেন। বাউলদের গান তাঁদের সাম্প্রদায়িক ধর্মসাধনার বাহ্য অভিব্যক্তি ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সংগীতকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সীমানা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃতিচেতনা, মানবিক প্রেমচেতনা প্রভৃতি ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। শুধু কেবল বাউলদের সংগীতই যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, বাউলদের জীবন অবলম্বনে তিনি তাঁর নাটকে অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। 'রাজা' নাটকের বাউল এবং 'কাস্তুরী' নাটকের অন্ধবাউল কথায় ও গানে সাধারণ বাউলের সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্যযুক্ত। তা ছাড়া তাঁর সাংকেতিক নাটকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যথা 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা, 'অচলায়তন' নাটকের দাশাঠাকুর প্রভৃতি বাউল-সাধকদের আদর্শে অঙ্কিত। রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের সন্ধান এবং মানবিক প্রেমের মধ্য দিয়ে ভগবত প্রেমের উপলব্ধি বাউল-সাধনার এই বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লিখিত নাট্যচরিত্রগুলির মধ্যে প্রতিফলিত। কয়েকটি নাটকে গ্রাম্য পরিবেশে সাধারণ লোকদের মুখে সম্মিলিত সংগীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীতের পরিবেশ ও আবেদন সৃষ্টি করেছেন, যথা 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' কৃষকদের মুখে 'হেদেগো নন্দরাণী', রাজা ও রাণী' নাটকে কার্ত্তবিরাদের গান 'বধু তোমায় করব রাজা তরুতলে' এবং 'অচলায়তন' নাটকে দর্শকদের গান ইত্যাদি।

বাউল গান ছাড়াও কবি সারিগান ও ভাটিয়ালির সুরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান রচনা করেছিলেন। 'গ্রাম ছাড়া ঐ বাঙামাটির পথ', 'আজ তোরা মরা গাঙে বান এসেছে', 'বসন্তে কি শুধুই কেবল ফোটা ফুলের মেলা', 'আজ ধানের ক্ষেতে রোদ্রচায়ার' প্রভৃতি সারিগানের সুরে রচিত। লোকসংগীতের সুর ও পল্লীরস কবি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু লোকসংগীতের গ্রাম্য ভাবারূপ তিনি পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত ক'রেই তাঁর গানে প্রয়োগ করেছিলেন। লোকসংগীতের মধ্যে ভাবার যে আঞ্চলিকতা এবং শব্দ ও অলংকার প্রয়োগে যে স্থূল গ্রাম্যতা দেখা যায় তাঁর গানে সে সব একেবারেই অমুরপস্থিত। যে-সব লোকসংগীতে নাগরিক কচিবিকৃত গ্রাম্য বাস্তবরস ও অনীলতা বিদ্যমান রবীন্দ্রনাথ সে-সব সংগীতের দিকে আকৃষ্ট হন নি।

লোকনৃত্য, লোকনাট্য ও লোকশিল্প সম্পর্কে কবির আগ্রহ দেখা যায় জীবনের শেষভাগে। অবশ্য বাউলদের গানের সঙ্গে নাচের ভঙ্গি তিনি উত্তরবঙ্গে থাকতেই দেখেছিলেন। কিন্তু শাস্তিনিকেতনে

ধাকবার সময়েই তিনি রাইবৈশে নাচ, সাঁওতালো নাচ এবং অগ্গাণ্ড লোকনৃত্য দেখে সেগুলির প্রকাশভঙ্গি ও ভাবরস তাঁর পরিকল্পিত নৃত্যধারার মধ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। অবশ্য বাংলার নিজস্ব লোকনৃত্যের সঙ্গে গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের লোকনৃত্য, বালিন্দীপের লোকনৃত্যনাট্য এবং ইউরোপের লোকনৃত্যের ভঙ্গি ও রসের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। শেষজীবনে তিনি শাস্তিনিকেতনে নৃত্যশিল্পশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং নৃত্যশিল্প অবলম্বনে নাটক রচনা করেন। তাঁর গীতিনৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে ক্লাসিক নৃত্যের সঙ্গে লোকনৃত্যও স্থান পেয়েছে। তাঁর বাউল জাতীয় নাট্যচরিত্রগুলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই চরিত্রগুলি গানের সঙ্গে নাচের মধ্য দিয়েও ভাবপ্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে রবীন্দ্র-নৃত্যরীতির সঙ্গে বাউল নৃত্যের একটি বড় মিল এখানে যে, বাউলের নৃত্য যেমন কোনো বিশেষ নৃত্যরীতির চও্ডে আবদ্ধ নয়, ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় প্রকাশই তার নৃত্য রূপ নেয়, রবীন্দ্র-নৃত্যও ঠিক তেমনি প্রাণের আবেগ ও অহুভূতির প্রকাশের সহজ ছন্দিত মাধ্যম মাত্র। তাঁর বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের মধ্যে লোকনৃত্যের প্রভাব স্পষ্ট করা যায়, 'বান্দীকিপ্রতিভা'র দম্ভাদের নৃত্য, 'চিদ্ভাঙ্গদা'র গ্রামবাসীদের নৃত্য এবং 'চণ্ডালিকা'র সাধারণ মেয়েপুরুষদের নৃত্য লোকনৃত্যের প্রভাব স্পষ্ট। নৃত্যের ভঙ্গিতে পরিবেশিত 'নবীনে' অগ্গাণ্ড নাচের সঙ্গে বাউল ও রাইবৈশে নাচের প্রয়োগ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে যাবার পর যে সব সাংকেতিক নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে লোকনাট্য অর্থাৎ যাত্রার প্রভাব স্পষ্ট। জোড়াসাঁকোতে থাকবার সময় তিনি যে সব নাটক লিখেছিলেন সেগুলি বাস্তবধর্মী রঙ্গমঞ্চেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু জীবনের মধ্যভাগে তিনি পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের অহুকরণে নির্মিত আঙ্গিকবহুল বাস্তবধর্মী মঞ্চের প্রতিবাদ করলেন এবং যাত্রারীতি গ্রহণ করবার পক্ষে জোড়ালো যুক্তি উত্থাপন করলেন। বাস্তবধর্মী মঞ্চের বিরুদ্ধে তিনি বিজোহ জানালেন ১৩০৯ সালের রচিত 'রঙ্গমঞ্চ' নামে প্রবন্ধের মধ্যে। পরবর্তীকালে তিনি একাধিক স্থানে কৃত্রিম কলাসর্বস্ব মঞ্চের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ সমান জোরের সঙ্গেই জানিয়েছেন। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ তিনি শুরু করেছেন ভারতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নাট্যমঞ্চের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকবিরল মুক্তমঞ্চের পক্ষে সমর্থন জানাতে গিয়ে ভারতের নাট্যশাস্ত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের কথা উল্লেখ করে বোধ হয় ঠিক করেন নি। কারণ ভারতের নাট্যশাস্ত্রে প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ এবং পশ্চাত্তী বর্ণিত যবনিকা এবং অপটাক্ষপ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত নেপথ্য বিধানেরও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি যে চার প্রকার অভিনয়ের কথা বলেছেন তার মধ্যে আহাৰ্য অভিনয়ে মঞ্চের কৃত্রিম সজ্জা ও উপকরণের কথাই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চকে স্বভাবান্ত্রিত রঙ্গমঞ্চ না ব'লে সজ্জা, অলংকরণ ও উপকরণবহুল রঙ্গমঞ্চই বলা উচিত। স্বভাবান্ত্রিত রঙ্গমঞ্চ বলতে প্রাচীন গ্রীক থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয়ের আসরের কথাই উল্লেখ করতে হয়। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে যাত্রাভিনয় প্রশংসা করে কবি লিখলেন, 'আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ অগ্গা ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আত্মকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহজরতায় সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।' তিনি কেন শাস্তিনিকেতনের জীবন শুরু করবার সময় যাত্রাভিনয়কে এতখানি পছন্দ করলেন তার কতকগুলি কারণ অস্বাভাবিক করা যেতে পারে। প্রথমত শাস্তিনিকেতনে ব্যবহৃত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানো তাঁর পক্ষে তখন কষ্টসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়ত শাস্তিনিকেতনের আবাসিত ও উন্মুক্ত

প্রকৃতির পটভূমিতে যাত্রারীতির অভিনয়ই স্বাভাবিক ও রসাবেদনের পক্ষে অমূল্য ছিল। তৃতীয়ত মাটি ও মানুষের কাছাকাছি গিয়ে তিনি যে নাটক রচনা করলেন তাতেও মাটির রূপ ও রস এবং সাধারণ মানুষের ভিড় দেখা গেল। সেই নাটকের গঠনরীতি এবং প্রয়োগকৌশল যাত্রাধর্মী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। চতুর্থত রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার নাটকগুলিতে নাট্য ও যন্ত্রের কলাকৌশল অবলম্বনে ঘনীভূত নাট্যাবেগ এবং জীবনরস সৃষ্টিই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ দিককার সাংকেতিক নাটকগুলিতে বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব পরিস্ফুটনের দিকেই ছিল নাট্যকারের লক্ষ্য, অর্থাৎ সেখানে প্রধান ছিল বক্তব্য, নাটকীয় আবেগ ও রসসৃষ্টি ছিল গৌণ। সেজন্য কলাকৌশল বর্জন করে তখনকার নাটক হয়েছিল যাত্রার মতোই কলাকৌশলমুক্ত ও দর্শকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

ভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে যাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের কতখানি সাদৃশ্য রয়েছে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। যাত্রার মধ্যে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর অলৌকিক মহিমা দেখানো হয় (আধুনিক যাত্রার কথা অবশ্য আসাদ)। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকেও তেমনি মানুষের সঙ্গে ভগবানের অলৌকিক প্রেমের লীলাই পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মমতে ব্রাহ্ম ছিলেন বলে পৌরাণিক দেবদেবীর লীলা বর্ণনা করেন নি, রূপের মধ্যে অরূপ ভগবানের লীলাই প্রত্যক্ষ করেছেন। যাত্রার মধ্যে অনেক স্থলে বাহ্য রূপের আবরণে অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যাত্রায় ব্যবহৃত এই রূপক রীতি রবীন্দ্রনাথের রূপক অথবা সাংকেতিক নাটকে পূরোপূরি গ্রহণ করা হয়েছে।

যাত্রায় কোনো বাধা রক্ষমঞ্চ নেই, তার চারিদিক খোলা, পিছনে কোনো দৃশ্যপট নেই। রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে এই যাত্রারীতি মোটামুটি গ্রহণ করেছিলেন। ‘তপতী’ নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—‘আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে। কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে যেখানে কণে কণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।’ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দৃশ্য বিহীনতার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করলেও সর্বত্র যে দৃশ্যবিহীন নাটক লিখেছেন তা নয়, নাটকের মধ্যে দৃশ্যস্থলের নির্দেশ থাকলেই রক্ষমঞ্চে সেই নাটক উপস্থাপন করবার সময় দৃশ্যপট ব্যবহার করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। যন্ত্রে দৃশ্যের ব্যবহার তুলে দিতে গেলে নাটকেও দৃশ্য বিহীন ক’রে তোলা দরকার। ‘শারদোৎসব’ নাটকে দুটি দৃশ্য রয়েছে। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ তো পূরোপূরি অন্ধ ও দৃশ্যসম্বলিত নাটক। ‘রাজা’ নাটকের মধ্যেও বিচিত্র দৃশ্যের সমাবেশ হয়েছে। ‘অচলায়তন’ নাটকেও দৃশ্যরূপ আসাদ আসাদ। ‘ডাকঘর’ থেকে একটি যাত্র দৃশ্যসজ্জার দিকে প্রবণতা দেখা গেল। ওই নাটকে দৃশ্য তিনটি কিন্তু দৃশ্যসজ্জা মাত্র একটি। ‘ফাল্গুনী’ নাটকের প্রয়োজনায় সাংকেতিক দৃশ্যসজ্জার ব্যবহার হয়েছিল কিন্তু ওই নাটকেও বিভিন্ন দৃশ্যস্থলে ঘটনা ঘটেছে। ‘মুক্তধারা’, ‘রক্তকরবী’ ও ‘রথের রশি’ নাটকের মধ্যেই যথার্থভাবে দৃশ্যের একত্ব ও অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। তবে ‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’ যাত্রার মতো একেবারে দৃশ্যসজ্জাহীন নয়, ওই দুটি নাটকে প্রতীকী দৃশ্যসজ্জা নাট্যঘটনার পটভূমিতে রয়েছে। একমাত্র ‘রথের রশি’তে কোনো দৃশ্যসজ্জার নির্দেশ নেই, সেজন্য ওই নাটকটি খাটি যাত্রাধর্মী বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের যাত্রাধর্মিতার আর একটি লক্ষণ হ'ল গানের বাহুল্য। যাত্রার গানের বাহুল্যের কারণ, (১) গানের উচ্চত্বের দ্বারা বহু লোকের কাছে বক্তব্য পৌঁছানো যেতে পারে ; (২) বহুলোকের মনোরঞ্জন প্রকৃষ্টতম উপায় হল মধুর কণ্ঠে গাওয়া গান ; (৩) ভাষার মধ্য দিয়ে যে গভীর অধ্যাত্মত্ব অথবা জীবনতত্ত্ব বোঝানো সম্ভব নয়, গানের মধ্য দিয়ে তার ব্যঙ্গনা শ্রোতাদের চিত্তে জাগানো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন, প্রাকৃতিক পটভূমির সৌন্দর্যবস এবং গভীর অতীন্দ্রিয় সত্যের আভাস গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। যাত্রার মধ্যে নাট্যঘটনার বিভিন্ন অংশ গানের মধ্য দিয়ে সংযোজিত করা হয়, রবীন্দ্রনাথও তাঁর নাটকের বিভিন্ন ঘটনা-অংশ গানের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, অবিরাম ঘটনা দেখার ক্লান্তি থেকে দর্শকদের স্বস্তিজনক মুক্তি দিয়েছেন এবং নাটকের গুঢ় ভাবতত্ত্ব গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। নাটকের বাউন্স জাতীয় চরিত্রের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সব চরিত্র যাত্রার বিবেক চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছে। অর্থাৎ, ওরা গান ও কথার মধ্য দিয়ে নাটকের ভাবতত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছে এবং অন্যান্য চরিত্রের স্নায়বোধ ও ধর্মবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছে।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'ছড়া' জাতীয় কবিতার দ্বারা এই চিত্রকলাতেও তাঁর খেলায় মনের এলোমেলো প্রকাশ ঘটেছে। এই চিত্রকলা লোকচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কিনা তা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য। তবে এই চিত্রকলায় প্রথার শাসনমুক্ত শিল্পীর যে স্বাধীন অঙ্কনপ্রণালী দেখা যায় এবং যে সব উদ্ভট ও বীভৎস আকৃতির আদিম মানুষ ও জন্তুর চেহারা চিত্রগুলির মধ্যে পরিস্ফুট তাতে তাঁর চিত্রকলার মধ্যে লোকচিত্রের আভাস অনুমান করা অসম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির বনিয়াদের উপর স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য বিলিতি ধরনের সভাসমিতির চেয়ে দেশী ধরনের মেলার উপরেই তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই মেলার মাধ্যমেই সকলের মধ্যে মিলনসাধন করা সহজ। 'স্বদেশী সমাজ' নামে প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ আহ্লাদে দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত।' বাংলা দেশের যত মেলা হয় সব মেলার তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করার কথা তিনি ওই প্রবন্ধে বলেছেন। মেলা সম্বন্ধে তাঁর এই আগ্রহ শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার আয়োজনের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত চাকশিল্পের আয়োজন যেমন শান্তিনিকেতনে তেমনি কাকশিল্পের আয়োজন শ্রীনিকেতনে। অন্তর্ভাবে বলা যায়, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আনন্দলীলা প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতনে, আর কর্মী রবীন্দ্রনাথের কর্মসাধনা মূর্ত হয়েছে শ্রীনিকেতনে। যথেষ্ট থেকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি বলেছেন—'আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।' দেশের অবজ্ঞাত কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যে শ্রীনিকেতনে পরিস্ফুট হ'ল শুধু তাই নয়, শ্রীনিকেতনে উৎপাদিত দ্রব্যগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ব্যবহারে আমাদের কচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তুললেন। কৃত্রিম জাঁকজমক ও পীড়াদায়ক ঐশ্বর্যের প্রভাব মুক্ত ক'রে তিনি কুটিরশিল্পজাত সরল ও স্নিগ্ধ কচিসম্মত দ্রব্যগুলির সংস্পর্শে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন

শ্রীমত ও সৌন্দর্য মণ্ডিত ক'বে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং নিজের বচনায় সাক্ষীকরণ ক'বেই তাঁর কাজ শেষ করেন নি, সেই লোকসংস্কৃতিকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেও সাক্ষীভূত ক'বে তুলেছেন। যার সঙ্গে মাটির যোগ রয়েছে যা আমাদের দেশের জলবায়ু ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই যে যথার্থ সুন্দর এ-বোধ তিনি জাগিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য আজকের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল সমাজ নাগরিকতার বাহ্য চাকচিক্য ও যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন কৃত্রিম বিলাস সামগ্রী পরিহার ক'বে গ্রামের মাটি থেকে উৎপন্ন সহজ সৌন্দর্যে মণ্ডিত জব্য ব্যবহারেই অধিকতর আগ্রহ দেখাচ্ছেন। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ দান এই যে, তিনি আমাদের কুচি ও সৌন্দর্য বোধে লোকসংস্কৃতির প্রভাব এনে দিয়েছেন।

গ্রন্থসমালোচনা

কালিকট থেকে পলানী । সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । সাহিত্যসংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-২ ।

মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

স্মৃতিময় অতীত । সঞ্জীবকুমার বসু । সংস্কৃতি প্রকাশন ১০ হেটসে ষ্ট্রিট কলিকাতা ১ । মূল্য চার টাকা ।

ঝকঝকে তকতকে পুস্তকখানির পাতা খুলে পড়বার পূর্বেই প্রচ্ছদপটের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পূর্বে দুটি তারিখ জলজল করছে—কালিকট ২০/৫/১৪৯৮ আর পলানী (কলিকাতা) ২৩/৬/১৭৫৭। ইতিহাসের পটভূমিকায় ভবিষ্যত ভারতের সংকেতময় এই দুইটি চিহ্ন, কাহিনীর যে ধারাকে মহাকালের স্রোতে বহন ক'রে নিয়ে যায় তাতে দেখা যায় যে এই কমবেশি আড়াইশো বছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রবলপরাক্রান্ত উজবেক-কাজাগিস্থান হতে আগত চাঘতাই মুঘলদের উত্থান ও পতন এবং বহির্বিভাগে পতু'গীজ, হল্যান্ডজ বা ওলন্দাজ বা ডাচ, দিনেমার, বেলজিয়ান, ফরাসী, ইংরাজের আগমন। শুরু করেছিল পোতু'গীজ, সারা করলে ইংরেজ—পশ্চিমের বণিক শক্তি মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড হাতে নিলে। শুধু কি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ডাঙ্কো-ডি-গামা কালিকটের জ্যামোরিনের দরবারে এসে পৌঁছিলেন? তাতো নয়—এর গুরুত্ব শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানি নয়, এ হ'ল ভারতবর্ষে আসার একটি নতুন দুর্যাবের সন্ধান। এতো শুধু আগমন নয়, এ হ'ল আবির্ভাব, শুধু জ্যামোরিনের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী বিরোধই চললো না, এলো আলবুকার্ক, এলো ক্যাম্ব্রাল, এলো গম্বালেস, ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো পতু'গীজ, কোথায় কালিকট আর কোথায় হুগলী-কলিকাতা, অর্থের সঙ্গে পরমার্থের যোগ যে যুগে স্থনিবিড়, কি ইসলাম্ কি খৃষ্টপন্থী পোতু'গীজদের মধ্যে তখন 'হিদেরদের' অমৃতালোকে নিয়ে আসবার চেষ্টাও যে চলেছিল ছলে বলে কোণলে, বক্তৃতায়, পাণ্ডিত্যে—সে কথায়ও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অনেকে মনে করেন যে ইংরাজরা এই বিষয়ে যথেষ্ট উদার ছিল বলেই অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে মেশায় নি বলেই তাদের কূটনীতি শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল। The ricepot and the rupee policy, Five and steel the dungeon and the rack—এই পন্থা অবলম্বন ক'রেই এগিয়েছিল পোতু'গীজরা—লেখক এই যুগের ইতিহাসের দুটি অত্রান্ত ইঙ্গিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ভারতীয়দের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মৈত্র্যবাহিনী গঠন করা যায় আর এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতের কণি প্রাণ রাজস্ববর্গ বা শাসক সম্প্রদায় চাণক্যনীতির 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' এই সূত্রেই বেশি বিশ্বাসী। দক্ষিণাপথে এই কথা সত্য হলেও উত্তরে বিরাট বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য দুই শতাব্দী ধরে রাজাধিরাজের পদে সমাসীন ছিল। মুঘলরাজসম্রাটের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশ মোটের উপর শাস্তিতেই ছিল, আর সব চেয়ে বড় কথা, সেখানে খাণ্ডের ছিল প্রাচুর্য, ধনধান্তে গুল্পে ভরা এই দেশে, বলতে গেলে পূর্বাঞ্চলের শস্তাগারের গল্প শুনিয়েছেন ফরাসী বার্নিয়ার, টেডার্নিয়ারে, ইতালীয়ান, মাতুচি, পোতু'গীজ, ম্যানবিক ও পরের যুগে ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ট্রাট। ব্যবসায় বাণিজ্যে রমরম করছে তখন হুগলী নদীর মোহানা—চলেছে দেশে দেশান্তরে কার্পাস জাত কাপড়, নীল, আফিং, রেশম, চাল, পাট, বড়ি, সন্টপিটার। মসলিন, শব্দের জিনিস এ সব তো ছিলই।

জানি না এ কথা সত্য কিনা যে হিন্দুদের প্রথম নাবিক অভিযির দল পোতুগীজরা যারা পদার্পণ করেছিল কালিকটে, কিন্তু তার পূর্বে বহির্বাণিজ্যের ভার নিয়েছিল আরবরা বা মুররা। এদের আমরা কি বলবো? ইতিহাসে দেখি যে হিন্দুস্থানের মাল ছোট ছোট পাল তোলা জাহাজে চলেছে পারস্য উপসাগরের কূলে 'অরমুজ'। 'অরমুজ ও ইণ্ড'র ঐশ্বৰ্য্যের কথা পড়ি মিন্টেনের লেখায়। তার পর বসোরা থেকে চলেছে উটপৃষ্ঠে ক্যারাবান, হয়তো মক্কাগিরি কাস্তার পার হয়ে কাস্পিয়ানের তীরে না হয় কৃষ্ণসাগরের কোণে না হয় ইস্তাম্বুলে, তার পর ভেনিসে জেনোয়ায়। বাজার সবগরম, শুধু বেশম, মশলিন, দাকুচিনি চন্দন জায়কল নয়, নানা ধরনের মশগার বেসাতী চলেছে প্রচুর—গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ ইত্যাদি। এর একচেটিয়া ব্যবসা ছিল প্রধানতঃ আরবদের হাতে—মুঝ বলতে মরোক্কো থেকে পারস্য উপসাগরের বসোরা বাগদাদের মুসলমান বণিকদেরও বুঝাইত। এদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে স্থলপথ বাদ দিয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকারে নামলো প্রথমে পোতুগীজ, তার পরে অন্তান্ত ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়। এরই একটি মনোজ্ঞ (তার নিজের কথায়) 'নির্ভাজ ইতিবৃত্ত'—'ইতিহাসের মোড়কে ইতিকথা নয়' গেঁথেছেন সুধী লেখক। কিন্তু ইতিহাসের খুব গভীরে গেলে এটাও দেখা যায় যে ইংলণ্ডের বিস্তৃত ঐশ্বৰ্য্যের মূল কেন্দ্র তার বাহির্বাণিজ্য বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের বাণিজ্যের মুনাফার উপর নির্ভর করলেও অন্য কারণও ছিল না যে তা নয়। আমরা হঠাৎ এক মহাঐশ্বৰ্য্যময় দেশ থেকে ভিক্টোর আন্তানাতে পরিণত হলাম এটার স্বপক্ষে যুক্তি থাকলেও আমাদের নিজেদেরও অনেক দোষ ক্রটি ছিল সে কথা না বললে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বা বাংলার ইতিহাস একটি অবসাদগ্রস্ত কাহিনী—শ্রদ্ধের যত্নাধ সবকারের নানা লেখায় তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে—সেখানে বাঙালি শুধু আত্মবিস্মৃত জাতি নয়, আত্মঘাতী। যে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে আমরা এককালে মাতামাতি করেছি তার ইতিহাস সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কি বলেন? তবে একথা সত্য আজকের যুগের Brain drain এর মতো সেকালে চলেছিল মনিমুক্তা মাণিক্য ও অন্ত পণ্যসম্ভারের drain এর সেই পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থাকে মন্থণ করেছিল এই আড়াইশো বছরের ইতিহাসের ইউরোপ গামিনী ধারা যাতে সম্ভব হয়েছিল তার 'Industrial revolution, তার Renaissance movement এর দু'একটি দিক, তার সাম্রাজ্যবাদের পতন, তার আর্থ ঐশ্বৰ্য্যের সৃচনা। বইটি তারই একটি পটভূমিকা রচনা করেছে, পোতুগীজ পর্ব, ডাচ ও ওলন্দাজ পর্ব, ফরাসী-দিনেমার-বেলজিয়ান পর্ব থেকে ইংরেজ পর্বের অবতারণায়। সেকালের যানবাহন, বিদেশী আর্থ বিনিময়ের হার (যেমন পতুগীজ মুদ্রা এক ক্রুসাডো = দুনিলিং দশ পেন্স ইংরেজি) ব্যক্তি ও বিষয় পরিচয়, সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্রী, শব্দ ও বিষয়শৃচী বইটির মূল্যবৃদ্ধি করেছে। এই ধরনের ইতিহাস আলোচনায় লেখক প্রায় পথিকৃত বললেও চলে। এ সম্বন্ধে বহু উপাদান নানাভাবে নানা জায়গায় (যেমন ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীতে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, ভারতবর্ষের বহু সরকারী রেকর্ড ক্রে) ছড়িয়ে আছে, সেগুলিকে শুধু উদ্ধার নয়, সমালোচকের দৃষ্টিতে পঠন পাঠন ক'রে সম্পাদন করতে পারলে অনেক নতুন তথ্যপত্রী বেরিয়ে যাবে যার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি মূল্যবান প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছি—বৈদেশিক জাহাজগুলির 'লগবুক', কাপ্তেনদের বিবরণ, হার্মাদদের কাহিনী, মগেদের অত্যাচার, নারীধর্ষণ ও অপহরণের বহু পর্যোক্ষ ইতিহাস এই সব 'লগ বুক' পাওয়া যায়।

শুধু লেখককে নয়, সাহিত্যসংসদেব কৰ্ণধারদেবও ধন্যবাদ যে তাঁরা আজকের জৈবিক স্মৃতি কেমিক সমাজেব তথাকথিত অবস্কেব ও জীবন জিজ্ঞাসাব নানা লাঞ্চে পূৰ্ণ সাহিত্যেব বিপুল কাটতিব দিনে এই ধৰনেব চিন্তাব ধোঁবাক জোগাবাব ভাব নিয়েছেন।

ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণতঃ বৃষ্টি ঘটনার পর ঘটনার লম্বা এক ক্রিস্তি (record of events) বা কোনো রাজা- হারাজা-মন্ত্ৰাটের স্মরণ পরাজয়েব বিবরণ, না হয় বংশলেখমালা, না হয় বৃষ্টি বা ওয়াকিয়া-নবীজে বা সভাকবিব সত্যাক্তিভরা দোষগুণ কীর্তনাবলী নির্ভর দুদশটা শিলালেখ, প্রশস্তি, মুদ্রা, মূৰ্তি অর্থাৎ স্থাপত্য ভাস্কর্য ইত্যাদিব নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা বা সেই যুগেব সাহিত্যেব ও শিল্পেব পরিচয় এবং পরিব্রাজকেব ভ্রমণকাহিনীেব মধ্যে মালমণলা যতটুকু পাওয়া যায় তাব সংগ্রহ। ইতিহাস শুধু তাই নয়, তাব চেয়েও বেশি—একটি জাতিব বা দেশেব বা গোষ্ঠীেব মনমন্দিত আগ্রহ সংগ্রহেব পরিচয়। শুধু অশোকেব কটা ছিল নাতি, আওরঙ্গজেবেব কটা ছিল হাতি, এই সব ঘটনােব ইতিবৃত্ত সংগ্রহ কৰাই ইতিহাসেব শেব কথা নয় কাৰণ ইতিহাসে রাজা-মহারাজা-সামন্ত-সেনাপতি শাস্ত্ৰকাব-লিপিকাৰবা প্রধানেব ভূমিকা গ্রহণ কৰলেও সত্যকাব ইতিহাসেব ধ্যানে মননে নিদিধ্যাসনে শুধু এই ধৰনেব বিবরণী এহবাহ। ঘটনাপঞ্জীেব শাসন বা discipline of facts না মেনে শুধু কল্পনােব বড়ীেব বেলুন উড়িয়ে বা মতবাদেব জিগীৰ দিয়ে যে অপরিশোধিত ইতিহাস লেখা যায় না তা নয়, কিন্তু বহির্জগতে যা ঘটে অন্তর্জগতেও তাব তুফান ওঠে এবং এই দুইয়েব মধ্যে সম্পর্ক সূজতীেব ও সূনিবিড়। জানি কট্টেব বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসিকবা হয়তো মুচকে হাসবেন, বলবেন ইতিহাস রম্যরচনা বা দর্শন নয় কিন্তু টয়েনবীেব মতো চিন্তালীল ইতিহাসিকবা তাই Stable ingredients in human nature-এব সন্ধান করেন, সৃষ্টিলীল মহৎসত্তা (The creative geneius) এর খোঁজে চলেন ঘটনা পঞ্জীেব মধ্যে, কোথায় সেই পরিব্রাতা (the Saviour), কোথায় তাঁেব সময় যন্ত্ৰ (time machine), কোথায় সেই দেবতাত্মা মাহুশেব দল, কাৰণ সত্যিকাৰ ইতিহাস ঐতিহাসিক ও সমাজিক জীবন ছাপিয়ে।

এই কথাগুলিই মনে হচ্ছিল উপরোক্ত বই এবং সঞ্জীবকুমার বসুেব 'স্মৃতিময় অতীত' এই বইখানি পড়বার সময়। কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধকে একত্ৰ কৰেই তাঁেব এই বইটিেব সূচনা। তাতে অবশ্য বইটিেব 'ইমেজ' বা 'আমেজ' নষ্ট হয় নি। 'এক হারানো সভ্যতােব কাহা' নিয়েই আৰম্ভ। তিনি লিপিবদ্ধ কৰছেন প্রাচীন পৃথিবীেব আশ্চর্য প্রাণ স্পন্দন, যখন গাঙ্গেয় প্রদেশেব অধিকাংশ ছিল সমুদ্র অতল ভুক্ত, গঙোয়ানা প্রদেশেব অন্তর্গত। ভূতাত্ত্বিক এই গবেষণাব পর তাঁেব সফল মন চলে গেছে ভারতেব বৈদেশিক বাণিজ্যেব সূত্ৰপাতেব কাহিনীতে। ধনলুক লোকেবাই সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ কৰে—ঋগ্বেদেব এই ঋক্ থেকে তিনি টলেমিেব ভূগোল, পেরিক্লাসেব বিবরণী কিছুই বাদ দেন নি। তাব পরেই শতাব্দীেব পর শতাব্দীেব পেরিয়ে তিনি এসে গেছেন মুঘলযুগেব সপ্তগ্রামেব ইতিহাসে, সবস্বতীেব তীবে যাকে বলা হ'ত প্রতাপ নগর গঙ্গায়মুনােব সঙ্গমস্থল। সাতগাঁ মুঘলদেব আগেও পাঠান আমলেব একটি বিখ্যাত শাসন কেন্দ্ৰ। তাব পরে তিনি এসে গেলেন ভারতে ইংরাজ আধিপত্যেব গোড়াব কথােব প্রথম ইংরাজ যিনি ভারতবর্ষে আসেন—Apostle Thomas তাঁেব কথা লিখেছেন বিশপ মেডেলিষ্ট—মায়লাপুবে তাব স্মৃতিচিহ্ন আজও বর্তমান। জব চার্গকেব ইতিহাস তো সর্বজন বিদিত। হেজেব ভায়েবীতে নানা মুখবোচক গল্প আমরা পাই—তাঁেব হিন্দু স্ত্রীেব কথা, বৈঠকখানা বাজারে বটফক্ষিণীকে সাক্ষী রেখে স্ত্রীতোহুটীেব তেজীমান্দী কাববার। বাদশাহ

হেওরা হেওরানি নিয়ে কত রঙের তুরূপের খেলা, জাহাজ ভরতি সওদা, পণ্যবাহী সভ্যতার পুণ্য মুনাকা—
 মাঝি ও গুণ্ডার, নুটি ও ভাণ্ডার। তারই কলরোলে সাগরপারে উঠেছে ভারত ফেরত নবাবদের প্রাসাদ,
 শিল্পবিপ্লবের আমন্ত্রণ আর তাদেরই প্রসাদপুষ্ট তাঁবেদার সাকরের বেনিয়ান দালাল মুংসদি নায়েব গোমস্তার
 হুজুর। যখন ফোট উইলিয়ামের পতন। তখন বজ্রবাহী বাদ্যবনে বেতের জঙ্গল চিরে দক্ষিণ রায়ের
 রাজস্বে গোবিন্দপুর স্ততোমুটি ডুবুডুবু, কালিঘাট ভেসে যাচ্ছে, প্রমত্তা হয়ে উঠেছে কলিকাতা। সাত সমুদ্রের
 জেরোনদী পেরিয়ে যাদের আগমন তার। ভোগবতীর ভুজার ভরে নিতে জানে ভাগীরথীর জলে। ইতিহাসের
 পাতায় পাতায় তার শিহরণ লাগে, দিল্লীরবের সিংহাসনে তাঁর কাঁপন জাগে, ভিত নড়ে, ফাটল ধরে।
 দিল্লীর বংশাশায় বংশহলের শিশমহলের কক্ষে কক্ষে বাতি নেভে, মুঘল বংশের ইমারত জহরৎ নাদীরশা
 আবদাল্লাহরানৌরোহিলারা নিয়ে পালায়। আর পূর্ব দিগন্তে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয়।
 তারই এক একটি কাহিনী নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক শুধু ঐতিহাসিকের কুশলী বৃত্তি দিয়ে নয়,
 বণিকের মনোভিরাষ ব্যঙ্গনা দিয়েও। ধরণ দুই কোম্পানির ঘন ও উইলিয়াম নরিসের গল্প। ইংরাজ
 আমলের গোড়ার যুগে যে আত্মকেন্দ্রিক হ'কাবরদার, পেয়াদা, আদালী আবদার শোভিত সমাজ গড়ে
 উঠেছিল পরগাহার মতো যেখানে জেটসম্মান এটনৌ উইলিয়ন হিকি 'ট্যাভার্নে' গিয়ে পেটপুয়ে চমৎকার
 মাছ খেতো, ক্যাবেট উড়িয়ে নর্তকী 'নিকি' নাচতো, বেলজিয়ান শিল্পী 'সলভিন' ছবি আঁকতো, কালিঘাটের
 মন্দিরে সবাই যেতো বেড়াতে, চড়ক দেখতে, সে সব দিনের কথাই অনেক বিবরণ পাই এই 'স্মৃতিময়
 অতীতে'। শুধু শতবছর পূর্বকার বাঙালির জীবনের কথাই লিপিবদ্ধ করেন নি তিনি এসে ধেয়েছেন
 ভারতীয় রেলপথের গোড়ার কথাই। হাওড়া থেকে বানীগঞ্জ সেদিনের তুলনায় বহুদূর—প্রথম শুকু অবশ্য
 হাওড়া থেকে হুগলী ১৮৫৪ সালে। এই সব কাহিনীগুলি ধওধও ভাবে লিখিত হলেও একটা অঞ্চল
 আমেজের সূত্র ধরিয়ে দেয় সেইখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

প্রচ্ছদপট, বাধাই ও ছাপা প্রশংসনীয়।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য। এগরগুন ঘোষ। লেখাপড়া ১৮বি স্তম্ভাচরণ দে প্লিট
 কলকাতা ১২। দাম আট টাকা

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে প্রতিভার যে ক্ষুরণ এবং বিকাশ দেখা দিয়েছিল তা একটি জাতির ইতিহাসে
 বিশ্বকর এবং অভিনব। চিন্তা ও মননের পটভূমি এত ব্যাপক যে সে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বিংশ
 শতকের শেষপাদ অবধি প্রবাহিত হয়েছে। বলা যায় চিন্তা ও মননের সেই উত্তরাধিকার বিশ্বত হয়েছি
 বলেই আমরা চিন্তাক্ষেত্রে সুসংহত এবং দৃঢ় হতে পারি নি, ভ্যাকুয়ামের মধ্যে বাস করছি। উনবিংশ
 শতকের গৌরবোজ্জ্বল চেতনাকে স্বর্ণময় অতীত বলে গৌরববোধ করেছি কিন্তু সপ্রকৃ দূরত্ব বজায় রেখেছি।
 অধ্যাত্মচেতনার, সাহিত্যে, মননে, ধর্মসংস্কারে, শিক্ষায়, সমাজসংস্কারে, জাতীয়তাবোধে—জীবনের সর্বক্ষেত্রে
 এমন সামগ্রিক সচেতনতা আর দেখা যায় নি। একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, অন্যদিকে

ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাব, একদিকে দেশীয় লোকাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংস্কারচেষ্টা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রতি বিতৃষ্ণা কিন্তু বহিঃস্থ জীবনযাত্রার স্বত্বকরণের আগ্রহ, একদিকে বেদান্ত, অধ্যাত্মচর্চার অধৈতবাদ, জ্ঞানমার্গ ও ব্রহ্মোপলব্ধি, অন্যদিকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শন, বিশ্বাস ও সংশয়, একনিষ্ঠ সাধনা ও প্রচলিত সব কিছু অস্বীকার, অন্তর্লীন অধ্যাত্মোপলব্ধি ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা—বিচিত্র এবং পরস্পর-বিরোধী নানা স্রোতধারা উনবিংশ শতকের মননভূমিতে প্রবাহিত। এই নবজাগরণ কেবল চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার ও জাতীয়তাবোধের প্রসারে এক অখণ্ড সামগ্রিক রূপলাভ করেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ উনবিংশ শতকের মনন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। একাধিক খণ্ডে পরিকল্পিত সমগ্র গ্রন্থটিই উনবিংশ শতকের মননলোকে প্রবেশের ভূমিকা। এত বিচিত্র ভাবনা, চিন্তা, নানা মানসিকতার সংঘাত ও সমন্বয় সমগ্র জাতির অন্তর্লোকে প্রবাহমান ছিল এবং এত মনীষীর দান সেই স্রোতধারাকে পরিপুষ্ট করেছিল যে মননের সেই বিশাল পটভূমি এবং কর্মকৃতির সঠিক মূল্যায়ন বহুখণ্ড গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। বর্তমান গ্রন্থে রাজা রামমোহন রায় থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অবধি প্রথম পর্বের পরিচয় কয়েকজন মনীষীর দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

যে মনীষীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই গণ্যশিল্পী। বাংলাদেশের মনন ও সাহিত্যে তাঁদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচিত অধ্যায়গুলি : আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন ; ডিবোজিও : নবযুগের প্রবর্তক ; প্যারীচাঁদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সার্ব-শতাব্দীর আলোকে ; ‘বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থ’ ও অক্ষয়কুমার দত্ত ; স্বতন্ত্র পারিজাত বিজ্ঞানাগর ; রাজনারায়ণ বসু ও সমকালীন বাঙালীমানস ; মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় : স্বদেশ ও স্বধর্ম এবং নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা : শ্রীরামকৃষ্ণ। এই মনীষীদের প্রত্যেকেই চিন্তার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার অটল এবং প্রত্যেকের সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ধ্রুবজ্যোতি। আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বিচারে অনেকেই পরস্পরবিরোধী কিন্তু উনবিংশ শতকের বিশাল মননভূমিতে প্রত্যেকেই নিজ মহিমায় ভাস্বর, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। তাঁদের ব্যক্তিজীবন পর্যালোচনায় একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের বাক্যে এবং কর্মে, জীবনবোধ এবং জীবনধারায়, বিশ্বাসে এবং আচরণে, ব্যক্তিগত জীবনচর্চা এবং সাহিত্যরচনায় কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব স্বদৃঢ় নিষ্ঠার ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত। সেখানে কোনো আপোষ নেই ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র মিশে এক হয়ে গেছে। এই ব্যক্তিত্ব উনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য।

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ বিভিন্ন অধ্যায়ে একক ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কেবলমাত্র রচনার মূল্যায়ন করেন নি, যে জীবনবোধ ও মহৎ প্রেরণা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের মননের এবং কর্মের সামগ্রিক পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। দশক, শতক অথবা বিশেষ যুগ নিয়ে আলোচনা করলে কাল-ই প্রধান হয়। ফলে আমরা যুগমানস বুঝতে পারি কিন্তু ব্যক্তিমানস সামগ্রিকভাবে বোঝা যায় না। সীমিত কালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি হয়ে যায় খণ্ডিত। এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের যোগফল পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব নয়, কারণ একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের মধ্য থাকে অতীত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, বর্তমানের পরিবেশ ও সাধনা এবং ভবিষ্যৎকালের উপর তার প্রভাব। একজন মনীষীর

দান সব সময় তাঁর ব্যক্তিগত রচনা অথবা কর্মকৃতির উপর নির্ভর করে না। তাঁর সমসাময়িক এবং ভবিষ্যৎ মানবসমাজকে তিনি কতখানি প্রভাব অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছেন, সেটাও তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়নে অপরিহার্য। অধ্যাপক শ্রী ঘোষের আলোচনা এই দিক দিয়ে সার্থক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি ব্যক্তিকে দশক বা যুগ দিয়ে ভাগ করেন নি, সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিধৃত করেছেন। প্রত্যেকটি মনীষীর চিন্তাকাশের পূর্ণ পরিচয় লেখক দিয়েছেন, তাঁদের কেবল উনবিংশ শতকের সফলরূপে চিত্রিত করেন নি। লেখক দেখিয়েছেন তাঁরা স্ব স্ব মহিমায় প্রোজ্জ্বল। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে লেখক অগ্রসর হয়েছেন বলে তাঁর রচনা নৈর্ব্যক্তিক যুগচেতনা প্রকাশে সীমাবদ্ধ হয় নি, প্রজ্ঞা উপলব্ধি এবং অহুত্ব-সজ্জাত মননভূমি ও মানসলোকের পরিচয় প্রকাশে সমৃদ্ধ হয়েছে।

নবযুগের উন্মেষকালে রামমোহনের চিন্তার আধুনিকতা, বিশ্বমানবিকতা, ধর্মসহিষ্ণুতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ, 'সর্বজনীন ধর্ম', বাংলা গল্পের সূচনাপর্বে তাঁর দান, ব্রহ্মসংগীত, চিরপ্রেরণাময় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লেখক আলোচনা করেছেন। ডিরোজিও নবীন বাঙালির মানসক্ষেত্রে যে বীজ বপন করেছিলেন তা হল, স্বাধীন ও যুক্তিবাহী দৃষ্টিভঙ্গি, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ, অত্যাচার প্রতি ঘৃণা ও দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার প্রতি আন্তরিক অহুবাগ। তাঁর ছাত্র ও ছাত্রকল্প ব্যক্তিরা তাঁর দীক্ষা এবং অহুপ্রেরণা লাভ করে বাংলার ভাবলোকে নতুন চেতনা সঞ্চার করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য সাধনা, স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণচিন্তা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রজ্ঞা, অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ধর্মচেতনা, অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানচেতনা, সামাজিক আন্দোলনে প্রগতিশীলতা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐতিহ্যসচেতনতা, চিন্তার স্বকীয়তা, সমাজসংস্কার, গুরুসাহিত্যে দান, কর্মযোগ প্রভৃতি বিষয় লেখক ঐতিহাসিক পটভূমিতে আলোচনা করেছেন। এই মনীষীরা নানা ভাবে আলোচিত। উনবিংশ শতকের মননভূমিতে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তি প্রতিভা এবং সর্বোপরি তাঁদের আত্মিক সাযুজ্য যে ভাবে মননভূমিকে একলক্ষ্য্যভিমুখী করে সুসংহত রূপদান করেছে, লেখক সেই বিষয়টি একস্থলে বিধৃত করেছেন।

অপেক্ষাকৃত অল্প আলোচিত মনীষীদের দান কোনো অংশেই পূর্বোক্ত মনীষীদের অপেক্ষা কম নয়। রাজনারায়ণ বসুর স্বদেশাহুবাগ এবং জাতীয় গৌরববোধ চিন্তাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রবল বস্তার মাঝনে বাংলাদেশকে সুসংহত করেছিল এবং দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত করেছিল। পরবর্তীকালে তা জাতীয়তাবোধে রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনিই ভারতীয় 'জাতীয়তাবোধের জনক'। তাঁর একটি কীর্তি 'জাতীয় গৌরবসম্পাদনী' বা 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা' বাংলার জাতীয় চেতনাকে রূপ দিয়েছে। এর প্রভাবে হিন্দুমেতার পরিকল্পনা। জাতীয় সংহতি, স্বদেশ প্রেম এবং সংগঠনমূলক কর্মপ্রেরণা পরবর্তীকালে রূপ লাভ করল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল স্বগভীর ঐতিহ্যসচেতনতা, তাঁর চিন্তাশক্তি মৌলিক, প্রকাশভঙ্গি যুক্তিনিষ্ঠ, অধ্যয়ন ব্যাপক এবং মনন স্বগভীর তত্ত্বসন্ধানী। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধির নবরূপায়ন, অষ্টৈতবেদান্তের উপলব্ধির সঙ্গে মানবিকতার সংযোগ সাধন। এই তিনজন মনীষীর দান জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্যচেতনা এবং ধর্মচেতনা। মননক্ষেত্রে এই মনীষীদের দান লেখক বিশ্লেষণ করে মননভূমির ভিত্তি নির্দেশ করেছেন।

গ্রন্থের নামকরণে 'বাঙালি' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। লেখক যেমন তাঁর আলোচনায় যুগ ও কালকে মুখ্য করেন নি, ব্যক্তিই মুখ্য, তেমনি স্থানকে গোণ করে পাত্রকে মুখ্য করেছেন। দেশ এবং কাল অপেক্ষা

পাত্র অনেক বড়। বাঙালির মনন এবং সাহিত্যই আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য মনীষীদের অনেকেই চিন্তার ব্যাপকতায় ভারতীয় ও বিশ্বনাগরিক হলেও তাঁদের চিন্তা উৎকেন্দ্রিক নয়। তা নিজস্ব ভাবরসে পুষ্ট এবং যে সমাজকে তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তা বাঙালিসমাজ। লেখকের কৃতিত্বে, তিনি বাঙালিমননের যথার্থ স্বরূপটি উদ্ঘাটিত ক'রে স্বক্লেদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পীযুষকান্তি মহাপাত্র

রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতি। অবন্তীকুমার সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী ২০৬ বিধান সরণী কলকাতা ৬। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। নেপাল মজুমদার। সারস্বত লাইব্রেরী ২০৬ বিধান সরণী কলকাতা ৬। দাম ছয় টাকা।

ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ। নরেশচন্দ্র ঘোষ। সাধনা প্রকাশনী ৩৬ সাধনা ষ্টেশনার রোড কলকাতা ৮। দাম তিন টাকা।

বিচিত্র রবীন্দ্র-চর্চা।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার দিকে ক্রমে আমাদের দৃষ্টি বেশি ক'রে পড়ছে। কাব্যনাটো সীমাবদ্ধ রবীন্দ্র-আলোচনার স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সর্বাত্মক পুষ্টি যদিও বহুদূরে। তবুও নানা মনের ও স্বরের লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আশ্রয়ে রবীন্দ্র-ভাবনাকে বৈচিত্র্য দান করছেন। একটা অবিরাম চেষ্টার স্বলক্ষণ মিলছে। আলোচ্য তিনটি বইয়ের লেখকেরা কেউ অধ্যাপক-সমালোচক, কেউ নির্মাতা গবেষক, আবার কেউ পথে ভ্রমণশীল শুদ্ধ আনন্দের আবেগে। বিষয় বিচিত্র। অবস্খীয়াবু করেছেন সাহিত্য সমালোচনা, নেপালবাবু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার একটি নতুন দিকে আলো ফেলেছেন, নরেশবাবু ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাণীমূর্তিরূপে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্র-গল্পরীতির আলোচনায় এখনও যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করা হয় নি। সাধু ও চলিতের দুই অসমশক্তি ঘোড়ার গাড়িকে কি কৌশলে তিনি এক লক্ষে প্রয়োজনবোধে অতি দ্রুত বা মন্থর গতিতে চালিয়েছেন, শব্দ-চিত্র-অলংকার ও বাক-বিন্যাস ঘটিত কি জাতীয় প্রবণতা তাঁর শিল্পীস্বভাবের বিশিষ্ট প্রতিকলন হয়ে উঠেছিল, বিষয় বৈচিত্র্যে এবং কালক্রমে প্রসারিত রীতির বিকাশ ও বিভিন্নতার ভিত্তিতে কোনো কেন্দ্রীয় ঐক্য লক্ষণীয় কিনা-এ সব ভাবনা রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতির বিশেষ আলোচনায় একরূপ অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতি বিষয়ে অবন্তীকুমার সান্যাল যে বইটি লিখেছেন তাকে স্বাগত জানাব বিষয় নির্বাচনের জ্ঞান। এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু লেখা চোখে পড়লেও সামগ্রিক আলোচনা বোধ হয় এই প্রথম। যদিও লেখক নিজেই বলেছেন 'রূপরেখাটি মাত্র ধরতে চেষ্টা করেছি'। রবীন্দ্র-গল্পরীতির কোনো একটিও দিককে বোধ হয় ১২৪ পৃষ্ঠার সংকীর্ণ সীমার আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ণ আলোচনা এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু প্রবীণ অধ্যাপক সান্যাল মহাশয় রবীন্দ্র-গল্পরীতির যে মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তার তাৎপর্য অবশ্যস্বীকার্য। প্রথম পর্বে প্রস্তুতিপর্বের গল্পভঙ্গির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে চলতি ও সাধু উভয় রীতির বিকাশ ঘটেছে। তৃতীয় পর্বকে সাধু গল্পের শ্রেষ্ঠ পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন লেখক। এই পর্বে চলতি গল্পের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। চতুর্থ পর্বে চলতি গল্পের

একাধিপত্য। পরবর্তী চারটি আলোচনা কিছুটা উপগ্রাসনিক। নাটকের গল্প, গল্পরীতি ও পদ্ধতিরীতি; অলংকরণ; স্টাইল। ক্রমবিকাশের সূত্রে চারটি পর্বে বিশ্লিষ্ট বিশ্লেষণে যে সমগ্রতা ধরবার চেষ্টা আছে, এখানে তা অল্পপস্থিত। তবে মূল বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু স্টাইল এবং অলংকরণের মূল আলোচনার সঙ্গে মিশে যাবার কথা—এখানে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল কি ক'রে এ প্রশ্ন আগতে পারে। নাটকের গল্প নিয়ে পৃথক অধ্যায় লেখা হ'ল, কথাসাহিত্যের গল্প নিয়ে হ'ল না কেন? মননশীল প্রবন্ধ, সৃষ্টিধর্মী গল্পনিবন্ধ এবং গল্পোপস্থাসের ভাবারীতি একই ধরনের বস্তু কিনা—তাদের মাপার পদ্ধতি পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা—এরূপ কথা পাঠক ভাববেন এ বই পড়তে গিয়ে। এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পের শুধু সাধু চলিতের সর্বজনীন রীতিভেদ নয়—সব মিলিয়ে গল্পশিল্পীর বিশেষ ব্যক্তিত্বটি পাঠক খুঁজতে আগ্রহ বোধ করবেন এই বইটি পড়ে।

মূল রচনাবলী থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি এ জাতের বইয়ে থাকবেই। তবে লেখক সাক্ষাটিক পদ্ধতিতে অল্পপত থেকে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের ইচ্ছিতে উদ্ধৃতাংশগুলির স্বাদ অল্পভূতিলীল পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির দাবি কিছু পৃথক ধরনের।

তবুও সব মিলে বলা চলে অবশ্যীবাবুর বই আমাদের আশা আগায়, পূর্ণ তৃপ্তি না দিলেও বঞ্চিত করে না। এবং তৃপ্তি ব্যাপারটিই কি দ্বিগন্তম্পর্শী-মরীচিকা নয়?

নেপাল মজুমদারের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' কবির রাজনৈতিক চেতনার নিপুণ বিশ্লেষণ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। রাষ্ট্র-দর্শনবেত্তা রূপে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রিক পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে বিচারের যে চেষ্টা মজুমদার মশায় করেছেন তা উক্ত বিষয়ে এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ লেখা বলে অভিহিত হতে পারে। সে বই ধারা পড়েছেন 'রবীন্দ্রনাথ ও স্ভাবচন্দ্র'কে তাঁরা একটা বিস্তৃততর ভাবনাসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারবেন। ধারা এ বইটিকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখবেন তাঁরাও নিশ্চিন্ত হতে পারেন এর স্বাধীন পূর্ণতা বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্ভাবচন্দ্রের সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণ তথ্য ও ঐতিহাসিক নথির ভিত্তিতে লেখক উপস্থিত করেছেন। আমরা শোনা কথা এবং কিয়দস্তী বেশি পছন্দ করি, গালগল্পের সবসত্য ভুলে যাই। নেপালবাবু এই ধারণার বিকল্পে অঘোষিত সংগ্রাম ক'রে চলেছেন। জনপ্রিয় হবার দায় থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর দায়িত্ব শুধু ঐতিহাসিক তথ্যের কাছে। কোথাও ব্যাখ্যায় ওলটপালট করার চেষ্টা নেই। সহজ সিদ্ধান্তগুলির দিকে সরাসরি আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। লেখকের রাজনৈতিক মত কি, কিছু আছে কিনা—আমি জানি না। এ বইও কিছু জানায় না। এখানে সত্যসাধনা নিরঞ্জন।

সমকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং রবীন্দ্রনাথ-স্ভাবচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র রায়—মেঘনাদ সাহা অনিলকুমার চন্দ্রের মধ্যে যে সব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল তার ভিত্তিতে নেপালবাবু তাঁদের দুজনের সম্পর্কের একটি ধারাবাহিক কাহিনী রচনা করেছেন এবং স্বভাবতই এ কাহিনী শুধু দুই বাঙালি মনীষার সম্বন্ধের নয়, ভারতবর্ষের বৃত্তীয় ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের উপাদান সংকলন।

স্ভাবচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে যে বামপন্থী আন্দোলন দানা বাঁধছিল সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং কতগুলি ক্ষেত্রে সমর্থন; সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি বিষয়ে স্ভাবচন্দ্র-মেঘনাদ-রবীন্দ্রনাথের ভাবনার নৈকট্য নানা তথ্য সহযোগে উপস্থাপিত। গান্ধীজির সঙ্গে স্ভাবচন্দ্রের বিরোধকালে

রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'পাক্ষীজি ও তাঁর অহুগামী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যখন স্বভাবচন্দ্রের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে তখন রবীন্দ্রনাথই স্বভাবচন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করে এগিয়ে এসেছিলেন।' এই সিদ্ধান্ত বহু দলিলপত্র সহযোগে তিনি প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি অনাবিস্কৃতপূর্ব নতুন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হবার মতো 'Source material' সরবরাহ ক'রে লেখক বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসসচেতন পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

পূর্বোক্ত গ্রন্থটির পরিকল্পনা, পরিবেশন, রূপসজ্জায় প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরী যাক্ষিত কৃতি এবং জ্ঞানসাধনার প্রীতির পরিচয় দেওয়ার বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখেন।

নরেশচন্দ্র ঘোষের 'ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ' কিছুটা অ্যামেচারিস্ হলেও আন্তরিকতার পূর্ণ। নানা প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি ঐক্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। পরিকল্পনার সজাগ নৈপুণ্যের চিহ্ন বিশেষভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

ভারত-আত্মার মহাপ্রকাশ, রবীন্দ্র-কবিমানসের দ্বিব্যদৃষ্টি, বিশ্ববোধির আলোকে, আত্মার আলোকে, 'জীবনদেবতা'র তীর্থপথিক, ভারতসত্যের উৎসসন্ধান, চিন্তা-ঐক্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীঅরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় চিন্তার আলোকে, রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য, রবীন্দ্র-নাট্যের ভাববীজ, জাতীয় সংগঠনে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, জাতি সমাজ ও স্বদেশ, জাতীয় আন্দোলনে অবদান, ভারতের আত্মিক সম্বোধি প্রভৃতি প্রসঙ্গের চৌদ্দটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রপ্রতিভা হীরের মতো। নানা মুখ নতুন ক'রে কাটার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ। বিভিন্ন দিক থেকে আলো পড়ায় তার বিচিত্র বর্ণবস্তুরূপ বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে।

ক্ষেত্র গুপ্ত

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের সৃজনমৌলিক চিত্রশিল্পের চৈতন্যলোকে উত্তীর্ণ হ'ল পরিণত বয়সে। তিনি আপন মানস অহুভূতিকে যেমন নৈসর্গিক চিত্ররচনার রূপায়িত করেছিলেন তেমনি ভাবব্যঞ্জনাময় প্রতিকৃতি রচনাতেও অভিনিবেশ স্থাপন করেন। এই প্রতিকৃতি রচনার কাজে আত্মনিয়োগ কালে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবপ্রকৃতির প্রকাশ ঘটিয়ে আপন প্রতিকৃতিও অকিত ক'রে গিয়েছেন। এমনি একটি প্রতিকৃতি রচনা করলেন ১৩৪২ সালের পরমা আষাঢ় চন্দননগরে। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত চিত্রটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়েছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি পত্র দিয়েছিলেন। বর্তমান সংখ্যায় তারই মধ্যে একটি প্রকাশ করা হ'ল বিশ্বভারতীর অবগতিক্রমে। পত্রটিও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালায় সংগৃহীত।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকাও বর্তমান সংখ্যাটি রবীন্দ্র-জন্ম পক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই সংখ্যায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনাই মৌলভাবে প্রকাশ করা হ'ল।

'রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা' প্রসঙ্গের আলোচনাটি বিদগ্ধ লেখকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত লালাবক্তৃতামালার একটি অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বটিক চিন্তার মৌল আলোচনা।

'রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা' প্রসঙ্গের প্রবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রবীন্দ্র-অধ্যাপকের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দিন ধরে যে কিভাবে বাউল সাধনাকে উপলব্ধি ও উপভোগ করেছেন সে প্রসঙ্গেই কৃষিকা রচিত হ'ল।

'রবীন্দ্র-দর্শন' ও 'রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব'এর আলোচক রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্যের বর্তমান সংখ্যা থেকে 'রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা' বিষয়ের আলোচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

কবি-অধ্যাপিকা 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পকবিতা'র সম্পর্কে আলোচনা ক'রে রবীন্দ্র-কবিজীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি বহু তথ্য ও ভঙ্গি পরিপূর্ণ।

'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিজ্ঞা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক 'রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরসুহরীদের গবেষণা' প্রসঙ্গের আলোচনাটিতে ভারতভাবনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন অত্যন্ত স্বজ্ঞাভাষায়।

'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' বিষয়ের আলোচনাটিতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রধান অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, নাটকে ও শিল্পে এক ভাবচৈতন্যে লোকসংস্কৃতির প্রভাব কিভাবে কতটুকু আছে—সে প্রসঙ্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

কবির ১০২-তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধা প্রণতি নিবেদন করা হ'ল।

। নাভানার বই ।

অমৃতলালবসু জীবনী ও সাহিত্য

ডঃ অরুণকুমার মিত্র



বাংলাদেশে পাবলিক স্টেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রসরাজ অমৃতলাল একাধারে নট, নাট্যকার, কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, বক্তা, সামাজিক, শিক্ষামুরাগী ও দেশপ্রেমী। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনকথা ও সমগ্র সাহিত্যভাণ্ডার এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। রসরাজের বিভিন্নমুখী প্রতিভায় ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট

হয়েছিলেন তাঁর সমকালীন যে সব বরেণ্য ব্যক্তি, তাঁদের বহু অপ্রকাশিত পত্র ছয় শত পৃষ্ঠার এই ব্যাপক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রসরাজের নিজের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জীর অনেকগুলি ছিন্নপত্র।

দাম : ২৫.০০

। গল্প ।

চিররূপা : সন্তোষকুমার ঘোষ
বসন্ত পঞ্চম : নরেন্দ্রনাথ মিত্র
বন্ধু পত্নী : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

। উপন্যাস ।

সমুদ্র হৃদয় : প্রতিভা বসু
এক অঙ্গে এত রূপ : অচিন্তাকুমার
সেনগুপ্ত

কবিস্মারক : দীপক চৌধুরী
মেঘের পরে মেঘ : প্রতিভা বসু
গড় শ্রীখণ্ড : অমিরভূষণ মজুমদার
স্তিম ভরদ্বাজ : প্রতিভা বসু
চার দেয়াল : সত্যপ্রিয় ঘোষ
বিবাহিত স্ত্রী : প্রতিভা বসু
মীরার তুপুর : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
মনের ময়ূর : প্রতিভা বসু
প্রথম প্রেম : অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত

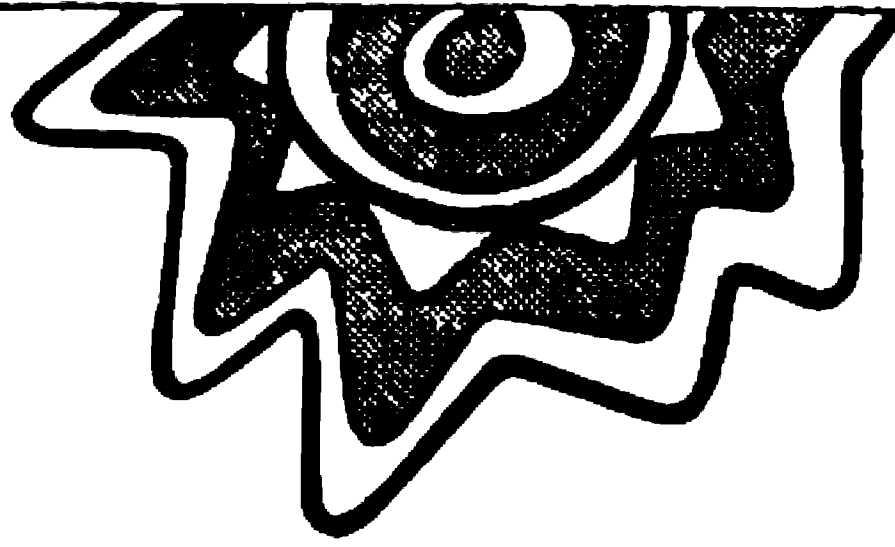
। কবিতা ।

৩.০০ বিষ্ণু দেবের শ্রেষ্ঠ কবিতা : পরিবর্ধিত
২.৫০ তৃতীয় সংস্করণ ৬.০০
২.৫০ পাল্লা-বদল : অমির চক্রবর্তী ৩.০০
৫.০০ ঘরে ফেরার দিন : অমির চক্রবর্তী ৩.৫০
৪.০০ মরকে এক ঋতু : (A Season in Hell)
৪.০০ ব'গাবো অম্বাবাদক : লোকনাথ ভট্টাচার্য ৩.০০
৩.০০ নির্জন সংলাপ : নিশিনাথ সেন ২.৫০
৩.০০ সাগরস্মৃতি : গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ২.৫০
৪.০০ । প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা ।
৩.৭৫ সাম্প্রতিক : অমির চক্রবর্তী ৮.৫০
৮.০০ সব পেয়েছির দেশে : বুদ্ধদেব বসু ২.৫০
৪.০০ আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় :
৩.০০ দীপ্তি ত্রিপাঠী ৮.৫০
৩.৫০ পলাশির যুদ্ধ : তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫.০০
৩.০০ রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম : মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় ৩.০০
৩.০০ রক্তের অন্ধরে : কমলা দাশগুপ্ত ৩.৫০
৪.৫০ চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ : বীণা মুখোপাধ্যায় ১০.০০

নাভানা

নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশন বিভাগ

৪৭ গণেশচন্দ্র এডিনিউ, কলিকাতা ১০



মূল্য ২.০০
সাইজ ৪-১০

গরমে চলুন হালকা পায়ে



ষাটার স্যান্ডাল আর চম্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া
খেলতে পার, যাতে সারাদিন পারে লেগে থাকে এক মোলারেম ও
স্নিগ্ধ আমেজ। সূত্রে ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পারের
স্বাক্ষরের কথা মনে রেখেই তৈরি। পরলেই ভালো লেগে
যাবে চমৎকার নমনীর আপ্যার। সূতাম তালি চলার ছন্দ
হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয়
ষাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চম্পলের
যেন মেলা ব'লে গেছে—এখানে তার মাত্র কয়েকটি
নকশাই দেখছেন। আসুন না, একবার প'রে দেখুন।

মূল্য ০.৮০
সাইজ ১-৭

মূল্য ৮.৯০
সাইজ ২-৬

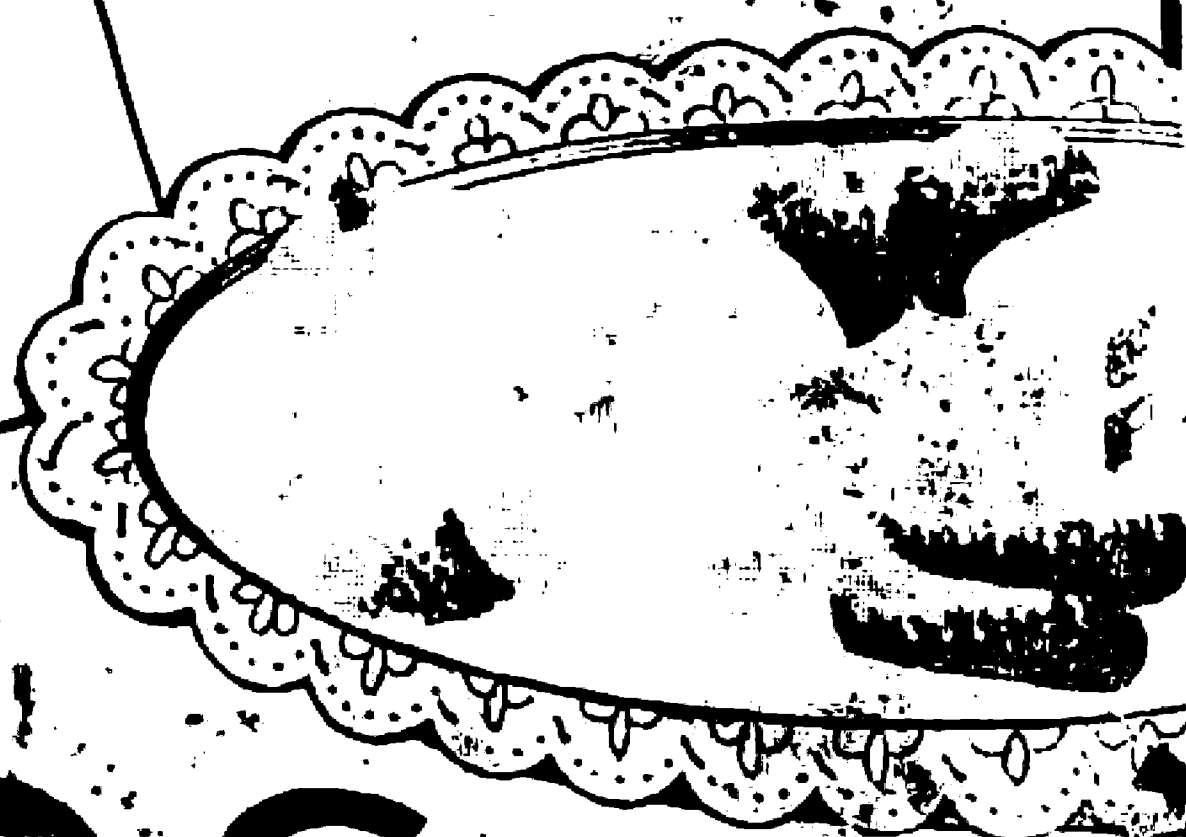
মূল্য ১৪.৫০
সাইজ ২-৭

মূল্য ১৮.৫০
সাইজ ৪-১০

Bata

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিরে তৈরী
খাসার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়



আমি



ঐক্য জয়ন্তী সংস্করণ

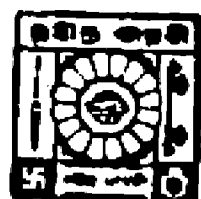


অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১৩৭৭ • জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭০

সম্পাদক
স্বপ্নেন্দ্রনাথ মল্লিক



রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭

With Compliments from :



SREE SARASWATY PRESS LTD.
CALCUTTA—9

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাময়িক পত্রপত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণ-
মূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে
প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও সরকারী
বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা বাগ্মসিক—২.৫০ টাকা
বার্ষিক—৫ টাকা

ওয়াস্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী
সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি
ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা বাগ্মসিক—৫ টাকা
বার্ষিক—১০ টাকা



গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটাস' বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

প্রকাশিত হল

উ দ্বা স্ত্র

শ্রীহরিপ্রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

(আই. সি. এস. অবসরপ্রাপ্ত)

পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তরা আজও এদেশে কাতারে কাতারে আসছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম বছরগুলিতেও আগত উদ্বাস্তর প্রবাহে পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এক তীব্র সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছিল। এই মানুষগুলি পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বারস্থ হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাদের সমস্যা কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কি ছিল, সমস্যার ব্যাপকতা ছিল কতটা, উদ্বাস্তরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের জগ্রে কি-পথ নিয়েছিল, উদ্বাস্ত নেতারা কি বা কি চেয়েছিলেন, কেনই-বা ২২-২৩ বছর পরেও উদ্বাস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হল না—এ সব কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই বইতে। লেখক উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মুখ্যসচিব ও মহাধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন—এ সমস্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ। উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি—বহুলাংশে সে অভাব মেটাবে এই বই। প্রত্যেক সচেতন পাঠকের অবশ্যপাঠ্য।

॥ দশ টাকা মাত্র ॥

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা ৯

গল্পসংগ্রহ

গল্পসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর 'গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলির সাময়িক পত্র প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। লেখকের আলোকচিত্র-সংকলিত। মূল্য ১০.০০, শোভন সংস্করণ ১২.০০

প্রবন্ধসংগ্রহ

বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ধসংগ্রহের দুই খণ্ডে সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হয়েছে।

মূল্য ১৬.০০, শোভন সংস্করণ ১৮.০০

॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা আলোচিত হয়েছে। ২.০০

অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর বিচার

ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলির Appearance and Reality গ্রন্থের প্রাঞ্জল অমুবাদ। অমুবাদক : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। ৮.০০

আত্মজীবনী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহর্ষি-রচিত এই মূল্যবান গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ১২.০০

পূর্ণকুন্ত ॥ শ্রীরানী চন্দ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরীর ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাধীন-পুস্তক প্রাপ্ত। ৫.০০

হিমাদ্রি ॥ শ্রীরানী চন্দ

কেন্দার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুন্ত' গ্রন্থের জায় স্থখপাঠ্য। ৫.০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেন, কলিকাতা-৭

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

নিয়মাবলী

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা প্রতি জ্যৈষ্ঠাষী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয়।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক গ্রাহক ঠান্ডা চার টাকা। পত্রিকা 'সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং' রেখে গ্রাহকদের দায়িত্বে পাঠানো হয়। রেজিষ্ট্রি ডাকে মাত্ৰ টাকা।

সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যার প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থমালোচনার অংশে দু'কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বিক্রয়কেন্দ্রে, বিভিন্ন পত্রিকাস্টলে এবং পত্রিকা সিন্ডিকেট অফিসে (১২/১ লিওনে স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬) খুচরা সংখ্যা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা কার্যালয়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-৫২৫১

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

পুরাতন সংখ্যা

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার পুরাতন যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় নিয়ে তা উল্লেখ করা হল—

প্রথম বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বর্ষ। ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পাওয়া যায়।

তৃতীয় বর্ষ। ১ম, ৩য় ও ৪র্থ তিনটি সংখ্যা পাওয়া যায়।

চতুর্থ বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায়।

পঞ্চম বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায়।

সপ্তম বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায়।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

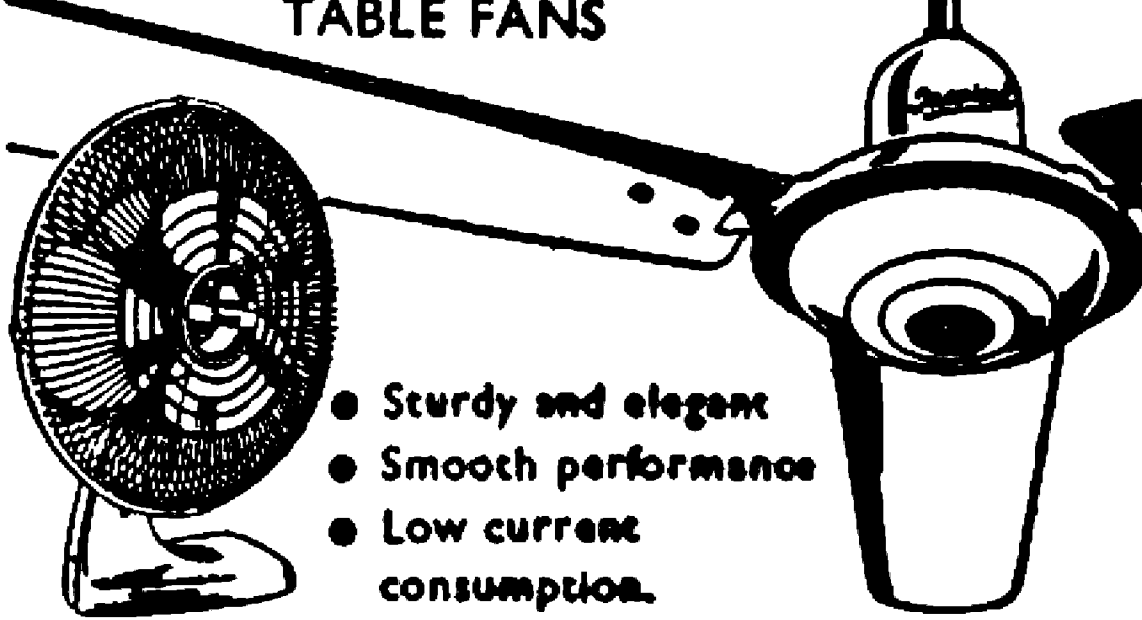
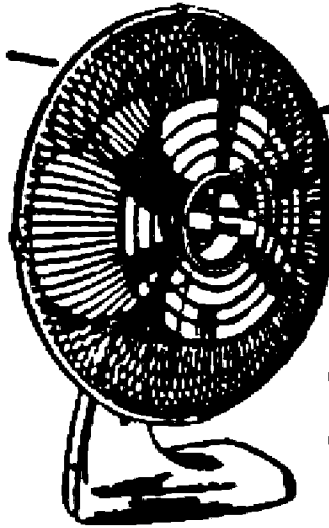
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

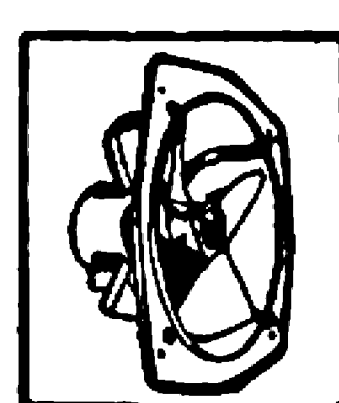
LAST FOR A LIFE TIME

Tropical

DE LUXE CEILING AND TABLE FANS

PEDESTAL AND EXHAUST FANS



- Sturdy and elegant
- Smooth performance
- Low current consumption.

OMF-1-67

MANUFACTURED BY

BHARAT ELECTRICAL INDUSTRIES LTD. Calcutta-1.

AGENTS:

THE ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD., Calcutta ● Bombay ● Madras ● Delhi ● Kanpur

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের তথা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের অমূল্য বিশিষ্ট মনীষী দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত বহু নতুন তথ্য সম্বলিত কর্মধারার বিবরণবিধৃত গ্রন্থ। তাঁরই বংশের উত্তরপুরুষের দীর্ঘকালপূর্বে লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে জীবনীটি প্রকাশিত হল।

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যে ও চিত্রে যে শিল্পতাত্ত্বিক অবদান ও অনুভূতি, যে নান্দনিক ব্যাখ্যা ও বোধি শাস্ত্রত মর্যাদায় প্রকাশিত তাঁরই সহজ সুন্দর রসবিচার। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বেটিক চিন্তার সামগ্রিক আলোচনা।

দাম আট টাকা

RABINDRABHARATI JOURNAL

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপকবৃন্দের মৌলিক প্রবন্ধ ও রবীন্দ্র-কবিতার ইংরাজি অনুবাদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বার্ষিক ইংরাজি সংকলনে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে ১ম খণ্ড, ১৯৬৯ সালে ২য় খণ্ড এবং ১৯৭০ সালে ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতি খণ্ডের মূল্য দু'টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা • শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭

সূচীপত্র

চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৫
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদ	সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৬
ভাস্করের ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ	রমা চৌধুরী	২১৩
রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৩
বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী	ক্ষেত্র গুপ্ত	২৪২
রাসেলের নৈতিকচিন্তা	শিবপদ চক্রবর্তী	২৫২
বাংলা গদ্যের আদিকথা ও অক্ষয়-ঈশ্বর	স্বকুমার সেন	২৬৪
সাহিত্যে স্টাইল	বিজেন্দ্রলাল নাথ	২৭৪
গ্রন্থমালোচনা	অজিতকুমার ঘোষ	২৮৫
	ধীরেন্দ্র দেবনাথ	২৮৬
	উমা রায়	২৮৭
	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	২৮৯
সম্পাদকীয়		২৯০

চি অ নু চী

আশ্ব-এদীপ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

THE HOUSE OF THE TAGORES

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ও পরিজনবর্গের পরিচয়বাহী গ্রন্থের পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ২'০০

STUDIES IN AESTHETICS

প্রবাসজীবন চৌধুরী

বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সৌন্দর্যদর্শন, নিরুপকৃত উদ্বেগ ও শিল্পানুভূতি, কীটসের সৌন্দর্যচেতনা, ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোকে প্রেটো ও অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত। মূল্য ১০'০০

TAGORE ON LITERATURE AND AESTHETICS

প্রবাসজীবন চৌধুরী

সৌন্দর্যদর্শনের আলোকে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের গভীর আলোচনা। ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত। মূল্য ৮'০০

A CRITIQUE OF THE THEORIES OF VIPARYAYA

ননীলাল সেন

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা সমস্যা হল 'বিপর্যয়'। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের তথ্যসম্মত-মাত্রেরই সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ১৫'০০

STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY

মানস রায়চৌধুরী

সঙ্গীত-শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনে স্রষ্টাধর্মের প্রভাব ও মানসিক পরিমণ্ডল বিষয়ে তথ্যবহুল বিশ্লেষণ। মূল্য ১৫'০০

INDIAN CLASSICAL DANCES

বালকৃষ্ণ মেনন

ভারতীয় নৃত্যকলায় বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ-কলা নির্দেশিত। বহু চিত্রসুচিত। মূল্য ২৫'০০

REFORM AND REGENERATION IN BENGAL, 1774-1823

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১৬'৫০

SOCIOLOGY OF PLANNING

শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১৫'৫০

রবীন্দ্র-স্মৃতিস্মিত

রবীন্দ্র-রচনার উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতিসম্ভার।

মূল্য ১২'০০

ছারকানাথ ঠাকুরের জীবনী

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ৫'৫০

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ৮'০০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

রবীন্দ্র-আলোকে মৃত্যুজিজ্ঞাসার বিশদ ব্যাখ্যা।

মূল্য ৬'০০

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পদাবলী ও রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার আলোচনা।

মূল্য ৫'০০

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিজ্ঞা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মূল্য ৩'০০

গান্ধীমানস

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন

ও নির্মলকুমার বসু

গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মূল্য ৩'০০

সঙ্গীতচলচ্চিত্রিকা

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বরলিপি-সহ মূল্যবান গ্রন্থের দুইখণ্ড একত্রে প্রকাশ। মূল্য ১৫'০০

শিল্পতত্ত্ব

বেনিডেটো ক্রোচে

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য-অনূদিত ক্রোচের 'শিল্পতত্ত্ব' ও 'শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়ের একত্রে প্রকাশ। মূল্য ১৫'০০

চৈতন্যোদয়

হরিশ্চন্দ্র সাংখ্যাল

মানবজীবনের চেতনা-উদ্বোধনের শাস্ত্রীয় পর্যালোচনা। মূল্য ২'৫০

জ্ঞানদর্পণ

হরিশ্চন্দ্র সাংখ্যাল

নীতিশাস্ত্র ও ধর্মচিন্তা এসঙ্গে তথ্যবহুল আলোচনা।

মূল্য ৩'০০

। যত্রহ ।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো কলিকাতা-২ ও ১৩৬এ বাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২২



ସାନ୍ତନୁ-ପ୍ରଦୀପ

ଗଗନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାକୁର



রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা • শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭

চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

ও

প্রীতিনমস্কার

আপনার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলাম। দুর্গতির আজ বজ্রা বয়েছে পৃথিবীতে, আমার আর বিশেষ করে নালিশ করবার নেই। নিজের সাধ্যসীমার মধ্যে প্রয়োজন সঙ্কোচ করে জীবনধারণ করবার সাধনা ভালোই—আমি তার জন্তে আনন্দে প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু এমন অপঘাত এসে পড়ে যাতে বেড়া ভেঙে যায়। মীরা^১র ছেলে নীতু^২ লাইগ্‌মিকে ছাপার কাজ শিখছিল, খবর এসেছে তাকে ক্ষয়বোগে ধরেচে। মীরাকে যেতে হচ্ছে জার্মানিতে। এই দুঃখাভিষাভের জন্তে কোনোদিকেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ঝোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়িটা ভাড়া দেবার চেষ্টা করেছিলাম। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্প্রতি একটি মোটোরি প্রেস কিনেছেন, সেইটে বসাবার জন্তে তাঁরা ওটা মাসিক চারশো টাকার ভাড়া নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে বিচার করে বললেন, জায়গাটা ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়। জমিদারী ছাড়া প্রায় আমার সমস্ত আয় বিশ্বভারতীর। সেই জন্তে শেষ কালটায় লেখার ব্যবসা ধরতে হোলো। কিন্তু এ আমার সম্পূর্ণ সহিবে না—কেন না লেখার শক্তিতে এখন আমার আর বেগ নেই—লিখতে ইচ্ছেও করে না—লেখা বেচতে আরো অপ্রবৃত্তি।

দুর্দশার কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলুম এই জন্তে, পাছে আপনি মনে করেন আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারে কোনো বিকৃতি ঘটেছে।

দৈন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ জনতার সঙ্গে মানুষকে সমানক্ষেত্রে নাবিয়ে আনে। বস্তুত তাদের চেয়ে জীবিকার স্বযোগ আমরা অধিক পেয়েছিলাম দৈবগতিক, নিজ গুণে নয়। সেইটে বুঝতে পারা ভালো—এবং বুঝতে পেলেও মনের শান্তি রক্ষা করা চাই। সকলের চেয়ে দুঃসহ দৈন্ত অন্তরের, সেইটে থেকে রক্ষা পেলেই জীবন মার্থক মনে করব।

কেদার^৩ এলে তার সঙ্গে ছবির বই ছাপানোর পরামর্শ করতে হবে। ইতি ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ মীরা। কবির কনিষ্ঠা কন্যা

২ নীতু। কবির দৌহিত্র ও মীরা দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জার্মানীতে মুদ্রাবত্ত ও প্রকাশন-শিল্প শিক্ষার্থে যান। সেখানেই ২২ আষাঢ় ১৩৩৯ সালে নীতীন্দ্রর মৃত্যু হয়

৩ কেদার। রামানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র কেদার চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুক্তিবাদ সাম্প্রতিকতার দাবি করলেও সে দাবি টেকসই নয়। যুক্তিবাদ যে এ কালের বিশেষত্ব নয়—তাই তার একালীয়ত্বের দাবি যে যথার্থ নয় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে। অন্ধ দেশের কথা নাই বা উল্লেখ করলুম, ভারতবর্ষে বৈদিক যুগেও বৈদিক যাগযজ্ঞের বিধি ও অস্পষ্ট আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিলেন ধারা তাঁরা বৈদিক সাহিত্যে ত্রাত্য নামে অভিহিত। আচার-বন্ধতা ও রীতি-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে ত্রাতাদের এই বিদ্রোহ বৈদিক যুগে যুক্তিবাদের অস্তিত্বের অসম্ভব প্রমাণ দেয়।

তার কয়েক শতাব্দী পরে বৈদিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বিদ্রোহ ভারত-ইতিহাসের এক অমূল্য অধ্যায় রচনা করেছে। যাগযজ্ঞের ও পশুবলির আধ্যাত্মিক যথার্থতার দাবি অস্বীকার ক'রে তার বিরুদ্ধে ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ ব্রাহ্মণত্বের জাতিগুলির সামাজিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ যে ভাবে রুদ্ধ ক'রে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যে বিদ্রোহ শুরু করলেন তা ভাবালুতার উপর নয়, সম্পূর্ণ ভাবে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপ্রমাণ আধির্দৈবিক কারণ দর্শিয়ে কোনো কিছু যথার্থতা প্রমাণ করবার কোনো চেষ্টা বুদ্ধদেব করেন নি। বৌদ্ধ সাধনার মধ্যে আধির্দৈবিক বা অতিপ্রাকৃত কোনো কিছু স্থান নেই। মানুষের মনকে কুহেলিকা-মুক্ত ক'রে যুক্তির পথে যুক্তির গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার এমন চেষ্টা বৌদ্ধ মতবাদের মতো আর কোনো মতবাদ করে নি।

কালে এই যুক্তিবাদের ধারা নানা ধরনের আধির্দৈবিক বালির চরের বিরুদ্ধে ক্ষীণ-শ্রোত হয়ে পড়লেও, এ ধারা কখনো লুপ্ত হয় নি ভারতবর্ষে।

উপনিষদকার বলেছেন যে, মন ও বুদ্ধি—এ সবই ব্রহ্মলাভের উপায়। অতিপ্রাকৃত পথে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ উপনিষদ স্বীকার করেন নি। ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের নাগালের বাইরে কিছা শুধু শাস্ত্রবাক্যের মাহাত্ম্যের জোরে ব্রহ্মলাভ ঘটবে—উপনিষদ এই মতও অগ্রাহ্য করেছেন। একান্তপ্রত্যয়সারং—জ্ঞান হচ্ছে নিজের আন্তঃপ্রত্যয়ের সার। বেদান্তও অগং কারণরূপে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন।

যোগবশিষ্ট-এর রচয়িতা বলেছেন—যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্তঃ তৃণমিব তাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজয়না—বালক যদি যুক্তিযুক্ত কিছু বলে তা সাদরে গ্রহণীয়, আর শয়নং ব্রহ্মা যদি যুক্তিহীন কিছু বলেন তা তৃণের মতো পরিত্যজ্য।

বৃহস্পতি বলেছেন—কেবলং শাস্ত্রমাত্রিত্য ন কর্তব্যার্থে নির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রচার্যতে। কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর ক'রে কোনো কিছু অর্থ নির্ণয় করবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই ধরনের যুক্তিহীন বিচারের পন্থা অবলম্বন করলে ধর্মহানি হয়।

যুক্তিহীনতার পথ ধরলে যে ধর্মহানির আশঙ্কা আছে, এমন অপূর্ব ও সুদীপ্ত বাক্য ভারতবর্ষের ঋষির মুখ থেকে আমরা শুনেছি। যুক্তিবাদের এর চেয়ে জোরালো সমর্থন আর কি হতে পারে?

বড় দর্শনের যুগেও যুক্তিবাদ অস্বীকৃত হয় নি। সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে যে পন্থা মীমাংসা-কার বাত্লে দিয়েছেন সে পন্থাও সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে যে

সত্য সিদ্ধান্তে পৌছানোর চারটি পৈঠা-যুক্ত একটি সোপান আছে, সেটি হচ্ছে শাস্ত্র-সন্দেহ-বিচার-সঙ্গতি— এই চারটি ধাপযুক্ত একটি সোপান। একটা কিছুকে নিয়ে তো শুরু করতে হবে সত্যের সন্ধান, তাই শুরু করতে হবে শাস্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে। শাস্ত্র আর কিছুই নয়, শাস্ত্র হচ্ছে অতীতের চেতন পুরুষদের জ্ঞানলব্ধ উপলব্ধির চ্যনিকা। মানুষের কোনো অভিজ্ঞতাই যেমন হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু নয়, ধীর মনে বিচার ক'রে সেটি গ্রহণযোগ্য কিম্বা বর্জনযোগ্য সেটি স্থির করা উচিত, শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধেও সেই একই বিচারশীল মনোভাব প্রযোজ্য। শাস্ত্রের যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু করার মানে সেই সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ ক'রে নেওয়া নয়। সেই সিদ্ধান্তটি নিয়ে শুরু করেই, তার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে বলছেন মীমাংসাকার। সন্দেহ প্রকাশ করবার উপদেশ নিয়ে শাস্ত্রকার আমাদের মনকে আগ্রত হওয়ার অন্তে আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের অলস মন অলস দেহের মতোই পরিভ্রম করতে চায় না। চিন্তাহীন গ্রহণ অথবা চিন্তাহীন বর্জন—এই আরামের পথ ধরতে পারলেই সে বেঁচে যায়। এই আলসে মনের খোরাক জুটিয়ে দেন নি শাস্ত্রকার। তিনি সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্বন্ধে শুরুতেই সন্দেহ করতে বলছেন। সন্দেহের নিরাকরণ করবার অন্তে বিচার করবার প্রস্তাব জানিয়েছেন। সিদ্ধান্তটিকে বিচার করে, সেই সিদ্ধান্ত আমাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, কিম্বা মানুষের শিকলে বেঁধে জড়নের উপাসক ক'রে তুলছে—সেটি আগ্রত মন দিয়ে বিচার ক'রে দেখো, তার পর সেই সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে কিম্বা বিচারের দ্বারা তার পরিবর্তন সাধন ক'রে কিম্বা তাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন ক'রে ও সেই হেতু তাকে বর্জন ক'রে আর একটি সিদ্ধান্তে পৌছোও। এই পথই সত্য সিদ্ধান্তে পৌছানোর পথ।

সত্য সিদ্ধান্তে পৌছবার অন্তে কিম্বা একটি সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করবার অন্তে মীমাংসাকার নির্দিষ্ট এই প্রণালী স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে যুক্তিহীন বিচারহীন মনের জড়তা নাশ ক'রে স্রোতহীন মানসিক অলাগরে স্রোত আনবার অন্তে আমাদের আহ্বান জানিয়ে গেছেন মীমাংসাকার। যুক্তিকে উপেক্ষা ক'রে কোনো কিছুকেই গ্রহণ করতে বলেন নি ভারতের যুগযুগান্তব্যাপী সাংস্কৃতিক জীবনের স্রষ্টা চিন্তানায়কের দল।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও মায়াবাদী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমকে বিচারে পরাজিত করেন। দক্ষিণভারতে শ্রুতি, পুরাণ ও আগম-বিশারদ আচার্যদের বিচারে পরাজিত ক'রে গোড়ার বৈষ্ণববাদের প্রতিষ্ঠা করেন। বারাণসীতে বিখ্যাত মায়াবাদী অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সব্বতীকে বিচারে পরাস্ত ক'রে তাঁর পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশ্বরোপলব্ধির অন্তে জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের চেয়ে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন নি চৈতন্যদেব কীর্তন গেয়ে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ বুদ্ধির দ্বারা তিনি ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন।

আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় হচ্ছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বৈদিক যুগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর চিন্তাধারার কথা বলবার প্রয়োজন কি ছিল—এই কথা কারো কারো মনে হতে পারে। প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। একটি জাতির মানস পূর্বাপর-রহিত ভূঁইফোড় নয়, তার একটি ঐতিহাসিক পরিণতির দিক আছে। ভারতীয় মানসের মধ্যে শত শতাব্দী ধরে যুক্তিবাদ বারবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে নির্বিচার গ্রহণের বিরুদ্ধে, তাই সেটি সম্বন্ধে দু'চারটি কথা না বললে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ পরম্পরা-রহিত ভূঁইফোড় বলে প্রতিপন্ন হবে। ইতিহাস সে

কথা বলে না—অতএব সেটা সত্য নয়, এবং সেই কারণেই অসঙ্গত। আরো একটি কারণ আছে। ভারতীয় চিন্তাধারায় যথো যুক্তিবাদের দ্বারা যে প্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান এটি জানা থাকা স্বকারণ। অজ্ঞানতা-প্রসূত একটি অপপ্রচার চলতি আছে—সেটি হচ্ছে এই যে ভারতীয় চিন্তাধারায় যুক্তিবাদের প্রথম সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর যুগোপই হচ্ছে ভারতের এই যুক্তিবাদের জনক। যুরোপের যুক্তিবাদের চেউ ভারতের তীরে এসে পৌঁছয়, তারই থাকার আমাদের যুক্তিবাদের জন্ম। যুরোপীয় যুক্তিবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছে আমাদের যে কোনো কাজে আসে নি এমন অল্প জাতীয়তাবাদ-হুটে কথা আমি আদবেই বলছি না, কিন্তু আমাদের ভারতীয় যুক্তিবাদের জনক যুরোপীয় যুক্তিবাদ, এই কথাটি আদবেই স্বীকার করা যায় না।

তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অনন্তসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ জ্ঞানে ও কর্মে যুক্তিবাদের অগ্নিস্পর্শ দিয়ে আমাদের দেশে নব যুগের সূচনা করলেন সেই যুগ-পুরুষ রাজা রামমোহন রায় বাইশ বৎসর বয়সে ইংরিজি শেখেন। যুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি হয় তাঁর বাইশ বৎসর বয়সের পরে। তাঁর আগেই তাঁর জীবন-দর্শন পরিণতি লাভ করেছে ও সে পরিণতি লাভে তাঁকে সহায়তা করেছিল সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী ভাষার তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। রামমোহন সংস্কৃত সাহিত্য এবং ফারসী ও আরবী সাহিত্য মনন করেছিলেন। ভারতীয় দর্শন ও আরবী যুক্তিবাদ এই দুটি রামমোহনের জীবনতত্ত্বের বনিয়াদ রচনা করেছিল, যুরোপীয় দর্শন নয়। রামমোহন শাস্ত্রকে অস্বীকার করেন নি কিংবা নির্বিচারে বর্জন করতে বলেন নি। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি বিচার ক'রে নিতে হবে এই কথা তিনি বলেছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন বেদান্তের বাংলা অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদের 'অনুষ্ঠান' নামক মূখবন্ধে রামমোহন লেখেন—'আমাদের উচিত শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্ধারিত পথের সর্বথা চেষ্টা করি; এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।'

কেনোপনিষদের ইংরিজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন শাস্ত্র ও যুক্তিকে সত্য নির্ণয়ের উপায় বলেছেন। তিনি বলেছেন—'সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বোধ হয় এই যে, শাস্ত্র ও যুক্তি এ দুয়ের কোনও একটির হস্তে আপনাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ না ক'রে উভয়ের প্রদত্ত আলোকের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক জ্ঞানকে উজ্জ্বল রাখা।'

রামমোহন তাঁর বিচার-গ্রন্থগুলিতে বৃহস্পতির এই বচনটি প্রায়ই উদ্ধৃত করেছেন—

কেবলং শাস্ত্রপ্রাপ্তিত্য ন কর্তব্যোহর্থ নির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানি প্রজায়তে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে রামমোহন যেমন তাঁর যুক্তিবাদকে দাঁড় করালেন তেমনি গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তিনি অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশের বসুদা সহরে যে গুতাঙ্গিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মতবাদের দ্বারা। সেই মতবাদের পাঁচটি মূল বক্তব্য ছিল এই—

এক) ভগবানের সঙ্গে ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট বস্তুদের কোনো সাদৃশ্য নেই। ভগবান মনুষ্যমূর্তি ধরে আবির্ভূত হন না অর্থাৎ অবতারবাদ ভ্রান্ত মত। ঐশ্বর্য আছে কিন্তু সেই গুণগুলি ঈশ্বরের সত্তার থেকে পৃথক নয়।

দুই) মানুষের সমস্ত ক্রিয়া মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছা-প্রসূত।

তিন) আবু বকর যে খলিফা হয়েছিলেন সেটি যদিও বিধিসম্মত, সেটি কিন্তু divine revelationএর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এক কথায় divine revelation মৃত্যুঞ্জিলার স্বীকার করেন নি।

চার) কোরাণ অপৌকুষের নয়। কোরাণ মানুষের সৃষ্টি।

পাঁচ) যে সব জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে ঐশ্বরিকজ্ঞাত শাস্ত্রের অধিকারী হয় নি, সে সব জাতিও জ্ঞান লাভ ক'রে তাদের কর্তব্য পালন করে।

ইসলামীয় শাস্ত্রের গোড়ামির বন্ধন ছিন্ন ক'রে এই মতবাদ বসুধা থেকে বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে সিরিয়ার ও মিশরে এই মতবাদ প্রসার লাভ করে। এমন কি স্পেন দেশেও মৃত্যুঞ্জিলা মতবাদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

রামমোহন এই মৃত্যুঞ্জিলা চিন্তা-প্রণালীর যুক্তিবাদের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। তুফৎ-উল-মুহাদ্দীন নামক যে বইটি তিনি লেখেন ফারসী ও আরবী ভাষায়, সেই বইটিতে রামমোহন যুক্তিবাদী মনোভাব নিয়ে ধর্মের বিচার করা দরকার এই মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—নানা ধর্মের অভ্যাস ও বিভিন্ন বাতাবরণের মধ্যে বাস করার ফলে ব্যক্তিদের চরিত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলির সঙ্গে তাদের অন্তর্নিহিত গুণগুলি যেগুলি জাতির কিংবা ব্যক্তির প্রকৃতিগত—তাদের মধ্যে সুগভীর পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা জাতি যে সব বিভিন্ন ধর্মীয় মতগুলি গোষণ করছে সেই সব মতগুলির স্বার্থতার নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে।

ধর্মগুলির তুলনামূলক বিচার করবার অগ্রে রামমোহন তার দেশবাসীদের ও বিশ্ববাসীদের আহ্বান জানান। ধর্মগুলির তুলনামূলক অহুসঙ্কিতসার জনক হচ্ছেন রামমোহন, শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মগুলির তুলনামূলক বিচারের পন্থা অবলম্বন করেন। রামমোহন লেখেন—‘মৃত্যুঞ্জি জাতির প্রকৃতিতে একটি অন্তর্নিহিত গুণ আছে, সেটি হচ্ছে এই—সেই গুণের বশবর্তী হয়ে যে কোনো ব্যক্তি একটি ধর্মমত গ্রহণের পূর্বে কিংবা পরে বিভিন্ন জাতিরা যে সব ধর্মমত লিপিবদ্ধ করেছে সেগুলির খোঁজ খবর নেবে ও কোনো একটি বিশেষ ধর্মমতের প্রতি কোনো বকম পক্ষপাতিত্ব না ক'রে স্বেচ্ছানিষ্ঠার সঙ্গে সব ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিচার ক'রে কোনটি সত্য, কো-টি অসত্য, কোনটি যুক্তিসম্মত আর কোনটি যুক্তিবিরুদ্ধ তার বিচার করবে।’

এই ভাবে ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলে রামমোহন সব কুসংস্কারের ও অন্ধবিশ্বাসের মূল কারণটি কি সেটি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তিনি বলেন—‘প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ অহুসঙ্কিত করবার ক্ষমতার অভাবের ফলে কুসংস্কারের জন্ম।’

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ অধিকারী ভেদের কথা তুলে থাকেন অর্থাৎ ব্যক্তির গ্রহণ-ক্ষমতার উপর ফলাফল নির্ভর করে—এ কথা তাঁরা বলেন। রামমোহন অধিকার-ভেদের কথা আংশিক ভাবে স্বীকার ক'রে বলেছেন—‘কতটা ফল দেবে সেটি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহণ-ক্ষমতার উপর নির্ভর করলেও এটি এক বিশ্বাসীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। কেউ যদি বিষকে মিষ্টান্ন মনে ক'রে খায়, সেই বিশ্বাস থাকার অগ্রে সে কি মরবে না?’

এই ভাবে প্রতিটি বিষয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধটি আবিষ্কার ক'রে সব অন্ধবিশ্বাসের ও কুসংস্কারের মূলচ্ছেদ করবার উপদেশ দিয়েছেন রামমোহন। অতিপ্রাকৃতবাদের ও অলৌকিকত্বের বিষয়ে রামমোহন

বলেছেন যে ‘মাহুয যা বুঝতে পারে না, যার হেতু সম্বন্ধে তার ধারণা নেই তাকেই সে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বলে ধরে নেয়। আসলে কিছু কার্যকাণ্ড সম্বন্ধেই দ্বারা এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু অস্ত্র বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অভিজ্ঞতার অভাবেই একটি বস্তুর হেতু অজানা থাকে। তখন কোনো কোনো ব্যক্তি বস্তুর অস্তিত্বের কার্য-কাণ্ড-সম্বন্ধ-জ্ঞান-রহিত লোকদের জুটিয়ে নেয় আপনাদের অলৌকিক শক্তির দোহাই দিয়ে।’

রামমোহন বললেন যে ‘ভগবানও অলৌকিক কিছু করতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন যে ভগবান যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি মৃতকেও প্রাণ দিতে পারেন, তিনি এই দেহকে আলোর গুণ ও বাতাসের শক্তি দিতে পারেন। এই ধরনের যুক্তি শুধু ‘হতেও পারে’ এই সম্ভাবনার কথা বলেই খালাস। এই ধরনের বাস্তব ঘটনার প্রধান দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করে না।’

এইসব কথা বলার পর রামমোহন বললেন—‘ভগবানও নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেন না। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না—যেমন ভগবান তাঁর নিজের অস্তিত্বের অভাব সৃষ্টি করতে পারেন না।’ তুফৎ-উস্-মুহাদ্দীন, যার অর্থ হচ্ছে একেশ্বরবাদীগণকে উপহার—সেই পুস্তিকার রামমোহন যুক্তির ভিত্তির উপর ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার পথ ধরবার জন্তে তাঁর দেশবাসীদের আহ্বান করেছেন। মার্যাবাদী বৈদান্তিকদের মতও তিনি যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, নিগূর্ণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম—মার্যাবাদীদের এই ব্রহ্ম-বিভাগের মতবাদে রামমোহন একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। মার্যাবাদীদের মতে অপরব্রহ্ম ‘জ্ঞানোদয়েমার্যামণীচিকাবৎ বিনাশীল’। ব্রহ্মের এই বিনাশীলতা অমুক্তিযুক্ত বলে তিনি মনে করতেন।

শঙ্করের মার্যাবাদ তিনি স্বীকার করেন নি। বেদান্তের ধারণা—‘পরমাত্মা হি সংসার মার্যায় ন সম্পৃক্ততে।’

রামমোহনের ধারণা—পৃথিবী ঈশ্বরেতে আছে তাই সত্য। ঈশ্বর থেকে পৃথক হলে অসত্য। যেমন ভগবান সত্য, তেমনি জগৎও সত্য। রামমোহনের মতে ‘মার্য’ হচ্ছে ভগবানের সৃজনীশক্তি, তাঁর সৃষ্টি। মার্য হচ্ছে ভগবানের real energy ও তাঁর ইচ্ছাশক্তি। ভগবান হচ্ছেন তাঁর ভাষায় ‘The wilful agent of creation’, সৃষ্টি তাঁর লীলা খেলা নয় কিংবা তাঁর মার্যের সৃষ্টি সম্ভাবনের তাঁর মার্যের মাজিক দেখাবার জন্তে নয়। পৃথিবী ভগবান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই ধারণা পৃথিবীকে অসত্য করে—এই ছিল রামমোহনের ধারণা। জীবন ও পৃথিবীকে রামমোহন মার্য বলে জ্ঞান করতেন না। কেন না এই পৃথিবী ভগবানের সৃষ্টি আর এই সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রকাশ। পৃথিবীর সঙ্গে ভগবানের যোগ নেই এই ধারণা হৃদ সৃষ্টি ক’রে আমাদের সব শক্তি শুকিয়ে দেয় ও সামাজিক কর্তব্য সাধন ও ভগবৎপূজা এই দুয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, ভগবানের পূজা করলে আর সামাজিক কর্তব্যের প্রয়োজন নেই—এই সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে। রামমোহন ভগবৎ-আরাধনা ও সামাজিক কর্তব্যসাধন—এই দুয়ের মধ্যে বিরোধের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

রামমোহন তাই কখনো কর্ম ত্যাগ করতে বলেন নি। এমন কি জীবের মুক্তির পক্ষেও কর্মের প্রয়োজন আছে এই কথা বলেছেন। মার্যাবাদীর মতে পৃথিবীকে ও জীবাত্মাকে দুইকে ভুলতে হবে ব্রহ্মের জন্তে। রামমোহন এটা আদর্শেই মানেন নি। সম্মানকে তিনি মুক্তির একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করেন নি।

কিন্তু শুধু ধর্মকে আচার ও রীতির জড়বন্ধন-মুক্ত ক'রে তিনি পথ নির্দেশ করেন নি, আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তিনি নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রথম প্রবক্তা। তিনি শুধু নৈব্যক্তিক চিন্তা-ধারাকে গতি দিয়ে ক্ষান্ত হন নি, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নানা দিকে গতি সঞ্চার করেছিলেন। সমাজকে জড় প্রধার অত্যাচার থেকে পরিভ্রাণ করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন টোলো শিক্ষা-প্রণালীর বদলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করবার জন্তে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড এ্যামহাষ্টকে তাঁর সুবিখ্যাত চিঠিটি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বলেন যে ব্যাকরণের নিয়মগুলি আয়ত্ত কয়ানো আর metaphysical বিচার-নিপুণতা শিক্ষা দেওয়ানো—এই দুই অত্যন্ত নিবর্থক মানব-সমাজের পক্ষে। এই সব বাদ দিয়ে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, natural science, ভূগোল ও ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁর প্রস্তাব তখন গৃহীত না হলেও, বারো চোদ্দ বছর পরে তাঁরই শিক্ষানীতি অল্পমারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২১ থেকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লেখেন 'সংবাদ-কৌমুদী'তে। ভূগোলের পুস্তিকা ও ম্যাগনেট, বেলুন, মাছদের আচরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন রামমোহন।

তাঁর আর একটি বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন লেখেন—'I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions among them, has entirely deprived them of political feeling. It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion, at least for the sake of their political advantages and Social comfort.'

এর থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে সেটি রামমোহন তাঁর যুক্তিবাদী মন দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই ভাবে বিশ্লেষণ ও যুক্তির দ্বারা আমাদের মনের বিচিত্রমুখী ধারণাগুলিকে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকত্বের কুয়াশা-মুক্ত ক'রে, জ্ঞানের নির্মল স্রোতে তাদের ধৌত ক'রে, ধর্মের সাফাই গেয়ে যে কর্ম-বিমুক্ত জড়তার পূজা আমরা করেছিলুম তার থেকে আমাদের জ্ঞান ক'রে ও অতীতের সত্য অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে আমাদের চিন্তের যোগসূত্র রক্ষা ক'রে নতুন যুগের পথে আমাদের যাত্রা শুরু করিয়ে দিয়ে রামমোহন চলে গেলেন।

তিনি চলে গেলেন বটে কিন্তু যুক্তিবাদের যে প্রবল ধারা বইয়ে দিয়ে গেলেন তাতে বাংলা দেশের যুক্তিকা থেকে অল্প জড়তার সব জঞ্জাল ভেসে চলে গেলো। একের পর এক মশালবাহী পুরুষ এলেন বাংলার অঙ্গনে, জ্ঞানের ও অমুভূতির আশ্চর্য ফসল ফললো বাংলাদেশের মানসভূমিতে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা ও এই সভার দ্বারা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সূচনা—বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এই দুটিই হচ্ছে নবযুগ-প্রবর্তনী ঘটনা। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা যথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সভ্য ছিলেন। শুধু ধর্মীয় জীবনে কুসংস্কার দূর করার ত্রুত নিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' বাংলা দেশের জীবনে আবির্ভূত হয় নি, অতিপ্রাকৃতত্বের দোহাই দিয়ে যুক্তিলেশবর্জিত যে চিন্তাধারা বাংলা দেশের জীবনে ক্ষীরমান স্রোতে বধে চলেছিল, তাকে অতিপ্রাকৃতত্বের বালুচরের পীড়ন থেকে যুক্তিবাদের বহুধার দ্বারা মুক্ত ক'রে তাকে বেগবান ক'রে তোলাও ছিল

‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্ততম অভিপ্রায়। তার সঙ্গে ভাব-জগতে যে আবিলতা ও বিকার বাঙালির জীবনকে নিবীৰ্ণ ভাবানুভূতির আবর্জনার পঙ্খিল ও অপরিচ্ছন্ন ক’রে রেখেছিল সেই আবর্জনা দূর ক’রে অহুভূতির ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রসারিত ক’রে ও বৃদ্ধি ক’রে বাঙালীর মানসকে বহুতী নৃষ্টির অগ্নি-বীজ দেওয়াও ছিল ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র শ্রেষ্ট অস্ততম উদ্দেশ্য।

‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র প্রারম্ভ থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত হন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। অক্ষয়কুমারকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ নিঃসংশয়ে বলা চলে। অগ্রধান অহুভূতির প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেন নি চিন্তার ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত অহুভূতির দোহাই দিয়ে বিচারকে ঠেকিয়ে রাখবার যে বেওরাজ বহুকাল থেকে চলে আসছিল চিন্তার জগতে, অক্ষয়কুমার কণ্ঠে দাঁড়ালেন তার বিরুদ্ধে। অহুভূতির প্রামাণ্যকে বিচারের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত করবার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্তে আত্মোপলব্ধিতে বিশ্বাসবান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মত-বিরোধ ঘটেছিল, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সত্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদের পথ থেকে মুহূর্তের জন্তেও সরে যান নি। ছুঃখের বিষয় যে এই অসাধারণ পুরুষকে বাংলা দেশ একেবারে ভুলে গিয়েছে। অগ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করলে দোষ হবে না যে অক্ষয়কুমার হচ্ছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বারো বৎসর ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পাদনা করেন অক্ষয়কুমার। বহু অসুস্থতাসামূলক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ তিনি লেখেন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র শুধু ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ থাকতো, এই একান্ত ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দূর করা উচিত ছিল বহুদিন আগে। পরিতাপের ও লজ্জার কথা যে অতীতের সাধনার সঙ্গে যোগবিযুক্ত সমকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র ও ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র অপরিমীয় দান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন বললেও চলে। তার ফলে কতীর বোকা বহন করতে হচ্ছে সমকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজকে।

১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র অক্ষয়কুমার লেখেন—‘Pure rationalism is our teacher. What ever has been discovered by Bhaskara and Aryabhatta, Newton and Laplace is also a part of our Scripture.’ খাঁটি নির্ভেজাল যুক্তিবাদ হচ্ছে আমাদের শিক্ষক। ভাস্কর, আর্যভট্ট, নিউটন ও ল্যাপ্‌স—এঁরা যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, সবই আমাদের শাস্ত্রের অন্তর্গত।

অক্ষয়কুমার শাস্ত্রের সীমানা প্রসারিত করে ছিলেন। শুধু ভারতীয় নয়, সারা পৃথিবীর যুক্তি-আশ্রয়ী আবিষ্কারকে তিনি শাস্ত্র বলে স্বীকৃতি দিলেন। যেন রাখতে হবে যে চিন্তার ক্ষেত্রে এই ছুঃসাহসিকতা গতানুগতিককে টিপে ফেলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে।

১৭৭৬ শকের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র চৈত্র সংখ্যার অক্ষয়কুমার লিখলেন—‘সমাজ ও ব্যক্তি, সমষ্টি ও ব্যক্তি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বদ্ধ। ব্যক্তি যদি দরিদ্র থাকে, অসৎ হয় তা হলে সমাজের কল্যাণ হতে পারে না।

দারিদ্র্যের সঙ্গে ব্যক্তির অসৎ হওয়ার প্রবণতার যে গভীর সম্বন্ধ আছে তার এমনই যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা অক্ষয়কুমার ক’রে গেছেন একশো বছর আগে। ব্যক্তির দারিদ্র্য না ঘোচালে যে সমাজের কল্যাণ অসম্ভব সে কথাও তিনি দীপ্তভাবে ঘোষণা করেছেন এক শতাব্দী পূর্বে।

কিন্তু এই দাবিজ্ঞা দূর হবে কি ক'রে? ভগবৎ-আরাধনার কৃপায় কিম্বা ধনৌকে মৎ হয়ে দাজাগিরির সাধনায় লিপ্ত হতে বলে? যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার একেবারেই ভাববিলাসী ছিলেন না। ১৭৭৬ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৌষ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন—'যদি প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদন বাড়বে, লোকের অভাব কমবে, অবসর পাবে, অহুসঙ্কিতসার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।'

যুক্তিবাদী সোশালিষ্ট চিন্তাধারার সার কথা অক্ষয়কুমার বলে গেছেন। অবসরকে কি তাতে কাজে লাগানো যাবে সেটি হচ্ছে গভীর চিন্তার বিষয় সমকালীন যুগে। অবসরের যে ব্যবহার সমকালীন যুগের মানুষেরা ক'রে চলেছে তাতে সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে পৃথিবী জুড়ে। অক্ষয়কুমার বলেছেন—এই অবসরকে অহুসঙ্কিতসার কাজে লাগাও। তবেই ব্যক্তির জীবনে ও সামাজিক জীবনে কল্যাণ হৃদয়প্রসারী হবে।

'ধর্মনীতি' ও 'বাহ্য বস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'—তার লেখা এই বই দুটিতে অক্ষয় কুমার দেখিয়েছেন যে ধর্ম, নীতি, স্বাস্থ্যের নিয়ম, আইন—এ সবই প্রকৃতির নিয়ম থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতির এই নিয়মগুলি জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অহুসঙ্কিতসার চাই আর এই অহুসঙ্কিতসার জন্য যুক্তিবাদ থেকে।

এই ভাবে বাইরের প্রকৃতির জগৎ ও মানুষের অন্তর-প্রকৃতির জগৎ—এই দুই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অতিপ্রাকৃতির কুয়াশা-মুক্ত ক'রে অক্ষয়কুমার বিদায় নিলেন। গভীর চাবীদেবী হুদশা সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি যে সব প্রবন্ধ লেখেন সেগুলি যেমন যুক্তিপূর্ণ, ভাবানুভূতি-বর্জিত তেমন গভীর মানবপ্রেমের নিদর্শক।

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন অসাধারণ ও অতুলনীয় পুরুষ হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। তিনি ছিলেন একাধারে বহুগুণ সমন্বিত পুরুষ—যুক্তিবাদী, গভীর মানবহৃদয়ী ও অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ। এই তিনটি চারিত্রিক গুণের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে বলে আমার ধারণা। তার ব্যাখ্যা করার প্রলোভন আপাতত সম্বরণ করা গেলো।

কোনো বস্তুর যথার্থতা প্রমাণের জন্যে সেই বস্তু সম্বন্ধে কোনো একটি শাস্ত্র কি বলেছে তার উদ্ধৃতিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় একমাত্র যুক্তি বলে গ্রাহ্য করেন নি। শাস্ত্র কি বলেছে সেটি নিশ্চয় জানতে হবে কিন্তু জানা মানেই তাকে স্বীকার করা নয়। শাস্ত্র-বাক্যকে বিচার ক'রে দেখতে হবে। এ বিষয়ে তিনি একান্তভাবে রামমোহনের অহুগামী।

ডাক্তার ব্যালান্টাইন্ শিকাসংক্রান্ত বিষয়ে যে রিপোর্ট দেন সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শিক্কা-পরিষদকে যে লিখিত মন্তব্য দেন তাতে লেখেন—'বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন এ সম্বন্ধে এখন আর মতবৈধ নাই। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধতি যে ভালো এ কথা ডাঃ ব্যালান্টাইন্ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠ্যের ফলে 'সত্য বিবিধ'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে লোক সংস্কৃত ও ইংরেজি—এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুঝিমানের মতো পাঠ করিয়াছে, বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এ ভয় জন্মিবার কোনো কারণ নাই। যে যথার্থ রূপে ধারণা করিয়াছে তাহার কাছে সত্য—সত্যই। 'সত্য দুই বকমের' এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল।

ডাঃ ব্যালাটাইন্ বলেন—‘হিন্দু ধর্মাত্মিক আলোচনা যে সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতার বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে।’ হুঃখের বিষয় এই বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাটাইনের সহিত অঙ্গমত। ‘আমার মনে হয় না, আমরা সকল আয়গার হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল যুগোপীয়া বিজ্ঞানের তথ্য সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা হুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোনো নতুন ভাব—এমন কি তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহাবই পরিবর্তিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায় তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অস্বভাবের আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।’

বেদান্ত ব্রাহ্ম কিংবা অত্রান্ত তার বিচার এই বক্তৃতার বিষয় নয়। আমি শুধু এইটেই দেখাতে চাই যে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত সম্বন্ধে চলুতি সত্যকে তাঁর ধারণা অল্পসারে বাতিল করিতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর তাই শত্ৰুচন্দ্রকে বিভাগাগর মহাশয় লেখেন—‘আমি দেশাচারের নিত্যস্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের স্বকলের জন্য বাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহাই করিব।’

করলেনও তিনি তাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-পুনর্গঠন সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করলেন গভর্নমেন্টের কাছে তাতে পাঠপ্রণালীর পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জোর দিলেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, তার অন্ত্রে বাংলা ভাষায় নানা ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা দরকার আর ইংরিজিও শেখাতে হবে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর আশ্চর্য মিল আছে রামমোহনের শিক্ষানীতিক ধারণার সঙ্গে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কায়স্থ ছেলেবা ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সব জাতের হিন্দু ছেলেবা বিভাগাগর মহাশয়ের কৃপায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অধিকার পেলো। জাতের সংকীর্ণ গতি ভেঙ্গে দিলেন তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে। কম বাধা তাঁকে পেতে হয় নি অতীত-মুখো কুসংস্কারবদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে বিভাগাগর মহাশয় শুধু শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করেন নি, নিজের যুক্তিও দর্শিয়ে ছিলেন। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বিভাগাগর মহাশয়ের লেখা ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা’ এই প্রবন্ধ ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র সংশয়বাদী (agnostic) তো ছিলেনই, মনে হয় যে তিনি নাস্তিকতার দিকে খুঁকে পড়েছিলেন। যুক্তিবাদ তাঁর বলিষ্ঠ সমর্থনে দৃষ্ট পথে এগিয়ে গেলো বাংলার।

ধর্ম জগতের বাসিন্দারা উপলব্ধির উপর কোঁক দেন বলে, তাঁদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা যে তাঁরা যুক্তিবাদী হন না। আর এই ধারণা যে একেবারে অহেতুক তাও নয়। তাই একজন ধর্ম-পথের পথিকের যুক্তিবাদ সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল সেটি জানলে আমাদের উপকারই হবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ও তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। তিনি ধর্মসাধনার একান্তভাবে নিবেদিত ছিলেন ও তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, শুধু বাংলার কিংবা ভারতের নয়, পৃথিবীরও—এই খ্যাতির অধিকারী ছিলেন তিনি। ঈশ্বরের ধ্যানে ও উপাসনায় তিনি বিভোর হয়ে থাকলেও, ধর্মের ভিত্তি অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত ভাবে—এ তিনি আদর্শেই স্বীকার করতেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে তিনি ‘Am I an inspired prophet’ বলে ইংরিজি ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন—‘I accept no truth unless it be such as can be demonstrated. Religion must have as

strong and sound a basis of evidence as Euclid and Mathematics, otherwise it cannot be acceptable...If there is any thing in my church which is opposed to science, I wish rather that my church should perish and the cherished creed of my life than science would perish...I will give up all my mysticism, my daily communion with God, my asceticism, my philosophy, if it can be proved that these are opposed to science, and contrary to the revelations of nature.'

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে লেখা 'An epistle to fellow-Indians' প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র লেখেন—'Ye shall respect science above all things, the science of matter above the Vedas, and the science of mind above the Bible. Astronomy and geology, anatomy and physiology, botany and chemistry are the living scriptures of nature's God. Philosophy, logic and ethics, Yoga, inspiration and prayer are scriptures of the soul's God. In the new faith every thing is scientific.'

এই ভাবে ধর্মকে ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে, প্রমাণের উপর, বিশ্বাসের উপর নয়, যুক্তির উপর, নিছক অহুত্বের উপর নয়, বৈজ্ঞানিক অহুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আহ্বান করেন কেশবচন্দ্র। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও যুক্তিবাদের সমর্থনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ১২৯১ সালের প্রাবণ সংখ্যায় 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' নামক প্রবন্ধে লিখলেন—'গুরু—আমি কোনো ধর্মকেই ঈশ্বরের প্রণীত বা অভ্যাস্ত ঋষি-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করি না। সকল ধর্মেই অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা আছে মানি। কিন্তু ধর্ম মাঝেই যে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই ইহা স্বীকার করি না। তাহা বলিলে মনুষ্যবুদ্ধির অহুচিত অবমাননা করা হয়। বস্তুত সকল ধর্মেই কিছু মিথ্যা কিছু ভ্রম আছে। আবার সকল ধর্মেই কিছু সত্য আছে। কেহই একেবারে সত্য, একেবারেই মিথ্যা নহে। একেবারে মিথ্যা এমন কোনো ধর্ম যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, এবং তদ্বারা মনুষ্যের কোনো উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই।

শিষ্য—আমার বড় আপত্তি এই যে, ধর্ম মাঝেই যদি ভ্রম এবং মিথ্যার সংশ্লিষ্ট আছে, তবে কোনো ধর্মই অবলম্বনীয় হয় না। কেন না মিথ্যা মাঝেই অনিষ্ট আছে।

গুরু—এই জন্য সকল ধর্মের সংস্কার আবশ্যিক। যে ধর্মই অবলম্বন করো তাহার সংস্কার পূর্বক, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক, তদন্তর্গত সত্যকে উদ্ধার করিবে।

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকায় 'হিন্দুধর্ম' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—'বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা নিখিতেছি না।...যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবুও অসত্য, অধর্ম বলিয়া পরিহার্য।...তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু মার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম, সেইটুকু অহুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। প্রথম জিজ্ঞাসা হিন্দু ধর্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক বকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে 'সত্য সত্য' বলে, হাই তুলিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দু ধর্ম? অমুক শিরবে শুইতে নাই, অমুক আশ্রয় খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বাবে কোঁরী হইতে নাই, অমুক বাবে অমুক

কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম ?... যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাহি না।'

উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের আলোকে বাঙালি যখন শাস্ত্রগুলিকে যাচিরে দেখতে শুরু করেছিল, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তখন শাস্ত্রে যা কিছু উল্লিখিত আছে তা নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে, এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। আলসে মনের মাহুবদের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি কম হয় নি সে সময়। যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত গ্রহণযোগ্য নয় বলেন। 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের ফুটনোটে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাঁহার কোনো কথার প্রতিবাদ করিলাম না।'

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-ভিত্তিক মনোভাব সম্বন্ধে নানাভাবে নানা কথা নানা সময়ে বলেছেন। তাঁর জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ও তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। যে পথ ধরে বৈজ্ঞানিকের যাত্রা সে সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র 'বিজ্ঞান সাহিত্য' নামক তাঁর প্রবন্ধে লেখেন—'বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বস্তুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এইজগ্রে মনের কথা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনো মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।'

'নিবেদন' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—'বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জগ্রে অনেক সাধনার আবশ্যক।'

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মর্ম বোঝবার জগ্রেই আচার্য জগদীশচন্দ্রের দুটি লেখা থেকে এই অংশগুলি উদ্ধৃত করেছি। বাইরের বস্তুর ও নিজের মনের বস্তুর কঠোর পরীক্ষা করতে হবে, নিজের মনের কোঁক বস্তুর উপর আরোপ ক'রে কোনো কিছুর বিচার করা চলবে না। এ পথে ভুল অনিবার্য।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের Royal Society of Arts এ বক্তৃতাকালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বলেন—
'Believing that the prosperity of my country depends in a great measure on the spread of scientific education and the practical application of science I shall in this paper put forward a few suggestions...so that the above-mentioned object could be attained.'

এই বলে তিনি বিজ্ঞানকে কি ভাবে সহজ ক'রে যুনিভার্সিটিতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, কি ভাবে তার প্রচারের ব্যবস্থা হতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে তিনি বলেন—'We want to train our students to think accurately and to fix in their minds a few fundamental principles. We want to teach them...how to observe and how to avoid errors. We would wish them, as far as possible to find out things for themselves, and take very little on trust,

এই অল্প কয়েকটি কথার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

খুঁতিয়ে নিভূর্ণ চিন্তা করতে শেখা, কণ্ঠকণ্ঠলো বনিয়াদী নিয়ম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করা, মন দিয়ে দেখতে শেখা, আর অন্তরের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে নিজে অনুসন্ধান করে জানা—এই হ'ল বৈজ্ঞানিক মনোভাবের মাপকাটি।

বিজ্ঞানের শিক্ষা কি ভাবে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে ১৩১২ সালে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন। জগদীশচন্দ্র তার উত্তরে বলেন— 'আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞানচর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই।...তাহার জন্তে দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যপ্ত হওয়া চাই। ছাত্ররা যাহাতে...প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।'

বিজ্ঞানদৃষ্টি চালনার চর্চা ছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির ও অন্তরপ্রকৃতির বহুস্তর সন্ধান মেলা অসম্ভব এই হুঁশিয়ারী তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও বিজ্ঞানের পথে যাত্রা করতে আমাদের ডাক দিয়েছেন। ১৩২৯ সালে লেখা 'বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়' প্রবন্ধে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতার সম্বন্ধে তিনি লিখছেন— 'সভ্যতার মূলমন্ত্র হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার পূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের সুখ ও সম্ভোগে নিযুক্ত করা।'

ভারতের ভাগের পন্থাকে যারা বিজ্ঞানমূলক সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর খেলা খেলে আমাদের বাধা দেয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করবার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে, তাদের কঠিন সত্য কথা শুনিয়াছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি বলেছেন— 'ভাগের পন্থা অবশ্য আধ্যাত্মিক হিসাবে উচ্চ পন্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু ভোগের ক্ষমতার অভাবে যে ভাগ সেই সে ভাগকে তো সাত্বিক ভাগ বলা যাইতে পারে না।'

তিনি বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা জাতি গঠনের কার্যে কিছুতেই ফললাভ করিতে পারিব না।'

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'ব্রহ্ম-পরীক্ষা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখছেন— 'বর্তমান কালে জগতে বিজ্ঞানের যে রূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদের বিজ্ঞান-জ্ঞান সামান্য ছিল। তবে ইহা স্বীকার্য যে যখন যুরোপ তমসাক্ষর ছিল তৎকালের পক্ষে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল গৌরবজনক। প্রাচীন কালে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে কুসংস্কার এবং কবিকল্পনার রাজত্বও বিস্তৃত হইয়াছিল।'

যুক্তিবাদীর সত্যনিষ্ঠার অপূর্ব পরিচয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই উক্তি। জাতীয়তাবাদীদের অতিশয় উক্তির ও অজ্ঞ মিথ্যা রচনার ধার দিয়েও তিনি যান নি। যেখানে ভারতবর্ষের সত্য প্রশংসা প্রাপ্য সেখানে সত্য প্রশংসা করেছেন, আর যেখানে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির তুলনায় তার জ্ঞান সীমিত ছিল, তার ঐতিহাসিক কারণ দর্শিয়ে তিনি আমাদের সত্য বিচারের পথ দর্শিয়েছেন।

তিনি আরো বলেছেন যে, 'পূর্বপুরুষদের অধুনা-বিলুপ্ত বাহাদুরীর বড়াই করিয়া আর বেদবেদান্ত উপনিষদের দোহাই পাড়িয়া জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, দারিদ্র্যও দূর হইবে না।'

বেদবেদান্ত উপনিষদকে আচার্য প্রমুখচন্দ্র আদর্শেই অবজ্ঞা করে নি, এগুলির দোহাই পেড়ে যারা যুক্তির পথ, বিচারের পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়ায়, ভারতের অগ্রগতির পথ-রুদ্ধকারী তাদের নিবু'দ্ধি বাচালতাকে তিনি কমা করেন নি।

১৩৪২ সালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন সেই ভাষণের এক জায়গায় তিনি বলেন—‘মানুষ শু' কবি নয়। বিশ্বলোকের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে।’ এই বিচিত্র প্রবর্তনার সাড়া দিতে গেলে প্রতিটি বিষয়কে জানবার প্রয়োজন আছে। আর এই বিষয়কে জানা সম্ভব নয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব ছাড়া। কাব্যের জগতে যে মহাকবি ভাব ও রস বর্জিত তৃপ্তীকৃত তথ্য-সম্মল কবিতাকে কবিতা বলে স্বীকৃতি দেন নি, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে, জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে তিনি বিশ্লেষণ-বিমূখ, অতীতের সিদ্ধান্তগুলিকে নির্বিচারে গ্রহণেচ্ছু মনোভাবকে বীৰহীন ও জড়তাবদ্ধ বলে কঠোর ভাবে ভঙ্গনা করেছেন।

শাস্ত্রের দোহাই দিবে দেশকে অচলাব্রতনের মধ্যে বন্দী ক'রে পচিয়ে তোলা যেমন সমস্ত কাজ নয়, তেমনি ভাবানুভাব উদ্ধামতা দিবে দেশকে ঠেলে নর্দামার নামিয়ে দেওয়া ও কল্যাণের পরিপন্থী। যেখানে স্বন্দেহের সাধনা সেখানে যেমন ভাবের আরাধনা, যেখানে কল্যাণের সাধনা সেখানে তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধির, বিশ্লেষণ ও বিচার শক্তির ব্যবহার। এই কথা রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে শতবার আমাদের জানিয়েছেন।

শাস্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি, কিন্তু বিচার ক'রে নিতে বলেছেন। এখানে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে স্বামনোহন-পরী। শাস্ত্রগুলির শিক্ষার যেখানে গতির নির্দেশ আছে সেগুলি তিনি গ্রহণ করেছেন, যেখানে শাস্ত্র-বাক্য মানুষের মনকে গতিহারা করে দিবে নিশ্চলতা'র বিকারগ্রস্ত করেছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ সেই সব শাস্ত্র-বাক্যের যথার্থতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। কি ধর্মের স্বরূপ বিচারে, কি সমাজের নানা আচার ও রীতির বিচারে রবীন্দ্রনাথ কোনো কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কি বস্তু, ত্যাগের আসল মর্ম কি, পাপের উৎস কি, কর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কি পবম্পর-বিরোধী শক্তি—বর্ষ-সংক্রান্ত এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যুক্তির পন্থা অনুসরণ ক'রে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক সমস্যাগুলির সমাধান বাতলেছেন তিনি যুক্তির অবতারণা ক'রে ও যুক্তিদানের পথ ধরতে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—‘এ কথা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেলে হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতেই দূর হতে পারে না। মানুষের জ্ঞান এগিয়ে চলবে না, কেবল তার কবাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতো বড় কুলিগিরির সাধনা আর নেই।’

মানুষের যে জ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে চলতে বলেছেন সেটি কোন জ্ঞান? সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের জ্ঞান, বিশ্লেষণ-ভিত্তিক জ্ঞান, যুক্তির ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান।

১৩১৫ সালে শাস্তিনিকেতনের শিক্ষক ভূপেনচন্দ্র বসুকে রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি চিঠিতে তাঁকে চাষীদের নতুন নতুন ফসল ফলাবার জন্যে উৎসাহ দিতে বলেছেন। মাছাতার আমল থেকে তারা যে ফসল কলিরে আসছে তার থেকে একচুলও এদিক ওদিক হওয়ার প্রবৃত্তি তাদের নেই, এই জড় বুদ্ধির বন্ধন থেকে তাদের মনকে মুক্ত ক'রে দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—‘কৃষি-বিজ্ঞানের উপদেশ মতো চেষ্টা করিবে।’

এটা বলাই বাহুল্য যে যেখানে বিজ্ঞান সেখানেই বিশ্লেষণ ও বিচার, সেখানেই যুক্তির অনুপ্রবেশ।

ত্রিনিদেডের বার্ষিক অধিবেশনে গ্রামের কর্মীদের সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন—‘দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ একে দূর করে জ্ঞান-বিজ্ঞান কি পল্লী, কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত, প্রেত, ওঝা, তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, নিরানন্দ নিরে, তাদের অন্ধে শিক্ষার একটুখানি যে কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি।’

এখানেও গ্রামে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনকে বিচারশীল ক'রে তুলতে হবে, তা হলেই ভূত প্রেত ওঝা, অশিক্ষা সব দূর হয়ে যাবে। যা তা কিছু অশ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করলে চলবে না। তাতে আছে শুধু গ্রামবাসীদের প্রতি অসম্মান। গ্রামবাসীদের মন আগিয়ে তুলতে পারলেই প্রকৃত কাজ করা হবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গ্রামা-স্বর্জের যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথ বীজরূপে বাঙালির মনে বপন করেন তার মধ্যে গ্রামের মানুষদের চেতনাকে উদ্ধৃত করার কথা ছিল। সেই উদ্ধৃত যুক্তির পথ ছাড়া আর কোনো উপায়ে চিরস্থায়ী হতে পারে না মানুষের মনে। শুধু ভাবপ্রবণতা ও সাময়িক উত্তেজনার উপর আশ্রয় নিলে সেই উদ্ধৃত কপূর্বের মতো উবে যাবে, যেমন ঘটেছে এ কালে।

সম্ভার প্রণালীর প্রবর্তনের দ্বারা ও গ্রামাঞ্চলে intensive cultivation প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা ক'রে কৃষি-অর্থনীতির পরিবর্তন সাধনের মহতী সম্ভাবনার কথা চাষীদের বুঝিয়ে দেওয়ার অন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। বিচার-বুদ্ধির বাণ ভাকাও দেশের মধ্যে তাতে অতীতের স্বাতন্ত্র্য-জড়ত্বের কচুরীপানা ভেসে চলে যাবেই যাবে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ধারণা।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অসামান্য যুক্তিবাদী ও ক্রান্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে অর্ধশতাব্দীরও আগে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন তাদের নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা বন্ধা করবার ও তাদের অভাব অভিযোগগুলির কথা শিক্ষকমণ্ডলীর সভায় আলোচনা করবার। অধুনা ছাত্রদের অধিকারের ক্রাঘ্যদাবি বিকৃতি ও অসংযমের আতিশয্যে তার যথার্থতাকে হ্রাস করেছে ও সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে মনে। সংঘম যে দুর্বলতার লক্ষণ এ ভুল কেমন ক'রে বাংলার তরুণদের পেয়ে বসলো তা জানি নে। শিক্ষকগোষ্ঠীর বিচারহীন উদ্ধৃত মনোভাবও যে আংশিক ভাবে এই বিকৃতি ও অসংযমের অন্ধে দায়ী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শান্তিনিকেতন বিজ্ঞানতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থার অন্ধে রবীন্দ্রনাথ উঠে পড়ে লেগেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুক্তিবাদী ও বিচারশীল মন নিয়ে তিনি ভারতের ও বিশ্বের সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা ক'রে গেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অসামান্য শক্তির পথিক পুরুষদের মধ্যে শেষ পথিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর পরে তাঁর জন্ম, ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামীজির যুক্তিবাদী বিচারশীল মনের খবর দেশবাসীরা অল্পই রেখে থাকেন। যেখানে তিনি আত্ম-সম্মানহারা জাতির আত্মসম্মান আগানোর অন্ধে অতীত ভারতের উজ্জ্বলিত অরণ্যে গমন করেছেন শুধু সেইটুকুই তাঁরা জানেন। এই অজ্ঞানতার অন্ধে দেশের লোক দায়ী নন, দায়ী হচ্ছেন পরিবেশকের দল। যে কোনো বীর্যবান ব্যক্তির মতো স্বামীজির মধ্যেও প্রবল বিরোধ ছিল, নানা ধারণার সংঘর্ষ ছিল। তাঁর চরিত্রের ও ধারণার বিচিত্র প্রকাশকে খর্ব ক'রে দাঁড়া তাঁর একপেশে পরিচয় দিয়ে তাঁকে তাঁদের গোষ্ঠীর কাছে লাগান, তাঁরা স্বামীজির প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি অবিচার করেন।

দেশের স্বাস্থ্যসাধকরাই জড়তার আবহাওয়ায় স্বামীজি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এদের অল্প মনের জড়তা ঘোচাতে গেলে আঘাত হানতে হবে এদের ধারণাগুলির বুকে। হয়তো তাতে এদের মনের নিশ্চল নিশ্চয়তা নাড়া খাবে, এরা ভেগে উঠে ভাবতে শুরু করবে। যুক্তিবাদের প্রেচ্ছার সমর্থনে স্বামীজি বলেন—‘কোনো একজনের কথায় কোটি দেবদেবতার অল্প বিশ্বাস রাখার চেয়ে যুক্তি ও বিচার অহুসরণ করে সমস্ত মানব-সমাজ নাস্তিক হয়ে যায় সেও ভালো।’ যুক্তিবাদের এর চেয়ে জোরালো সমর্থন আর কি হতে পারে ?

স্বামীজি অলৌকিকত্বের চমুতি মহিমা উপেক্ষা ক’রে বললেন—‘জীবনের দরজা প্রত্যেকের অগ্রে খুলে ধরে বর্ণের একচেটিয়া স্বযোগগুলি নষ্ট করে কিছু লোকের মূঠোর মধ্যে যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য লুকোনো আছে সেগুলি সহজে আলোচনা শুরু করে দিয়ে ভূতবাদ (materialism) এক অর্থে ভারতের জাণের কাজে এসেছে।’

যে লোক ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন নয় সে লোক যথার্থ যুক্তিবাদী নয়। ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজি ভারতের জীবনে ভূতবাদের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। ভূতবাদ না এলে, আধ্যাত্মিক মতবাদের সঙ্গে ভূতবাদের দ্বন্দ্ব না শুরু হলে আলোচনা শুরু হবে কি ক’রে ? আর আলোচনা ছাড়া বস্তুর স্বরূপের সন্ধানই বা কি ক’রে পাওয়া যাবে ? মেকী আধ্যাত্মিকতাকে নির্মম বিক্রপ ক’রে তিনি বলেন—‘মাংসাধারে আধ্যাত্মিকতা নষ্ট নয় এমন আধ্যাত্মিক দেশে ক’জন আছেন ?’

কর্ম-বিমুক্ততা ধারা আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন বলে জাহির করেন সেই কাপুরুষদের ভৎসনা ক’রে স্বামীজি বললেন—‘এই জগতের ঘূর্ণায়মান চাকা থেকে পালিয়ে যেও না। এর ভিতরে এসে দাঁড়াও, কাজের বহুস্ত আরম্ভ করো।’ পলায়নী বৃত্তির অনাধ্যাত্মিকতাকে এই ভাবে নির্মম আঘাত হেনেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্তে, দারিদ্র্য দূর করবার জন্তে কৃষি-প্রধান ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়।

জাতীয়তাবাদীরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সত্যসন্ধান না জেনেও তার নিন্দায় পক্ষমুখ ছিলেন, আজও আছেন। সেই অজ্ঞদের কান মলে দিয়ে স্বামীজি বললেন—‘পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সাদরে আহ্বান করিতে হইবে। অবজ্ঞা করবো না তাকে, কেন না অবজ্ঞা বর্বরোচিত।’ ধর্মিয়ে দিলেন তিনি জাতীয়তাবাদীর মূর্থতার তাসের ঘর। জিজ্ঞেস করলেন তাদের—‘হিন্দু ধর্ম লইয়া এ্যামেরিকার সমাজ গড়িতে পারো ?’

এ্যামেরিকায় যে প্রাণ-উচ্ছলতা, নয়া সমাজ গড়বার জন্তে সেখানকার যাহুযুদের যে অশ্রান্ত সাধনা, তার প্রতি স্বামীজির শ্রদ্ধা ছিল। জাতির অজ্ঞতায় শতবিভক্ত ভারতবাসী শক্তিহীন ও জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিল। স্বামীজি জানতেন যে এই ধণ্ডিত, গতিহীন সমাজ ব্যবস্থায় নতুন কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর মুখে কাল তার যবনিকা ফেলে দিল। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের শেষ যুক্তিবাদী, স্বামী বিবেকানন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ১৯০২ সালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের যে তিনজন বিজ্ঞানবিদ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, মানব-সমাজ সম্বন্ধে তাঁদের কি ধারণা তার সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বর্তমান আলোচনা শেষ করবো। প্রথমে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মতামত উল্লেখ করি। উক্তর প্রদেশের বিজ্ঞান

এ্যাকাডেমীর ১৯৩২ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সাহা বলেন—‘Before the great world war, the politician was at the stage where the physicist found himself before the time of Archimedes, or better still, in the day of Homer and Hesiod. His country was his Olympus, his own people were his gods, all others were demon, barbarians fit only to be secured against the stroke of the sword or exploited as helots...olympian attitude towards other nations must be forsaken, the present faulty system of education which seeks to perpetuate the mediaval mind must be eschewed. The humanising influence of science must get a large scope...The politicians should hand over many of his functions to an international board of trained Scientists...who will think in terms of the whole world as a unit.’

অধ্যাপক সাহা মতে জাতীয়তাবাদ, মধ্যযুগীয় মনের অস্তিত্ব ও যুক্তিবাদের অভাব - এরাই হচ্ছে পৃথিবীর নানা অশান্তির জন্ম দায়ী। তিনি বলছেন—প্রকৃত বিজ্ঞানী যে বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকে তার কারণ হচ্ছে যে সে সেই মূল সূত্র অথবা নীতি অবলম্বন ক’রে মানব সমৃদ্ধির সৌধ রচনা করা যায়।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যুক্তির পথ ছাড়া এই বিশ্লেষণ কোনো মতেই সম্ভব নয় ও মূলনীতিতে পৌঁছনোও অসম্ভব। অধ্যাপক সাহা বলছেন—‘বিজ্ঞানীর এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে শুধু ধর্মশাস্ত্র চর্চা করে সেটা কখনো হবে না। প্রেরণা ও শক্তির জন্মে নিভুতে তার জীবনদেবতার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তার অহুস্কার ও চর্চা করবার প্রয়োজন আছে মানুষের, কিন্তু মানুষ যখন কাজে নামবে তখন সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ মন নিয়ে নামতে হবে অর্থাৎ বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে একেবারেই চলবে না।’

আমরা আগেই দেখেছি যে অধ্যাপক সাহা মতে বিজ্ঞানের পথ হচ্ছে বিশ্লেষণের পথ ও যুক্তিবাদের পথ। মেঘনাদ বলছেন—‘দড়িকে সাপ কল্পনা করলে চলবে না, কল্পনা দিয়ে সব কিছুর অস্তিত্ব ‘নাস্তি’ বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, যদি ‘নাস্তি’ বলে উড়িয়ে দিই তা হলে মানুষের বোম্ব অনাহার প্রভৃতির দুঃখ কখনো দূর হবে না।’

নিছক কল্পনার পথ ধরে মানুষকে সামাজিক ও অর্থনীতিক নিষেধনের জাঁতাকল থেকে জ্ঞান করা চলবে না। যুক্তিবাদের পথ ধরে সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থারও প্রচলিত ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ক’রে অশান্তির ও নিষেধনের মূল কারণটি বের করতে হবে তবেই মানুষ পরিজ্ঞান পাবে।

বহুবিজ্ঞান মন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেন—‘প্রকৃতির নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করবার শক্তি মানুষের আছে। সত্য আছে, কিন্তু সেই সত্যকে অহুস্কার ও পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করতে হবে ও তার ফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বৈজ্ঞানিকের ধারণা হচ্ছে এই যে সব আবিষ্কার ও ফলাফল সাময়িক ধাঁচের। এই কারণে যারা সেই সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয় তাদের মতামতও পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তাতে যদি নিজের সিদ্ধান্ত ভেঙে যায় তো যাক, বদল করতে হয় তো হোক।’

দেবেন্দ্রমোহন পরীক্ষার পথে ও বিশ্লেষণের পথে প্রকৃতির নিয়মগুলিরও সত্যের অহুস্কার করতে বলেছেন। যুক্তিবাদী সহিষ্ণু হবে, উদার হবে কেন না সে যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে, নিজের গোঁড়ামির

নয়। যে গোড়া সে যে শুধু যুক্তিবাদী নয় তা নয়, সে আসলে মানবতাবাদীও নয়। দেবেন্দ্রমোহনের মতে ধর্মের উৎপত্তি মানুষের অবচেতন লোকে যেখানে প্রতীক (symbol) তৈরির উৎস রয়েছে। এই প্রতীকগুলি যুক্তির মশলা দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হৃদয়বেগ দিয়ে। তাই ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির বলি হয়েছে। গোড়ামি বহুলাংশে দেখা দিয়েছে। আচারবদ্ধতা ও আনুষ্ঠানিকতা সত্যসন্ধানের বাধা হয়েছে।

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ধর্মের ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্র এই যুক্তিবাদী মন নিয়ে অবস্থার ও নীতির বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে। চরম দৈন্ত্য সত্যসন্ধানী যুক্তিবাদী মনের সমকালীন যুগে। অন্ধ অন্ধ গোড়ামি আজ যুক্তিকে নির্ধাসিত করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক সত্যেন বসু বলেন—‘বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধ্যাত্মবাদীদের বোধ হয় এই বকম মনোভাব যে বিজ্ঞানীরা বেলাগাড়ি চালিয়েছে, কালিখুলি মেখে কয়লা ভেঙ্গে প্রকৃতির কাছ থেকে কিছু শক্তি সংগ্রহ করেছে, কিন্তু তাতে সভ্যতার বহিরঙ্গের রূপ কতকটা বদল হয়েছে কিন্তু এ সব নিয়ে যেতে থেকে বিজ্ঞানীরা হারিয়েছে দার্শনিকের মনোভাব। কিন্তু এটা ঠিক নয়। সৃষ্টির বহুস্তর বুঝতে মানুষ সব সময়ই চেষ্টা করে এসেছে, বিজ্ঞানীরাও ক’রে থাকেন।’

সত্যেন্দ্রনাথের মতে বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশই উপরের দিকে চলেছে, তার সভ্যতা ক্রমশই উর্ধ্বপথে চলেছে। তাই নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করলে মানুষের জয়যথ এগোবে না। প্রকৃতির ভাঙার থেকে সংগ্রহ-করা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানব-সভ্যতাকে। যদি শুধু দর্শন শাস্ত্রের বোহাই দিয়ে আমরা ভাবি যে সব হিংসা-দ্বন্দ্ব বিসর্জন দিয়ে আমরা সারা জীবন কাটাতে পারবো, তা হলে আমাদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সেটা অলীক কল্পনামাত্র। পরাতন ভারতবর্ষের ঘরোয়ানা জিনিস কিন্তু ভারতবর্ষের কোনোকালে দ্বন্দ্ব-হিংসা সংঘাতের বিরাম নেই। দারিদ্র্য অজ্ঞতা, অত্যাচার ও অবিচারকে সারা বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ব্রহ্ম সত্য, অগৎ মিথ্যা বলে একগুলোকে এড়িয়ে গেলেও চলবে না। বিজ্ঞানীর ধারণা হচ্ছে এই যে, মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন সে চেষ্টা করবে এই সব ক্লেশ মানুষের জীবন থেকে মুছে দিতে ও এমন সমাজ গড়তে যাতে এদের অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষ যে মানুষকে বিশেষভাবে সম্মান ক’রে এসেছে এতকাল, তা মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের পথ ধরে মানুষ সবে মাত্র সেই পথে যাত্রা শুরু করেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে তার ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিংশ শতাব্দীর বার্ষিক্যের যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশের জীবনে প্রায় দুশো বছর ধরে যুক্তিবাদের যে ধারা বয়ে চলেছে—কখনো প্রবল জোয়ারে বাঙালির চিন্তাকে, তার মানসকে প্রাণিত করে, কখনো বা গোড়ামির বালিতে চাপা পড়ে ক্ষীণ ধারায়, তাই একটা ধারাবাহিক পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করেছি এই আলোচনায়। এই বিরাট ধারাকে একটি বক্তৃতার বীধ দিয়ে ধরে দেওয়ার চেষ্টা যদি সফল না হয়ে থাকে, সেই ধারাকে যথায় যাতে প্রকাশ করতে যদি না পেরে থাকি তো তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী আমি, দায়ী আমার শক্তির অভাব, দায়ী নয় বাংলার এই প্রাণদায়িনী মনের ভ্রমোনাশিনী যুক্তিবাদের ধারা।

ভাস্করের ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদ

রমা চৌধুরী

ভারতবর্ষে ভাস্কর নামে বহু মনীষী গ্রন্থকারের আবির্ভাব হয়েছে। তন্মধ্যে বৈদাস্তিক ভাস্করাচার্য জ্যোতিষী ভাস্করাচার্যের পূর্বপুরুষ এবং 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'কার ভাস্করাচার্যের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে বৃষ্ঠ রূপে প্রখ্যাত^১। তাঁর পিতার নাম জিবিক্রম এবং তিনি শাণ্ডিল্য বংশ জাত ছিলেন। তিনি 'কবি-চক্রবর্তী' বা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠরূপে অশেষ সম্মানান্বিত ছিলেন এবং কথিত আছে যে, তিনি ভোজরাজ কর্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে বিভূষিত হন। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'কার ভাস্করাচার্য স্বীয় গ্রন্থ গোলাধ্যানে নিজের যে পরিচয় প্রদান করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, তিনি বৈদাস্তিক ভাস্করের বৃষ্ঠ বংশধর ছিলেন এবং শাণ্ডিল্যগোত্রসংভূত, বিজ্ঞ বৈদাস্তিক ভাস্কর সহপর্বতস্থিত 'বিজ্ঞড় বিড়' নামক 'ত্রৈবিণ্যবিদ্বজ্জন' ও 'নানা সম্ভজন' পূর্ণ স্থানে বসবাস করতেন। গ্রন্থকার ভাস্কর পূর্বপুরুষ ভাস্করের অপূর্ব পাণ্ডিত্যের উল্লেখ ক'রে স্বীয় গ্রন্থে এই স্থানে বলেছেন—

শ্রোত-স্মার্ত-বিচার-সার-চতুরো নিঃশেষ-বিদ্যানিধিঃ।

সাধুনামবধির্মহেশ্বরকৃতী দৈবজ্ঞ-চূড়ামণিঃ।^২

অর্থাৎ ভাস্কর শ্রোত ও স্মার্ত-বিচার-চতুর, জ্ঞান-সমুদ্র-পারঙ্গত, সাধুশ্রেষ্ঠ, মহেশ্বরকৃতী ও দৈবজ্ঞ চূড়ামণি ছিলেন।

ভাস্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বিশেষভাবে বারংবার শঙ্কর-মত-খণ্ডনের প্রচেষ্টা করেছেন। সেজন্য তিনি যে শঙ্করের পরবর্তী বা খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

শঙ্করভাষ্যের টীকাকার 'ভাস্কর'কার বাচস্পতি মিশ্র ৩-৩-৩৮ সূত্রভাষ্যে ভাস্করের ৩-৩-২৮ সূত্রভাষ্যের মতবাদ উদ্ধৃত ক'রে খণ্ডন করেছেন। 'ভাস্কর'র টীকাকার কল্লভরূপকার অমলানন্দও এই উদ্ধৃত মতবাদ ভাস্করেরই মতবাদ বলে নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন—'ভাস্কর-মতমত্বদতি। ইতি শ্রুতিং ভাস্কর উদাহৃত্য' ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র ৮৪১-৪১ খ্রীষ্টাব্দে বা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর ভারতভূমি অলঙ্কৃত করেন। সেজন্য ভাস্কর যে সেই সময়ে বা পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন তা অনুমান করা যায়।

প্রসিদ্ধি আছে যে, ভাস্কর রাজা ভোজ কর্তৃক 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন। রাজা ভোজের সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে সাধারণতঃ তাঁকে খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর লোক ব'লে গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে ভাস্করের সময় স্থির করা যেতে পারে।

জ্যোতিষী উদয়ন তাঁর 'জ্যোতিষ-কুসুমাজলি' গ্রন্থে ভাস্করের নামোল্লেখ পূর্বক তাঁর মত উদ্ধৃত ও খণ্ডন করেছেন—'ব্রহ্মপরিণতেব্রিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে', 'ভাস্করস্ত্রিদণ্ডিমত-ভাষ্যকারঃ'। উদয়নাচার্যের সময় ৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সেজন্য ভাস্কর এই সময়ে বা তাঁর পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন।

রামানুজ তাঁর 'শ্রী-ভাষ্যে'ও ভাস্কর-মত খণ্ডন করেছেন (১-১-১, পৃ: ২২৯, ২৪৫, ৩০৪, ৩১৮, ৩২২ ; ২-১-১৫, পৃ: ৭৮)। রামানুজের জন্মকাল ১০১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ভাস্কর এই সময়ের পূর্ববর্তী।

বিজ্ঞানমণীশ্বর (১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর 'বিবরণ-প্রমের-সংগ্রহে' ভাস্করীর মত খণ্ডন করেছেন।
ডট্টোজী দীক্ষিত (১৬শ-১৭শ শতাব্দী) তাঁর 'বেদান্ত-তত্ত্ব টীকা বিবরণে' ভাস্করের নামোল্লেখ পূর্বক বলেছেন—'ভট্টভাস্করস্ত ভেদাভেদবেদান্তসিদ্ধান্তবাদী'।

শ্রীযুক্তাচার্য বর্ধমানোপাধ্যায়ও 'শ্রীমদ্ভাস্করমণীশ্বরপ্রকাশে' ভাস্করের মত উদ্ধৃত করেছেন।

'সিদ্ধান্তশিবোমণি'কার ভাস্করাচার্য স্বীয় গ্রন্থে নিজের জন্ম সময় ১০৩৬ শকাব্দ বা ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন এবং ভাস্কর তার ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ। এই অনুসারেও ভাস্করের স্থিতিকাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। সুতরাং সাধারণ ভাবে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, ত্রৈণাধিকভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক ভাস্কর কেবলান্বৈতবাদী শঙ্কর ও বিশিষ্টান্বৈতবাদী রামানুজের মধ্যবর্তী ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বভাগে ভারতভূমি অলঙ্কৃত করেন।

ভাস্করাচার্যের একটি মাত্র গ্রন্থের কথাই আমাদের জানা আছে, অর্থাৎ তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য'। তিনি তাঁর ভাষ্যকে শঙ্করের স্মারক, 'শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্য' নামে অভিহিত করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদ্যের শেষে Colophonএ তিনি বলেছেন—'ইতি ত্রিভুগবন্তাশ্রমচার্য-প্রণীতে শারীরক মীমাংসা-ভাষ্যে' ইত্যাদি। তাঁর মতে যা আমরা পরে দেখব, ব্রহ্মবহুত্ব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন হলেও, মোক্ষকালে 'শারীর' বা জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেজন্যই তিনি শঙ্করের মতোই 'ব্রহ্মমীমাংসা'কে 'শারীরক-মীমাংসা' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই ভাষ্যের প্রপঞ্চনা-প্রণালী সংক্ষিপ্ত ও স্মারক-সম্বন্ধিত। সেজন্য স্থানে স্থানে ভাষা ছর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছে, যদিও অধিকাংশ স্থলেই এই ভাষা সুখপাঠ্য। এই ভাষ্যে, ভাস্কর বিশেষভাবে শঙ্কর-মত খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছেন। রামানুজের স্মারক বিশদভাবে না হলেও, অন্বৈতবাদের প্রধান মতগুলি প্রায় সবই তিনি সুনিপুণ ভাবে সমালোচনা করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভ শ্লোকেই তিনি নামতঃ না হলেও কার্যতঃ অন্বৈতবাদীদের উল্লেখ ক'রে বলেছেন— 'সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্তা স্মারকপ্রায়প্রকাশনাৎ।

ব্যাখ্যাভংগৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে।'

অর্থাৎ ধারা নিজেদেরই মতবাদ প্রচার করবার জন্য ব্রহ্মসূত্রসমূহের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা না ক'রে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদেরই মতবাদ খণ্ডনের জন্য এই বেদান্ত-শাস্ত্র পুনরায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

ভাস্কর অন্বৈতমতবাদকে বৌদ্ধমতবাদ বলে অভিহিত করতেও কুণ্ঠিত হন নি। যেমন তিনি বলেছেন—'তথা চ বাক্যং পরিণামস্ত স্মাদ দধ্মাদিবদিত্তি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাযানিক-বৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।' (১-৪-২৫ পৃঃ ৮৫)।

'যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেহপ্যনেন স্মারকপ্রায়ৈব নিবৃত্তা বেদিতব্যঃ।' (২-২-২২ পৃঃ ১২৪)। অর্থাৎ অন্বৈতবাদীগণ ভিত্তিহীন মাহাযানিক বৌদ্ধ মত মায়াবাদ প্রপঞ্চনা ক'রে সকলকে মোহগ্রস্ত করেছেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদীগণকেও এই ভাবে সূত্রকার নিবৃত্ত করছেন।

ভাস্কর-ভাষ্যে ভাস্কর দু'এক স্থানে বলেছেন—'ছান্দোগ্যে চ তত্র তজ্ঞানয়োর্মীয়া-প্রবিলম্ববাদিনো-নিরাকরণং বিস্তরেণ কৃতমমিত্যুপসং-স্থিতং।' (১-৪-২১, পৃঃ ৮৪)

'যন্তত্র কিকিদ্বেব স্মারকমপি দূষণং কেন চিহ্নংপ্রেক্ষতে, তৎ সর্বং ছান্দোগ্যে বিস্তরেণ পরিহৃত-মিত্যুপসংস্থিতং।' (৪-৩-২৩, পৃঃ ২৪০)

অর্থাৎ ‘ছান্দোগ্যো’ এই সব বিষয় সবিস্তারে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে, সেজন্য এখানে আর করা হচ্ছে না। এই থেকে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, ভাস্কর ছান্দোগ্য-ভাষ্যও রচনা করেছিলেন।

ব্রহ্মের স্বরূপ

ভাস্করের মতেও ব্রহ্মই সর্বোচ্চ তত্ত্ব। ভাস্কর তাঁর ভাষ্যে আত্মোপাস্ত্র কেবলমাত্র ‘ব্রহ্ম’ এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন অথবা স্থানে স্থানে ‘ঈশ্বর’ এই নামটিরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিদের ত্যায় ‘ব্রহ্ম’কে ‘বিষ্ণু’, ‘কৃষ্ণ’, ‘শিব’ প্রভৃতি বলে গ্রহণ করেন নি।

ব্রহ্ম বিশ্বপ্রপঞ্চের একমাত্র পৰম কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা। তিনিই এর অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ভাস্কর বলেছেন—‘যস্মাদীশ্বরাং, সর্বজ্ঞাং, সর্বশক্তেঃ পৰমকারণাদন্ত জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতন্ত বিবিধ বিভক্ত-ভোক্তৃ-সংযুক্তন্ত নিয়ত দেশ-কাল-ফলোপভোগাশ্রয়শ্চাচিস্ত্যবচনন্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে তদ্ ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তব্যম্।’ (১-১-২, পৃ: ৮)

অর্থাৎ যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, পৰমকারণ থেকে নামরূপের দ্বারা প্রকটিত, বিবিধ-ভোক্তৃ-সংযুক্ত, অচিস্তনীয় ভাবে রচিত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় সংঘটিত হচ্ছে তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের দ্বিরূপ

ভাস্করের মতে ব্রহ্ম দ্বিরূপ : কারণ-রূপ ও কার্য-রূপ। তিনি বলেছেন—‘ব্রহ্মৈব হি কারণাত্মনা কার্যাত্মনা ব্যবস্থিতমিত্যুক্তম্।’ (১-১-৪, পৃ: ১২)। ‘তং কারণাত্মনা কার্যাত্মনা দ্বিরূপেণাবস্থিতমিত্যুক্তম্।’ (১-১-১১, পৃ: ২৪) ‘যোহয়ং ভূতযোনিঃ কারণাত্মা স এব কার্যাত্মনাবস্থিত ইতি দর্শয়িতুং রূপমূপশ্রান্তন্তে।’ (১-২-২৩, পৃ: ৪৬)। অর্থাৎ ব্রহ্ম কারণ-রূপে ও কার্য-রূপে দ্বিরূপে অবস্থান করেন। যিনি কারণরূপে অরূপ বা রূপাতীত, তিনিই কার্যরূপে বিস্বরূপ বা অনন্তরূপধারী।

কারণরূপে ব্রহ্ম এক, কার্য-রূপে বহু। যেমন স্বৰ্গ প্রভৃতি স্বৰ্গখণ্ড-রূপে এক, স্বৰ্গ-বলয়, স্বৰ্গ-কুণ্ডল রূপে বহু। ভাস্কর শ্লোকছন্দে বলেছেন—

‘কার্যরূপেণ নানাভ্যমভেদঃ কারণাত্মনা।

হেমাাত্মনা যথাহ ভেদঃ কুণ্ডলাত্মানা ভিদা।’ (১-১-৪, পৃ: ১৮)

এরূপে ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্ন-রূপ। ‘অতো ভিন্নাভিন্নরূপং ব্রহ্মেতি স্থিতম্।’ (১-১-৪, পৃ: ১৮)

ব্রহ্ম দ্বিরূপ হলেও তাঁর প্রথম, অভিন্ন কারণ-রূপই হ’ল তাঁর আদি, মত্যা, স্বাভাবিক রূপ ; দ্বিতীয় কার্য-রূপটি ঔপাধিক মাত্র এবং সেজন্য আগন্তুক অথচ মত্যা রূপ। ভাস্কর বলেছেন—‘স চাভিন্নাভিন্ন-স্বরূপোহভিন্নরূপং স্বাভাবিকমৌপাধিকং তু ভিন্নরূপম্।’ (২-৩-৪৩, পৃ: ১৪১)

আদিতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নামরূপবিহীন, অভিন্নস্বরূপ ও কারণ মাত্র রূপে বিরাজ করেন। পরে তিনি নানাবিধ নামরূপবিশিষ্ট বস্তু বা কার্যে উপাধির মাধ্যমে নিজেকে বেচ্ছায় অভিব্যক্ত করেন, এবং এরূপে সবিশেষ, নামরূপবিশিষ্ট, ভিন্ন-স্বরূপ ও কার্য-রূপ হন। এই ভাবেই হয় চিদচিদ্বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি। ভাস্কর বারংবার ব্রহ্মের এই দুটি রূপ : ‘প্রপঞ্চবিলক্ষণ-কারণ-রূপ’ ও ‘প্রপঞ্চ-লক্ষণ-কার্যরূপ’এর মধ্যে প্রভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ হলেও ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ নন।

‘ব্রহ্মাত্মকে হি নামরূপপ্রপঞ্চো, ন প্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম, যথা সমুদ্রাত্মকঃ সমুদ্র ইতি ।’

(৩-২-১১, পৃ: ১৬৫) ।

‘ভোক্তৃ ভোগ্য-নিয়ন্তৃ-রূপশ্চ প্রপঞ্চশ্চ ব্রহ্মাত্মতা, ন প্রপঞ্চরূপতা ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ ।’

(৩-২-১৩, পৃ: ১৬৬) ।

অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের ব্রহ্মাতিবিস্তৃত বা ব্রহ্মবহির্ভূত অস্তিত্বই নেই। কিন্তু ব্রহ্মের জগদতিবিস্তৃত, জগদ্বহির্ভূত অস্তিত্ব আছে—কারণ মহান্ ব্রহ্ম একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতেই পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারেন না। সেজন্য ভাস্কর বলছেন—‘কর্তৃ-ভোক্তৃরূপাং সংসারিণো জীবাদধিকো সংসারী ঈশ্বরঃ সমস্ত-প্রপঞ্চ-ধর্ম-রহিতোহ দ্বিতীয়ঃ সত্য-জ্ঞানানন্ত-লক্ষণস্তশ্চ সর্ববেদান্তোপদেশাৎ ।’ (৩-৪-৮, পৃ: ২০২) অর্থাৎ সংসারী জীব থেকে অসংসারী ঈশ্বর ‘অধিক’ এবং এই হ’ল তাঁর সমস্ত প্রপঞ্চ-ধর্মরহিত, সত্য-জ্ঞান-অনন্ত লক্ষণ, অদ্বিতীয় রূপ।

এরূপে ব্রহ্মের প্রথমে স্বাভাবিক কারণরূপ ; পরে ঔপাধিক কার্যরূপ। প্রথমরূপে তিনি নির্বিশেষ, অদ্বিতীয়, সমস্ত-প্রপঞ্চ-ধর্ম-রহিত, জগদ্বহির্ভূত, সত্য জ্ঞান ও অনন্ত রূপে কেবল মাত্র। দ্বিতীয় রূপে তিনি সর্বিশেষ, অদ্বিতীয় হয়েও বৈত জীবজগদ্বিশিষ্ট, জগদ্বহির্ভূত হয়েও জগদ্ব্যপ্ত।

পূর্বেই যা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে ভাস্কর বিশেষ যত্নের সঙ্গে বারংবার প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ব্রহ্মের প্রপঞ্চ-রূপ এবং ভিন্নকার্য-রূপ, ঔপাধিক ব’লে যা স্বাভাবিক তার চেয়ে অল্প সত্য বা অসত্য কোনোক্রমেই নয়। বস্তুতঃ তিনি শব্দ-বেদান্তের গ্রন্থ শব্দ ‘উপাধি’কে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

ব্রহ্ম অস্তিত্ব-নিমিত্ত-উপাদান-কারণ

অসংখ্য বৈদান্তিকদের দ্বারা ভাস্করের মতেও ব্রহ্ম বিশ্বপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব’লে নিজেকেই নিজে কার্য-রূপে জীবজগতে পরিণত করলেও তিনি কোনোদিনই পরিবর্তনভাগী হন না। উর্গনাভ যেমন স্থায়ী শরীর থেকে তত্ত্ব সৃষ্টি ক’রেও নিজে অপরিবর্তিত থাকে, ব্রহ্মও ঠিক তাই। সেজন্য জগদ্ব্যপ্তির অর্থ ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপ এবং সৃষ্টিকার্যসমূহে তাঁর আত্মা রূপে, স্বরূপ রূপে, অন্তর্ধামীরূপে ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত। সেজন্য জগদ্ব্যপ্তি হয়েও, জগদ্ব্যপ্তি হয়েও, জগদাত্মা হয়েও, জীবের অন্তর্ধামী হয়েও ব্রহ্ম কোনোদিনও জীবজগতের শোক-দুঃখ, দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা-অপবিত্রতা প্রভৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হন না।

২-১-১৪ সূত্রভাষ্যে ভাস্কর সংকার্যবাদ ও পরিণামবাদের বিশদালোচনা এবং অদ্বৈতবেদান্ত-সম্মত বিবর্তবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। পরিণামবাদিগণ সাধারণতঃ ক্ষীর-দধি প্রভৃতির উদাহরণ দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, ক্ষীর বা দুগ্ধ সাবয়ব বস্তু এবং সেজন্য পরিণাম সম্ভব ; কিন্তু ব্রহ্ম ত নিরবয়ব, নিরংশ, সেজন্য ব্রহ্মের পরিণাম এক অসম্ভব কথা।

এর উত্তরে ভাস্কর বলছেন—‘ন সাবয়বত্বং তত্র পরিণতিহেতুর্বা দি স্তাৎ অমুনোপি দধিভাবেন পরিণামঃ স্তাদতোহপ্রয়োজকং সাবয়বত্বম্ ।’ (পৃ: ২৬) ।

অর্থাৎ সাবয়বত্ব পরিণতির কারণ নয়, যেহেতু এক্ষেত্রে সাবয়ব দুইয়ের দ্বারা জলও দধিতে পরিণত হতে পারত। তা যখন হয় না, তখন স্বীকার করতে হবে যে, সাবয়বত্ব নয় উপযুক্ত-শক্তি-বিশিষ্টই পরিণামের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ কোনো একটি কারণের কোনো একটি কার্যে পরিণত হবার শক্তি

থাকলেই, সেই কারণ থেকে সেই কার্যের উৎপত্তি হতে পারে, অসম্ভব নয়। সেজন্য কারণটি সাবয়ব বা নিরবয়ব, সেইটিই প্রকৃত প্রশ্ন নয়—প্রকৃত প্রশ্ন হ'ল, কারণটি কার্যোৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট কি না।

ভাস্কর বলছেন—‘তস্মাদ্ভিন্নবয়বৈশ্বে পরিণামো দৃশ্যত ইতি ব্রহ্মণ্যোপ্যুপপত্ততে।

তথা চ স্ত্র্যোধানাং দৃষ্টাস্তেন পরিণামো বর্ণিতঃ স্ত্র্যত্যাচষ্টে।

অপ্রচ্যুত-স্বরূপশ্চ শক্তি-বিক্ষেপ-লক্ষণঃ। পরিণামো যথা তদ্ব্যনাদশ্চ পটতন্তবৎ।’

(২-১-১৪, পৃ: ২৬)

অর্থাৎ নিরবয়বেরও পরিণাম দৃষ্ট হয়। সেজন্য নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ‘পরিণামের’ অর্থ হ'ল অপ্রচ্যুত-স্বরূপের শক্তির বিকাশই মাত্র। যেমন তন্তুস্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, অথচ তন্তু বস্ত্রে পরিণত হয়; আকাশস্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, অথচ আকাশ বায়ুতে পরিণত হয়; তেমনি নিত্য, নিরবয়ব, অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম স্বরূপের কোনোরূপ বিকার না ঘটেও, স্বীয় চিদচিদশক্তির বিক্ষেপ বা বিকাশ দ্বারা, ব্রহ্ম জীবজগতে পরিণত হন। বৈদান্তিক সংকার্যবাদ ও পরিণামবাদের এই হ'ল প্রকৃত অর্থ।

অষ্টমতমতসম্মত-বিবর্তবাদবিরোধী ভাস্কর বারংবার এই পরিণামবাদের বিষয় উল্লেখ ক'রে বলছেন—‘পরমাত্মা স্বয়মাত্মানং কার্ষতেন পরিণময়ামাসেত্যর্থঃ। শক্তিবিক্ষেপং কৃতবান্। অনন্তা হি তন্ত্র শক্তয়োহচিস্ত্যান্ত। তাসাং বিক্ষেপং কৰোতি সৃষ্টিস্থিতিকালে, যথা সূর্যোবস্মীনাং তদ্বদেব সংহরতি।’ (১-৪-২৫, ৮৫) অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং স্বীয় আত্মাকে জীবজগতে পরিণত করেন বা শক্তি বিকশিত করেন। ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত ও অচিস্ত্য। সৃষ্টি ও স্থিতিকালে তিনি এই শক্তি প্রকটিত করেন, প্রলয় কালে সেই শক্তি সংহত করেন, যেমন সূর্য রশ্মিসমূহকে প্রকাশিত বা সংহত করেন।

‘শক্তি বিক্ষেপ-লক্ষণঃ পরিণামঃ ইতীশ্বরশ্চ য়ে শক্তী ভবতো, ভোগ্যশক্তিরেকা ভোক্তৃশক্তি স্তাপরাপ্যভোগ্য-শক্তিশ্চ সাক্ষাদ্বিকল্পেণাচেতন-পরিণামাপত্তেৰ্ভোক্তৃশক্তিঃ, সা চেতনা জীব-রূপেণাবতিষ্ঠতে। তত্র যথা সূর্যঃ স্ববস্মীষিক্ৰিপ্যোপসংহরতি এবং প্রপঞ্চনানন্তভেদাং শক্তিং বিক্ষিপ্যোপসংহরতি পরমেশ্বর ইত্যুপপন্নম্।’ (২-১-২৭, পৃ: ১০৫) অর্থাৎ পরিণামের অর্থ হল শক্তিবিক্ষেপ। ঈশ্বরের দুই শক্তি, ভোগ্যশক্তি ও ভোক্তৃশক্তি। ভোগ্যশক্তি আকাশাদিকল্পে অচেতন জগতে পরিণত হয়; ভোক্তৃশক্তি চেতন জীবে পরিণত হয়। সূর্য যেমন রশ্মি বিস্তারিত ক'রে সজ্জিত করে, তেমনি পরমেশ্বরও স্বশক্তি-প্রকট ক'রে সৃষ্টি-স্থিতি ও সজ্জিত ক'রে লয় সাধন করেন।

ব্রহ্ম জগজ্জীন ও সর্বস্বর্ষামী হয়েও যে, দোষস্পৃষ্ট হন না, সে সম্বন্ধে ভাস্কর বলছেন—‘সর্বজ্ঞদয়-সম্বন্ধাৎ সুখ-দুঃখাভ্যুপভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন—বৈশেষ্যাৎ, বিশেষো হি জীব-পরয়োর্ভবতি। জীবশ্চ হি সুখ-দুঃখভোগে কর্ম নিমিত্তং, নেশ্বরশ্চ অপহতপাপ্যাদিগুণশ্চাসৌ ক্রয়তে। হু চ দেশপ্রাপ্তিমাভ্যেণ তদীয়ধর্মপ্রাপ্তির্ন হি নভসোহগ্নিদেহ-সম্বন্ধাদাহযোগঃ। তস্মাজ্জীবৈশ্বেবোপভোগো ন পরশ্চেতি সিদ্ধম্।’ (১-২-৮, পৃ: ৪০) অর্থাৎ সর্বজ্ঞদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েও ব্রহ্ম জীবের দ্বারা সুখদুঃখভাগী হন না, কারণ সকাম কর্মই হ'ল সুখদুঃখের হেতু। একই স্থানে অবস্থিতি করলেই যে, একই ধর্মভাগী হতে হবে, তার কোনো নিয়ম নেই। যেমন আকাশের সঙ্গে অগ্নিপূর্ণ স্থানের সম্বন্ধ থাকলেও আকাশ অগ্নিবদ্ধ হয় না। একই ভাবে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ আছে বলেই ঈশ্বর জীবের ধর্মসংশ্লিষ্ট হন না।

ব্রহ্মের বিরূপের মধ্যে মূলগত ভেদ

ত্রিত্ববাদী, একেশ্বরবাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকেরা অবশ্য সকলেই ব্রহ্মের বিরূপ—কারণরূপ ও কার্যরূপের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই ভাস্করের মতো একরূপ বায়ংবার জোরের সঙ্গে ব্রহ্মের এই দুই রূপের প্রভেদের কথা বলেন নি। তার কারণ হ'ল এই : বাশাহুজ-নিখার্ক প্রমুখ ত্রিত্ববাদী ও ভেদাভেদবাদীদের মতে ব্রহ্মের কারণরূপ ও কার্যরূপের মধ্যে বিশেষ কোনো মূলীভূত পার্থক্য নেই। উভয় রূপেই, ব্রহ্ম সত্ত্ব ও সবিশেষ বা স্বগতভেদবান। কেবল প্রথমটি গূঢ়, অনভিব্যক্ত, অদৃশ্য রূপ ; দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম, অভিব্যক্ত, দৃশ্য রূপ—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু ভাস্করের মতে, ব্রহ্মের এই দুই রূপের মধ্যে সত্যিই একটি মূলগত প্রভেদ আছে। কারণ, কারণরূপে ব্রহ্ম নিবিশেষ ও স্বগতভেদহীন কার্যরূপে তিনি সবিশেষ ও স্বগতভেদবান। কারণাবস্থায় ব্রহ্মের সমস্ত গুণ ও শক্তি তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন ও একীভূত হয়ে থাকে, যেমন একটি লবণকণা সমুদ্রের জলে বিগলিত হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়। সেজন্য সে সময়ে এগুলি তাঁর এমন কি স্বগতভেদও নয়।

কিন্তু উক্ততা যেমন অগ্নির ধর্ম বলে অগ্নির সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকে, তেমনি কারণাবস্থায় ব্রহ্মের সমস্ত গুণ ও শক্তিও তাঁর সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকে। সেজন্য ভাস্করের মতে কারণাবস্থায় নিবিশেষ স্বগতভেদহীন ব্রহ্ম, কার্যাবস্থায় সবিশেষ ও স্বগতভেদবান হন। ব্রহ্মের এই দুই রূপের মধ্যে এই বিশেষ প্রভেদ আছে বলেই ভাস্কর একরূপ জোরের সঙ্গে বায়ংবার তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

ব্রহ্ম সত্ত্ব

ভাস্করের মতে ব্রহ্ম নিগূর্ণ নন, সত্ত্ব। অবশ্য পূর্বেই যা বলা হয়েছে কারণাবস্থায়, ব্রহ্মের সমস্ত গুণ ও শক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। ভাস্কর বলছেন—‘ন ধর্ম-ধর্মি-ভেদেন স্বরূপভেদ ইতি।’ (৩-২-২৩, পৃ: ৬২) ‘ন চ গুণগুণিনোরেকত্বানেকত্ববিবোধঃ। যথায়িরেকঃ সপ্তজিহ্বাঃ প্রকাশবানুর্ধ্বজলন উক ইতি নানাস্বম্ যথা উত্তন্নিব একঃ কিরণজালং অবনিমণ্ডলে প্রথমগ্ননেকো ভবতীতি।’ (৪-৪-৭, পৃ: ২৪৪)।

অর্থাৎ ধর্ম-ধর্মি-ভেদের জন্ত স্বরূপভেদ হয় না। ত্রব্য এক, কিন্তু তাঁর নানা গুণ থাকতে পারে। যেমন অগ্নি এক, কিন্তু তাঁর রশ্মি অনেক ; সূর্য এক, কিন্তু তাঁর কিরণ অনেক ইত্যাদি।

ব্রহ্ম সৎ-সত্তাবান, চিং-চিহ্ন

ব্রহ্ম ‘সত্ত্বরূপ’ বা সত্ত্বাত্ত এবং ‘বোধলক্ষণ’ বা চিহ্নাত্ত (৩-২-১৫—১২)। অর্থাৎ তিনি সৎস্বরূপ, চিংস্বরূপ, তা সত্ত্বও সৎ ও চিং তাঁর গুণও অর্থাৎ তিনি সৎস্বরূপ ও সত্তাবান ; জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানবান বা জাতা। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি। তাঁর অন্ত্যন্ত বহু গুণও বিদ্যমান—যেমন তিনি সর্বপাপবিমুক্ত (১-১-২০) ইত্যাদি।

ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি

এ স্থলে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাশাহুজ-নিখার্ক প্রভৃতির দ্বারা ভাস্কর কোনোস্থানেই ব্রহ্মকে স্পষ্ট ভাষায় ‘অনন্ত-গুণ-বিশিষ্ট’ বলে উল্লেখ করেন নি। তিনি তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে আত্মোপাস্ত ব্রহ্মের কেবল একটি মাত্র গুণেরই অর্থাৎ তাঁর সর্বজ্ঞত্বের কথাই বায়ংবার বলেছেন। সর্বত্রই তিনি ব্রহ্মকে

‘সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি’ এই দুই বিশেষণ-বিশৃঙ্খিত করেছেন। বস্তুতঃ তিনি যখনই ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখনই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই দুটি বিশেষণও যুক্ত ক’রে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন—‘স্বাধীশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ’ (১-১-২)। ‘স চ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সন্’ (১-২-৬)। ‘তস্মাৎ স্বতন্ত্রঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্নিবন্ধনঃ’ (১-৪-২৬)। ‘কিমূত চেতনশ্চ সর্বজ্ঞশ্চ সর্বশক্তিঃ স্বতন্ত্রঃ...’ (২-১-১৪)। ‘ব্রহ্ম পুনঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ’ (২-১-২৪)। ‘পরমাত্মা সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিরিতি’ (২-১-৩৪)। ‘ব্রহ্মোপাদানকারণং চ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ’ (২-২-৪০, পৃ: ১২৮)—ইত্যাদি।

অন্যান্য বহুস্থলে ভাস্কর ব্রহ্মকে অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি-বিশিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। যথা—‘অনন্তা হি তত্ত্ব শক্তয়োঃ চিন্ত্যাক্ষ’ (১-৪-২৫)। ‘স্বোতীশ্বতরা অপীশ্বরমচিন্ত্যশক্তি-মামনন্তি’ (২-১-১৪)। ‘মজ্জ সর্বশক্তিষাদিতি’ (২-২-২)। ‘ব্রহ্মণো হনন্তঃ শক্তয় ইত্যুক্তম্’ (২-৪-৪) ইত্যাদি।

ব্রহ্মের শক্তির গুরুত্ব

এরূপে অন্যান্য দ্বিত্ববাদী বৈদান্তিকেরা যে স্থলে ব্রহ্মের অনন্ত ও অচিন্ত্য গুণের কথাই প্রধানতঃ বলেছেন, সে স্থলে ভাস্কর গুণের অপেক্ষা শক্তির উপরই অধিকতর জোর দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একবারও ব্রহ্মকে সকলকল্যাণগুণাকর ও সকলহয়গুণার্জিত বলে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেন নি। বরং তিনি যেন মেনেই নিয়েছেন যে, ব্রহ্ম সত্ত্ব ও বিবিধগুণ-সমন্বিত এবং সে বিষয়ে সাক্ষাৎ উল্লেখ না ক’রে বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য আলোচনা কালেই ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণের কথা তিনি বলেছেন।

ব্রহ্মের কোমল-রূপের অনুলেখ

বিশেষ ক’রে ভাস্কর ব্রহ্মের কোমল রূপের কথা একেবারেই উল্লেখ করেন নি—যে রূপ পরবর্তী দ্বিত্ববাদ ও ভেদাভেদবাদে ক্রমশঃ কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছিল। তিনি অবশ্য অন্যান্য বৈদান্তিকদের মত ব্রহ্মকে আনন্দময় বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কোনোস্থানেই, একবারও ব্রহ্মের সৌন্দর্য, মাধুর্য, ককণা, কোমলতা প্রভৃতির উল্লেখমাত্র করেন নি।

এরূপে ভাস্করের ব্রহ্ম, স্বামাহুজ-নিষার্ক প্রভৃতির ব্রহ্মের মতো ‘Personal, Embodied Being’ বা পুরুষোত্তম ও দেহবিশিষ্ট নন। স্বামাহুজ-নিষার্ক প্রভৃতির মতো ব্রহ্ম দিব্য, অপ্ৰাকৃত দেহধারী। কিন্তু ভাস্কর-ভাণ্ডে কোনো স্থলেই ব্রহ্মের দেহের উল্লেখ নেই। তিনি অবতারদের বিষয়েও কোনো কিছু বলেন নি এবং পাঞ্চরাত্র মতবাদের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি চতুর্বাহুবাদ অধৌক্তিক ব’লে বর্জন করেছেন। (২-২-৪১—৪৪)।

ভাস্কর-ভাণ্ডে কোনো স্থানে ঈশ্বর-প্রসাদেরও উল্লেখ নেই ; এবং কোনো স্থানেই তিনি ঈশ্বরকে ‘ভক্তবৎসল’ ইত্যাদি বলে বন্দনা করেন নি। এরূপে ভাস্করের মতে ব্রহ্ম সকলের একমাত্র উপাশ্রয় দেবতা নিশ্চয়ই—কিন্তু পরমহুন্দর, পরমকরণাময়, পরমমধুরূপে নয়,—নিষাকার, নির্বিশেষরূপে। অন্যান্য দ্বিত্ববাদী বৈদান্তিকদের মতে পরমেশ্বরকে জানতে হবে, ভালোবাসতে হবে, উপাসনা করতে হবে। কিন্তু ভাস্করের মতে পরমেশ্বরকে কেবল জানতে হবে ও উপাসনা করতে হবে—ভালোবাসতে নয়। এরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো নিকটত্ব, ব্যক্তিগত, সুমধুর সম্পর্ক আমাদের নেই।

ব্রহ্ম প্রাপ্তবা

শঙ্কর প্রভৃতির মতে অবিকারী ব্রহ্ম চতুर्वিকার থেকে মুক্ত অর্থাৎ তিনি উৎপাদ, বিকার, সংস্কার ও আপ্য—কোনোটাই নন। কিন্তু ভাস্করের মতে তিনি প্রথম তিনটি না হলেও, শেষটি বা 'আপ্য'। অর্থাৎ তিনি প্রাপ্তবা; অথবা মুক্তজীবেরা তাঁকে প্রাপ্ত হন। ভাস্কর বলেছেন—'চতুर्वিধং হি কর্মকারকমুৎপাদ্যং, প্রাপ্যং বিকারং, সংস্কারং চেতি। অজ্ঞোচ্যতে। সত্যং ত্রিবিধং কর্ম ন সম্ভবতীত্যাশ্যং তু ন শক্যতে নিরসিতুম্। যদৈব জ্ঞানেনাবিজ্ঞাননিবৃত্তিহায়েণ ব্রহ্মব্রূপমবাপ্যাত ইত্যভ্যুপগম্যতে' (১-১-৪)।

অর্থাৎ ব্রহ্ম কর্মের বা ক্রিয়ার বস্তু নন। কারণ কর্ম চার প্রকারের—উৎপাদন, পরিবর্তন, সংস্কার ও প্রাপণ। অবশ্য নিত্যসত্য ও নিত্যতত্ত্ব ব্রহ্মের উৎপাদন, পরিবর্তন বা সংস্কার অসম্ভব। কিন্তু তাঁর প্রাপ্তি ত অসম্ভব নয়ই, বরং তিনি জীবের নিত্য-প্রাপ্য এবং মুক্তজীব তাঁকে প্রাপ্ত হয় (পৃ: ১৬)।

অন্যান্য স্থলেও ভাস্কর ব্রহ্মকে 'আপ্য' বা 'প্রাপ্তবা' বলে বর্ণনা করেছেন—'কর্মভেনোপাশ্রকভেন প্রাপ্যভেন চ ব্রহ্ম ব্যপদিশ্রুতে।' (১-২-৪)।

এইদিক থেকে ভাস্কর রামানুজ-নিম্বার্ক-প্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদী, ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকদের সঙ্গে একমত। অর্থাৎ তাঁদের মতে মোক্ষ কেবল অভাবাত্মক অজ্ঞাননিবৃত্তিই নয়—যা অদ্বৈত-বৈদান্তিকদের মত—সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবাত্মক ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

চিৎ ও উপাধি

রামানুজ-নিম্বার্ক প্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকদের দ্বারা ভাস্করের মতেও চিৎ বা জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণুপরিমাণ ও বহুসংখ্যক।

কিন্তু এই সকল বৈদান্তিকদের সঙ্গে ভাস্করের মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই যে, তাঁর মতে, জীবের উক্ত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও বহুত্ব আদিম বা অনাদিকাল থেকে বিद्यমান ও অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী নয় অর্থাৎ নিত্যও নয়, স্থাবরিকও নয়, কিন্তু কেবলমাত্র উপাধিক, আগন্তুক ও অনিত্য অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত উপাধি থাকে ততদিন পর্যন্তই কেবল স্থায়ী।

ভাস্করের মৌলিক উপাধিবাদ

এই প্রসঙ্গে ভাস্করের নিজস্ব মৌলিক উপাধিবাদের বিষয় আলোচ্য। ভাস্করীয় উপাধিবাদানুসারে সংসারাবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্যাবস্থায়, জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন; কিন্তু প্রথমে অর্থাৎ ব্রহ্মের কারণাবস্থায়, জীব ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল এবং পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে ও মোক্ষকালে জীব পুনরায় ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন হবে।

এ রূপে সংসারাবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্যাবস্থায় জীব অংশ, কার্য ও আশ্রিতরূপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন যেহেতু অংশ অংশী থেকে, আধের বা আশ্রিত আধার বা আশ্রয় থেকে ভিন্নাভিন্ন।

ভাস্কর বলেছেন—'কার্যকারণয়োবনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ।' (১-৪-২)

'ব্রহ্মণোহনন্যত্বং ভোগ্য-ভোক্তৃবর্গয়োঃ। কারণস্যেব কার্যত্বানা দৃষ্টবদবতিষ্ঠতে যৎসমম্বিতং হি কার্যমূলভ্যতে ত্রিষপি কালেবু কারণাধীনকার্যং, ক্রমমহিববদেশতঃ কালতো বা ব্যতিরিক্তমূলভ্যতে কারণস্তাবস্থামাত্রং কার্যম্।' (২-১-১৪)

‘সদেব কার্যং । কৃতঃ ? কারণমেব হি তাং তামবস্থাং প্রতিপত্তমানং কার্যমিতি গীয়তে । অবস্থা-
তত্ত্বতোচ্চ নাত্যন্তভেদো, ন হি শুক্ল-পটয়োঃ ধর্ম-ধর্মিণোরত্যন্ত-ভেদঃ, কিস্ত্বেকমেব বস্ত্র, ন হি নিগুণং নাম
দ্রব্যমস্তি, ন হি নির্দ্রব্যো জ্ঞপোস্তি, তথোপলব্ধেঃ, উপলব্ধিচ্চ ভেদাভেদব্যবস্থায়ং, প্রমাণং প্রমাণব্যবহারিণাং
তথা কার্য-কারণয়োর্ভেদাভেদাবহুভূয়েত । অভেদধর্মচ্চ ভেদো, যথা মহোদধেরভেদঃ স এব তরঙ্গাঙ্গাঙ্গানা
বর্তমানো ভেদ ইত্যুচ্যে ন হি তরঙ্গাদিঃ পাষাণাদিষু দৃশ্যন্তে, তস্মৈব তাঃ শক্তয়ঃ, শক্তি-শক্তিযতোচ্চানন্তত্বমন্ত
চোপলব্ধ্যতে, যথাগ্নেদহন-প্রকাশনাদিগন্তয়ো ভেদাঃ যথা চ বায়োঃ প্রাণাদিবৃন্তিভেদেন ভেদঃ । তন্মাং
সর্বমেকানেকাত্মকং নাত্যন্তমভিন্নং ভিন্নং বা ।’ (২-১-১৮)

‘যথা পটঃ সংবেষ্টিতঃ কচিং প্রসারিতো বা ন ভিজ্ঞতে তথা কারণং স্বরূপাবস্থং কার্যাবস্থং চ ন
ভিজ্ঞতে ।’ (২-১-১৯)

‘মূলকারণেনানন্তত্বং জগতঃ সর্ববেদান্তেষু বিধিস্থিতম্ । তচ্চি চেতনাচেতনাস্বকম্ । তত্র
চেতনো ভোক্তৃবর্ণো জীব স্বভাবত এব তদাত্মক ইত্যনন্তত্বং সিদ্ধম্ । অচেতনবর্ণস্ত তু ভূতেন্দ্রিয়-বিষয়-
সংজ্ঞস্ত তচ্চি কারণেদেনানন্তত্বং বস্ত্রং সৃষ্টিপ্রকরণবি প্রবৃন্তানি ।’ (২-৪-৪)

‘কার্য ও কারণ অভিন্ন—এই হল অভিপ্রায় ।’

‘ত্রয় ভোগ্য জগৎ ও ভোক্তা জীবগণের সঙ্গে অভিন্ন । কারণই কার্যরূপে বিরাজ করে ; যেমন
ঘট যা সৃষ্টিকারুপীই মাত্র । কার্য জিকালেই কারণের অধীন । কার্য ও কারণ, অথ ও মহিষের স্তায়
দেশ বা কালের দিক থেকে ভিন্ন নয় । উপবস্ত্র কার্যকারণের অবস্থাস্তর মাত্রই কেবল ।’

‘কার্য নিশ্চয়ই সৎ । কেন ? ‘কারণই’ সেই সেই অবস্থা ধারণা ক’রে ‘কার্য’ রূপে বর্ণিত
হয় । যা অবস্থা ধারণ করে এবং যে অবস্থা তা ধারণ করে—এই দুয়ের মধ্যে অত্যন্ত-ভেদ নেই ।
বস্ত্রতঃ বস্ত্র এবং তার শুক্লত্ব, দ্রব্য এবং তার গুণের মধ্যে অত্যন্ত-ভেদ নেই, কিন্তু বস্ত্র সেই একই ।
গুণহীন দ্রব্য থাকতে পারে না দ্রব্যহীন গুণও থাকতে পারে না—এই হল আমাদের উপলব্ধি । আমাদের
একুপ উপলব্ধিই হল কারণ-কার্য, দ্রব্য-গুণের মধ্যে একুপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধের প্রমাণ । সেজন্ত একুপ প্রমাণ-
বশবর্তী সকলেই কারণ-কার্যের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই উপলব্ধি করেন । ‘ভেদ’ ‘অভেদের’ ধর্ম । যথা
মহাসমুদ্র এক ও অভিন্ন । কিন্তু তা যখন তরঙ্গ-রূপে বিরাজ করে তখনই তাতে ভেদ এসে যায় । বস্ত্রতঃ
তরঙ্গ ত কেবল সাগরেরই, পাষাণাদিতে তরঙ্গ দেখা যায় না কোনোদিনও ; তরঙ্গ সাগরেরই শক্তি । শক্তি
ও শক্তিমানের মধ্যে অভেদও আছে, ভেদও আছে । যথা অগ্নির দহনশক্তি, প্রকাশনশক্তি প্রভৃতির জন্ত
তার মধ্যে ‘ভেদ’ আছে ; বায়ুর প্রাণ অপানাদি-শক্তির জন্ত তার মধ্যে ‘ভেদ’ আছে । একই ভাবে
প্রত্যেক বস্ত্রই এক অথচ ‘অনেক’ ; এবং এক ‘অনেক’ থেকে অত্যন্ত-অভিন্নও নয়, অত্যন্ত-ভিন্নও নয় ।’

যেহুপ সঙ্কচিত-বস্ত্র এবং প্রসারিত বস্ত্রের মধ্যে কোনোরূপ ভেদ নেই । একই ভাবে ‘কারণ’
এবং তারই স্বরূপের অবস্থা বিশেষ ‘কার্যের’ মধ্যে কোনোরূপ ভেদ নেই ।’

অর্থাৎ সকল বেদান্তেই মূলকারণের সঙ্গে জগতের অভিন্নতার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ।
তিনি চেতন ও অচেতনাত্মক । এ হলে ‘চেতন’ ভোক্তা জীব স্বভাবতই, তৎস্বরূপ এবং সেজন্ত তাঁর
সঙ্গে অভিন্ন । ‘অচেতন’ ভূত সমূহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্ত্রও তাদের কারণ-স্বরূপ তাঁরই থেকে অভিন্ন ।
সৃষ্টিপ্রকরণসমূহ এই কথাই বলে ।

কাৰ্য-কাৰণ-সম্বন্ধ

এ স্থলে ভাস্কর প্রধানতঃ কাৰ্য-কাৰণ-সম্বন্ধের সাহায্যে চৈব ও জীবজগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করছেন। কাৰ্য-কাৰণ-সম্বন্ধ 'জালাত্না' বা 'অনন্তত্ব' সম্বন্ধ। 'অনন্তত্ব' কিন্তু 'অভিন্নত্ব' নয়, 'ভিন্নাভিন্নত্ব'। প্রথমতঃ কাৰণই কাৰ্যরূপে পরিণত হয়, সেজন্য কাৰ্য-কাৰণের অবস্থা বিশেষই মাত্র এবং কাৰণাত্মক বা কাৰণস্বরূপ। কাৰণ ব্যতীত কাৰ্যের স্থিতিই অসম্ভব, ত্রিকালেই কাৰ্য কাৰণাধীন। অগ্নি ও মহিষ যেমন পরস্পর-ভিন্ন, কাৰ্য ও কাৰণ তেমনই ভেদভেদ ও কালভেদ ভিন্ন কোনোদিনও নয়। এই দিক থেকে কাৰণ ও কাৰ্য অভিন্নস্বরূপ।

কিন্তু পুনরায় কাৰণ ও কাৰ্য ভিন্ন-স্বরূপও সম্ভাবে। এই ভিন্নতার কাৰণ নিয়ে বলা হচ্ছে। যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ, অগ্নি ও শিখা, বায়ু ও প্রাণাদিবৃত্তির সম্বন্ধ। তরঙ্গ সমুদ্রাত্মক বা সমুদ্র বলে সমুদ্র থেকে অভিন্ন; পুনরায় তরঙ্গ রূপে সমুদ্র থেকে ভিন্ন। শিখা অগ্নি থেকে অগ্নিস্বরূপ বলে অভিন্ন, শিখা রূপে ভিন্ন। প্রাণাদি বায়ু থেকে বায়ুস্বরূপ বলে অভিন্ন, প্রাণাদি রূপে ভিন্ন। এ রূপে, কাৰণ ও কাৰ্য সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। কাৰ্য-কাৰণ সম্বন্ধকে শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধও বলা যেতে পারে, যেহেতু কাৰ্য কাৰণের শক্তি-বিক্ষেপ বা শক্তির প্রকাশই মাত্র। যেমন সমুদ্রের শক্তির প্রকাশ তরঙ্গ কিন্তু পাবাণে সে শক্তি নেই বলে পাবাণে কোনোদিন তরঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এ রূপে শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ 'অনন্তত্ব' বা 'ভিন্নাভিন্নত্ব'।

বস্তুবস্তুত্রয় ও জীবজগৎ ভিন্নাভিন্ন

সুতরাং সংসারকালে ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ কেবল অভেদও নয়, কেবল ভেদও নয়, কিন্তু ভেদাভেদ। একদিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন; অন্য দিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এই অভিন্নতা ও ভিন্নতার হেতু কি? প্রথমতঃ, অভিন্নতার হেতু পূর্বেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কাৰ্যরূপী জগৎপ্রপঞ্চ কাৰণরূপী ব্রহ্মের স্বরূপের পরিণাম অবস্থাস্বরূপ বা অভিব্যক্তিই মাত্র। সেজন্য জীবজগৎ ব্রহ্মস্বরূপ বা স্বরূপভূতঃ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন।

ভাস্করীর উপাধি

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভিন্নতার হেতু হল 'উপাধি'। এই 'উপাধিই' ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্ম থেকে স্বরূপভূতঃ অভিন্ন জীবজগৎকে সংসারাবস্থায় ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বা পৃথক্ ক'রে রাখে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এ স্থলে ভাস্কর পরিণামবাদসম্মত ও বিবর্তবাদসম্মত উভয় প্রকারের উদাহরণই দিয়েছেন। তাঁর মতে জীব ব্রহ্মের অংশ—অনাদি অবিজ্ঞা ও কর্মাত্মক উপাধিজনিত অংশ। যেমন সূক্ষ্ম অগ্নির অংশ, কর্ণমধ্যস্থিত আকাশ মহাকাশের অংশ (উপাধি—কর্ণ) বা দেহমধ্যস্থিত প্রাণ বায়ুর অংশ (উপাধি—দেহ)। প্রথমটি পরিণামবাদীদের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বিবর্তবাদীদের প্রিয় উদাহরণ। ভাস্কর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম উদাহরণটির কথাই বলেছেন, অথচ সাধারণ পরিণামবাদীদের স্তায় সূক্ষ্মকে অগ্নির পরিণাম সাক্ষাৎভাবে না ব'লে, তিনি তাকে অগ্নির উপাধিজনিত অংশই মাত্র বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন—'অজ্ঞোচ্যতে। পরাগাহ ভবানন্তি ভেদোহপ্যনাদিকাল প্রবৃত্তাবিভা-কর্মোপাধ্যবচ্ছেদাদংশো পরস্তাহং জীবো নাম, যথায়ৈবিসূক্ষ্মা যথাকালন্ত পার্শ্ববাস্তুধিষ্ঠানোপাধ্যবচ্ছিন্নঃ ছিন্নপ্রদেশঃ তৎসংশ-শব্দগ্রহণ-

শক্ত্যপেক্ষা, যথা চ বায়োঃ প্রতিশরীরং পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণভুখারং ভিন্নাভিন্ন-বভাবো জীবঃ সংসারী ন কদাচিন্মুক্তপূর্বঃ ।’ (১-৪-২১, পৃ: ৮১) অর্থাৎ অনাদি অবিজ্ঞা ও কর্মরূপ উপাধির দ্বারা বিচ্ছিন্ন জীব ব্রহ্মের অংশ যেমন ক্ষুদ্র অগ্নির অংশ, কর্ণপটাহমধ্যস্থিত আকাশ আকাশের অংশ, শরীর মধ্যস্থিত প্রাণ বায়ুর অংশ । সে অন্য সংসারী জীব ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন : স্বরূপতঃ অভিন্ন, উপাধিবশতঃ ভিন্ন ।

বদ্ধজীব ব্রহ্মের অংশ

২-৩-৪৩ শ্লোকে ভাস্কর বদ্ধজীবকে কি অর্থে ব্রহ্মের ‘অংশ’ বলা যায়, সে বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলেছেন । ‘অংশ’ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে । যেমন অংশের অর্থ হতে পারে ‘কারণ’ বা ‘দ্রব্যবিভাগ’ । প্রথম অর্থে তত্ত্বকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয় যদিও তত্ত্ব ব্রহ্মের কারণস্থানীয় । দ্বিতীয় অর্থে বলা যেতে পারে ‘আমরা পরিষদব্রহ্মের অংশী’ বা সেই সকল দ্রব্য বিভাগ ক’রে আমরা গ্রহণ করছি । কিন্তু জীবকে যখন ব্রহ্মের অংশ বলা হয়, তখন এই দুটি অর্থে বলা হয় না, অন্য অর্থে বলা হয় ।

‘উপাধাবচ্ছিন্নস্থানন্তুভূতস্ত বাচকোহসংশয়শব্দঃ প্রযুক্তঃ যথাগ্নেবিক্ষুদ্রিতস্ত ।’

(২-৩-৪৩, পৃ: ১৪০) ।

এ স্থলে অংশ শব্দটির অর্থ—উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন অনন্ত অংশ, যেমন ক্ষুদ্র অগ্নির অংশ । অর্থাৎ সমগ্র দ্রব্যটি থেকে একটি অংশ উপাধি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন হয়ে যায় অথচ দ্রব্যটি থেকে সেই অংশটি অনন্ত বা স্বরূপতঃ অভিন্ন । সমগ্র দ্রব্য থেকে এ রূপে স্বরূপতঃ অভিন্ন অথচ উপাধি দ্বারা ভিন্ন অংশটিই প্রকৃত ‘অংশ’ । এই অর্থেই জীব ব্রহ্মের অংশ । এ স্থলে ভাস্কর পূর্বের মতো অগ্নি-ক্ষুদ্রিত, আকাশ-কর্ণছিত্র, বায়ু-প্রাণ এবং একটি নূতন মনবৃত্তির উদাহরণ দিয়েছেন । কামপ্রমুখ মনোবৃত্তি যেমন মন থেকে উপাধিবশতঃ ভিন্ন, যদিও স্বরূপতঃ অভিন্ন, জীবও ব্রহ্ম থেকে ঠিক তাই ।

‘স চাভিন্নাভিন্ন-স্বরূপোহ ভিন্নরূপঃ স্বাভাবিকমৌপাধিকঃ তু ভিন্নরূপম্ ।’ (২-৩-৪৩) ।

অর্থাৎ জীব ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন—সংসারকালে ভিন্ন, মুক্তি ও প্রলয়কালে অভিন্ন । তার ঈশ্বর থেকে ভিন্নতা ঔপাধিক, অভিন্নতা স্বাভাবিক, ‘ঔপাধিক’ মিথ্যা নয় ।

ভাস্কর তাঁর উপাধিবাদ প্রপঞ্চনাকালে বারংবার অগ্নি ও ক্ষুদ্রিতের উদাহরণ দিয়েছেন বলে, বোঝা যায় যে, তাঁর মতে ‘উপাধি’ মিথ্যা বা অসত্য নয়, কারণ ক্ষুদ্রিত ও অগ্নির সত্য, বাস্তব অংশই মিথ্যা বা অবাস্তব অংশ নয় । আমরা পূর্বেই দেখেছি যে ভাস্করের মতে অনাদি অবিজ্ঞা ও তজ্জনিত সকাম কর্মই ‘উপাধি’ (১-৪-২১) । অন্য একস্থলে ভাস্কর বলেছেন যে, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ এবং তাদের গুণ কাম-লোভাদিই ‘উপাধি’ । (২-৩-২২—৩০) । অতএব ভাস্করের মতে অনাদি অবিজ্ঞাবশতঃ জীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বলে মনে করে এবং সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় । ফলে সে জন্মজন্মান্তরভাগী হয়ে জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে । এ রূপে এই অচিৎ বা জড়বস্তুর উপাধিরূপে জীবকে সংসারকালে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ক’রে তোলে ।

‘সত্য’ ও ‘নিত্য’ সমার্থক নয়

এ রূপে ভাস্কর ‘উপাধি’র সত্যতা স্বীকার করেছেন । তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে বা ‘ঔপাধিক’, তা ‘অপারমার্থিক’ বা মিথ্যা নয় ।—‘ন চৌপাধিক-কর্তৃত্বম্ অপারমার্থিকম্ ।’ (২-৩-৪০) ।

‘স্বাভাবিক’ ও ‘ঔপাধিক্য’ মধ্যে প্রভেদ এই নয় যে, প্রথমটি সত্য, দ্বিতীয়টি অসত্য—প্রভেদ কেবলমাত্র এই যে, প্রথমটি নিত্য বা চিরকালস্থায়ী, দ্বিতীয়টি অনিত্য বা অল্পকালস্থায়ী। ভাস্করের মতে যা অনিত্য—অর্থাৎ যাগতক, কালক্রমে আপত্ত, প্রথম থেকে অনন্তকাল থেকে বর্তমান নয়—তা অসত্য নয়। যেমন একটি বস্তুতে বা পাত্রের প্রথমে তাপের অস্তিত্ব না থাকতে পারে, যদিও পরে অগ্নির সংস্পর্শে এলে, সেই একই বস্তুতে বা পাত্রের তাপের আবির্ভাব হয়। এ স্থলে সেই বস্তুর ‘তাপ’ নামক গুণটি অনিত্য নিশ্চয়, কারণ তা নিত্যকাল বস্তুটিতে বিদ্যমান নয়, কালক্রমেই তাতে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এই ভাবে অনিত্য হলেও ‘তাপ’ নিশ্চয়ই অসত্য নয়। সে অল্প ভাস্করের মতে ঔপাধিক গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধিটি বর্তমান ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য—উপাধির বিলয়ে স্বভাবতঃই তারও বিলয় হয়। যেমন যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি, পাত্রটি অগ্নির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হয়ে আছে, ততক্ষণ বস্তুটি, পাত্রটির তাপও বিদ্যমান এবং সেই তাপ সম্পূর্ণ সত্য। অগ্নির অভাবেই তাপেরও অভাব হয়।

এই ভাবে তাপ পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং সেজন্য অনিত্য, কিন্তু কোনোক্রমেই অসত্য নয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী যে বর্তমান, তা অনিত্য হলেও তাকে অসত্য বলবে কে? কারণ যেটুকু তার সমীচীন অস্তিত্ব, সেটুকুই ত সত্য।

শরীর ও ভাস্করীর উপাধিবিদের মধ্যে প্রভেদ

এ রূপে শরীরের ‘উপাধি’ ও ভাস্করীর ‘উপাধির’ মধ্যে প্রভেদ অনেক। শরীরের মতে যা ঔপাধিক, তা অপারমার্শিক, কারণ যা পারমার্শিক তা কোনো দিনই বাধিত হয় না, অস্তিত্ববিহীন হয় না। এ রূপে শরীরের মতে ‘সত্য’ এবং ‘নিত্য’ সমার্থক। যা সত্য, তা নিত্যকাল সত্য, চিরস্থায়ী, অবাধিতস্বরূপ। কিন্তু ভাস্করের মতে ‘সত্য’ ও ‘নিত্য’ সমার্থক নয়—যা সত্য তা নিত্যও হতে পারে, অনিত্যও হতে পারে। অল্পস্থায়ী বস্তুও এই অর্থে সত্য বস্তু।

ব্রহ্মজীবের মধ্যে স্বাভাবিক, ভেদ উপাধিক

সে অল্প এ রূপে, ভাস্করের মতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ স্বাভাবিক অর্থাৎ, সত্য ও নিত্য; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ প্রমুখ সর্বকালে, সৃষ্টি-প্রলয়-মুক্তি-প্রমুখ সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ উপাধিক অর্থাৎ সত্য ও অনিত্য; কেবল সৃষ্টি বা সংসার অবস্থাতেই বিদ্যমান।

উপাধির বিলয়ে, জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। যেমন উপাধি ঘট ভগ্ন হলে ঘটাকাশ মহাকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়, যেমন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লবণকণা সমুদ্রজলের সঙ্গে এক হয়ে যায়—তেমনি প্রলয় ও মুক্তিকালে জড়দেহাদিরূপ উপাধিবিমুক্ত জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সেই অবস্থায় জীব ব্রহ্মেই লায় সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বাত্ম হয়।

জীবের জাতক-কর্তৃক-ভোক্তক-দগু

ভাস্কর-মতে ‘উপাধির’ প্রকৃত অর্থ কি, তা উপসন্ধি করলে, তিনি কি অর্থে জীবের কর্তৃক, ভোক্তক ও অণুতক ‘উপাধিক’ বলে গ্রহণ করেছেন, তা স্পষ্ট হবে। তাঁর মতে জীবের কর্তৃক যদি স্বাভাবিক হ’ত, তা হলে সে সর্বদাই কর্মকারী, ক্রিয়ামূল হ’ত। কিন্তু সকাম কর্মের নিশ্চিত ফল সংসার ব’লে, সেফল জীবের সংসার-দশাও কোনোদিন শেষ হ’ত না। সে অল্প বীকার করতেই হয় যে, জীবের কর্তৃক নিত্য ও

স্বাভাবিক নয়, অনিত্য ও ঔপাধিক ; অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জীব দেহমনোসংগঠিত বা জড় উপাধিসংগঠিত হয়ে থাকে, ততদিন পর্যন্তই কেবল সে কর্তৃত্বশীল (যেমন যন্ত্রাদিসম্বন্ধিত হলেই তক্ষ কৰ্তা, অন্য সময়ে নয় ; অথবা ইন্ধনসংগঠিত হলেই অগ্নি ধুম্রশীল, অন্য সময়ে নয়) অন্তর্ধায় নয়। বলা বাহুল্য উপাধির পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে জীবের ঈদৃশ ঔপাধিক কর্তৃত্ব কোনোক্রমেই অপারমার্গিক বা মিথ্যা নয় ; অর্থাৎ জীব নিত্যকর্তা বা সর্বদাই কর্মকারী না হলেও, সংসারদশায় তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপেই সত্য। সেই সময়ে অবশ্য জীব ব্রহ্মের অধীন।

একই ভাবে জীবের ভোকৃত্ব ও অণুত্বও ঔপাধিক, জীবের সংসারকালীন গুণই মাত্র। স্বভাবতঃ জীব কর্মফলভোগহীন ও সর্বব্যাপী।

জীবের বহুত্বও এই ভাবে ঔপাধিক কিনা, সে বিষয়ে ভাস্কর স্পষ্ট ক'বে কিছু বলেন নি। তা সত্ত্বেও ভাস্করের মতে মুক্তজীব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান, যেমন লবণকণা সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় ; সুতরাং জীবের বহুত্বও যে তাঁর মতে ঔপাধিকই মাত্র, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কেবল জীবের জাতৃত্ব ঔপাধিক নয়, স্বাভাবিক। জীব ব্রহ্মস্বরূপ বলে সর্বকালে, সর্বাবস্থাতেই যে ব্রহ্মেরই স্থায় জ্ঞান-স্বরূপ ও জ্ঞাতা।

অচিৎ

ভাস্করের মতে অচিৎ বা অজ্ঞগৎ, ব্রহ্মের কার্যাবস্থায় বা সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন ; ব্রহ্মের কারণাবস্থায় বা প্রলয়কালে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন। পূর্বোক্ত যে যে কারণে, সংসারাবস্থায় জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সেই কারণেই জগৎকেও সেই সময়ে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সেই কারণেই জগৎও সেই সময়ে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। অপরপক্ষে প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ একীভূত হয়ে যায়, যেমন লবণও সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে সমুদ্রের মধ্যে বিলীন হয়ে তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। পুনরায় লবণ-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সমস্ত দ্রব্যই যেমন লবণ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মে বিলীন জগৎও চেতন রূপ প্রাপ্ত হয়। ‘চেতনে অচেতনং ক্ষিপ্তম্ অভেদাৎ চেতনং ভবেৎ।’ (৩-২-১৭)

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ

ভাস্কর ত্রিতত্ত্ববাদী। তাঁর মতে ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ—এই তিনটি তত্ত্ব। এই ত্রিতত্ত্বের সম্বন্ধের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মের কার্যাবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টিকালে ও সংসারাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। কিন্তু ব্রহ্মের কারণাবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়কালে ও মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন।

প্রায়শ্চৈ ভাস্কর কেবল-ভেদবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধেই যে এই সমালোচনা তা নিঃসন্দেহ। ভাস্করের মতে ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য সেজন্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে ভেদকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি যে বিভিন্ন দ্রব্য পরস্পর-ভিন্ন এবং একরূপ নিঃসঙ্কিঞ্চ, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে স্বীকার না ক'রে ত উপায় নেই। অভেদজ্ঞানের স্থায় ভেদজ্ঞানও জ্ঞান—‘ভেদজ্ঞানম্ অপি জ্ঞানমেব’ (২-১-১৪)। সে অস্ত্র অভেদজ্ঞান যদি মিথ্যা না হয়, ভেদজ্ঞানই বা মিথ্যা হবে কেন ?

এ কথাও বলা চলে না যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ বলে উভয়ের সহাবস্থিতি অসম্ভব। কারণ ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতিও প্রত্যক্ষদৃষ্টে, অনস্বীকার্য সত্য। বস্তুতঃ পৃথিবীতে কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ কোনোটিই দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক বস্তুই ভিন্নাভিন্ন—কার্য ও ব্যক্তিরূপে ভিন্ন, একই কারণোদ্ভূত এবং একই জাতির অন্তর্গত রূপে অভিন্ন। যেমন একটি মানুষ অন্য একটি মানুষ থেকে ব্যক্তিরূপে বিভিন্ন; কিন্তু উভয়েই মানবজাতিভূক্ত বলে অভিন্ন। প্রত্যেকই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সেজন্য ভেদাভেদের সহাবস্থিতি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বলে প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য।

অতএব এক ও বহু, ব্রহ্ম ও বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ নেই। যদি কোনোরূপ বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকত, তা হলে তৎ বিশেষ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ব্রহ্ম থেকে হতেই পারত না। সে জন্য এক ও বহুর সহাবস্থিতি সম্ভব ও সত্য।

এ রূপে ভেদের সত্যতা ও অভেদের সঙ্গে সহাবস্থান বিশেষ যত্নে সঙ্গে প্রমাণিত করে, ভাস্কর অবশেষে বলছেন যে, ভেদ সত্য হলেও নিত্য নর অর্থাৎ ভেদ আগন্তুক, অনিত্য, ঔপাধিকই যাত্রা, নিত্য বা স্বাভাবিক নয়। এই তত্ত্বটি ভাস্কর বাৎসর্য বিশেষ জোরে সঙ্গেই বলেছেন।

‘স চাভিন্নাভিন্নরূপোহভিন্নরূপং স্বাভাবিকমৌপাধিকং তু ভিন্নরূপম্’ ॥ (২-৩-৪৩)।

আমরা পূর্বেই দেখছি যে, ভাস্কর ‘উপাধি’ শব্দটিকে একটি নূতন বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে ‘ঔপাধিক’ হ’ল সেই গুণ যা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতর ভাবে সত্য—যদিও তা স্বাভাবিক গুণের স্থায় চিহ্নস্বরূপ নয়। সে জন্য ভাস্করের মতে ‘ভেদ’ ‘অভেদ’এর অপেক্ষা অল্প দ্বারী হলেও অল্প সত্য নয়। যতদিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন, কর্ম জড়ত্ব প্রমুখ উপাধির অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভেদও সত্য-বস্তু রূপেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ঘটটি চূর্ণ হয়ে গেলে যেমন ঘটাকালের আর অস্তিত্ব থাকে না, অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করা হলে যেমন স্বর্ণখণ্ডের কলরু সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি উপাধি তিরোহিত হলে, জীবেরও ভেদও তিরোহিত হয়।

সে জন্য ভাস্করের মতবাদকে ‘ঔপাধিকভেদাভেদবাদ’ বলা হয় (স্কন্দর ভট্ট)।

মোক

ভাস্করের মতেও মোক্ষ পরিপূর্ণ আনন্দধন অবস্থা—কেবলমাত্র দুঃখভাবই নয়। অধৈতবেদান্ত মতবাদের তীব্র সমালোচনা ক’রে ভাস্কর বলছেন যে, মোক্ষ শুদ্ধজ্ঞানের অবস্থা নয়। যেহেতু এরূপ তথাকথিত শুদ্ধজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানেরই ত নামাস্তর যাত্রা। মোক্ষ পরিপূর্ণ, পবন অছতুতি বা উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু তথাকথিত শুদ্ধজ্ঞানমূলক অধৈতবেদান্তমত মোক্ষে এ রূপ আনন্দোপলব্ধির অবকাশ কোথায়? সে জন্য এরূপ মোক্ষের অপেক্ষা এবং শৃগালত্বও প্রেরঃ।

‘নিঃসংবোধো নিরাস্বাদস্বপ্নশব্দে মোক্ষঃ স্ত্রাং চৈতন্তমাত্মাবশেষস্তাং বদন্তি কেচিৎ, শৃগালত্বং বনে বরশ্রুতি।’ (১-১-৪, পৃঃ ২১)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মোক্ষকালে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে যায়।

‘তন্মাদ্রুতঃ কারণাত্মানং প্রাপ্তঃ তদ্বদেব সর্বজ্ঞঃ, সর্বশক্তিঃ, সর্বাশ্রাতির্ভবতি।’ (৪-৪-৭)

সাধারণতঃ বেদান্তদর্শনে মোক্ষকে নিত্য ও জীবকে নিত্যমুক্ত বলে গ্রহণ করা হয়। যেহেতু অপসারণে যেমন পূর্বস্থিত পূর্ব একালিতাই হয় যাত্রা, নূতন ক’রে নূরুৎপত্তি হয় না—ঠিক তেমনি অজ্ঞানাবরণ

বিদূষিত হলে জীবের শাস্ত, প্রকৃত মুক্ত রূপটি উদ্ধাসিত হয়ে উঠে যায়, নূতন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয় না। সে অল্প মোক্ষলাভের অর্থ কেবল অজ্ঞানের অপসারণ ও চিরস্থায়ী স্বরূপের উদ্ঘাটন, নূতন কোনো অবস্থাপ্রাপ্তি নয়। এই হ'ল সাধারণ বেদান্ত মত। কিন্তু ভাস্করের মতে মুক্তি নিত্য নয় জীবও নিত্যমুক্ত নয়, মোক্ষ কেবলমাত্র নঞমূলক অজ্ঞানাপসারণই নয়, সেই সঙ্গে সম্মূলক নব অবস্থা প্রাপ্তিও। সে অল্প ভাস্কর বলছেন যে, উৎপাদ্য সংস্কার, বিকার ও প্রাপ্য বা আপ্য—এই চতুর্বিধ কর্মের মধ্যে প্রথম তিনটি মোক্ষের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও, চতুর্থটি পূর্ণভাবে সম্ভব। ভাস্কর বলছেন—

সত্যং ত্রিবিধ কর্ম ন সম্ভবতি, আপ্যং তু ন শকাতে নিরসিতুং। যদি চ নিত্যপ্রাপ্তঃ মোক্ষঃ শ্রাদযত্নেন সিদ্ধত্বাৎ সর্বলোকো মুচ্যতে।'

মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়। মোক্ষ যদি নিত্যপ্রাপ্ত হ'ত, তা হলে সর্বলোকই মুক্ত হয়ে যেত।

মোক্ষ নিত্যপ্রাপ্ত হলে আরেকটি অস্ববিধা হ'ত এই যে, মোক্ষোপদেশের কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকত না। সেজন্য ভাস্করের মতে জীব পূর্ব থেকেই মুক্ত নয়—পরে সাধন বলেই সে মুক্তিলাভ করে।

‘অয়ং ভিন্নাভিন্নত্বাবো জীবঃ সংসারী ন কদাচিন্মুক্তপূর্বঃ।’ (১-৪-২১, পৃঃ ৮১)।

ভাস্কর বিদেহমুক্তিবাদী। তিনি অদ্বৈতবেদান্তসম্মত জীবমুক্তিবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ভাস্করের মতে মুক্তি দ্বিবিধ সত্ত্বোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। ছান্দোগ্যোপনিষদ বলছেন—যিনি যে ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সেই ভাবে মুক্তিলাভ করেন। সেজন্য ধারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁরা পরব্রহ্মকে লাভ করে সত্ত্বোমুক্তি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁরা তৎকথাৎ পরব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পরব্রহ্মের স্ফায়ই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী হন। অন্তপক্ষে ধারা কেবল কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের আরাধনা করেন তাঁরা প্রথমে কেবল কার্যব্রহ্মকেই লাভ করেন, পরব্রহ্মকে নয়। তার পরে হিরণ্যগর্ভলোকে পরমজ্ঞান লাভে ধন্য হয়ে তাঁরা হিরণ্যগর্ভসহ পরব্রহ্মে বিলীন হন। এই হ'ল ক্রমমুক্তি। এই শ্রেণীর জীবেরা প্রথমে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নই থাকেন এবং ব্রহ্মের স্ফায় সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী হতে পারেন না। পরে অবশ্য সত্ত্বোমুক্ত জীবগণের স্ফায়ই তাঁরা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ও ব্রহ্মের স্ফায় সর্বশক্তিমান হন।

‘বিদ্যা-মুক্তিঃ। সত্ত্ব এব মুক্তিঃ, ক্রমমুক্তিচেতি। যে সাক্ষাদব্রহ্মৈবোপাসনে সত্ত্ব এব মুচ্যেবন্। ইত্যে তু হিরণ্যগর্ভং প্রাপ্য...তেন সহ মুচ্যেবন্।’ (৪-৩-১৪ পৃঃ ২৪০)।

সাধন। জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ

ভাস্কর বারংবার জোরে মতে কর্মকে মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধনরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভেই বলছেন যে, কর্মজিজ্ঞাসার পথেই, পূর্বে নয়, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সম্ভবপর। কারণ জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয় দ্বারাই মোক্ষলাভ হতে পারে, অন্য কোনো উপায়ে নয়। সে জন্য কোন শ্রেণীর কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় করা কর্তব্য, তা স্থির করবার জন্য কর্মের স্বরূপ প্রথমে জানতে হয়। এক্ষেত্রে ভাস্কর সর্বত্রই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ বিশেষ জোরে মতে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চিত করেছেন। ভাস্করপ্রারম্ভেই তিনি বলছেন—

‘অত্র হি জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়াৎ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ সূত্রকারস্ত অভিপ্রেতা।’ (১-১-১)।

ভাস্করের মতে ধারা কেবলমাত্র বেদপাঠ করেন তারা বৈদিক বাক্যাদির অর্থ গ্রহণে মাত্র সমর্থ কিন্তু তারা ত কোনোক্রমেই প্রকৃত জ্ঞান-পদবাচ্য নন কারণ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নিভাম-কর্ম-সাধনক অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের যথাযথ সাধন, তপস্বী, পরসেবা, সংযম, শৈর্ষ প্রমুখ নিভামকর্মাত্মী।

অবশ্য কেবল কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না কারণ এ রূপ জ্ঞানহীন, স্ফায় কর্মের ফল কণিকাই মাত্র। কিন্তু জ্ঞানসম্বিত নিভাম কর্মের ফল নিত্য বা মোক্ষ। ভাস্কর বলছেন—‘অতঃ কণিকস্তাপি কর্মণো জ্ঞান-বস-বিকৃত অক্ষয়কল্যাণ ন কীর্ততে ইতি উচ্যতে।’ (১-১-১, পৃ: ৪)

অপর পক্ষে কেবল জ্ঞানও সমভাবে নিফল। জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়েই কেবল মোক্ষলাভ সম্ভবপর।

জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ

জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়েই যদি এই ভাবে মোক্ষের একমাত্র উপায় হয়, তা হলে প্রশ্ন হতে পারে এই যে, উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি? ভাস্কর বলছেন যে, কর্ম জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ নয়, যেহেতু জ্ঞান প্রবণ প্রভৃতি থেকেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পরে কর্ম জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সহকারী এবং জ্ঞানকে মোক্ষ আনয়নে সাহায্যকারী। এ রূপে মোক্ষের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্ম প্রত্যেকেই নিজস্ব ফল আছে। যথা জ্ঞান অবিদ্যা, লোভমোহাদি দূর করে; সে ক্ষেত্রে কর্ম প্রাক্তন কর্মসংস্কার ধ্বংসীভূত করে।

উপাসনা-কর্ম-সমুচ্চয়

ভাস্করের মতে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয় এবং উপাসনা-কর্ম-সমুচ্চয় একার্থক। কারণ জ্ঞানের অনিবার্য পরিণতি উপাসনা। এ রূপে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ক’রে মুক্ত হইতঃই ব্রহ্মোপাসনার প্রবৃত্তি হন এবং উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ভাস্কর কারণব্রহ্ম ও কার্যব্রহ্ম—ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ রূপের কথা পুনঃপুনঃ বলেছেন। সেই অনুসারে ব্রহ্মোপাসনাও দ্বিবিধ হতে পারে।

প্রথমতঃ কারণ-ব্রহ্মোপাসনা। এটিই পরব্রহ্মোপাসনা, শ্রেষ্ঠব্রহ্মোপাসনা, সচোমুক্তিলাভের উপায়রূপ। এ রূপে ব্রহ্মের শুদ্ধ কারণরূপ বা তাঁর অভেদ, নিরাকার, প্রপঞ্চবিলক্ষণ, সন্নকণ, বোধনক্ষণ, একমেবাদ্বিতীয় রূপই শ্রেষ্ঠ ধ্যায়। এ রূপ ব্রহ্মকে উপাসকের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে ধ্যান করাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান। সে অস্ত পব্রহ্মধ্যান ‘আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি’ এইরূপ অভেদ-ধ্যান। এ রূপ অভেদ-ধ্যান জীবের অজ্ঞান বিদূষিত ক’রে জীবেরের ঔপাধিক ভেদের বিনাশ করে। অন্তান্ত কয়েক ক্ষেত্রের দ্বারা এ স্থলেও ভাস্কর ‘কনক-গত-মণের’ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে যেমন ‘অগ্নিতে বিগলিত হলে স্বর্ণের কলকও বিদূষিত হয়ে যায়, তেমনি অভেদ-ধ্যান দ্বারা জীব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলে, ব্রহ্মের সঙ্গে তার ঔপাধিক ভেদেরও বিলয় হয়।

‘উপাধিকৃতভেদস্ত মোহভেদভাবনরূপনীর্ততে। অগ্নিসম্পর্কেণ কনকগতমলস্ত।’ (৪-১-৩)।

পরব্রহ্মের এ রূপ নিরাকার-নিগূর্ণরূপ ধ্যান ব্যতীত, কয়েকটি সত্ত্ব উপাসনাও বিভিন্ন উপনিষদে বিহিত হয়েছে—যথা শান্তিলাভিত্তা, মধু-বিদ্যা প্রভৃতি। এগুলির প্রত্যেকটিই মোক্ষের দ্বার।

দ্বিতীয়তঃ কেহ কেহ পরব্রহ্ম বা কারণ ব্রহ্মের নিরাকার নিগূর্ণরূপ ধ্যান না ক’রে, প্রথমে

কেবলমাত্র কার্যব্রহ্ম বা হিমাগর্ভেই উপাসনার প্রবৃত্তি হতে পারেন। এঁরা প্রথমে হিমাগর্ভকে লাভ ক'রে, পরে পরব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন। অতএব ঈদৃশ উপাসকগণ ক্রমশঃ অধিকারী।

তৃতীয়তঃ নাম প্রভৃতিকেই ব্রহ্মরূপে পূজা ক'রে কেহ কেহ কেবলমাত্র প্রতীকোপাসনাতেই রত থাকতে পারেন। এ রূপ প্রতীকোপাসনা অবশ্য যোক্ত্যের উপায়স্বরূপ নয়, সাধারণ ফললাভেই কারণ মাত্র।

ভাস্কর-যোগেশ্বরের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ। ভাস্করের নিঃসর্গবাদ অনৈতিক

শঙ্করের সু-উচ্চ অদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধজ্ঞানবাদকে একান্তর নীচে নামিয়ে আনবার প্রথম প্রচেষ্টা আমরা পাই ভাস্করে। অবশ্য তব্দের দিক থেকে অদ্বৈতবাদের এবং ব্যবহারের দিক থেকে শুদ্ধজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের প্রধানতম ও পূর্ণতম পুরোধা বলা চলে একমাত্র রামানুজকেই। কারণ ভাস্কর রামানুজের পূর্ববর্তী হলেও, ধ্বংসমূলক অদ্বৈতবাদ সমালোচনা, অথবা গঠনমূলক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চনা—কোনোদিক থেকেই তিনি রামানুজের সমকক্ষ নন এবং তাঁর দ্বারা কোনো সম্প্রদায়ও তিনি সৃষ্টি ক'রে যেতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও, দীপ্ত ভাস্করতুল্য অদ্বৈতবাদের অভ্যুদয় জ্যোতির্কে সাধারণ জনদের নিকট সহনীয় ক'রে তুলবার জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তা সর্বদিক থেকেই ধন্যবাদার্থ, সন্দেহ নেই।

অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই প্রচেষ্টার ক্রটি অনেক। প্রথমতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণের কথাই ধরা থাক। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সর্বদাই নিঃসর্গ ও নির্বিশেষ, রামানুজ-নিম্নার্কে প্রভৃতির মতে তিনি সর্বদাই সগুণ ও সর্বিশেষ। কিন্তু ভাস্করের মতে প্রথমে কারণরূপে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও নিঃসর্গ; পরে কার্যরূপে তিনি সর্বিশেষ ও সগুণ হন। অবশ্য এ কথা সত্য যে ভাস্কর যখন ব্রহ্মকে নিঃসর্গ ও নির্বিশেষ বলছেন, তখনও তাঁকে অদ্বৈত-বেদান্তের অর্থে নিঃসর্গ-নির্বিশেষ বলছেন না। কারণ শঙ্করের মতে ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি কোনোকালেই নেই, কেবল স্বরূপমাত্রই আছে। কিন্তু ভাস্করের মতে ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি নিশ্চয়ই আছে। অথচ লবণ-বিন্দু যেমন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি কারণাবস্থায় ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি ব্রহ্মেই সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে একীভূত হয়ে যায় বলে, সেই সময়ে, সেই অর্থে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃসর্গ, স্বগতভেদহীন, স্বরূপবিশেষই মাত্র। এ রূপে এ ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বিভিন্ন মতবাদ পাই—

১) ব্রহ্ম সকলাবস্থাতেই নিঃসর্গ, নিরাকার, নির্বিশেষ, (a pure unity, a bare identity an abstract whole)—শঙ্কর।

২) ব্রহ্ম সকলাবস্থাতেই সগুণ, সাকার, সর্বিশেষ (a unity-in-difference, a concrete whole)—রামানুজ প্রভৃতি।

৩) ব্রহ্ম কারণাবস্থাতেই নিঃসর্গ, নিরাকার, নির্বিশেষ; কার্যাবস্থাতে সগুণ, সাকার, সর্বিশেষ—ভাস্কর।

এ স্থলে সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, হয় প্রথম বিকল্পটি, নয় দ্বিতীয় বিকল্পটিই গ্রহণীয়, তৃতীয়টি নয়। কারণাবস্থায় যে ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি অনভিব্যক্তরূপে ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে থাকে, তা রামানুজ

প্রভৃতিরাও ত স্বীকার করেন। কিন্তু এই বিলীনতার অর্থ এই নয় যে, তারা ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন হয়ে যায়। তারা সেই সময়ে জীবজগৎ রূপে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত না হলেও ত্রৈলোক্য থেকে ভিন্নই থাকে এবং ত্রৈলোক্যের স্বগতভেদরূপে ত্রৈলোক্যের সবিশেষত্ব সাধন করে। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি বাস্তব ভাবে দহনকার্যে অভিব্যক্ত না হলেও, অপ্রকাশিত শক্তিরূপেও অগ্নিস্বরূপ থেকে সেই অর্থে সর্বদাই ভিন্নই থাকে। সুতরাং হয় বলতে হয় যে, গুণ স্বরূপে পৰ্য্যবসিত হয়েছে ব'লে কেবল সর্বদাই স্বরূপমাত্রই আছে ; নয় বলতে হয় যে, গুণ স্বরূপ থেকে ভিন্ন ব'লে সর্বদাই স্বরূপ থেকে ভিন্নই থাকে। প্রথমে কেবল স্বরূপ, পরে স্বরূপ ও স্বরূপভিন্ন গুণ—ত্রৈলোক্যের এ রূপ অবস্থা পরিবর্তন কোনক্রমেই স্তাঘ্য নয়।

অবশ্য এ কথা সত্য যে ভাস্কর কোনো স্থলেই ত্রৈলোক্যকে স্পষ্ট 'নিগূর্ণ' বলে অভিহিত করেন নি। কিন্তু তাঁর মতবাদের যে এই অর্থ হয়ে দাঁড়ায়, তা অবশ্যস্বীকার্য। যদি কারণাবস্থায় ত্রৈলোক্যের গুণ ও শক্তি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সবণ-কণার মতোই ত্রৈলোক্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে, তা হলে সেই অবস্থায় ত্রৈলোক্য নিশ্চয়ই নিগূর্ণ নির্বিশেষ, শুদ্ধস্বরূপমাত্রই হয়ে দাঁড়ান—ভাস্কর স্পষ্ট ক'রে যাই বলুক না কেন।

এর অপর একটি প্রমাণ এই যে, ভাস্কর অন্য প্রসঙ্গে স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন যে, প্রলয় ও মুক্তিকালে জীবজগৎ ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে যায়—তাদের ও ত্রৈলোক্যের মধ্যে যে সংসারাবস্থা কালীন ঔপাধিক ভেদ, তার লেশমাত্রও তখন থাকে না। এই স্পষ্ট উক্তির পর সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই যে, কারণাবস্থায় ত্রৈলোক্য কেবল স্বরূপমাত্র রূপেই বিবাজমান থাকেন, অর্থাৎ সেই সময়ে তিনি নিগূর্ণ ও নির্বিশেষ, যেহেতু তাঁর গুণ-শক্তি-স্বরূপ চিৎ (জীব) ও অজগৎ (অচিৎ) সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, রামানুজ প্রভৃতির স্তায় নির্দ্বার্ক ত্রৈলোক্যকে স্পষ্ট ক'রে 'অনন্ত-গুণমণ্ডিত' প্রমুখ বিশেষণে ভূষিত কোনো ক্ষেত্রেই করেন নি এবং ত্রৈলোক্যকে বারংবার 'সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তি' বলে উল্লেখ করা ব্যতীত, তাঁর অন্ত্যন্ত গুণগ্রামের কোনো উল্লেখও ভাস্কর করেন নি। বিশেষ ক'রে ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকদের অতি প্রিয় মধুর গুণের কোনো আভাস মাত্র ভাস্কর-বেদান্তে নেই।

সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভাস্কর শঙ্করের প্রভাবে এ রূপ প্রভাবাধিত ছিলেন যে, শঙ্করের মতবাদের তীব্র সমালোচনা ক'রেও তিনি ভেদাভেদবাদিগণের মণ্ডনবাদ যেন ঠিক প্রাণ দিয়ে, মন খুলে গ্রহণ করতে পারেন নি। সে জন্য একপক্ষে তিনি যেমন পূর্ণ নিগূর্ণত্ববাদ বর্জন করেছেন, অন্যপক্ষে ঠিক তেমনি পূর্ণ মণ্ডনত্ববাদও যেন স্বীকার করতে পারেন নি। ফলে তাঁর মতবাদ পরিণত হয়েছে নিগূর্ণত্ব-মণ্ডনত্বের একটি অধৌক্তিক সমন্বয়ে মাত্র।

ভাস্করের উপাধিবাদ অধৌক্তিক

ভাস্কর-বেদান্তের সর্বত্রই এই অন্তর্বিবোধের লক্ষণ দেখা যায়। একদিকে ভাস্কর শঙ্কর-মতবিরোধী ; কিন্তু অন্যদিকে তিনি শঙ্করের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকেও ত সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। সে জন্যই তাঁকে করতে হয়েছে তাঁর অভিনব 'উপাধি' বাদের অবতারণা। শঙ্করের 'উপাধি' শব্দটি তিনি রেখেছেন অথচ তাকে নিতে চেয়েছেন এক সম্পূর্ণ নূতন অর্থে। ফলে তাঁর মতবাদ আত্মোপাস্ত এই অন্তর্বিবোধের দ্বন্দ্বে কতবিস্তৃত হয়ে উঠেছে।

সত্য অনিত্য হতে পারে না।

যেমন তিনি বলেছেন যে, যা স্বাভাবিক তা চিরস্থায়ী ; যা ঔপাধিক তা অল্পস্থায়ী—অথচ উভয়েই সমান সত্য। এটি আমাদের ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতীয় মত হ'ল এই যে, যা ক্ষণিক, যা চিরস্থায়ী নয়, তা পারমার্থিক সত্য নয়। যা সত্য, তা স্থির—তার বিনাশ হতে পারে কি ক'রে? বস্তুতঃ সত্য নিজেই নিজের গৌরবে বিরাজমান, তার সত্তা বা অস্তিত্ব কেবল তার নিজের উপরই নির্ভরশীল, অন্য কোনো বাইরের দেশকালাদি প্রমুখ সত্যের উপর নয়। সে সত্তা সত্য দেশাতীত, কালাতীত, সকল সত্যাতীত, শাস্ত্রত সত্তা (absolute, not relative reality)। যা ক্ষণস্থায়ী বা অল্পকালস্থায়ী তা ত এইভাবে সত্য হতে পারে না। এইদিক থেকেও ভাস্করের মত গ্রহণীয় নয়।

তার পূর্বোক্ত নিজস্ব ঔপাধি-বাদ অনুসারে ভাস্কর বলেছেন যে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের অভেদ স্বাভাবিক ব'লে সর্বদা, সর্বাবস্থায় বিद्यমান ; ভেদ ঔপাধিক বলে কেবল সংসারকালেই বিद्यমান। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন। সৃষ্টি বা সংসারকালে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ ভিন্নাভিন্ন। সৃষ্টির পরে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন। মুক্তিকালেও ঠিক তাই। অথচ ভাস্কর বারংবার জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে ভেদ ও অভেদ সমান সত্য। যে ভেদের পূর্বেও অস্তিত্ব ছিল না, পরেও অস্তিত্ব থাকবে না, সেই ভেদের কেবল সংসারকালীন, অবিজ্ঞাত অস্তিত্বের মূল্য কতটুকু? বিশেষ ক'রে মোক্ষই ত সর্ববাদিসম্মত ভাবে জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা ; জীবনের মূল উদ্দেশ্য। সেই মোক্ষকালেই জীব যদি ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে যায়, তবে সেই ত তার প্রকৃত স্বরূপ—ব্রহ্মভিন্ন রূপ তার মাত্র আগন্তুক, অনিত্য রূপ।

ব্রহ্ম পরিবর্তনশীল নয়

ভাস্কর-বেদান্তের এই ঔপাধি-বাদের প্রধান ত্রুটি হ'ল এই যে, এই মতানুসারে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ পরিবর্তনশীল হয়ে পড়ছেন। পূর্বেই যা বলা হয়েছে—নির্গুণ, নির্বিশেষ, স্বগতভেদবিহীন ব্রহ্মা সত্ত্ব, সবিশেষ, স্বগতভেদবান্ হয়ে পড়ছেন ; অণু জীব বিভূ হয়ে পড়ছে ; জড় জগৎ চিৎস্বরূপ হয়ে পড়ছে। অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা সমান সত্য : যথা জীবের অণু ও বিভূ সমান সত্য—অথচ একই জীব দুই সমসত্য স্বরূপভাগী হচ্ছে। এ রূপে সৃষ্টির পূর্বে যে জীব বিভূ ছিল, তা সৃষ্টির পরে অণু হয়ে পড়ছে, পুনরায় প্রলয়কালে বিভূ হয়ে যাচ্ছে। এ রূপ ভাবে স্বরূপ পরিবর্তন ও পূর্বস্বরূপধ্বংস অসম্ভব কথা নয় কি?

মুক্তি অনিত্য নয়

জীব যে নিত্যমুক্ত নয়, মুক্তি যে 'অন্ত' অনিত্য পদার্থ—এই মতবাদও সেই একই কারণে দোষগ্রস্ত।

ভাস্কর-বেদান্তে ভক্তিবাদ নেই

ভেদাভেদবাদের অবশ্যস্বাবী অঙ্গ ভক্তিবাদ। কিন্তু ভাস্কর-বেদান্তে ভক্তিবাদের কোনো স্থান নেই। তিনি উপাসনাকে মুক্তির উপায়স্বরূপ বলে গ্রহণ করেছেন সত্য। কিন্তু 'ভক্তি' শব্দটির উল্লেখমাত্র তার ভাস্ত্রে নেই। পরমদেবতার সঙ্গে মুমূক্ষুর কোনোরূপ স্মধুর ব্যক্তিগত সঙ্ঘর্ষের আভাসও তাঁর মতবাদে নেই। বস্তুতঃ তাঁর 'উপাসনা' জ্ঞানেরই নামাস্তর মাত্র। শব্দের বিকল্পে কর্মকে সাধনক্ষেত্রে স্থান দিলেও, ভক্তিকে তিনি কোনো স্থান দিতে পারেন নি।

ভাস্কর-বেদান্তের অন্তর্ধান

ভাস্কর-বেদান্ত পাঠে এই ধারণারই উল্লেখ হয় যে, ভাস্কর প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী। দৃশ্যতঃ অদ্বৈতবেদান্ত বিরোধী হলেও অদ্বৈতবেদান্তের নিগূর্ণবাদ, কেবলাভেদবাদ, শুদ্ধজ্ঞানবাদই ভাস্করের প্রকৃত মতবাদ—যতই না কেন তিনি 'উপাধি' প্রমুখ কতগুলি অবাস্তব তত্ত্ব এনে সেই সত্যটিকে গোপন করতে চেয়েছেন। এ কথা সত্য যে, ভাস্কর শব্দের অত্যাগ্র অদ্বৈতবাদ মন থেকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না অথচ অন্য কোনো স্থষ্ট, কায়সঙ্গত নূতন মতবাদও প্রপঞ্চনা করতে সমর্থ হন নি। এই উভয়-সঙ্কটের মধ্যেই অন্য ভাস্করের অভিনব 'উপাধিক-ভেদাভেদবাদের'। প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতের মিথ্যাভ্য ভাস্করের কোনোক্রমেই সহ্য করতে পারছিলেন না। বলেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নূতন, মৌলিক উপাধিবাদের—অথচ শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ভেদাভেদবাদের পূর্ণ গ্রহণেও তিনি যেন সাহসাবলম্ব্য করতে পারছিলেন না। এটিই হ'ল ভাস্কর-বেদান্তের মূলোভূত দোষ।

সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভাস্কর বেদান্তের অন্তর্নিহিত গাভীর্য ও মর্যাদা আমাদের মুগ্ধ না ক'রে পারে না। শব্দরচয়িত্রী হয়েও পৃথিবীর দার্শনিক ও নৈরায়িকপ্রবর শব্দের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা অল্প সাহস ও আত্মবিশ্বাসের কথা নয়। ভাস্কর-বেদান্তের সর্বত্র এই আবেগোচ্ছ্বাসবিহীন স্থিরবুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয়, পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। সহস্ররশ্মি ভাস্করের মতোই তাঁর একটিমাত্র গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র-ভাস্করের স্বদূর-প্রসারী কিরণ পরবর্তী বহু যুগ আলোকিত ক'রে রেখেছে। তাঁর মতবাদ গ্রহণ না করলেও তা উপেক্ষা করবার সাহস সে জন্ত কারোই হয় নি। এই কারণে পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ভাস্কর-মতের উল্লেখ প্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

ঠিক বলতে কি ধর্মের পথ অমৃত্যুর পথ। তা হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে বিশ্বসত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করতে চায়। প্রায় সকল প্রচলিত ধর্মই এই পথ গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথও মূলত এই পথেই ধর্মসমস্যা সমাধান খুঁজেছিলেন। কিন্তু তাঁর গভীর মন একটি অবস্থায় লব্ধ একটি বিশেষ চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় নি। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন পথে চিন্তা ক'রে তিনি মতের পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করলে তা করতে দ্বিধা করেন নি। এই ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে গিয়ে তাঁর ধর্মচিন্তার পরিণত রূপটির আবির্ভাব হয়েছে। খোলা মন নিয়ে তাঁর সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই কারণে তাঁর ধর্ম-সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তা শুধু অভিনব হয় নি মৌলিকত্ব গুণে ভূষিত হয়েছে।

মনে হয় তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা দুটি ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এখানে তাদের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তাতে আমাদের মৌলিক আলোচনায় প্রবেশ করতে সুবিধা হবে। তাদের প্রথমটি হল তাঁর নিজের মতিগতি। এ বিষয় প্রসঙ্গত ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশ্বসত্তার সহিত পরিচয়ের মান কি হওয়া উচিত সে বিষয় তাঁর চিন্তা খুব স্পষ্ট ছিল। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল জ্ঞানমার্গে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয় এনে দিতে অক্ষম। তা যে পরিচয় এনে দেয় তা নিতান্তই বাহ্যিকের পরিচয়, তা গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। অপর পক্ষে মৌলিক সত্তার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় খেলে প্রীতির পথে। তাঁর ধারণায় ঈশ্বরের সহিত প্রীতির সমুদ্রের ভিতর দিয়ে তাঁর গভীরতর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি জ্ঞানমার্গ, যুক্তিবৃত্তি তার অবলম্বন। দ্বিতীয়টিকে প্রীতিমার্গ বলতে পারি, হৃদয়বৃত্তি তার অবলম্বন। স্পষ্টতই দ্বিতীয়টির প্রতি তাঁর পক্ষপাত বেশী।

তাঁর প্রতিপাককে সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন একজন চিকিৎসক এবং তাঁর পুত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তার উপর এই দুই মার্গেরই প্রয়োগ সম্ভব। ধরা যাক তাঁর পুত্রের অসুখ করেছে। তখন তিনি তার চিকিৎসার জন্য তাকে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মতভাবে পরীক্ষা করবেন। এখানে তিনি তাঁর পুত্র সম্পর্কে জ্ঞানমার্গের প্রয়োগ করেছেন। অপর পক্ষে তিনি তাঁর পুত্রের জন্য যে গভীর স্নেহ বহন করেন সন্তানের রোগ হ্রাস তাকে উৎসাহিত করলে তিনি তাকে উচ্ছ্বাস ভরে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং সন্তানও তাতে সাড়া দেয়। এই প্রীতির বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তিনি সন্তান সহজে যে জ্ঞান আহরণ করেন তা আরও গভীর পরিচয় দেয়। এখানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।^{১৬} যুক্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞানের রীতিতে যা পাই তিনি তাকে তাই জানা বলেছেন; আর হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগে প্রীতির সহজে যা পাই তাকে তিনি পাওয়া বলেছেন।

১৬ 'The Scientific Knowledge of his son is information about a fact and not the realisation of a truth—the truth of relationship, the truth of a harmony in the universe, the fundamental principles of creation.'

দ্বিতীয় যে জিনিসটি তাঁর ধর্ম সংস্কার সমাধানে প্রযুক্ত সিদ্ধান্তটিকে প্রভাবান্বিত করেছে তা হল তাঁর নিজের স্থাপিত ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব আদর্শ। সে আদর্শটি একান্তই মৌলিক। তাঁর ধারণার আদর্শ ধর্ম হওয়া উচিত তাই যা মানুষের সকল মৌলিক বৃত্তিগুলির সমানভাবে পরিবর্তনে সহায়তা করে মানুষকে পরিপূর্ণ মানবত্বের অধিকারী করবে।

এখন মানুষ হল একটি জটিল সত্তা। তার নানাবৃত্তি, নানা আকৃতি। প্রথমত তার বুদ্ধিবৃত্তি একটি মৌলিক বৃত্তি। তাকে অবলম্বন করে বিশ্ববহুকে ভেদ করবার একটি আকৃতি তার মনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা হতেই তার জ্ঞানপিপাসার উৎপত্তি। তার হৃদয়বৃত্তি আছে এবং তাকে অবলম্বন করে অন্তরে প্রীতি করবার এবং প্রীতি পাবার আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগে তৃতীয়ত তার একটি ইচ্ছাবৃত্তি যার নিয়ন্ত্রিত কর্মে আকৃতি আছে। এই ভাবে তার তিনটি মৌলিক বৃত্তি তার মনে তিনটি শক্তিশালী আকৃতি প্রোথিত করে দেয়। এই বিভিন্ন আকৃতিই মানুষকে তার জীবন পথে এগিয়ে নিয়ে চলে।

কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রেও তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রভাবেই বিভিন্ন ধর্মচরণের রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। যার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল সে জ্ঞানমার্গে মূল সত্যের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহী হবে। যে মানুষের হৃদয়বৃত্তি প্রবল সে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইবে। গীতার এই দুই শ্রেণীর মানুষকেই ভক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিকে জিজ্ঞাসু এবং দ্বিতীয়টিকে ভক্ত বা জ্ঞানী বলা হয়েছে।^{১৭} আবার যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হওয়ার কর্মে আকর্ষণ বেশী সে এমন রীতি খোঁজে যেখানে কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা সম্ভব হয়। এই শ্রেণীর মানুষই অনেক সময় সমাজসেবক হয়। এই মনোবৃত্তির প্রেরণা হতেই মানবিকতার উৎপত্তি। অনেক ক্ষেত্রে সেবাবৃত্তির ও ধর্মের উপর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে বিগ্রহরূপে কল্পনা করে তাঁর সেবার অন্ত যে নানা আনুষ্ঠানিক রীতি গড়ে উঠেছে তা এর সুন্দর দৃষ্টান্ত।

এই ভাবে মতিগতির প্রভাবে ধর্মচরণ রীতি নানারূপ গ্রহণ করে জটিল আকার ধারণ করে। এই পরিবেশে প্রশ্ন ওঠে এত যে বিভিন্ন রীতি তাদের কোনটি গ্রহণ করব। এটার মীমাংসা এ পর্যন্ত হয়ে এসেছে দুই পথে। এক পথ হল যেটি ভালো মনে হল সেটিকে গ্রহণ করা এবং পণ্যগুলিকে তুলনার নিকটজ্ঞানে পরিহার করা। আমাদের দেশে এর সুন্দর উদাহরণ মেলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম আন্দোলনে। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তখন বিগ্রহকে কেন্দ্র করে নানা আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে নিজেকে জটিল করে তুলেছে। এদিকে যারা বাণিজ্য করতে এসে আমাদের মনবিহ হয়ে বসল তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিরাকার উপাসনা রীতি নব্য ইংরাজি শিক্ষিতদের মনে এক ভিন্ন রীতির ধর্মের আশ্রয় এনে দিল। তারা তখন হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিকতা ছুঁই বলে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের অনেকে খৃষ্টধর্মাবলম্বী হল। আর একদল মানুষ অসুস্থরূপে ক্রটি পোষণ করে ও রাজা রামমোহন বাবুর স্থাপিত জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক নূতন নিরাকার উপাসনা রীতি গ্রহণ করল। এই ভাবেই ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল।

১৭ চতুর্বিধ ভক্তের নাম: বুদ্ধি নোহ বুপ।

বার্তা জিজ্ঞাসুর্বার্তা জ্ঞানী চ ভরতর্ভত। —গীতা ১৭।১৬

আর এক পথেও এই সমস্তার সমাধান হতে পারে। তা হল সমন্বয়ের পথ। সমন্বয় বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়। দুটি ভিন্ন ধর্মীয় রীতির সমন্বয়ে একটি তৃতীয় রীতি গ্রহণের প্রস্তাব তা করে না। তা সংঘাতকে বর্জন করতে চেষ্টা করে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রে সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তুলে। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরকে ভক্তি নিবেদনের যে আকৃতি আগে তার তৃপ্তি সাধনই তো মূল কথা। সে ক্ষেত্রে যার যে ভাবে তৃপ্তি হয় সেইটিই তার পথ। একই পথ সকলের উপর জোর ক'রে আরোপ করবার প্রয়োজন নেই। এই যুক্তিটি রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বাণীর মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলতেন 'যত মত তত পথ'। মানুষের এ বিষয় কচির ভিন্নতা অনুসারে ধর্ম আচরণের নানা রীতি গড়ে উঠেছে। তাদের কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে প্রশ্ন অবাস্তব। যে যেটা গ্রহণ করতে পারে তার পক্ষে সেটাই উপযুক্ত। মতিগতি, বুদ্ধিশক্তি, হৃদয়বৃত্তি, তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার—সব জড়িয়ে ঠিক ক'রে দেয় কোন মানুষের কোন রীতিতে অধিকার। অধিকার ভেদে বিভিন্ন মানুষের গ্রহণযোগ্য রীতি বিভিন্ন হয়ে পড়ে। মূল সমস্যা হল ঈশ্বর তৃপ্তি নিবারণ। তৃপ্তি পেলে আমরা তো বিচার করি না; কলের জল খাব, কি নদীর জল খাব, কি কূপের জল খাব। যার যেটা সুবিধা সে তাই পান করুক। গীতারও এই দৃষ্টি ভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে মানুষ যে রীতিতে ঈশ্বরকে পেতে চায় সেই রীতিতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই দুটি পথের কোনোটিই গ্রহণ করেন নি। কারণ তাঁর আদর্শ ছিল বিভিন্ন। তিনি এ মত গ্রহণ করতে পারেন নি যে ঈশ্বরে ভক্তি প্রকাশই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। তা নিতান্তই সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর আদর্শ ছিল আরও ব্যাপক। তাঁর মতে মানুষের ধর্ম হবে তাই যা মানুষের সমগ্র প্রকৃতিকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। ধর্মের প্রকৃত কাজ হবে তার তিনটি মূলবৃত্তির—বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির যুগপৎ সুসমঞ্জস পরিবর্ধন ঘটিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণ মানব রূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করা। তাঁর মতে তাই হবে আদর্শ ধর্ম যা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকৃতির এমন ভাবে ব্যবস্থা করবে যাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই তিনটি বৃত্তিরও যুগপৎ বিকাশ ঘটাবে। তিনি বলেছেন মানুষের ধর্ম হল তার মানবত্ব।^{১৮} আদর্শ ধর্মের উদ্দেশ্য হবে সেই ধর্মকে বিকশিত করা।

এই পথেই তিনি নিজস্ব মতটিকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া দরকার। ধর্ম অর্থে তিনি কোনো প্রচলিত ধর্মরীতিকে গ্রহণ বা বর্জন করবার প্রশ্ন তোলেন নি। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা ক'রে ধর্মের যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তার ভিত্তিতেই নিজস্ব ধর্মরীতি গড়ে তুলেছেন। তাকে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলতে চান নি, তাকে তিনি বিশ্বের মানুষের ধর্মের আদর্শ হিসাবে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নানা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে যে বিভিন্ন রীতি গড়ে উঠেছে তার কিছু কিছু তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি, কারণ তিনি আদর্শ ধর্মের যে গুণ নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে সে গুণের তিনি অভাব লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তার ফলে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের আরও নিবিড় পরিচয় ঘটবে।

তিনি দার্শনিক রীতি যে অহুমোদন করতে পারেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত তা কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তিরই বিকাশ সাধন করে; হৃদয় মাত্ত্বের সামগ্রিক পরিবর্ধনের সহায়তা করে না। দ্বিতীয়ত তা মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে যে পরিচয় এনে দেয় তা নিতান্তই বাহ্যিকের পরিচয়। কারণ তা জোড়া দিয়ে দিয়ে আগে, এক সঙ্গে সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর ধারণা সমগ্রকে পাওয়া যায় হৃদয়বৃত্তির পথে স্রীতির সম্বন্ধে।

একই কারণে যে রীতি কেবল হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি সাধনকে অতিবেশী মূল্য দেয় তাকেও তিনি অহুমোদন করতে পারেন নি। তারও দুটি কারণ আছে। প্রথমত তাও একটি মাত্র বৃত্তির বিকাশের সহায়ক। শুধু তাই নয়, ভক্তির উচ্ছ্বাসকে অত্যধিক প্রাধান্য দেবার ফলে এই রীতিতে অনেক সময় উদ্বাহনা এসে পড়ে। আমাদের দেশে কীর্তন করতে করতে অনেকের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে মোহপ্রাপ্তি ঘটে। এই ধরনের উপাসনা রীতির বিরুদ্ধে তিনি তাই এই ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—

‘যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে
ভাবোন্মাদ মস্ততায়, সেই জ্ঞান হারা
উদ্ভ্রাস্ত উচ্ছল প্রেম ভক্তি মদ ধারা
নাহি চাহি নাথ।’^{১১২}

এই ধরনের ভক্তি রসাত্মক ধর্মের আরও এক রূপ পাওয়া যায় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনায়। এখানে ঈশ্বরকে বিগ্রহরূপে পূজা করা হয়। এই ধরনের উপাসনাবৃত্তি ভাবপ্রাণ ব্যক্তির কচির অহুকূল। বিগ্রহ সামনে থাকায় স্থিতি এই যে এখানে ভক্তি বা প্রজ্ঞা নিবেদনের অন্ত ঈশ্বরের একটি কল্পিত প্রকট প্রকাশ পাওয়া যায়। ফলে প্রজ্ঞানিবেদনের উপায়গুলিকেও স্থূল এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। উক্ত ঈশ্বরকে নাগালের মধ্যে পায় এবং তাঁকে সাজ সজ্জায় ভূষিত ক’রে নানা ভাবে সেবা করবার সুযোগ পায়। এই কারণেই পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের এত আকর্ষণ।

কিন্তু যে আদর্শ-ধর্মাচরণের মানদণ্ড রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছেন তার পরীক্ষায় একেও উত্তীর্ণ করানো যায় না। তার কারণ প্রথম তা কেবল হৃদয়বৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। বিগ্রহ সেবার মধ্যে কর্মবৃত্তির প্রয়োগের কিছু সুযোগ ঘটে বটে কিন্তু তাও সার্থক হয় না, কেবল ভক্তি নিবেদনেই পর্যবসিত হয়। অতিরিক্ত ভাবে এতে খানিকটা মৃগ্যভাব আসে এবং আচার ও অহুষ্ঠানের বাহ্যিকের মাঝখানে ভক্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলে। যা গোণ জিনিস তাই মৃগ্য স্থান অধিকার ক’রে বসে। তা মনুষ্য বিকাশের অন্তরায়। তিনি তাই তার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছেন—

‘মনুষ্য তুচ্ছ করি যারা সারা বেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা খেলা
মৃগ্যভাব ভোগে সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুস্তল।’^{১২০}

এই ভাবে বিভিন্ন রীতির তিনি কোনোটিকেই গ্রহণ করতে না পেয়ে শেষে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি নিজস্ব ধর্মবিষয়ক আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য তা একটি নিঃস্বপ্নীয় আদর্শ। তবে তা হঠাৎ গড়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে তাঁর সমগ্র সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে তা গড়ে উঠেছিল। তা পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে বিভিন্ন অবস্থায় এক সিদ্ধান্ত হতে অন্য সিদ্ধান্তে চলে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ অভিযানের শেষে তিনি যে পরিণত আদর্শটি গড়ে তোলেন তার মধ্যেই তাঁর মানবিকতা প্রতিফলিত। আমরা এখন এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাসটি ধারাবাহিক ভাবে স্থাপন করতে চেষ্টা করব।

এই দীর্ঘ অভিযানের প্রথম অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনেই। প্রকৃতির সহিত নিবিড় সংযোগের আকৃতিই তাঁর প্রথম লক্ষণ। তিনি এ বিষয় অবহিত ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে।^{২১} শৈশবে প্রকৃতির প্রতি কি তাঁর আকর্ষণ তিনি অস্বপ্ন করতেন তা তিনি 'জীবন স্মৃতি'তে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পৈত্রিক গৃহ উত্তর কলিকাতার এক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হলেও তাঁর শৈশবে তা একেবারে প্রকৃতির সংস্পর্শে বিবর্তিত ছিল না। তার আশে পাশে অনেক খোলা জমি ছিল। মূল গৃহের পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত উদ্যান ছিল। তার একেবারে পূর্বপ্রান্তে এক সারি নারিকেল গাছ মাথায় পাতার বাহার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। গৃহের দক্ষিণে একটি বড় দৌধি ছিল। তার কোণে একটি প্রাচীন বট মাথায় জটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে এখন বিচিত্রা ভবন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এক প্রশস্ত খোলা মাঠ ছিল। সেখানে বাড়ীর ঘোড়াদের সহিসরা বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াত।

বাড়ীর সংলগ্ন এই খোলা জায়গায় তৃণের সবুজ বিস্তার, গাছ পালায় বাতাসের আন্দোলন এবং উদ্যানের ফুলের শোভা বাল্যে তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। দীর্ঘের জলে হাঁসের সীতার কাটা দেখতে তাঁর ভারি ভালো লাগত। পূর্ব সীমানার সার বেঁধে যে নারিকেল গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকত তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ভোরের সূর্যের প্রথম কিরণে রঞ্জিত হয়ে তাদের মাথায় পাতার বেষ্টনী যখন বাতাসে আন্দোলিত হত তার শোভা তখন তাঁর মনকেও আন্দোলিত করত। এ সব কথাই তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ভোরের আকাশের আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার নিমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারবেন না। তাই দারুণ নীতেও প্রত্যাষে শয্যা ত্যাগ ক'রে প্রতিদিন বাগানে গিয়ে হাজির হতেন। মনে হয় তাঁর 'গীতিমালা'এর একটি কবিতায় এই অংশটি তাঁর বাল্যের স্মৃতিরই প্রতিধ্বনি—

‘আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি

তাই ভোরে উঠেছি।

আজ শুনেছি পাব প্রথম আলোর বাণী

তাই বাইরে ছুটেছি।’

২১ 'The first stage of my realisation was through my feeling of intimacy with nature.'

তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে আরও উল্লেখ করেছেন যে, বাল্যে প্রকৃতির সহিত এই নিবিড় যোগ তাঁর মনে প্রচুর আনন্দ এনে দিত ; কিন্তু প্রথম যৌবনে কবিতার আকর্ষণে তিনি যখন প্রথম নিজেকে ধরে দিলেন তখন প্রকৃতি হতে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এই পরিবেশে নিজের মনগড়া বিষয়কে কল্পনায় রঞ্জিত করে তিনি কবিতা রচনা করতে শুরু করলেন। ফলে তাঁর মনের মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম সার্থক কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর যুগ। তাই দেখি তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর কবিতাগুলিতে একটি বিষাদের মলিন ছায়া পড়েছে। তাঁর সেই সময়ের মানসিক অবস্থার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় নীচে উদ্ধৃত তাঁর কবিতার এই অংশটিতে—

‘তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
 গুমরি মরিতে চাস।
 তুই শুধু ওরে করিস রোদন
 ফেলিস ছুখের খাস।’

এই কবিতাটি তাঁর 'প্রভাত সঙ্গীতে' স্থান পেয়েছিল। বলা বাহুল্য তখন হতেই আপনার কল্পনার আপনি বহু থাকার ছঃসহ জীবন হতে মুক্তিলাভের আকুতি তখন তাঁর মনে সংক্রান্ত হয়েছিল। তার পর এক দিব্যদৃষ্টির ফলে প্রকৃতির সহিত তাঁর পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সে কাহিনীও তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সদর স্ট্রিটের এক বাড়ীর বারান্ডার দাঁড়িয়ে কুহেলি আচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করে প্রভাত সূর্যের উদয় দেখে তাঁর মনে যে অতুষ্ণতা জেগেছিল তাই তাঁর কারাবদ্ধ জীবনের অবসান ঘটল। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'এর প্রেরণা। এই ভাবে দেখলে সেখানে যা বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর কাব্য চেতনারই স্বপ্নভঙ্গ। এই দিব্যদৃষ্টি তাঁর অন্তর্মুখী কাব্যচেতনাকে বহিমুখী করে দিয়েছিল। ফলে প্রকৃতির সহিত তাঁর সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং 'প্রভাত সঙ্গীত'য়েই তাঁর কাব্য-স্রোতধারীর প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই যাত্রা পথে তাঁর প্রথম পরিচয় প্রকৃতির সঙ্গে। তার কতরূপ, কত বৈচিত্র্য, কত রঙের বাহার। তার সংস্পর্শে কবির লেখনীতে, ছন্দে, ভাষায় মনোহর কত কবিতা আয়তপ্রকাশ করেছে।

প্রকৃতি বিষয়ক এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি। কবিতাগুলি শুধু প্রকৃতির বিভিন্ন ভঙ্গির মনোমম বর্ণনার সীমাবদ্ধ নয় ; তার অতিরিক্ত জিনিস তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কবি প্রকৃতির শোভা দেখেই মুগ্ধ হন না, তার পশ্চাতে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির অব্যক্ত উপস্থিতিও উপলব্ধি করেন। ফলে তাঁর মনে এক অবস্থায় সেই প্রচ্ছন্ন সত্তাকে দেখবার এবং তাঁর সহিত পরিচিত হবার জন্য একটি তীব্র আকুতি জাগে। এ বিষয় তিনি নিজেই এক অবস্থায় অবহিত হয়েছিলেন। তাঁর নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যে আমরা তার সমর্থন পাই। মন্তব্যটি ইংরাজিতে রচিত। তাই তার অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত করা হল—

‘ন।—যদি বৃষ্টির ভাবে অবনমিত মেঘের পুঞ্জের বিষয়, হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটার নারিকেল গাছের সারির মেহে প্রবল আন্দোলন, প্রথম বৈশাখের মধ্যাহ্নের নিদারুণ নিঃসঙ্গতা, শরতের প্রাতে কুরাণার পর্দার আড়ালে নীরব সূর্যোদয়—এরা আমার মনকে একটি সর্বব্যাপী সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করেছে।’^{২২}

কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন সস্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা তাঁর মনে একদিনে গড়ে ওঠে নি ; তা ধীরে ধীরে তাঁর মনে বিভিন্ন অল্পভূতির মধ্য দিয়ে পরিণত রূপটি লাভ করেছিল। তাঁর মনের মধ্যে এই উপলক্ষের মে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি এমনি অস্থঃসচেতন কবি। তাই দোখ তিনি এ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাটির সঙ্গে বৈদিক যুগের ঋষিদের মধ্যে যে ভাবে এক ব্যাপক সস্তার ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তার সহিত তুলনা করেছেন। তাঁর একটি মন্তব্য হতে এই প্রতিপাত্তের সমর্থন পাওয়া যাবে। সেটিও ইংরাজিতে রচিত হওয়ায় তাঁর বাংলা অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত হল। মোটামুটি তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ে নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি তাঁর বৈদিক পূর্ব পুরুষের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিলেন—

‘অতীতের সেই দিনগুলির দিকে ফিরে চাইলে আমার মনে হয় যে না জেনে আমি আমার বৈদিক পূর্ব পুরুষদের পথ অনুসরণ করেছিলাম এবং আমার দেশের আকাশের মধ্যে নিহিত একটি সুদূর সস্তার অস্তিত্বের ইঙ্গিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।’^{২৩}

বৈদিক পূর্ব পুরুষের উপলক্ষের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সাধনজীবনের এই উপলক্ষের তুলনা সত্যিই করা যায়। ঋগবেদের বিভিন্ন স্তকের মধ্যে বৈদিক ঋষির সাধনজীবনের উপলক্ষের ইতিহাসের প্রমাণ আছে। সেখানেও দেখি তাঁদের ধর্ম তথা দর্শন সম্পর্কিত উপলক্ষ তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির বক্ষে যেখানেই শক্তির উপস্থিতি লক্ষিত হয়েছে বা সৌন্দর্যের বিশেষ প্রকাশ দেখা গেছে সেখানেই এদের ওপর দেবত্ব আরোপ ক’রে স্তুতি বচন রচিত হয়েছে। এই ভাবেই বিভিন্ন বৈদিক দেবতার আবিষ্কার ঘটেছে। সূর্য দেবতার আসন পেয়েছে বিভিন্ন নামে, বায়ু পেয়েছে, সমুদ্র বরুণ দেবতা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। অগ্নি ও দেবত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একটি বিশেষ অধিকার পেয়েছে। তা হল যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য। আকাশও দেবতা হয়েছে। ভোর আকাশের রাতিমা উষা নাম পেয়ে দেবত্ব ভূষিত হয়েছে। এই ভাবে বহু দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে।

এর পর দেখি বৈদিক ঋষির মনে একটি আকৃতি জেগেছে এক অতিদেবতা আবিষ্কার করবার জন্য। তাঁর একটা কারণ ছিল। তিনি গভীরতর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা উপলক্ষ করেছিলেন যে, যে সব শক্তিগুলির উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে তারা বিপ্লিষ্টভাবে কাজ করে ন’, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তারা যেন পরস্পরের সহযোগিতা ক’রে এক ঘোঁসে কাজ করে। সূর্য তাপ দেয়, আকাশের মেঘ জল দেয়, নদী তা নিজের বক্ষে বহন ক’রে এনে ধরণীকে শস্যমণ্ডিত ক’রে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। তিনি অনুমান করেছিলেন এই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য নিশ্চয় এক নিয়ামক শক্তি আছেন এবং তিনিই এই অতিদেবতা। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি শেষে বরুণকেই সেই অতিদেবতার পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন ; কারণ তাঁর ধারণায় বরুণই সেই নিয়ামক শক্তি। তাঁর ভূমিকা হল বিভিন্ন দৈবশক্তির মধ্য দিয়ে নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করা। তাই তাঁর নাম দেওয়া হল ‘দ্যুতব্রত’ এবং ‘ধর্মস্তা ব্যাধা’।

এই ভাবে বৈদিক ঋষির মন বহু দেবতা হতে একটি দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই ভাবে

তৃতীয় অবস্থাটির সূত্রপাত হল। তখন তিনি বললেন বিশ্বে বহু দেবতা নেই এবং অতিরিক্ত নিরামক শক্তি হিসাবে এক অতিদেবতাও নেই। আছেন একটি মাত্র দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর প্রকাশ। মাহু ব একই দেবতাকে তাই ভুল ক'রে বহু নামে ভূষিত করে। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। পরিণত অবস্থায় এই উপসক্তি আর একটু রূপে পরিবর্তন করল। বিশ্বকে যে মহাশক্তি ধারণ করেন তিনি এক সর্বব্যাপী সত্তারূপে কল্পিত হলেন। বেদের বহু দেবতা তাঁদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নৈব্যক্তিক সত্তায় পরিণত হলেন। এই প্রতিপাত্তের সমর্থন আশ্রয় পাই পুরুষ সৃষ্টির মধ্যে।^{২৪} বিশ্বসত্তার সর্বব্যাপিত্ব পরিশুদ্ধ করবার জন্য সমগ্র বিশ্বকে একটি অতিকায় সর্বব্যাপী পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পরবর্তী কালে উপনিষদে তিনিই ব্রহ্ম বা ভূমা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এইভাবে বৈদিক কবির সাধনজীবনের উপলব্ধির পরিণতরূপটি আশ্রয়প্রকাশ করেছে সর্বেশ্বরবাদে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ের ইতিহাসের সঙ্গে বৈদিক কবির উপলব্ধির সহিত আশ্চর্য বন্ধন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবিপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ যে ঘটে প্রকৃতির সঙ্গে পুনর্মিলনের পর সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় প্রকৃতির বন্ধে নানা সৌন্দর্য ও শক্তির সমাবেশ তাঁর কবিরসকে আকৃষ্ট করত। নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণীর উপর বাতাসের খেলা, সজল কালো মেঘের স্বদূর বিলম্বিত দেহ, উদয় আকাশের ডালে বাঁজা টিপটির মত অরুণোদয়—এরাই ছিল তাঁর কবিতার প্রেরণা। কিন্তু কেবল তাঁদের বাহিরের সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে নি, অতিরিক্ত ভাবে তাঁদের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক নিগূঢ় সত্তার অস্তিত্বের ইঙ্গিতও তিনি তাঁদের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির সহিত পরিচিত হবার জন্য তিনি আকুল হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উপরের প্রতিপাত্তের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হতে দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। তা হতে তাঁর উপসক্তি কি ভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছিল তা বেশ সহজে বোঝা যাবে। শরতের আকাশে ইতস্তত সঞ্চরমান মেঘগুলি শুধু তাঁর নয়নবন্ধন করে নি, যিনি তাঁদের ভাসিয়েছেন তাঁর কথাও শ্রবণ করিয়ে দিয়েছেন—

‘আজ ধানের ক্ষেতে ধোঁয়ায়

লুকোচুরি খেলা।

নীল আকাশে কে ভাসালে

সাদা মেঘের ডেলা।’^{২৫}

প্রথম বর্ষার আগমনে যখন নীল নবধন সমগ্র গগনে বিস্তার লাভ ক'রে তিসি ঠাই আর রাখে না তখন সে ভীষণ মধুর পরিবেশ তাঁর হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে। এখানেও তিনি তার পেছনে এক প্রচ্ছন্ন শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেন। শুধু অনুভব করেই ক্ষান্ত হন না, তাঁকে পাবার জন্য উল্লাসে আকুল হয়ে ওঠেন—

‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে মধুরের মতো নাচেরে

হৃদয় ন'চেরে।

শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ
আকুল হইয়া আকাশে চাহিয়া

উল্লাসে কাঁদে যাচে বে ।'২৬

অবশেষে নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনিও একদিন এই প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রকৃতির পরিচয় লাভ করলেন। বৈদিক যুগের ঋষির মতই তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন যে প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইন্ধিতে প্রচ্ছন্ন-প্রকাশ তিনি উপলব্ধি ক'রে আসছেন, তিনিও এক সর্বব্যাপী মহাসত্তা। তিনি সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে আছেন। প্রকৃতির মধ্যে বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুষ্পে যে প্রাণ-স্পন্দন আমাদের নয়নরঞ্জন করে, তারা সেই প্রচ্ছন্ন-সত্তার আলোর চরা ধেনু। আর গগনে যে অগণিত নক্ষত্ররাশি নিশার আকাশ উদ্ভাসিত করে তারা সব তাঁর আলোক ধেনু। তারা প্রকট, কিন্তু যিনি তাদের চরিত্রে বেড়ান, সেই বাথালটিকে কোথাও দেখা যায় না, কেবল তাঁর বেণু শোনা যায়—

'এই যে তোমার আলোক ধেনু
সূর্য তারা দলে দলে
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহাগগন তলে ।'২৭

কবিতা:

বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী

ক্ষেত্র গুপ্ত

দুর্গেশনন্দিনী বড় লেখকের প্রথম লেখা। বড় লেখা নয়।

এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রগাঢ় জীবন-ভাবনার মধ্যে খেতে চান নি। অথবা যেতে পারেন নি। কিন্তু এর দেহ নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন। গল্প বলার একটি নতুন রীতি আবিষ্কার করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। গল্প আগেও বসে হ'ত। কবিতার ভাষায়। বা মুখে মুখে—আসরে আড়ায় চতুর্মুখে। বঙ্কিমচন্দ্র গল্পে গল্প লিখবেন পাঠকের পড়বার জন্য। এমন ভাবে যাতে তা বেশি জোরে টেনে রাখতে পারে—যখন দরকার খামাতেও পারে। জোরে চালাতেও পারে বা ধীরে। ইচ্ছামত বাক্যে চোরাতে চমকতে উত্তেজিত বা নিস্তেজ ক'রে দিতে এবং আরও অনেক কিছু করতে পারে। এত সব ভেবেও তাকে প্রধানত ঘটনা আর চরিত্রের যোগাযোগে তৎপর থাকতে হয়েছে। কারণ দুর্গেশনন্দিনী চরিত্র ব্যক্তিতে অটল উপন্যাস না হলেও, উপন্যাস বটেই। কাহিনী সেখানে ছোট নয়—কিন্তু এককও নয়, যেমন হতে পারে গোয়েন্দা গল্প বা রূপকথায়। দুর্গেশনন্দিনীর মতো উপন্যাসেও লেখকের লক্ষ্য মানুষ। তার ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়। এ-কাহিনীর অনেকখানিই অপরিহার্যভাবে মানুষের মনের পথ ধরে চলেছে।

তবুও একথা ঠিক তাঁর অনেক উপন্যাসের তুলনায় দুর্গেশনন্দিনীর পাত্রপাত্রীরা সবল স্বভাব। ঘটনা থেকে মনে, মন থেকে ঘটনায় যেতে আসতে এ উপন্যাসে আন্তর্জাতিক আলোকপাত ঘটনাকেই বেশি উজ্জ্বল করেছে। আবার দুর্গেশনন্দিনী মনুষ্যধর্মে দীন নয়। মহৎ প্রাণের ভান এর কোথাও নেই। সে প্রাণ সবল ও সতেজ। অটল গভীর নয়। কিন্তু কৃত্রিমও নয়। এর দেহগত সমস্তাও প্রাণের সাহসেরই স্বাভাবিক প্রতিফলন। সবল সমস্তার উত্তরে প্রযুক্ত যত নিষ্ঠা এবং নতুন আবিষ্কারের সব প্রতিভা। দেহসজ্জার শিল্পীর নিপুণতা ও কচি নিয়ে তিনি এর মর্মকেই প্রকাশ করেছেন। সেখানে উপাদান হিসেবে প্রসাধনেরও যোগ্যস্থান আছে। তবে তাকে রঙ দিয়ে সাজিয়ে লোক ভোলাবার কাজে লাগান নি লেখক।

২

বঙ্কিমচন্দ্র সামনে কোনো মডেল রেখে কাজ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। দ্বিতীয় উপন্যাস থেকে দুর্গেশনন্দিনীই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাথমিক আদর্শ বার উপর যেমন ইচ্ছা হাত চালানো হয়েছে। প্রথম উপন্যাসে বেশি আখ্যান-জাতীয় রচনা থেকে রূপ ঘটিত প্রায়ই কিছুই বর্ণনেন নি লেখক। বিজ্ঞানসাগরের শকুন্তলা-সীতার বনবাস থেকে নয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অজুরীর বিনিময় থেকেও নয়।

সংস্কৃত গদ্য আখ্যান থেকে তাঁর রীতি গ্রহণের প্রস্রাই ওঠে না। কারণ তা ধীর, বর্ণনাসর্বস্ব এবং ঘটনাবিরল। বঙ্কিমের ভঙ্গি সর্বথা বিপরীত।

এককালে তিনি বাংলার স্বট বলে ভ্রান্ত অভিধা পেয়েছিলেন। অনেকে মনে করতে পারেন ওয়ান্টার স্বটই বুঝি বঙ্কিম-উপন্যাসের দেহভঙ্গির অঙ্গপ্রেরণা। প্রাথমিক পর্ববৈক্যেই কিন্তু অঙ্গরূপ সিদ্ধান্ত করতে হ'ল। ইংরেজ উপন্যাসিকের ঐতিহাসিক বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রবণতা, মনোর পরিবেশ-সৃষ্টি

এবং বিবরণ ধর্মী বিজ্ঞান রীতি সম্বন্ধে তিনি কোনো আগ্রহ বোধ করেন নি। স্বট বা একান্ত ভিন্নপন্থী ডিকেন্স বা অন্য নামজাদা ইংরেজ উপন্যাসিকেরাও নয়, বঙ্কিমকে দেহগঠনের আদর্শ যুগিয়েছে ইংরেজি নাটক—বিশেষ ক'রে সেক্সপীয়র। তাঁর নাটক গভীর কলাকৌশল, কাহিনীর আত্মগতা, তথ্য তাৎপর্যমুখিতা বঙ্কিমচন্দ্র প্রকার সঙ্গে গ্রাস করেছিলেন। এবং নাট্যজগৎ থেকে নিয়ে এসে উপন্যাস কথনে প্রয়োগ করেছিলেন। এই পথ ধরেই তিনি একটা মৌল ভঙ্গি আবিষ্কার করলেন যা নাটকীয় হলেও মোটেই নাটকের নয়। অল্পপ্রাণিত কিন্তু অমুক্ত নয়।

তা ছাড়া মেঘনাদবধের কাব্যরীতিই দেশি রচনার মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম যা বঙ্কিমকে উত্তেজিত করেছিল। মধুসূদন তাঁর কাব্যে নাটকের স্বাদ বহুল যুক্ত করেও কাব্যধর্মভ্রষ্ট নন। সংলাপ-সর্বস্ব ঘটমানতার নাটকোচিত বন্ধন বরণ করা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না। বর্ণনায় কল্পনার বিস্তারে মধুসূদন নাট্যবন্ধনমুক্ত। সেই মুক্তিসন্ধান বঙ্কিমকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

বঙ্কিম-উপন্যাসের দেহতত্ত্বটিত করেকটা মোটা কথা উল্লিখিত হ'ল। রীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এবারে ভূর্গেশনন্দিনী পাঠ করা যাক।

ভূর্গেশনন্দিনীর বলায় ভঙ্গিতে প্রথম থেকেই কুশলতা। উপন্যাসের আরম্ভেই পাঠক সোজাশুঙ্গি ঘটনাবর্তে নিক্ষিপ্ত এবং ফলে প্রস্তুতিহীন মন কিছুটা বিপর্যস্ত। এক অস্বাভাবিক, জনশূন্যপ্রাস্তর, কালবৈশাখীর ঝড়, স্থলরী রমণী সব মিলে আকস্মিক ঘটনাচক্র। যোদ্ধাপুরুষ এবং দুই নারী—প্রাথমিক পাত্রপাত্রী তিনজনের পরিচয়ই আবৃত। প্রদীপের আলোয়^১ পরস্পরকে ঘেঁটু ধরা গেল তাতে পরিচয় জানার ইচ্ছা প্রবলতর হ'ল। সে-ইচ্ছা পাঠকেরও। ইচ্ছা আগ্রহ ক'রে, তাকে অদম্য ক'রে তুলে এবং অপূর্ণ রেখে লেখক প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদের লক্ষণীয় কার্যকর্য—

এক। বর্ণনায় সুষোগ তৈরি করেও কঠোর সংযম রক্ষা। 'মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রবাহিত' হলেও তার বর্ণনায় কাহিনীর আবর্ত তারাক্রান্ত নয়। নারীরূপ চিত্রণের লোভও জয় করেছেন বঙ্কিম।

দুই। প্রদীপের আলোকে দুটি রমণী এবং একটি যুবক পরস্পরকে দেখতে পেল। এতক্ষণ অন্ধকারে কিছু কথা আশ্রয় ক'রে যে শব্দ সম্বল আলাপ চলেছে তা প্রত্যক্ষ পরিচয়ে পূর্ণ হয়ে উঠবার সুষোগ এল। উপন্যাসিক ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন পাত্রপাত্রীর চোখের পেছনে। সঙ্কোচ ও ভয়তার দূরত্ব থেকে পরস্পরকে যতটা দেখা যায় ততটুকুই মাত্র তারা দেখেছে। সে-দেখা চিত্তস্পর্শহীন বহিঃক, অপরকে জানবার চেষ্টার ক্রমে আটা।

পাত্রপাত্রী সকলের পরিচয় লুকিয়ে উপন্যাস বেশি এগুতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র পরস্পর অপরিচিত এবং পাঠকদেরও অজানা নায়ক-নায়িকা নিয়ে গল্প আরম্ভ করেছেন। পথের ধার থেকে পাঠককে হঠাৎ-ঘটা কাহিনীমুখের মধ্য দিয়ে কখনও দ্রুত—সোজা ও বাঁকা পথে গল্পের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণে ও উপভোগে প্রাণকেড়ে নিয়ে গেছেন। বাইরের একটি সমস্তা মিটেছে ভিতরের জটিলতর সমস্তার সৃষ্টি ক'রে।

১. প্রদীপের আলো জ্বলে স্থলরীর্ণন বঙ্কিমের প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল। কোথাও বা প্রত্যেকে পরিণত হয়েছিল।

নায়কের আবৃত্ত-পরিচয় খল্ল আড়ম্বরে প্রকাশ পেল। বঙ্কিম অবশ্য সেই মুহূর্তকে নাট্যাচমকের বৈদ্যুতি দিতে চেয়েছেন। জানা গেল যুবক মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কিন্তু এই পরিচয়ই উপভাসের ঘটে গুরুতর ভট পাকিয়ে তুলল। বিমলার নাম প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হলেও তার এবং অনামিকা নবীনা সুন্দরীর পরিচয় শুধুই থেকে গিয়েছে। কিন্তু জগৎসিংহ ও তরুণীর পারস্পরিক তৃষ্ণা সূচিত হওয়ার একটি প্রথম কাহিনী শুকু হবার সম্ভেত মিলছে।

কাল্পনিক প্রণয়বৃত্তান্তের প্রাথমিক আয়োজনের পরে নায়ক-নায়িকার দৃষ্টিতে মোহাবেশ ঘনিষে ভোলায় সঙ্গে সঙ্গে লেখক মানসিংহের সুখাত নামের সাহায্যে ইতিহাসের দিকে একটি জানালা ফণিকের জন্তু খুলে ধরলেন, এবং সেখানেই কিছু সমস্তা জটিল হয়ে আছে এমন ইঙ্গিত মিলল বিমলার কথায়^২। পক্ষকাল পরে জগৎসিংহ বিমলার দেখা হলেও হতে পারে এমন কীৰ্ত্ত প্রত্যাশার সৃষ্টি করা হ'ল। কাহিনীর একটি প্রান্ত খোলা রইল ভবিষ্যতের জন্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে বিমলা প্রভৃতিকে নেপথ্যে নিয়ে গেলেন। জগৎসিংহকে অনুসরণ ক'রে গল্প চলল মানসিংহের শিবিরে। ইতিহাসের পটভূমি একটি গোটা পরিচ্ছেদ জুড়ে বিবৃত হ'ল। পরিচ্ছেদটি সংক্ষিপ্ততর। বর্ণনা ভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ, ঘটনামুখ্যও ক্ষুদ্র। খুঁটিনাটি বিবরণের দিকে কোঁক দেখা যায় না। লেখক রূপরেখার পরিচয়েই সংযত ও সৌম্যবদ।

পটভূমি স্থির ক'রে পরিবেশ গড়ার প্রস্তুতি শেষ ক'রে কাহিনী আরম্ভ করার দীর্ঘকাল চলিত প্রথার দিকে জরুপ করেন নি বঙ্কিম। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভিক কলাকৌশল তাঁকে উৎসাহী ক'রে থাকবে।^৩

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের প্রার-অমিশ্র সংস্রবে থেকেছেন একটি মাত্র পরিচ্ছেদে। সেই তৃতীয় পরিচ্ছেদেরও শুরু এবং শেষ জগৎসিংহে। যদিও জগৎসিংহ সেখানে ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অংশমাত্র। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইতিহাসের ঠিকরে-পড়া আলোর কাজই নায়ক জগৎসিংহের বীর্যদৃষ্ট ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত করা।

ইতিহাস ও ব্যক্তিক প্রণয়-বিবরণকে কি অনুপাতে মেশাবেন সে-সম্বন্ধে উপন্যাসিকের কিছুমাত্র বিধা ছিল না। প্রথা-মার্কিক যে-ইতিহাসের দ্বি-মাত্রিক ফ্রাট পটভূমি মাত্র হয়ে থাকার কথা, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে পেছন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। মূল প্রেমকাহিনীর পাজপাজীদের উপরে আলো ফেলেছেন— চারপাশ অপরিচয়ের বহুস্ত ঘেরা অন্ধকার। তারই মধ্য থেকে একটি সূত্র বেকে ইতিহাস মূখী হয়েছে এবং স্বল্পস্থায়ী ক্ষুদ্র অর্ধবৃত্ত তৈরি ক'রে আবার গল্পের মধ্যে ফিরে এসেছে। সেই ইতিহাসসূত্র গল্পের মধ্যে বোনা হয়ে গেছে।

আমরা আবার গল্পের মধ্যে বিমলা ও নবীনা সুন্দরীর কাছে ফিরে এলাম।^৪ তবে সন্তোষিত ইতিহাস আর নিঃশেষে হারিয়ে গেল না। টুকরো টুকরো কথার মধ্য দিয়ে গড়মান্দারণ নামক দুর্গ এবং

২ 'যুবরাজ, আমি যে পরিচয় দিলাম না, ইহাতে আমাকে অপরাধিনী ভাবিবেন না, ইহার অবশ্য উপযুক্ত কারণ আছে।'

৩ তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে আখ্যান রচনা ভঙ্গিতে প্রথামুখ্য থেকেও মেঘনাদবধ কাব্যেই মধুসূদন বাতায়ো তীক্ষ্ণ।

৪ পরে দ্বিতীয় খণ্ডে বীরেন্দ্রের পূর্বপ্রসঙ্গ আবার এসেছে। তার বিস্তারিত একেবারে আলাদা।

বীরেন্দ্রসিংহ নামক ভূস্বামী সামনে এসে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। নবীনা এবং বিমলার পরিচয় অনাবৃত হ'ল, অবশ্য আড়ম্বর ও উত্তেজনা ছাড়াই। নাট্যরঙ্গের স্বাদ মিলল না। শুধু পরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের বহুত্ব ঘনীভূত হয়ে বইল বিমলার চারপাশে। সেটুকুই এর রচনাচাতুৰ্য।

এই পরিচ্ছেদ আসলে প্রাথমিক পরিচয়দানে নিযুক্ত। বীরেন্দ্রসিংহ, অতিরাম স্বামী, আসমানি, বিজাদিগগজ এবং বীরেন্দ্রের পূর্বকথা তাদাহড়া ক'রে বলে ভূমিকার কাজ শেষ করতে হয়েছে। এবং গল্পের প্রয়োজন শিল্পকে নির্জিত করেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লেখকের গঠনঘটিত দুটি বিশিষ্ট প্রবণতার গোড়াপত্তন হ'ল।

এক। সন্ন্যাসী-মহাপুরুষ জাতীয় চরিত্রের অবতারণা। প্রটে অট বাধাতে বা ছাড়াতে এদের ব্যবহার করা বঙ্কিমের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।^৫

দুই। অতি-লৌকিকের প্রয়োগ। অতি লৌকিকের সূক্ষ্ম বা নাতিশূল বিজ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্রে বহুল ব্যবহৃত। তার মধ্যে জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণী অন্যতম। 'মোগল সেনাপতির দ্বারা তিলোসুয়ার অনিষ্ট'—অতিরাম স্বামীর এই উক্তি কাহিনীর উপরে আশঙ্কার মেঘ ঘনিরে তুলেছে।

এ ছাড়াও বর্তমান পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মানসিংহের প্রতি বীরেন্দ্রের উগ্র ও তীব্র মনোভাবের খবর মিলেছে। ফলে তিলোসুয়া-জগৎসিংহের প্রণয়-সম্ভাবনায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিমলার কথায় যে সমস্ত ইঙ্গিত ছিল তার গুরুত্ব এবার অস্বীকৃত হয়েছে। গুঢ় কারণ যদিও অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রথম উপন্যাসেই জানা-অজানার আলোচ্যার খেলা বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী-বিজ্ঞান রীতির সম্পূর্ণ আয়ত্ত।

এ-পরিচ্ছেদে অবশ্য ইতিহাসসমূহের অটলতা বিধানের চেষ্টাও আছে। চর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাস শুধু কল্পকাহিনীর অঙ্গীভূতই নয়, ঐতিহাসিক সংঘাত ত্রিমুখী সরলতা ছেড়ে একটা ত্রিভুজাকার মিশ্র ব্যাপারে পরিণত হতে চেয়েছে। মোগল (মানসিংহ) পাঠান (কতলুখা)-এর পারস্পরিক ঘর্ষে বীরেন্দ্র একের প্রতি বিবিশিষ্ট এবং অপরের প্রতি আনুগত্যহীন। এই ত্রিমুখী সংঘাতকে অবশ্য বেশিদূর টেনে রাখা যায় নি। ফলে মূল প্রটের সঙ্গে ঐতিহাসিক সহভূমির যে তির্যক সম্পর্ক প্রত্যাশিত হয়ে উঠেছিল তা ক্ষত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

ঘটনাতত্ত্বকে নিরস্ত ক'রে সপ্তম পরিচ্ছেদ তিলোসুয়ার রূপবর্ণনার কাব্যস্বরভিত্তি। এই কবিস্বমূল বর্ণনারও প্রট মন্বরাধাবে কিঞ্চিৎ বিবর্তিত। তিলোসুয়ার পূর্বরাগের প্রাক-লক্ষণ আভাসিত হয়েছিল—এখন তার গাঢ় পরিচয় মিলল। কিশোরী প্রথম প্রেমে নিজের মন নিয়ে লুকোচুরি খেলার, ত্রিরজনের নাট্যোচ্চারণে যে পুলক-পিহরণ অস্বীকৃত করে তার শাস্ত চমকে এই কাব্যসুন্দর বর্ণনা চিহ্নিত।

কুস্ত্র অষ্টম পরিচ্ছেদ ঘটনাবিকালে ভূমিকাহীন। অতিরাম স্বামী বীরেন্দ্র বিমলার কোনো গোপন সম্পর্কের ইঙ্গিত কাহিনীকে চঞ্চল করেছে। তিলোসুয়ার প্রেমব্যাকুলতার সামনে কুস্ত্র বাধা—এ-কথা জানাবার জন্তু পরিচ্ছেদটির অবতারণা। অবশ্য লক্ষ্য করার ঘটনা—পূর্ব পরিচ্ছেদের সঙ্গে রচনা রীতিতে এর স্পষ্ট ভিন্নতা। সপ্তম অধ্যায় বর্ণনা-প্রধান, অষ্টম সংলাপ-সর্বস্ব।

পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে এই প্রবণতা প্রায়শঃ বৈচিত্র্যে ও চরিত্রসংলগ্নে প্রায়ই নিরস্তপ্রাপ্ত। এবং কচিং যুক্তাঙ্গক হুই।

পাঠকের মন যাতে নিকন্তেজ একধেরেমিতে ঝিমিয়ে না পড়ে সেজন্য বঙ্কিম রচনাশৈলীতে বৈচিত্র্যের আয়োজন করেছেন। বর্ণনা ও সংলাপ-মুখ্য দুটি অধ্যায়ের পরে নবম পরিচ্ছেদ ঘটনার পূর্ণ। অবশ্য বিবরণের সমতলে প্রায় অপ্রত্যাশিত ঢেউয়ের মতো শেষ বাক্য দুটি।^৬ বিবৃতি থেকে বিস্ময়ে-পরোক্ষ প্রশংসা-কখন থেকে প্রত্যক্ষ সম্বোধনে এই রূপান্তর ঘটনা-কোলাহলের মধ্যে হৃদয় গভীরে কণিক দৃষ্টিপাত। তাই ভাষাশীতির এই বক্রতা প্রশাধন হলেও অকারণ নয়।

দশম পরিচ্ছেদে বিমলাকে নানাভাবে দেখানো হয়েছে—তার ঐগাঢ় যৌবনের রূপে সজ্জার চটুলতার কর্মতৎপরতার কিঞ্চিৎ কামোদ্দীপক ভঙ্গিতে—তার ব্যক্তিত্বে, বীবেকের সঙ্গে গুঢ় সম্পর্কে। লেখক বিমলা-বীবেকের গোপন সম্বন্ধের পর্দাটি তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছেন; তেতরের এক চমক দৃষ্টের অস্পষ্টতা ঘন রহস্যের অঙ্ককার ছিঁড়বার ব্যাকুলতা জাগাচ্ছে।

এই পরিচ্ছেদের স্বর লঘু। কৌতুকের সঙ্গে ঘটনার আগ্রহ বা বাসনার বিকোভ সহজে সহজ বলে এ স্বরকে বহিরাগত বলা চলে না।

কিন্তু পরের পরিচ্ছেদে গজপতি বিদ্যাদিগ্গজকে আশ্রয় ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র কোমর বেঁধে বিলিফ আমদানি করতে চেয়েছেন। নাট্যকারদের কাছ থেকে এই কৌশলটি বঙ্কিমচন্দ্র ধার নিয়েছেন।

‘ড্রাম্যাটিক বিলিফ’ বহুল ব্যবহৃত একটি বিষয়। গম্ভীর স্বাদের নাটকে লঘু বা হাস্যোদ্দীপক প্রশংসা চরিত্র বা দৃষ্টের অবতারণা ক'রে কিছুক্ষণ দর্শকের মনের ভার-লাঘবের ব্যবস্থা করা হয়। সন্দেহ নেই কৌশল হিসেবে এটি পরিহার্য। লঘুচেতা দর্শকদের কথা ভেবেই এই রীতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। কচিং উচ্চাঙ্গের নাট্যকার এর শিল্পোন্নত প্রয়োগ করেছেন। সাধারণ ভাবে বলা চলে গম্ভীর প্রশংসা ও স্বরের সাহিত্য অবশ্যই অন্তর্নিবেশ সার্থক সৃষ্টি হতে পারে, লঘুতার হাওয়া বইয়ে পাঠকের মানস-বিশ্রামের আয়োজন আবাস্তর।

বিদ্যাদিগ্গজ-প্রসঙ্গ কাহিনীর বিবর্তনে সাহায্য করে না, কোনো চরিত্রের উপর নতুন কোনো ভাবনা আনে না। সে প্রচেষ্টার পক্ষে বোকা।^৭

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের আদর্শে এই ভাঁড় চরিত্র গড়েছেন। লঘুপ্রসঙ্গ সংযোজনের পরিকল্পনা যেমন ইংরেজি নাটক থেকে নেওয়া তেমনি চরিত্রটির রূপভাবনা সংস্কৃত নাটক থেকে পাওয়া। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য থেকে আঙ্গিকগত সহায়তা তিনি নিয়েছেন।^৮ এবং এই ঋণ গ্রহণ সর্বাংশে বার্ষ হয়েছে।

একাদশ থেকে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিদ্যাদিগ্গজ বৃত্তান্ত চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের সঙ্গে তাকে ক্ষীণভাবে যুক্ত করার নিফল চেষ্টা করেছিলেন। কারণ ঘটনা থেমে গিয়েছিল।

৬ ‘কুমার বীরমদে রণজয় করিতে লাগিলেন। শৈকেশ্বর! তোমার মন্দির মধ্যে যে মূল্যবীর সরল দৃষ্টিতে এই বোকা পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, সে-মূল্যবীরকে দেখা-কোলাহল মধ্যে কি তাহার একবারও মনে পড়ে নাই? যদি না পড়িয়া থাকে, তবে জগৎসিংহ তোমারই দ্বার পাশাপাশি।’

৭ স্বাদের মূলতা অন্তঃপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৮ চরিত্র ভাবনার সূত্র আহরণ অন্তঃপ্রসঙ্গে বর্তমানে আঙ্গিকগত প্রভাব।

এ-পর্যন্ত কাহিনীর যে বিস্তার তার এক তৃতীয়াংশ জুড়েই বিজ্ঞানিগ্গজ। বর্ণনার আকর্ষণ বা ইতিহাস-প্রসঙ্গের উদ্বেলতায় গল্প লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নি। কিন্তু স্থূল চাতুর্যের কাছে শিল্পীর আত্মসমর্পণ আকস্মিকগত মুখ্য ব্যর্থতা।^৯

ষোড়শ থেকে একবিংশ পরিচ্ছেদ (প্রথম খণ্ডের শেষ) পর্যন্ত ঘটনা গতিশীল। আগের পাঁচটি অধ্যায়ের রুদ্ধ ঘটনা হঠাৎ ছাড়া পেয়ে জোরে ছুটেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে জগৎসিংহের প্রণয় ব্যাকুলতা গভীরতর হয়েছে। মিলনের বাধা অব্যাহত বলেই কামনার গাঢ়তা বাড়ল। নায়ক-নায়িকার প্রেমের ক্ষেত্রে আভ্যন্তর যে সমস্ত ইঙ্গিত শোনা গিয়েছিল তার গ্রন্থি ভেঙে এখনও হয় নি, কিন্তু তাতে আর নতুন জটিলতার সূত্র বিস্তৃত হয় নি। ফলে তার জোর কমে আসছিল। এগারে বাইরে থেকে ঘটনাগত সমস্তার মেঘ ঘনিয়ে তোলা হয়েছে।

এই পরিচ্ছেদের শেষ দিক থেকেই কোনো অজানা বিপদপাতের আভাস মিলল। সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল পরের অধ্যায়ে। ঘটনার ক্রম ক্রতবেগে এগুতে লাগল। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বর্ষাঘাতে জগৎসিংহ পশ্চাদাহুসারীকে বধ করল, বিমলার অর্ধোচ্চারিত বাক্যে বিশ্বয়পুলকিত হ'ল এং শেষ পর্যন্ত তিলোত্তমার সঙ্গে মিলিত হ'ল। অর্থাৎ বীরত্ব, অপরিচয়ের বহুস্তর যবনিকার আন্দোলন এবং এ ক্ষেত্রে প্রণয়ের উপাদান মিশ্রিত।

তার পরে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ঘটনাতরঙ্গের শীর্ষমুখী উৎক্ষেপ।

বঙ্কিমচন্দ্র সৈন্যজনতার কোলাহল এবং পর পর নীবেজ ও জগৎসিংহের পরাজয়ের ছবি এঁকেছেন। বিমলার চটুলতা চতুরতা এবং কৌতুকমিশ্র কামোদ্দীপনাকে (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) আতঙ্ক বিপদ লুপ্তরাজ ও যুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

নায়ক-নায়িকার মিলনে নতুন ও প্রবল বাধা বাইরে থেকে এসে হাজির হ'ল ঘটনার ধারায়। পাঠানের হাতে তারা বন্দী হ'ল। হাসরুদ্ধকর ঘটনাস্রোতে বিরতি এল। উপন্যাসের প্রথমখণ্ড, বলা যায় প্রথমার্ধ শেষ হ'ল।

প্রথম খণ্ডের শেষে অভিলৌকিক সূত্রের একটি গাঁট খুলবার চেষ্টা আছে। 'মোগল সেনাপতি' নামে পরিচিত কবিমবন্ধের চেষ্টায় তিলোত্তমা ধরা পড়েছে। অভিগ্রাম স্বামীর জ্যোতিষগণনা সফল হয়েছে। কিন্তু এ-জাতীয় স্থূল (ওধু নাম-পরিচিতি নির্ভর) বহিঃপ্রয়োগে অভিলৌকিকের বহুস্তর ঘন স্বাদ মেলে নি।

প্রথম খণ্ডের শেষের অধ্যায়গুলি যেন বড়োর বাড়ি। তার পরেই বৃষ্টি-ধোয়া সকালের মতো দ্বিতীয় খণ্ডের পর্দা উঠল। রক্তাক্ত যুদ্ধ থেকে স্নিগ্ধ সেবার, বীর্য থেকে শয্যাশ্রয়ী শ্রান্তিতে, চতুর সেনানায়কের প্রেমকোমল দৃষ্টিতে—উজ্জ্বল ঘটনাতরঙ্গ থেকে শান্তির যুগ্তার বৈপরীত্যের ব্যঙ্গনা এসেছে।

তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে ঘটনাস্রোত বিশ্রাম করেছে। অবশ্য একটি নতুন কাহিনী সূত্রের উন্মেষ ঘটেছে—তার বিকাশভঙ্গি কিন্তু অস্থির। আয়েবাব প্রতি ওসমানের প্রেম। এ প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ধীর বিকাশের পথ ধরেন নি - যেমন ঘটেছিল জগৎসিংহ-তিলোত্তমার ক্ষেত্রে। কারণ—

৯ প্রথম সংস্করণের অতি বিস্তার পরবর্তীকালে সঙ্কুচিত করে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। শৈল্পিক দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত সংস্করণের যে ক্রটি এখানে তারই আলোচনা করা হয়েছে।

এক। প্রথম খণ্ডে মূল কাহিনী যে পর্বাংশে পৌছেছে তাতে স্বরের বৈচিত্র্য ঘটানো বা নতুন নৃত্য-সংযোগ চলতে পারে; কিন্তু কোনো নতুন কাহিনীকে এক এক পা ক'রে নানা বাক ফেরা পথে এগিয়ে এনে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যায় না।

দুই। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার অন্তোক্ত প্রেমের অসদৃশ আয়েষার প্রতি ও ওসমানের তাঁর একমুখী হৃদয়বেগ। দুই প্রেম প্রসঙ্গে প্রকাশ-স্বাভাব্য রক্ষা করেছেন লেখক।

এ ছাড়া দ্বিতীয় খণ্ডের গোড়ার পরিচ্ছেদটি আরও দুটি কারণে লক্ষ্য করার মতো—

এক। চার অধ্যায় ধরে নারীকা তিলোত্তমার দীর্ঘ অল্পস্থিতি কাহিনীকৌশল হিসাবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ।^{১০} বিশিষ্ট চরিত্রের উপস্থিতির তুলনায় অল্পস্থিতি অনেক সময়ে কার্যকর হয়ে ওঠে। এখানে তার নিদর্শন মিলেছে। জগৎসিংহের রোগাচ্ছন্ন স্বপ্নলোকে দেখা দিলেও কমনীয় সেই রমণী বন্দিনী ও নির্ধাতিতা হয়ে কঠিন অভিজ্ঞতার সব লক্ষা ও বেদনা নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল—সেই অহুচ্চারিত প্রশ্ন তিনটি পরিচ্ছেদেই স্রুত হয়েছে।

দুই। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেমে আয়েষার ভূমিকা নিয়ে পাঠকমনে কিঞ্চিৎ ভাবনা দেখা দিয়েছে, বিশেষ ক'রে ওসমানের বিহ্বলতার প্রতি আয়েষার পক্ষ উত্তরে।^{১১} এ দিকে ইঙ্গিতমাত্র আছে। তার পরেই মৌনের যবনিকা। বঙ্কিমী রীতির একটি বিশেষত্ব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদেই আবার সমুচ্চ ঘটনা বীরেন্দ্রের অহঙ্কৃত বীর্য ও প্রাণবাতী হুঃসাহসকে ভিত্তি ক'রে আলোড়িত। তবে তার হত্যা ব্যাপার সবল রেখায় আঁকা। মাত্র বিমলায় গুপ্ত পরিচয় উদঘাটনে নাটকের চমক মিলল। জানা গেল বীরেন্দ্রসিংহ তার স্বামী। যেন অনেক কোতূহল ও আগ্রহের শেষ হ'ল। কিন্তু ঐ স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ই আরও অনেক রহস্য ও প্রশ্ন ঘনিয়ে তুলল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তারই স্রোত চলেছে।

মধ্য একবার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বীরেন্দ্রের 'অপমান' ও বেদনাক্রান্ত কণ্ঠে তিলোত্তমা বিষয়ে দু'একটি বাক্যে আশঙ্কায় কথা শোনা গিয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পলকমাত্র তার দেখা মিলেছে কতলুগীর অব্যবধি। তার পর কাহিনী আবার দীর্ঘকাল তার সমক্ষে নীরবে থকেছে।

এই অবকাশে বিমলায় পূর্বকথা বিন্যস্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা শুধু বিমলায় পরিচয়-রহস্য নয়। তা হলে তার ভূমিকার গুরুত্ব যেনও বলতে হ'ত মূল কাহিনীকে অযথা ভারী করা হয়েছে। আসলে এ-নৃত্যে ঔপন্যাসিক বিমলা বীরেন্দ্র অভিযান-তিলোত্তমার সঙ্গজ্ঞানে গ্রন্থভেদ করেছেন। এই প্রসঙ্গটিকেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের কেন্দ্রীয় রহস্য-সমস্যা ক'রে রেখেছেন। এখানেই লুকিয়ে আছে মানসিংহের পুত্রের সঙ্গে বীরেন্দ্রের কন্যার বিবাহের বাধার কারণ।

১০. মধুসূদন কাব্যরসে মেঘনাদের উল্লেখমাত্র ক'রে সর্গের বেশির ভাগই তাকে পাঠকমনে থেকে দূরে রেখেছেন। মেঘনাদ ও রাবণের উপস্থিতি-অল্পস্থিতি নিয়ে তৈরি মানা কলা-নিপুণতা বঙ্কিমসঙ্গ লক্ষ্য ক'রে থাকতেন। মধুসূদনের এ-লিঙ্গা হোমর থেকে।

১১. 'আয়েষা कहিলেন, 'ওসমান'। তাইবহিস বলিয়া তোমার সঙ্গে যদি পাড়াই। বাড়াবাড়ি কলি তোমার সাক্ষাতে বাড়ির ছইব না।' [দ্বিতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

পূর্বকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার পত্রের সাহায্য নিয়েছেন। আসলে পত্রটি আত্মপ্রকাশের সুযোগমাত্র। প্রকাশরীতি মোটেই পত্রোচিত নীতল অতীত যোমস্বন নয়। বরং বিপরীত। প্রত্যক্ষ উদ্ভূত ঘটমানতা। 'ক্লাসব্যাক' পদ্ধতির সমগোত্র।

এ-বিষয়ে লেখকের অত্যধিক আগ্রহ ছিল। বেশ দ্রুত গয়ে হলেও একটি অমুগামী কাহিনীর উপরন্তু গড়ে তুলতে তিনি যত্ন নিয়েছেন। পাপকৃত মহুগুপ্রবৃত্তির তল খোঁজা বঙ্কিমের জীবনসাধনা হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে। এই গল্পে তার অঙ্কুর।

এ-কাহিনীর সবচেয়ে অপক অংশ ওসমানের শৈশবের সঙ্গে বিমলার বালাকে কুতজতার জালে জড়িয়ে ফেলা। প্রস্তুতিহীন এবং সোজাসুজি উদ্দেশ্যপ্রবণ বলে ঐ সম্পর্ক অবিদ্বান্ধ। ভবিষ্যতে তিলোত্তমার মুক্তির সুযোগ তৈরি করার জন্তই এই আয়োজন।

ঘটনার দ্রুতগতি ও তার থেকে পাঠকদের বিশ্রাম দেবার আয়োজন করতে হয়েছে পনের দুটি পরিচ্ছেদে। অষ্টম পরিচ্ছেদে অবশ্য জগৎসিংহের মধ্যে মনোগত উদ্বেজনা চলেছে। তিলোত্তমা বিষয়ে উৎকর্ষা আছে। আর আছে আয়েষার প্রসঙ্গ। তার প্রতি জগৎসিংহের মনোভাব কুতজ ও পবিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র নায়ককে আয়েষাতে আকৃষ্ট করেন নি। চরিত্রগত এই সম্ভাব্য সমস্তার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। ফলে আঙ্গিক জটিলতার সৃষ্টি হয় নি। তিলোত্তমা সম্পর্কে তার একমুখী প্রেমে আভ্যন্তর বাধা নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষাংশ এবং নবম পরিচ্ছেদ জুড়ে আবার বিদ্যাদিগগজ। লঘু কৌতূকের প্রয়োজনেই তাকে আনা হয়েছে। কাহিনীর এই পর্যায়ে স্থল হান্তের বিস্তৃত আয়োজন না ক'রে ঔপন্যাসিক সংযম দেখিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিলোত্তমার সংবাদ দিয়ে গল্পে জট বাধায় সাহায্য করেছে। বিমলা ও তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হয়েছে—জগৎসিংহের কাছে এই সংবাদ দেবার ফলস্বদূরপ্রসারী হয়েছিল। পাঠানের অবরোধে বন্দী—প্রেমমিলনের পথে প্রত্যক্ষ ও জোবালো বাধা তো ছিলই, মতীশ্বের সমস্তা তাকে অন্তর্মুখী এবং দুস্তর করল।

দশম পরিচ্ছেদ জগৎসিংহের ভাবনালোকে পরিক্রমা। অষ্টমে অংশত এবং দশমে মূলত মনো-জগতের ব্যাখ্যা—কিছু বিশ্লেষণ। এ-মন যথেষ্ট জটিল নয়। তবু চিন্তা ও অনুভূতিকে ঘটনা থেকে পৃথক ক'রে একান্ত ক'রে তোলা হয়েছে। অনন্তোপায় নাট্যকারকে স্বগত সংলাপের আশ্রয় কখনও বা নিতে হয়। তবে সাধারণত ঐ জাতের সংলাপ নাট্যোচিত নয়। আখ্যান কাব্যের কবিও পাত্রপাত্রীদের মনের ভিতরে মুহূর্তের জন্তই মাত্র প্রবেশ করতে পারেন। আসলে মানুষের মনের সদর ও অন্তরে যদৃচ্ছ ভ্রমণ ঔপন্যাসিক রীতিতেই স্বচ্ছন্দ।^{১২}

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত জগৎসিংহ-তিলোত্তমাকে আশ্রয় ক'রে মূল প্রণয় প্রসঙ্গই আলোচিত। মধ্যে ষাটশ অধ্যায়ে মাত্র প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রস্তুত বিমলাকে দেখা গেল। কাহিনীর অপর শাখার দিকে জিজ্ঞাসা একাগ্র ক'রে রাখা হ'ল। মূল প্রেমের গল্পের চারধারে নানা সমস্তার বিস্তার ঘটেছে। যেমন পঞ্চদশ অধ্যায়ে ঈর্ষাকাতর ওসমানের মুখের উপরে আয়েষা জোর গলায় জগৎসিংহের কথা

১২ মেঘনাদবধ কাব্যের নবমসর্গে রাবনের খেদ আত্মগত ভাবোচ্ছাসের মতো স্বপ্নতোড়িতেই প্রকাশিত।

বলেছে। শাখা কাহিনীর উপরন্তে এর ভূমিকা যথেষ্ট, যদিও আরেবার প্রেম নায়কের মনের বস্তু হয়ে উঠল না বলেই মূল বিষয়কে তা ধনিষ্টভাৱে আলোড়িত করে নি।

এই অংশে তিলোত্তমার বন্দিদশা ঘুচল। তাদের মিলনে একেই আসল বাধা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু গল্পের এই পর্যায়ে বঙ্কিম একটি পৃথক অন্তরঙ্গ সমস্যাতে বড় ক'রে তুললেন। নৈতিক প্রশ্ন উঠল। কতলুখার অববোধে তিলোত্তমার সত্যিকার বিনষ্ট—এই সন্দেহে সে পরিত্যক্ত হ'ল। এ-কারণেই লেখক পাঠান নৃপতির মৃত্যুর পরে বিমলাসহ তার পলায়নের জন্য প্রতীক্ষা করলেন না। তাকে গভীরতর হার্ষিক সমস্যা মধ্য ফেললেন। এর ফলে উপন্যাসের ময়ত লালিত সহজ সমাধানটি বিলম্বিত হ'ল। মিলনের বাধা পাঠানের অপমৃত্যু হলেও রোমাটিক কমেডির প্রত্যাশিত পরিণতি মিলল না। এই নৈতিক সমস্যা উপন্যাস সমাপ্তির মুখে আনা হয়েছে। গল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সংযোজন হওয়ায় এ-প্রসঙ্গ অপরিহার্য হয়ে ওঠে নি। এবং এর দ্বারা ঘটনাপ্রধান প্রতিবন্ধককে চরিত্রগত যথার্থ জটিলতা দানও সম্ভব হয় নি।

এর ফলে নানাবিধ অসঙ্গত বিষয়ের মধ্যে ঔপন্যাসিককে যেতে হয়েছে। মৃদু অবস্থায়ও কতলুখা তিলোত্তমার সত্যিকার প্রতিপাদনের জন্য অতিরিক্ত ব্যগ্রতা দেখিয়েছে।^{১৩} প্রকাশ রীতিতে নাটকের কল্পনা ছিল, কিন্তু তা নাট্যকল্পনা কারণ স্থান কাল-পাত্র বিবেচনার পূর্বানুসরণ নয়—আরোপিত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ উপন্যাস কাহিনীর সমাপ্তি বিক্ষোভ। বিমলা কর্তৃক কতলু খার গুপ্ত হত্যা এই অংশের আলোচ্য। বিমলার মনোবাসনা স্পষ্টভাবেই একাধিকবার জানানো হয়েছে। তবুও কাব্যিক বর্ণনার নাট্যোচিত আকস্মিকতা সঞ্চার করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের কোথাও কোথাও বঙ্কিমের বঙ্গীয় ভঙ্গি নানা রীতির মিশ্রণে শিল্পোৎকর্ষণভাব করেছে।

ষোড়শ-সপ্তদশ অধ্যায়ে কতলু খার মৃত্যুতে বিমলা-জগৎসিংহ মুক্ত হয়েছে, পাঠানদের পতনে ঐতিহাসিক স্বপ্নের অবসান ঘটেছে। ঘটনার উচ্চরবে কাহিনী সমাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তবুও গল্প শেষ হ'ল না। তিলোত্তমা জগৎসিংহের প্রেমে নীতি ঘটিত যে নতুন বাধা তৈরি হয়েছিল তার সমাধান মিললেও—তাদের মিলনকে লেখক স্থগিত রাখলেন। দুটি পরিচ্ছেদ জুড়ে ওসমান আরেবা ও জগৎসিংহের ত্রিধা সম্পর্কের মধ্যে উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে। ওসমানের প্রবৃত্তিভিত্তিক প্রতিহিংসাবাসনা, ধৈর্য ধুই, আরেবার আদর্শায়িত নিকাম প্রেমের পরিচয়ে সেই উপকাহিনীর বৃত্তটি পূর্ণ ক'রে হুলতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ অধ্যায়ের পরে গল্প হিসেবে এর নতুনতর বিকাশ ঘটল না। উপন্যাসের পরিণতির কাছাকাছি এসে শুধু ওসমানের চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুক্টিতে একটা গোটা পরিচ্ছেদের আরোজন শিল্পসিদ্ধ নয়। ঘটনা ঘটিত অনেক চমক, ইংরেজি রীতির ডুয়েল, সাজানো

১০ 'বীরেন্দ্রসিংহের কথা।'

রাজপুত্রকে বেন বৃত্তিক দশন করিল; চমকিতের স্তম্ভে বজ্রাঘাত হইয়া কিকিদুরে পাড়াইলেন। কতলুখা বলিতে লাগিলেন, 'শিত্তহীনা আশি পাণিষ্ট—ঃ তুকা। আরেবা পুনঃপুনঃ পানীয়াভিসিদ্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বাক্যকূরণ হুর্ঘট হইল। হাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিলেন, 'দাঁকন জালা—সাদী—তুমি দেখিও—' [সপ্তদশ পরিচ্ছেদ]

নারিকার সত্যিকারপ্রমাণের একাতীত প্রাণান্ত চেষ্টা বঙ্কিমের পরিণত কালের উপন্যাসেও আছে। যেমন চন্দ্রশেখরে।

চিতা ও কবর থাকলেও নয়। কারণ ওসমান-আয়েষার সম্পর্কের কোনো নূতন পরিচয় মেলে নি। জগৎসিংহের মনের উপরেও এর কোনো প্রভাব নেই।

দুটি অধ্যায় তিলোস্তমাকে আড়ালে রেখে তার মিলনের ধীর ও বর্ণবিবল রূপ আঁকা হয়েছে বিংশ ও একবিংশ অধ্যায়ে। বহুতরঙ্গিত কাহিনীর একরূপ পরিণতি প্রাপ্তিবাহক। 'অহং ব্রাহ্মণ'-এর বহুস্তাবৃত পত্র, তিলোস্তমার স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকৃতির দ্বারা অলঙ্করণের চেষ্টা হলেও ঐ অংশ প্রাপ্যোত্তম হয়ে ওঠে নি।

তিলোস্তমার বিবাহে আয়েষার আগমন ঘটিয়েছেন সেখক ষাণ্মাশ পরিচ্ছেদে। সব প্রসঙ্গের সম্পষ্ট সমাপ্তি এখানেই। মূল কাহিনীর শেষ দেয়াল নিশ্চিন্তভাবে বন্ধ হ'ল। কোথাও ব্যঞ্জনা ব্যাকুলতার স্রোযোগ রইল না।

মাত্র আয়েষার সংঘর্ষে এবং সংঘমাবৃত যন্ত্রণায় একটি চরিত্রের ছবি সব মিলনের স্বর ছাপিয়ে মুদ্রিত হ'ল।

প্রটগঠন বিশ্লেষিত হ'ল। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সূত্রাকারে বিবৃত হচ্ছে।

এক। ছুর্গেশনন্দিনী একটি ঘটনাবহুল উপন্যাস। শত্রু সৈন্যদের দ্বারা গড়মান্দারও দখল, বীরেন্দ্র-হত্যা, কতলুখার প্রাণ-নাশ, জগৎসিংহ-ওসমানের বন্দ্যবৃত্ত, প্রেম-অভিসারে গিরে বীরেন্দ্রের কারাবাস ও গোপন বিবাহের মতো উচ্চরোল ঘটনা উপন্যাসের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। তা ছাড়া আছে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ।

দুই। ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর মিশ্রণে কুশলতা দেখা যায়। ইতিহাসের বিবরণ বড় হয়ে ওঠে নি, তবে যোগল-বাঙালি ভূস্বামী এবং পাঠানের ত্রিমুখী স্বন্দেহ সঙ্গে কাহিনীর নায়ক (জগৎসিংহ) নায়িকা (তিলোস্তমা) এবং দ্বিতীয় নায়িকা (আয়েষা)-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইতিহাসকে স্বতন্ত্র দূরত্বে বিবর্ণ পটভূমি মাত্র ক'রে রাখে নি। অবশ্য বীরেন্দ্র পাঠান বিরোধী হওয়ার প্রত্যাশিত ঐতিহাসিক সংঘাতের জিধা অটলতা রক্ষিত হয় নি।

তিন। মূল কাহিনী জগৎসিংহ তিলোস্তমার প্রেম আয়েষার সহযোগে ত্রিভুজাকার হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু দুটি কারণে তা হয় নি। প্রথম, আয়েষার প্রতি জগৎসিংহ নিম্পৃহ, ফলে তিলোস্তমার প্রতি নায়কের মনোভাবে আয়েষার উপস্থিতির কোনো ভূমিকা নেই। দ্বিতীয়, একান্ত বিস্তৃত ও আত্মলীন আয়েষার প্রেম নায়ক নায়িকার মধ্যে কোনো সক্রিয় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নি।

জগৎসিংহ-তিলোস্তমার কাহিনী নাটকের রীতিতে পরিবেশিত। প্রথম দর্শন ও প্রেমের উন্মেষে গল্পের আরম্ভ। পূর্ব পিতৃ শত্রুতার ফলে আরোপিত বাধা সত্ত্বেও প্রেমের বিকাশ—এবং পাঠানের হাতে নায়ক নায়িকা বন্দী হওয়ার গল্পের 'ক্লাইমাক্স'। কারণ মিলন সম্ভাবনা এখানে ক্ষীণতম, প্রতিবন্ধক চরম। কতলুখার হত্যায় কাহিনীর 'ক্যাটাস্ট্রফি'। বাধা অশূন্য হ'ল এবং মিলন ঘটল। আগেই বলা হয়েছে কিভাবে ঔপন্যাসিক ক্যাটাস্ট্রফিকে অকারণে বিলম্বিত ক'রে রসচূড়তি ঘটিয়েছে। তা ছাড়া জগৎসিংহের মনে তিলোস্তমার সত্যীকরণের আশঙ্কা জাগিয়ে গল্পকে কিঞ্চিৎ অটল করার চেষ্টা হয়েছিল, কিছুটা অসম্মুখী করারও। তা শিল্প সফল হয় নি। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও কাহিনী সুবিস্তৃত এবং বৃত্তান্তিত।

চার। মূল কাহিনীর চারধারে আরও নানা ছোট বড় গল্প ও গল্পাংশ এসে জুটেছে।

ক. আসমানি-বিজ্ঞানগগ্ন-বিমলা প্রসঙ্গ। এই কৌতুকপ্রাণ উপকাহিনীটি বিস্তৃত কিন্তু মোটেই অপরিহার্য নয়। বিজ্ঞানগগ্ন হস্তের মূল্যে প্রটকে ভাবাক্রান্ত করেছে।

খ. বিমলা-বীরেন্দ্র-অভিষেক স্বামীর গোপন কথা মূল গল্পকে কিছু ঘটনাগত জটিলতা দিয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রে অজানা বহুস্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এই কথাবস্তুর সাহায্যে। মূল গল্পের সরল নিষ্পাপ প্রেমের তুলনার উপকাহিনীর অবৈধ বীরেন্দ্র-বিমলার প্রেম তীব্র ও জালায়। এই কাহিনীর বিবাস্তব মননে উদ্ভিত সরল ব্যক্তিত্ব ও কর্মতৎপরতা নিয়ে বিমলা নায়ক-নারিকার প্রেমকে উদ্ভাপ ও হাঙ্গ দিয়ে পুষ্ট করেছে।

গ. জগৎসিংহ জড়িত হলেও আয়েষা-জগৎসিংহ-ওসমান উপবৃত্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলে যায় নি। তবে এর একটি মুখ নায়ক নারিকার কেন্দ্রের দিকে উন্মুখ। নায়কের প্রতি সেবার ও ভালোবাসার এবং ভিলেনের প্রতি স্নেহে আয়েষা কাহিনীর ভিতরে অনেকটা প্রবিষ্ট। ইতিহাস প্রসঙ্গের একটি প্রান্তের সে প্রতিনিধি। তাই এই শাখা কাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরিহার্য বলা চলে না। কিন্তু এর নিজস্ব একটি বৃত্তপ্রায় গঠন আছে। সে গল্প সংঘত ভঙ্গিতে কথিত। মূল কাহিনীর ফাঁকে তার উত্তর মুহূর্তগুলি মাত্র বিক্ষোভিত। ওসমান আয়েষাকে এবং আয়েষা জগৎসিংহকে কামনা করেছে এবং পায় নি। দুজনের অসন্ত প্রেমই ব্যর্থ। মূলকাহিনীর সঙ্গে সদৃশে বিসদৃশের (Contrast in parallelism) ভাব সৃষ্টি করতে এ গল্পকে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। এ পদ্ধতি গল্পকে ভিতর থেকে জটিল করে তুলতে অপারগ কিন্তু বাইরে থেকে তাকে অলঙ্কৃত করতে পারে।

৬.

উপন্যাস-দেহের উপাদান চারটি। ঘটনা বর্ণনা সংলাপ বিশ্লেষণ। এদের আত্মপাতিক প্রাধান্য এবং মিশ্রণের পদ্ধতি অবশ্যই (১) ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা (২) উপন্যাস বিশেষের প্রসঙ্গের উপরে নির্ভর করে। উপন্যাসের ভাবাবীতি ও প্রকাশভঙ্গি ঐ চার উপাদানের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসমাত্র ঘটনাবহুল। দুর্গেশনন্দিনীতে ঘটনার গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ চরিত্র তুলনার ন্যূন।

ক. এ উপন্যাসের ঘটনা প্রায়ই প্রত্যক্ষ action হয়ে উঠেছে। ঘটনা প্রবল ও তরঙ্গিত। ঘটনার বিবরণকে নাট্যরীতির সহযোগে মুহূর্তে উত্তেজিত করে তোলা হয়েছে।

খ. পূর্ব ঘটনার নীতল বিবরণ খুবই কম। বঙ্কিম ইতিহাস-কথার কচিং বিবরণের আশ্রয় নিলেও, তা অতি-সংক্ষিপ্ত। এমন কি বিমলা-বীরেন্দ্রের যে গোপন অতীত চিঠিতে বিবরণের রূপ নিতে পারত তা ক্রাস্‌ব্যাক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হওয়ার প্রত্যক্ষ ঘটনার পর্যবসিত।

গ. প্রত্যক্ষ ঘটনা বা ঘটনার বিবরণে তিনি প্রায় কোথাও পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুনিষ্ঠায় (Realistic detail) প্রবণতা দেখান নি। উদাহরণ হিসেবে পাঠানদের গড়মাত্রার জয়ের স্মার ঘটনাবহুল প্রসঙ্গের কথা ভাবা যেতে পারে। পাঠানেরা কিতাবে দুর্গে প্রবেশ করল এবং দখল করল তার বস্তুধর্মী বিবরণের অন্ত লেখক ব্যস্ত নন। ওসমান ও বিমলার বুদ্ধির লড়াইয়ের ছবি আঁকতেই তিনি আগ্রহী। বিমলার চাতুর্যে বিপর্যস্ত প্রহরীর প্রসঙ্গ-বিস্তারের পিছনে পাঠান সৈন্যদের দুর্গজয়ের বিবরণ চেকে রেখেছেন লেখক।

অনেকখানি কোলাহল ও সৈন্যদলের ছুটোছুটিব একটা সামগ্রিক বোধের মধ্যে মুহূর্তের জন্য বীরেন্দ্রসিংহের বন্দী হওয়ার ঘটনা চিত্রিত। তবে জগৎসিংহের যুদ্ধ ও পরাভবের কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ দ্রুত।

ঘটনার গতি ধামিয়ে বর্ণনায় প্রবেশ ক'রে ঔপন্যাসিক কাব্যধর্মের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কাব্যস্থলভ রূপোপভোগ পরধর্ম নয় বলেই তরল ভাবানুভাব আশ্রয়ে কবিত্বের প্রমাণ দিতে তিনি ব্যস্ত নন। একটিমাত্র ক্ষেত্রে কবিত্ব বিষয়বস্তু ভেদ ক'রে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বনপথে বিমলার আকস্মিক সংগীতোচ্ছ্বাস তার চরিত্রের কোনো গভীরতর স্থপ্ত রোমাণ্টিকতার প্রতি ইঙ্গিতের চেষ্টা হলেও উদ্দীপক প্রসঙ্গের অভাবে এবং প্রস্তুতিহীন বলে নেহাত কবিত্বে পর্যবসিত।

সাধারণত বর্ণনায় বঙ্কিম সংযত। প্রকৃতি বিষয়ে তিনি রূপণতারই পরিচয় দিয়েছেন। কালবৈশাখী ঝড়ে উল্লেখ দু'চারটি ধ্বনি গম্ভীর শব্দে এবং চিত্রাঙ্কনে সীমাবদ্ধ। (১/১)। নদীতীরে সান্ধ্য শান্তি ভিলোক্তমার রূপবর্ণনার যোগ্য পরিবেশরূপে আহুত। (১/৭)। দুর্গপ্রকার থেকে দেখা চন্দ্রালোকিত বৃক্ষদীর্ঘ এবং অন্ধকার বৃক্ষতলের ছবিতে আলোছায়ার খেলা তথা পরিপ্রেক্ষিতের বোধ নিপুণভাবে প্রকাশিত। (১/১৮)। জগৎসিংহের মানসযন্ত্রণা প্রকাশের পটভূমিতে নৈশ প্রকৃতিকে স্বপ্নকালের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। (২/১০)। আসলে প্রকৃতির প্রাধান্য বা স্বাতন্ত্র্য নেই এ উপন্যাসে। তার উল্লেখ ও চিত্রণ প্রাসঙ্গিক, সংক্ষিপ্ত ও বৈশিষ্ট্যহীন।

যুদ্ধবর্ণনাকে ঔপন্যাসিক এ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ ঘটমান বিষয়ে রূপান্তরিত করেছেন। সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

রাজকীয় বিলাস ব্যাসনের বর্ণনায় প্রথম উপন্যাস থেকেই বঙ্কিম নিপুণতা দেখিয়েছেন। কতলুখার জন্মদিনের উৎসব সম্ভার যে ছবি আছে ঘটনার যোগ্য পটভূমি। বস্তু পরিচয়জ্ঞাপক শব্দপ্রাচুর্য কোলাহল বিশৃঙ্খলা, উপাদানবহুলতা, ঐশ্বর্য বিলাসিতা এবং চিত্তদীনতার পরিচয় দেয়।^{১৪} আবার ব্যঙ্গাত্মক স্বরের সংযোগে এই চিত্র যুগপৎ স্বাদু এবং মর্মাক্ত প্রকাশক হয়ে ওঠে।

কিন্তু দুৰ্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত দেহরূপ বর্ণনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। একাধিক ব্যক্তির রূপবর্ণনার স্রোতঃ লেখক এই উপন্যাসে ক'রে নিয়েছেন।

কয়েকটি হাস্যরঞ্জিত উপমার সাহায্যে বিভাদিগগ্জের ছবি এঁকেছেন। অস্ত্রবর্মাদির কাঁক থেকে জগৎসিংহের স্বদীর্ঘ বলিষ্ঠতা ও কাঁচা যৌবনের মিশ্রভাব চোত্চিত। কয়েকটি বিশেষণের আশ্রয়ে ওসমানের বীরত্বও মৌকুমার পেয়েছে। আসলে পুরুষের রূপবর্ণনায় বঙ্কিমের উৎসাহ অল্প। তিন-চারটি দীর্ঘ বাক্যের সাহায্যেই এ কাজ তিনি সমাধা করেছেন।

কিন্তু রমণীরূপের বর্ণনায় তিনি ব্যাকুলতা বোধ করেছেন। আসমানি প্রসঙ্গে অলঙ্কারবহুল চতুর

১৪ 'এইমাত্র সারাক্ষকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে ; দুর্গমধ্যে আলোকময় ; সৈনিক, সিপাহি, ওমরাহ, ভূতা, পৌরবর্গ, ভিক্ষুক, মন্ডপ, নট, নর্তক, গায়ক, গায়িকা, বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, তাম্বুলবিক্রেতা, আহারীয়বিক্রেতা, শিল্পকার্যোৎপন্নব্রজ্যাক্ত বিক্রেতা এই সকলে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। যথায় বাও তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাণ, গন্ধবারি, পান, পুষ্প, বাজি, বেস্তা।' (২।১২)।

ব্যক্তীক পদ্ধতিতে ভারতচন্দ্রের অল্পসংখ্য লক্ষণীয়। স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিই এর উদ্দেশ্য। অন্তর্জ বন্ধিমচন্দ্র যৌবন সৌন্দর্যে মোহিত।

তিলোত্তমার রূপবর্ণনার পটভূমি তৈরি করেছে প্রকৃতি। ঔপন্যাসিক নৈব্যক্তিকতা ঘূচিয়ে পাঠকদের সঙ্গে কিছু সহজ আলাপে প্রগল্ভ। বর্ণনা বিস্তৃত। কমবেশি চারশ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তিলোত্তমার মুখাবয়বই বিশেষভাবে চিত্রিত। কপাল, ক্র, ঠোট ও চোখের দৃষ্টির কথাই বলেছেন লেখক। প্রথমোক্ত তিনটি অঙ্গ উপমাশ্রয়ী এবং সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন ও বর্ণ-সম্পাতেও নিদর্শন। বলা যায় ভিটেলের কাজে বন্ধিমচন্দ্র এখানে সতর্ক ভাষাচিন্তী। ঠোট চোখ ও চোখের দৃষ্টি ভাবাত্মক একটি চরিত্র ব্যক্তিত্বের চোতক। সরলতা, কোমলতা, মাধুর্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যৌবনের শ্রী ও লালিত্য প্রকাশের জন্য আরও একটি অমুচ্ছেদের আয়োজন করেছেন শিল্পী। সে-অমুচ্ছেদের ধ্রুবপদ 'এই তরীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই স্নগোল আর স্থলমিত'।

বিমলার রূপচিত্রণেও চোখ এবং কেশবিন্যাসকেই মাত্র আশ্রয় করা হয়েছে। 'সুখলালসা পরিপূর্ণা' প্রগাঢ় যৌবনার দর্প এই চিত্রে প্রতিবিম্বিত। তাঁর আত্মরূপচেতনা, বুদ্ধির দীপ্তি এবং চতুর কর্মতৎপরতা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

আয়েষার রূপবর্ণনার বন্ধিমচন্দ্র দুটি দীর্ঘ অমুচ্ছেদ নিয়েছেন। প্রথম অমুচ্ছেদে তিলোত্তমা ও বিমলার যৌবনশ্রীর সঙ্গে তুলনার উপমাাত্মক রীতি অমূল্য। দ্বিতীয় অমুচ্ছেদে আত্মহারা শিল্পীর হৃদকম্পন ধরা পড়েছে। আয়েষার রূপ আঁকতে গিয়ে তিনি চিত্রকর হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভাষাভঙ্গিতে যেন সেই দৃষ্টযৌবনার প্রসাধনকারী হয়ে উঠেছেন।^{১৫} ঔপন্যাসিক আয়েষার দেহবর্ণ, কপাল, ক্র, বক্ষ, কর্ণ, দীর্ঘবপু, অঙ্গুলি, কবচপল্লব ও ভূষণের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানেও রঙ ও মোহের আলো বেশি পড়েছে কেশপাশে, চোখে তার ধীর কটাক্ষ। বারবার সূর্যের উপমা এসেছে। লেখক আয়েষার উজ্জ্বল তেজে দৃষ্ট ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

নবীন যৌবনা (বোল বংশর), পূর্ণ যৌবনা (বাইশ বংশর), প্রাপ্ত যৌবনার (পয়ত্রিশ বংশর) বয়সের তারতম্য তথা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশই বন্ধিমের নারীরূপ বর্ণনার কৃতিত্ব।

বন্ধিমচন্দ্রের সংলাপের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম উপন্যাসেই প্রকাশিত। ঘটনার বিবরণকে ধারিয়ে তিনি পাত্রপাত্রীদের সোজাসুজি সামনে এনে দেন। বহু ক্ষেত্রে মন্তব্য ছাড়াই তাদের আলাপচাষী করেন। সংলাপই অন্তরের আবেগকে প্রকাশ করে।^{১৬} অবশ্য মাঝে মাঝে বক্তার মনোভাব প্রকাশক শব্দ

১৫ 'যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাধিয়া দিতে পারিতাম।' (২/১)

১৬। একটি নিদর্শন—

বীরেন্দ্রসিংহ। বিমলা, তোমার আজ এ বেশ কেন?

বিমলা। আমার প্রয়োজন আছে।

বী। কি প্রয়োজন আছে আরি শুনিব।

বি। 'তবে শুধুন' বলিতে বলিতে বিমলা মঞ্চ শয্যার পী চন্দ্রের বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, 'তবে শুধুন, আরি এখন অভিসারে গমন করিব।'*

বী। যমের সঙ্গে না কি?

বি। কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই?

বী। সে মানুষ আজিও জন্মে নাই।

বি। একজন ছাড়া। [১১০]

সংলাপের ভাষাকে যুক্তি করছে।^{১৭} মূলত নাট্যরীতির আদর্শে সংলাপ রচনার দিকেই তাঁর বোঁক। অবশ্য নাট্যাতিরিক্ত রীতির স্বযোগ গ্রহণেও তাঁর সন্দেহ ছিল না। প্রায়ই সংলাপের ভাষা যথার্থ, চরিত্রানুগ, জীবন্ত এবং সংক্ষিপ্ত। কচিং ভাষায় অলঙ্কৃত এবং কৃত্রিম।^{১৮}

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপন্যাসিকের নিজস্ব। নাট্যকার বা গীতিকবির এ উপাদানে অধিকার নেই। প্রধানত চরিত্র-রচনারীতিতে এবং কখনও কখনও ঘটনার কার্যকারণ বুঝাবার জন্য বিশ্লেষণ প্রযুক্ত। চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি পরের অধ্যায়ের আলোচ্য। ঘটনা বিকাশে এই উপাদান স্বল্পব্যবহৃত। ঘটমান প্রত্যক্ষে তাঁর আস্থা আছে। তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে মাঝে মাঝে পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁকে করতে হয়েছে। যেমন বিমলার প্রতি ওসমানের অতিসদয় আচরণের কারণ বুঝানো হয়েছে (২/৫), গড়মান্দারণে পাঠানোর আকস্মিক প্রবেশকে বিশ্বাস্ত করার জন্য ঘটনার ব্যাখ্যান আছে (১/১৭), বিমলার পূর্বকাহিনী বলতে গিয়ে (২/৬, ২/৭) নানা অংশে বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়েছেন উপন্যাসিক। তবে সর্বত্রই একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গি আছে। অসম্ভব প্রায় ঘটনাকেও ক্ষুণ্ণগতিতে ও মুখর কোলাহলে তরঙ্গিত করে তুলে পাঠকের সংশয়কে প্রতিহত করা হয়েছে। যেমন আরেবার কারাগারে প্রবেশ (২/১৪) বা কতলু খাঁর গুপ্তহত্যা এবং বিমলার পলায়ন (২/১৬)।

ছর্গেশনন্দিনীতে নাটকের রীতি বহুল ব্যবহৃত। আগেই বলা হয়েছে নাটকের আদর্শে প্লট কিভাবে গঠিত হয়েছে। তা ছাড়া পাত্রপাত্রীর পরিচয় আবৃত রেখে হঠাৎ প্রকাশ করার এবং অভাবিত সম্পর্ক আবিষ্কারের স্বত্রে বিচিত্র নাট্য মুহূর্ত তৈরি করেছেন বঙ্কিম।

নাট্য কৌশল হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ-সংস্থানও। যেমন প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ—দেবমন্দির। চতুর্থ—মানসিংহের শিবির। ষষ্ঠ—বীরেন্দ্রের দেওয়ানখানা। সপ্তম—তিলোত্তমার কক্ষ। অষ্টম—অভিরাম স্বামীর কুটির। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ—বিজ্ঞানিগগঞ্জের কুটির। ষোড়শ—দেবমন্দির। অষ্টাদশ—উনবিংশ—গড়মান্দারণের প্রাকার। একবিংশ—তিলোত্তমার কক্ষ। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ—পাঠান অস্তঃপুরে জগৎসিংহের রোগ-শয্যা (কিছু কাল ভেদ আছে)। অষ্টম থেকে একাদশ—আবার ঐ কক্ষ। দ্বাদশ—পাঠান-অস্তঃপুরে তিলোত্তমার কক্ষ। চতুর্দশ-পঞ্চদশ—পাঠান কারাগার। ষোড়শ-সপ্তদশ—কতলু খাঁর প্রমোদ গৃহ।

নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনার সঙ্গে এদের মিল আছে। কিন্তু পরিচ্ছেদ নামাক্রিত স্বল্পদীর্ঘ দৃশ্যগুলি পারস্পর্যে ক্ষুণ্ণ ধারমান। ফলে প্রায় প্রতি অধ্যায়ের স্থানিক ঐক্য যে স্থিতির ভাব আনে তা গতিতে মুক্তি পেয়েছে।

উপন্যাসকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে কতকটা নাটকীয় অঙ্কবিভাগের আদর্শে। প্রথম খণ্ডের ঘটনাবলী গড়মান্দারণ ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ঘটেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানত কতলু খাঁর প্রাসাদে। শেষ করেকটি অধ্যায় বাদে প্রথম খণ্ডে তিলোত্তমার একাধিপত্য, দ্বিতীয়ে আরেবার প্রাধান্য, প্রথম খণ্ডে কৌতুক প্রণয়-রোমাঞ্চ থেকে আতঙ্ক ও বিপদে পৌঁছে দিয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে হত্যা প্রতিশোধ গভীর বেদনা অঙ্ক

১৭। * চিহ্নিত বাক্য দ্রষ্টব্য।

১৮। 'স্বামী! প্রভু! আপনাদের...স্বামী! কষ্টরত্ন! কোথা বাও! আমাদের কোথা রাখিরা বাও।'

হতাশা মহিয় আত্মভাগ মিলন-আনন্দে সমাপ্ত হয়েছে। তুলনায় দ্বিতীয় অংশে স্থর অনেক উচ্চগ্রাম।
তবুও দুটি খণ্ড মিলে একটি সুসম স্থাপত্য মৌকর্ষের রূপ।

পরিচ্ছেদগুলির সমাপ্তি অনেক স্থানে বিদ্যৎ চমকের মতো নাট্যসজ্জাবনাপূর্ণ। যেমন—

‘রাজকুমার পুনরায় অনিবার্য তৃষ্ণাকাতর লোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, লক্ষ দিয়া
অশারোহণ পূর্বক চলিয়া গেলেন।’ (১/২)

‘সকল কথা অন্তরালে থাকিয়া বিমলা আত্মোপাস্ত্র শ্রবণ করিলেন।’ (১/৬)

‘কালির চিহ্নমাত্র নাই; তথাপি বোধ হইল, যেন এখনও পড়া যায়; আবার জল আনিয়া
ধুইলেন, আবার বস্ত্র দিয়া মুছিলেন, তথাপি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেখা রহিয়াছে—‘কুমার
জগৎসিংহ।’ (১/৭)

‘এই কথা বলিলামাত্র ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি ক্ষুদ্রিত হইতে লাগিল; কঠোর
স্বরে কহিলেন, ‘পাপীরসি! নিজ হতভাগ্য বিশ্বত হও নাই? দূর হও!’ (১/৮)

[৬নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য (১/৯)]

‘বী। সে মাহুষ আজিও জন্মে নাই।

বি। একজন ছাড়া।

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিল।’ (১/১০)

‘বিমলা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের স্তায় তথা হইতে সরিয়া গেলেন; যুবরাজ দেখিলেন, সুবাসিত
কক্ষ, বজ্রতপ্রদীপ জলিতেছে; কক্ষপ্রান্তে অবগুষ্ঠনবতী রমণী,—সে তিলোত্তমা!’ (১/১৭)

‘ওসমানের কথা যথার্থ ‘বিমলার কটাক্ষকেই ভর।’ (১/১৯)

‘আয়েষা কহিলেন, ‘আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন’। (২/৩)

‘ওসমান লজ্জিত হইয়া মুহূর্ত্তাবে কহিলেন, ‘আমি সেনাপতিমাত্র’!

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, ‘আপনি পিণাচের সেনাপতি।’ (২/৯)

এই বাক্যগুলি কখনও পূর্বপ্রসঙ্গের সাগাকর্ষণ, পরম কাম্য কিছু অভাবিত ঘটনার আকস্মিক
উদ্ঘাটন, কখনও পাত্রপাত্রীর মনোভাবের তীব্র ও জলন্ত প্রকাশ, ঔপন্যাসিকের সূচত্ব মন্তব্য অথবা না জানা
বহুস্তরের প্রতি ইঙ্গিত বহু।

এবং উপন্যাস সমাপ্তির কথার—[‘ভাবিলেন, ‘এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে
দূর করাই ভালো!’ এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় চূর্ণপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।’ (২/২২)
বর্ণবিবল ও শাস্ত্র মিলন কাহিনীতে গাঢ় যন্ত্রণার মননজাত সংযত মহিমার চকিত প্রকাশ লক্ষণীয়।

কাব্যরীতির ব্যবহার পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণনা-প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। গীতধর্ম এ উপন্যাসে বিশেষ
সংযত। মাত্র নারীরূপ বর্ণনার শিল্পীচিত্তের বিহ্বলতা আন্দোলিত।

বিচিত্র উপাধান-মিশ্রণের একটি চরম নিদর্শন আছে দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে কতলু খাঁর
হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

‘আর, তুমি কে সুলতানী, যে কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে স্থা চালিতেছ? কে তুমি,
যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণ লাবণ্য দেহ প্রতি কতলুখা ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? কে

তুমি অব্যর্থ কটাক্ষে কতলু খাঁর হৃদয় ভেদ করিতেছ? ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি বিমলা। অত সুরা চালিতেছ কেন? চাল, চাল, আরও চাল, বসন মধ্যে ছুরিকা আছে ত? আছে বই কি! তবে অত হাসিতেছ কিরূপে? কতলু খাঁ তোমার মুখপানে চাহিতেছে। ও কি? কটাক্ষ! ওকি, আবার কি! কতলু খাঁ, সাবধান! কতলু খাঁ কি করিবে! যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে সুরাপাত্র দিতেছে! ও কি ধনি? এ কে গায়? এ কি মাতৃষের গান, না, সুর রমণী গায়? বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গাহিতেছে। কি সুর! কি ধনি! কি লয়! কতলু খাঁ, এ কি? মন কোথায় তোমার? কি দেখিতেছ? সময়ে সময়ে হাসিয়া কটাক্ষ করিতেছে; ছুরির অধিক তোমার হৃদয়ে বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ? আরও দেখিয়াছ কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক দোলন? দেখিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণভরণ হুণিতেছে? হাঁ। আবার সুরা চাল, দে মদ দে, এ কি! এ কি! বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গি! দে মদ! কি অঙ্গ! কি গঠন! কতলু খাঁ! আঁহাপনা! স্থির হও! স্থির! উঃ! কতলুর শরীরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পিয়লা! আহা! দে পিয়লা! আহা দে পিয়লা! মেরি পিয়ালী! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব! দে সরাব! [২/১৬]

এই ভাষার কোন অংশ ঘটনার বিবরণ, কতটুকু বর্ণনা, সংলাপ বা বিশ্লেষণ তা স্বতন্ত্র ক'বে দেখা কঠিন। একের গায়ে অন্য রীতি জড়িয়ে গেছে, একের মধ্যে অন্য মিশে গেছে। নাট্য চমকের মুহূর্তগুলিকে ঔপন্যাসিক ব্যর্থ হতে দেন নি, আপন শিল্পোচিত্তের রূপবিস্ময়তায় গীতিরস যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। কখনও তিনি বিমলার সঙ্গে আলাপচারী, কখনও কতলুর সঙ্গে। কখনও স্বয়ং কতলু খাঁ। নির্দেশক—প্রশাসক অনুজ্ঞাসূচক—বিশ্বয়বোধক চতুর্বিধ বাক্য একাকার হয়ে গিয়েছে। এবং আশ্চর্য্য স্বরে একটি আন্দোলন অনুভূত হয়—সে আন্দোলন বিমলার দেহের, কতলুর চিত্তের এবং মদমত্ত মস্তিষ্কের। ভাষার ও বাচনভঙ্গির প্রচলিত সব আদর্শকে ভেঙে বঙ্কিম উৎকর্ষের লীর্ষে উঠেছেন।

•

চরিত্র শিল্পরীতি প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। কিন্তু চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি বিচারের যোগ্য। তবে পদ্ধতি এবং বিষয় এত অঙ্গাঙ্গী যে পৃথকভাবে রীতির আলোচনা প্রায় অসম্ভব। এ কথা মনে রেখে পদ্ধতির কথা যেটুকু বলা যায় বলব।

এক। বিমলা ছাড়া কোনো চরিত্র জটিল নয় বলে পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিত্বাত্ম্য এবং ঘটনার অন্তোন্ত সম্পর্ক সর্বত্র নিশ্চিত হয়ে ওঠে নি।

দুই। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো চরিত্রের উপস্থাপনা এবং অল্পপস্থিতির সাহায্যে শৈল্পিক মূল্যায়না প্রকাশ পেয়েছে।

তিন। বঙ্কিমের চরিত্রাঙ্কনরীতি প্রধানত নাট্যধর্মী। অধিকাংশ পাত্রপাত্রী আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে যেন আপনিই গড়ে উঠেছে।

চার। কোনো কোনো চরিত্রের চরম পরিচয় মিলছে কতগুলি ঘটনা-বিস্ফোরণের পরিস্থিতিতে। আরেবার ব্যক্তিত্বের উচ্চকণ্ঠ বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেল ওসমানের বিক্রমে ও ভৎসনায়। তার যত্নাও

সংসমপূর্ণ হয়ে উঠল জগৎসিংহ-ভিলোস্তমার বিবাহে। প্রণয়িনী বিষলার হৃদয় উদ্ঘাটিত হ'ল বীরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডে। ওসমানের ব্যর্থ প্রেম ও আহত পৌরুষ জলে উঠল বৈরধ যুদ্ধে।

পাঁচ। রূপবর্ণনার সাহায্যে চরিত্রে ব্যক্তি স্বভাবের ছোঁতনা আনার চেষ্টা আছে। আগেই সে-বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ছয়। দুর্গেশনন্দিনীতে কোনো চরিত্রের ক্রমবিকাশমান রূপ দেখান নি বঙ্কিম। বিষলা বা ওসমানের কিংবা অভিরামস্বামীর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের নানা দিক ক্রমে প্রকাশ পেয়েছে—তাদের এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে বিকশিত ক'রে তোলা হয় নি। আয়েবার ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভাবনা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিকে দৃকপাত করেন নি।

সাত। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেন নি লেখক। কিন্তু সমকালে এ রীতির যতটুকু ধারণা সম্ভব তা বঙ্কিমের ছিল। তাকে গোপ ভাবে তিনি কাজেও লাগিয়েছিলেন। ভিলোস্তমার ভাবনা এবং জগৎসিংহের নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা কতকটা চিন্তাবিশ্লেষণ ধর্মী। এ বিষয়েও সেক্সপীয়রের পাত্রশাজীদের স্বগতোক্তিই পথ দেখিয়েছে।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিণত উপন্যাস। কিন্তু শিল্পরীতি ইতিমধ্যেই তাঁর আয়ত্তে। সে রীতি স্থনির্দিষ্ট এবং শিল্পীর ব্যক্তিকপ্রবণতার চিহ্নবাহী।

রাসেলের নৈতিকচিন্তা

শিবপদ চক্রবর্তী

মহামনীষী রাসেলের মৌলিক চিন্তাধারা বহু বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। গণিতে, জ্যামিতিতে, দর্শনে, রাজনীতিতে, সমাজবিজ্ঞানে, দর্শনের ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিক্ষণ মতবাদে, সমালোচনায় তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। এই বহুমুখী প্রতিভার মৌলিক চিন্তাগুলির সংক্ষিপ্তসার করা দুর্লভ ও অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুদীর্ঘ জীবনের নানাস্তরে এই মনীষীর স্বাধীন, মুক্ত চিন্তা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—কোনো একদেশদর্শিতা বা গোড়ামীর পঙ্কলে আবদ্ধ থাকে নি। এতবার তিনি পাল্টাপাল্টা করেছেন যে তাঁর চরম মতটি বার করা দুঃসাধ্য। তাই আমাকে রীতিমতো দ্বিধার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর মতবাদের সংক্ষিপ্তসার না করে তাঁর নৈতিকচিন্তা নিয়েই আলোচনা করব। গণিত বা জ্যামিতি আলোচনাই অধিকতর প্রশস্ত ছিল; কারণ এখানেই রাসেলের মৌলিক চিন্তা গভীরতম স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু তা অত্যন্ত দুর্লভ ও পারিভাষিক বলে আমি সে আলোচনা তুলছি না।

বিভিন্ন পুস্তকে ও প্রবন্ধে রাসেল মানুষের নৈতিকজীবন, নৈতিক ভাবাদর্শ ও নীতিবাক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করেছেন সে পুস্তক বা প্রবন্ধ পরানৈতিক (metamoral)। নৈতিকবাক্যের স্বরূপ যে বাক্যে নির্ধারিত হবে সে বাক্য কখনও নৈতিকবাক্য নয়; সে বাক্য নৈতিকজীবন বা বাক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের পরানৈতিক বাক্য (Secondary or meta-ethical statements)। একান্ত প্রথমদিকে রাসেল যে ভাবে আলোচনা উত্থাপন করেছেন পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধ মতটিই তিনি গ্রহণ করেছেন, যদিও তাতে তাঁর চরম সন্তোষ হয় নি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের 'The Elements of Ethics' গ্রন্থে তিনি জি. ই. মুরের পথ অবলম্বন করে নৈতিক আদর্শ বা মূল্যের ব্যক্তিনিরপেক্ষ সার্বজনীনতাই স্বীকার করেছেন। এই সময়ে তাঁর মত ছিল যে শুভাশুভ বা মঙ্গলামঙ্গল, ব্যক্তিবিশেষের আশা, আনন্দ, নিন্দা, প্রশংসা নিরপেক্ষ বাস্তব অবস্থা বা ঘটনার ধর্ম, যেমন কোনো বস্তু স্বতঃই গোলাকার বা ত্রিকোণাকার হতে পারে। সত্যতা বা অসত্যতা বস্তু বা পুরুষেরই ধর্ম, মানস-নির্ভর (subjective) নয়। তবে এগুলি ঠিক প্রাকৃতিক বা ইন্দ্রিয়গম্য ধর্মও নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম ও নৈতিকবিধির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। নিছক প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী হওয়া আর নৈতিক বিধিসম্মত দায়িত্বের অধীন হওয়া সম্পূর্ণ পৃথক। ডেভিড হিউম বলেছেন যে, কোনো কিছু 'আছে' থেকে সেটা 'হওয়া উচিত' বা 'করা উচিত' কখনই জ্ঞানীয়ভাবে অনুমান করা যায় না। এরূপ অনুমিতির দোষকে মূর প্রকৃতিবাদোদ্ভূত দোষ (naturalistic fallacy) বলেছেন। রাসেলও তাঁর চিন্তার এই পর্যায়ে নীতিবিজ্ঞানে প্রকৃতিবাদ (naturalism) পরিহার করেছেন; বস্তুগত শুভাশুভ তাঁর মতে বস্তুর অগ্নি কোনো প্রাকৃতিক ধর্ম থেকে অনুমিত হতে পারে না। নৈতিক মূল্যবোধ সর্বত্র এক না হলেও, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে এক্ষেত্রে বিরোধ থাকলেও, রাসেল বিশ্বাস করতেন যে কিছু সর্বগত নৈতিক মূল্য অবশ্যই আছে। তর্কের দ্বারা তা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য বলেই যে এরূপ বস্তুগত মূল্য নেই তা বলা যাবে না। নৈতিক বিচার একান্তভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ হলে, দুজনের নৈতিক বিচার কখনও বিরুদ্ধ হতে পারত না। ক যদি বলে 'খ ভালো' আর গ যদি বলে 'খ মন্দ'

ভবে ক'ও গ পরম্পর বিরোধী হয় না ; কারণ কয়ের কাছে যা ভালো লাগে গয়ের কাছে তা স্বাভাবিকভাবে খারাপ লাগতে পারে। তাই ব্যক্তিসাপেক্ষতা অস্বীকার ক'রে রাসেল বলেছেন যে একজনের কচি অন্যজনের কচির থেকে অনেক উন্নত হতে পারে ও এই ভারতম্য বিচারসহও বটে।

কিন্তু পরবর্তী পর্ধায়ে রাসেল নৈতিকমূল্যের ব্যক্তিসাপেক্ষতাই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন আর এটাই তাঁর পরিণত চিন্তার ফল। শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল এখন আর তাঁর কাছে, কর্তা বা কর্মগত কোনো ধর্ম নয়। সদস্যত বর্জনতার মতো বিষয়গত ধর্ম নয়। মূল্য সংক্ষেপে মতভেদও কোনো স্থির, ঐক্য নৈতিক মূল্য সম্পর্কে মতভেদ নয়—কচির ভেদমাত্র। কচির অর্থ হ'ল কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির আকাঙ্ক্ষা বা কামনা। রাসেল এমনও বলেন যে কোনো কচি বেশি উন্নত আর কোনো কচি কম উন্নত, কোনো কচি ভালো আর অন্য কচি মন্দ হতে পারে। কিন্তু এখন তিনি বলবেন যে এই কচিভেদ কোনো ব্যক্তি বা জাতিনিরপেক্ষ সর্বগত নৈতিক মূল্যের উপর নির্ভর করে না ; অর্থাৎ এমন বলা যাবে না যে কোনো কচি ঐ নিরপেক্ষ মূল্যের নিকটবর্তী আর অন্য কোনো কচি তার দূরবর্তী। কচিভেদের অর্থ হ'ল আমার বা আমাদের কচিই উন্নত আর তোমার বা তোমাদের কচি নিকৃষ্ট। এই মতভেদ কোনো জ্ঞানযুক্তির দ্বারা যাবার নয়। 'What I believe' পুস্তিকায় রাসেল বলেছেন 'what we ought to desire is merely what someone else wishes us to desire. (P 29)' অর্থাৎ আমার 'একুপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত' এর অর্থ হ'ল অন্যদের কামনা হ'ল আমার একুপ আকাঙ্ক্ষা হোক।

এই পর্ধায়ে রাসেলের মতে নৈতিকবাক্য কোনো বাস্তব ধর্ম, ঘটনা (fact) বা সত্য (truth) প্রকাশ করে না। নৈতিকবাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না—নীতিবিহীন কোনো বাস্তব অবস্থা বা সত্যের আলোচনা নয়। একমাত্র সিদ্ধপর বাক্যই সত্য বা মিথ্যা হতে পারে যথা 'পৃথিবী গোলাকার', কার্যপর বাক্য (দরজা বন্ধ কর) সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। নৈতিকবাক্য কার্যপর বাক্য বা অনুজ্ঞা বলে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। 'পৃথিবী গোলাকার' ও 'পরশ্রীকাতরতা মন্দ' এই দুইবাক্যের মধ্যে কিছুটা ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকলেও জ্ঞানগত অমিল অত্যন্ত প্রকট। দ্বিতীয় বাক্যটিকে 'পরশ্রীকাতর হওয়া না' এই অনুজ্ঞায় বা 'পরশ্রীকাতর হওয়া অনুচিত' এই বিধিবাক্যে অনুবাদ করা চলে ; কিন্তু প্রথমটির অর্থ সিদ্ধপর, বিরূতিমূলক বাক্যের ওরূপ অনুবাদ হয় না। অবশ্য কার্যপর ও সিদ্ধপর বাক্যের মধ্যে কিছুটা মিল আছেই। কোনো সিদ্ধপর বাক্য সত্য বলে অনুভূত হলে আমরা গ্রহণ করি, মেনে নিই ; মিথ্যা হলে বর্জন করি, অস্বীকার করি। তেমনি কোনো কার্যপর বাক্য বা অনুজ্ঞা মানতেও পারি নাও মানতে পারি। কিন্তু অন্তর্দিক থেকে এরা অত্যন্ত ভিন্ন। সিদ্ধপর বাক্য কোনো কিছু ঘটেছে এমন বলে আর কার্যপর বাক্য কিছুকে ঘটতে বলে।

রাসেলের মতে সিদ্ধপর বাক্য যে ভাবে বাস্তব ঘটনাকে বিরূত করে কার্যপর বাক্য ঠিক সেই ভাবে ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে বিরূত করে না। কেউ যদি বলে যে 'সুখই একমাত্র স্বতোমূল্যবান' বা 'ভগবৎপ্রমই একমাত্র স্বতোমূল্যবান' তবে এই বাক্যগুলি তৎ তৎ বিষয়ে ঐ মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে এইরূপ বিবরণ দেয় না। নৈতিক বাক্য বিবরণ মূলক বাক্যই নয়—ব্যাকরণগত মিল থাকলেও। এই বাক্যগুলি আকাঙ্ক্ষার বিবরণ নয়—আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ মাত্র। যথা 'জল দাও' বা বর্তমান কলকাতার প্রাচীর লিখন 'মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব!' 'ঘৃণা করা পাপ' এই নৈতিক বাক্যের অর্থ হ'ল 'ঘৃণা করো'।

না।' কবিকথার মধ্যে এইরকম মূল্যবোধক, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক, এমন কি ভাবোদ্দীপক বাক্য পাওয়া যায় ; যথা—

—মহারাজ, তুমি মহারাজ,
এ মিনতি । দূর কর জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার ; পদাহত
সতীত্বের ঘৃণাও ক্রন্দন ; অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান—ত্যাগ করো
দুর্যোধনে ।

(দ্রুপদ)

গান্ধারীর এই সবাক আবেদনে তাঁর মরমী মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে । উপরন্তু এ বাক্যে গান্ধারীর ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ আর তীব্র লজ্জারূপ আবেগগুলিও সঞ্চারিত হয়েছে—এরূপ মানসিক অবস্থার বিবরণ হয় নি । এই কবিকথা আবৃত্তি করলে যতটা অর্থব্যঞ্জক হয়, লিখিতরূপে ততটা হয় না । অথচ বিজ্ঞানের বিবরণমূলক বাক্য লিখিতরূপেই বেশি অর্থব্যঞ্জক । বীজগণিতের সূত্রগত প্রতীক বা লিখিত সংকেত উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য । গালাগালি দিতে কিন্তু গলাবাজি করাই ভালো ; লিখে গালি দেওয়া বিড়ম্বনা ।

নৈতিকমূল্যের ব্যক্তিসাপেক্ষতা আশ্রয় ক'রে রাসেল তাই বলেন যে নৈতিকবাক্য কোনো নিরপেক্ষ ধর্মের বিবরণ না দিয়ে, মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে যাত্র । এই প্রসঙ্গে রাসেল ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নৈর্ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য করেছেন । ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাণ্ডের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাষীর যশের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত । 'প্রাণদণ্ড রদ করা হোক' বা 'বর্ণবিদ্বেষ দূর হোক' এমন ইচ্ছা আমার হতে পারে, যদিও তা হলে আমার ব্যক্তিগত কিছু লাভ-ক্ষতি নেই । নৈতিক বাক্য এরূপ নৈর্ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ । আমি নির্বাচিত মন্ত্রী হয়েও এমন আদর্শ প্রকাশ করতে পারি যে 'গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলদায়ক', এক্ষেত্রে যদি আমার মন্ত্রী থাকার ইচ্ছা প্রকাশ না পায়, যদি সকল জাতি সম্পর্কেই আমার এই ইচ্ছা ধ্বনিত হয়, তবে ঐ আদর্শ নৈতিক হবে । পরিণত বয়সে রাসেল যখন পরমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন তখন ব্যক্তিগত লাভালাভ খতিয়ে দেখেন নি, তিনি সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন—তাঁর ইচ্ছা তখন যেন সর্বমানবের ইচ্ছার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল । তাই যে সব দার্শনিক নৈতিক আদর্শের সার্বিকতা (universality) প্রমাণ করতে চান, রাসেল তাঁদের সমর্থক । এই সার্বিকতা কিন্তু প্রত্যক্ষপূর্ব (a priori) বা গায়গত (logical) নয় । কামনার বস্তুটির সার্বজনীনতাই এই সার্বিকতা । ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নৈর্ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য করলে নীতিশাস্ত্রে অনেক অসুবিধা দূর হয় ; না করলে পথপ্রদর্শক বা সংস্কারকের কোনো ভূমিকা থাকে না ।

নৈতিক আদর্শকে যখন রাসেল ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা অব্যক্তকটিভ মনে করতেন তখন তিনি ভাবতেন যে নৈতিক বাদানুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপায় (means) সম্পর্কে, উদ্দেশ্য (end) সম্পর্কে নয় । অর্থাৎ যদি মানবজীবনের চরমতম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ্য মত তৈরি করা যেত, তা হলে উপায় সম্বন্ধে বাদানুবাদ বিজ্ঞানই যীমাংসা ক'রে দিতে পারত ; কেন না ঘটনা বা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন উপায় উপাদেয় তা বিজ্ঞানই বলতে পারত । রাসেল কিন্তু এখন বলবেন যে এ কথা ঠিক হলেও, চরমতম নৈতিক আদর্শ এক সার্বজনীন নৈর্ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করবে ; কোনো বাস্তব ঘটনা বা তথ্যকে নয় ।

এই পর্ষায়ে রাসেলের মতে কিন্তু চরমতম 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কেও মতানৈক্য বর্তমান। নৈতিক মূল্যের ব্যক্তিসাপেক্ষতা একটি পরানৈতিক (meta moral) মত। তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করা যায় যদিও নৈতিক বাক্যকে যুক্তিসহ করা যায় না, কেননা তা সত্য-মিথ্যা হয় না। ব্যক্তিসাপেক্ষতার যুক্তি হিসাবে, এই পর্ষায়ে রাসেল আর 'ভিন্নরুচিহিঃ লোকঃ' এই তথ্য উপস্থিত করেন নি। এখন তাঁর যুক্তি হ'ল যে নৈতিক উদ্দেশ্য সহজে বাদান্তবাদ দূর করা কখনই সম্ভব নয়—এর কোনো নিশ্চিত মীমাংসা নেই। 'তোমার মূল্যবোধ নিকৃষ্ট' ও 'আমার মূল্যবোধ উৎকৃষ্ট' এই দুয়ের মধ্যে মীমাংসা করার কোনো উপায় নেই; কেননা তা কঠিন উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মতভেদ দূর হয়; কিন্তু কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলীর আলোকে নৈতিক বিসম্বাদ দূর হবার নয়। এর কারণ হ'ল অধিবিজ্ঞা (metaphysics) বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাক্য থেকে কোনো নৈতিক বাক্য অনুমিত হতে পারে না; কেননা নৈতিক বাক্য কোনো তথ্যের বিবরণ নয় আর তাই সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না।

রাসেলের সমালোচকেরা বলেছেন যে, রাসেল-স্থাপিত নৈতিক মূল্যের ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদ রাসেলেরই জীবনধারণের প্রণালী দ্বিগুণে উৎপাটিত হয়ে গেছে। রাসেল যখন নীতিসমালোচক বা সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন, তখন কি তিনি নৈতিক ব্যক্তিসাপেক্ষতা স্বীকার করেছেন? subjectivist কোনো নৈতিক বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না; কেবল বলতে পারে কেউ কেউ এটা চায়, অন্য কেউ ওটা চায়। 'Marriage and Morals' (বিবাহ ও নীতি) গ্রন্থে যে মৌল অনুশাসন তিনি প্রশংসা করেছেন অথবা 'গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্র থেকে ভালো', 'যুদ্ধ সর্বধা পরিবর্তনীয়' ইত্যাদি মতকে অস্বতঃ তিনি দৃঢ়ভিত্তিক, যৌক্তিক বলতে বাধ্য আর তাঁর বিরোধীদের তিনি অযৌক্তিক ও প্লথভিত্তিক বলতে বাধ্য। রাসেল বলতে পারেন যে তাঁর নৈতিক বাক্য তাঁর রুচি বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে বলতে হবে যে তাঁর রুচি বিরোধীদের রুচি থেকে উন্নত ও অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য। Reply to my critics-এ রাসেল নিজের এই অস্ববিধা বোধ করেছেন। তবু তিনি বলেন যে তাঁর নৈতিক মতবাদে অস্ববিধা থাকলেও তিনি অন্তান্ত নীতিবিদদের মতে অধিকতর অস্ববিধা বোধ করেন।

পরন্তু নৈতিক বাদান্তবাদ যে অনেকক্ষেত্রে উপায় সম্পর্কে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে নয় এ কথা যেমন ঠিক তেমনি এ কথাও ঠিক যে উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বাদান্তবাদ আছে। তবু এগুলো হয়তো চরম উদ্দেশ্য বা আদর্শ নয়। মনে করুন গর্তপাত আইনসম্মত করার ওপরে বাদান্তবাদ চলছে। যিনি এর বিরোধী তিনি বলেন যে অবিবাহিত নারীপুরুষের যৌনমিলনের বাধ্য তা হলে উৎখাত হয়ে যাবে। তাঁর প্রতিপক্ষ কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই গর্তপাতকে আইনসম্মত করতে চাইবেন। তাই যদিও মতভেদটা উপস্থিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে, তবু এটা কোনো চরম উদ্দেশ্য নয়। এতদুভয়বাদী কেহই হয়তো ঘৃণা প্রেম অপেক্ষা ভালো বা দুঃখ সুখ অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় বলবেন না। তাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ নাও থাকতে পারে।

নৈতিক বাক্যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত বা ফুট হয়, নৈতিকবাক্যে অস্বজ্ঞাবাক্য এ কথা মোটামুটি ভাবে ঠিক হলেও, আমি বহুদিন ধরেই এই মতো কিছু অস্ববিধা বোধ করেছি। নৈতিক অস্বজ্ঞা, বিধি বা নিষেধ, ও অনৈতিক অস্বজ্ঞার মধ্যে কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে। এ কারণে নৈতিকবাক্যকে নিছক অস্বজ্ঞা বাক্য বলতে আমার আপত্তি। 'দরজা বন্ধ কর' অস্বজ্ঞাটি বক্তা শ্রোতার ওপরেই প্রয়োগ করেন, নিজের ওপরে নয়। এরূপ অনৈতিক অস্বজ্ঞা প্রথম বা মধ্যম পুরুষেই প্রযোজ্য উত্তম পুরুষে নয়।' কিন্তু 'সহায়

হও' এই নৈতিক অনুজ্ঞা কেবল অপরের প্রতিই প্রযোজ্য নয়, যে হুকুম করে তার নিজের প্রতিও প্রযোজ্য। নৈতিক অনুজ্ঞা সর্বজনীন, তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। যিনি নৈতিক অনুজ্ঞাটি দেন, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তিনিই ঐ অনুজ্ঞার দ্বারা দায়বদ্ধ হন আর যখন নিষ্ঠার সঙ্গে এরূপ অনুজ্ঞা রচনা করা হয়, তখন অনুজ্ঞাকারীর ওপরে তার প্রভাব থাকবেই—অপরে সে অনুজ্ঞা স্বীকার করুক আর না করুক কিছু আসে যায় না। অনৈতিক অনুজ্ঞা অপরের জন্ত; নৈতিক অনুজ্ঞা প্রধানতঃ নিজের জন্ত। তাই কোনো নৈতিক আদর্শ অনুজ্ঞার মতো হলেও, সাধারণ অনুজ্ঞা নয়। আমরা দেখেছি বিবরণমূলক বাক্য ও অনুজ্ঞা বাক্যের মধ্যে কিছু মিল আছে। নৈতিক আদর্শমূলক বাক্য সত্য মিথ্যা হতেই পারে না বা মূল্য কোনো তথ্যই নির্দেশ করে না তা ঠিক কিনা ভেবে দেখতে হবে। রাসেল কঠিন তারতম্য স্বীকার করেন, তবে বলেন যে নৈতিক মতভেদ যুক্তির সাহায্যে কিছুতেই মীমাংসা হবে না। মূল্যবোধের বেলায় হয়তো তথ্য বা ঘটনাশ্রয়ী যুক্তি উপাদেয় নয়। কিন্তু তথ্য বা ঘটনাশ্রয়ী বিজ্ঞানের যুক্তিই যে একমাত্র যুক্তি তা কে বলল। মিল তাঁর উপযোগিতাবাদ স্থাপন করতে গিয়ে কিছু যুক্তির অবতারণা করেছেন; তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে এ যুক্তি সাধারণ অর্থে যুক্তি নয়। কিন্তু অবুঝ সমালোচকেরা তাঁর যুক্তির অপয়শ দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। আমার মনে হয় তথ্যশ্রয়ী যুক্তি ছাড়াও আর একরকমের দার্শনিক যুক্তি থাকতে পারে, যার সাহায্যে কোনো নৈতিক আদর্শকে অল্প কোনো আদর্শ অপেক্ষা বলবন্তর ও বিচারসহ বলে প্রমাণ করা যায় ও মতভেদের মীমাংসা হয়। এটা সম্ভব হলে রাসেলের মত খণ্ডিত হবে।

বাংলা গল্পের আদিকথা এবং অল্প-দৈর্ঘ্য

সুকুমার সেন

বাংলা গল্পে সংস্কৃতের প্রভাব খুব আছে। সে প্রভাব বাংলা গল্পে অতটা পড়ে নি। হঠাৎ মনে হতে পারে এ ব্যাপার অস্বাভাবিক। কেন না গল্প ব্যবহারিক ভাষা-যান, তাতে পুরানো সাহিত্যের ছাঁদনের টান থাকবার তো কথা নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝব এ ব্যাপার অস্বাভাবিক নয়। আমরা যে গল্পের কথা এখানে বলছি তা প্রতিদিনের কাজকর্মের কথাবার্তার স্থায়ী বাক্যকর্ম নয়। এ হল লেখা-পড়ার কাজকর্মে (স্বল্প পরিমাণে) ও সাহিত্যকর্মে (বেশি পরিমাণে) ব্যবহৃত স্থায়ী রচনা-ভাষা। বাংলায় এ সাহিত্যভাষা প্রথম থেকেই প্রাচীন সাহিত্যভাষা থেকে—সংস্কৃত ও অবহট্ট থেকে—রস পেয়ে ও রূপ ধরে এসেছে। বাংলা গল্পসাহিত্যে সংস্কৃত ও অবহট্ট প্রভাব আরও বেশি ছিল, যসের প্রবাহ তো ছিলই, রূপের প্রলেপ ছিল প্রচুর—অলংকারে, তার উপর অতিরিক্ত ছিল বস্তুর ব্যবহার। (গল্পে যে বস্তুর ব্যবহার ছিল তাকে অনুবাদের পর্যায়ে ফেলতে পারি।) তবুও বলা পুরানো বাংলা গল্পে সংস্কৃতের প্রভাবের গুরুত্ব গল্পের তুলনায় কম ছিল। কেন না বাংলা গল্পের যে যান, ছন্দোবীতি, তা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। বাংলা গল্পে তাই সংস্কৃতের প্রভাব—উৎকট অলংকার অথবা বিকট-শব্দ প্রয়োগের বাইরে—সহসা প্রতীয়মান নয়। এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। বাংলা গল্পরীতিতে যে সংস্কৃত গল্পরীতির মিল পাই তা সবটাই প্রভাবজাত অথবা অনুকরণ নয়, তার অনেকটা হল বংশগত মিল। ভারতীয় যাত্রাবের চিন্তার ধারা পালটায় নি। সে চিন্তার সূত্রও বংশানুক্রম সঞ্চারিত ভাষারূপ বেয়ে এসেছে। মুখের ভাষায় গল্পের ভঙ্গিতে চিন্তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশের ছাপ পড়ে। সংস্কৃত ও বাংলা গল্পরীতিতে কোন কোন বিষয়ে মিল তাই প্রভাবজাত নয় অনুকরণও নয়, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত। বৈদিক সাহিত্য থেকে সরল স্বাভাবিক আখ্যানরীতির উদাহরণ একছত্র তুলে তার যথাযথ বাংলা অনুবাদ দিয়ে দেখিয়ে দিই, দুটি রীতি কতটা ঘনিষ্ঠ, বাংলা সংস্কৃতের কেমন ছায়াবহ। যে বই থেকে বাক্যটি উদ্ধৃত করেছি তা ভারতীয় সাহিত্যে সবচেয়ে পুরানো গল্প গ্রন্থ।

নাভানেদিষ্টং হ মানবং ব্রহ্মচর্যং বসন্তং ভ্রাতরো নিরু-অভজন্।

(নাভানেদিষ্ট তো মনুপুত্র যখন ব্রহ্মচর্য-বাস করছিল ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলে পৈতৃক অংশ।)

অনুবাদের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ দুটি আছে—‘যখন’ ও ‘পৈতৃক অংশ’। আসলে কিন্তু শব্দ দুটি অতিরিক্ত নয়। কালবোধক অব্যয়টির অর্থ শতৃপদেই নিহিত আছে; কর্মকারকের পদটিও ভজ ধাতুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে, ধাতুটির মানে ছিল ভাগ বাটোয়ারা ক’রে নেওয়া বা দেওয়া। কর্মপদ প্রায়ই উহ থাকত।

ভারতীয় সাহিত্যে স্থায়ী গল্পের প্রথম প্রয়োগ দেখতে পাই সংক্ষিপ্ত আখ্যানে ও সরল ব্যাখ্যানে। সংক্ষিপ্ত আখ্যানের ও সরল ব্যাখ্যানের উদাহরণ দিচ্ছি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে।

সংক্ষিপ্ত আখ্যান :

বৃদ্ধকুমারীন্দ্রগোষ্ঠা বয়ঃ বৃণীষেতি।

(= বয়স্হা অনুজা মেয়েটিকে ইন্দ্র বললেন, বয় যাগ।)

স। বরমবুগীত পুত্রা মে বহুকীরঘ্যতমোদনং কাংস্তপাত্র্যাং ভুঞ্জীরমিতি ।

(= সে বর চাইলে, আমার ছেলেরা যেন কাসার থালায় প্রচুর কীর ঘি দিয়ে ভাত খায় ।)

ন চ তাবদন্তাঃ পতিভবতি কুতঃ পুত্রাঃ কুতো গাবঃ কুতো ধান্ম ।

(= তার তো স্বামীই নেই, কোথায় ছেলেপিলে, কোথায় গোরুবাছুর, কোথায় ধানধন ।)

তজ্ঞানয়ৈকেন বাক্যেন পতিঃ পুত্রাঃ গাবো ধান্যানীতি সর্বং সংগৃহীতং ভবতি ॥

(= সেখানে এক কথাতেই স্বামী ছেলেপিলে গোরুবাছুর ধানধন সব পাওয়া গেল ॥)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান :

এবং হি কশ্চিং কঞ্চিদাহ । এষঃ পার্শ্বতঃ করকাস্তমানয়েতি ।

(= এইরকম একজন একজনকে বললে । ওই যে পাশে গাড়ু রয়েছে ওটা আন ।)

স আহ । উখায় গৃহাণ দূরং ন শক্ষ্যামিতি ।

(= সে বললে । উঠে এসে নাও, দূরে আছে, পারব না ।)

অপর আহ । দূরং মথুরায়া পাটলিপুত্রমিতি ।

(= অপর ব্যক্তি বললে । দূর তো মথুরা থেকে পাটলিপুত্র ।)

স আহ । ন দূরমস্তিকমিতি ॥

(= সে বললে । দূর নয়, কাছে ॥)

সরল আখ্যান গল্পরীতি উপনিষদ্ পর্বন্ত এসে থেমে গেল । ঠিক থেমে যায় নি, ছুঁভাগ হল । একভাগ আসরে রইল, তবে কিঞ্চিং অন্তরালে এবং তা নিলে পড়ের পথ । আর ভাগ গল্পের পথেই রয়ে গেল, তবে সাহিত্যের আসর থেকে নির্বাসিত হয়ে । ভারতীয় সাহিত্যে গোড়া থেকেই পড়ের রাজত্ব । বৈদিক সাহিত্যে গল্পের একটু স্থান হয়েছিল পড়ের চাপের কিছু কাঁধ-বদলি দিতে, সংস্কৃত নাটকে সরস বিকল্পকের মতো । তবে সে অল্পকালের জন্যে । উপনিষদগুলি লেখা শেষ হয়ে যাবার আগেই শ্লোকের অর্থাৎ অবৈদিক পড়ের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল । তার প্রমাণ রয়েছে পরবর্তীকালের উপনিষদে । সেগুলি প্রায় পুরোপুরি পড়ে লেখা । সরল আখ্যান পদ্ধতিতে পড়ের আক্রমণ প্রথম লক্ষ্য হয় আদিত্যে অথবা অন্তে অথবা আন্তস্তে সারার্থ অথবা উপদেশ শ্লোকগ্রন্থনে । (গল্পে পড়ে মিশ্রিত আখ্যানরীতিও চলিত ছিল । সেগুলির কথা এখানে ধরছি না । সেগুলির মধ্যে পড়িতেরা পরবর্তী কালের নাটকের ও আখ্যায়িকাকাব্যের বীজ অঙ্কুর করেছেন ।) তার পরে স্মরণীয় গল্পগুলি পড়ে সংক্ষিপ্ত রূপ পায় । তাতে সংস্কৃত গল্পরীতির পক্ষে যতই হানি হোক সবদিক দিয়ে দেখলে সাহিত্যের পক্ষে উপকারই হয়েছে বেশি । অনেক গল্প স্থায়ী হয়েছে, এমন কি চিরস্থায়ী হয়েছে বলা যায় । আমাদের কাছ পর্যন্ত চলে এসেছে, দেশ দেশান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে । পড়ে সম্পূর্ণ না হলে, গড়ে ছড়ানো থাকলে, গল্পগুলি কালের প্রবাহে বিধ্বস্ত না হোক বিশ্বস্ত হয়ে যেত । প্রাচীন সাহিত্যে সরল আখ্যান পদ্ধতি চিরকাল পড়ে সর্বদা সম্পূর্ণ ছিল না । বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা নীতিগর্ভ অনেক গল্প পরে গড়ে বিস্তারিত করেছিলেন, তবে সেই সঙ্গে গল্পের মূলমন্ত্র যাঁ পড়বন্ধে চলে এসেছিল তাও দিতে ভোলেন নি । এগুলি ‘জাতক’ গল্প বলে পরিচিত । জাতক গল্প সংস্কৃতে এবং পালিতে পাওয়া গেছে । বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা গল্পগুলিকে ধর্মের কাজে ব্যবহার করেছিলেন । তাঁদের পরে অ-বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ এমন গল্পকে সাধারণ শিক্ষামূলক নীতিকথা রূপে গড়ে ব্যবহার

করলেন। এঁরা যে ভাবে গল্পগুলিকে গল্পে বাধলেন তাতে এক বিশেষ শিল্পকৌশল দেখা দিলে। কতকগুলি ছোট ছোট গল্পকে গেঁথে মালা ক'রে বড় গল্প রচনা করা হল। মালার মতন গাঁথা বলাটা ঠিক হল না। বলা যায় কোটোর ভিতরে কোটো রেখে সাজানো। বড় গল্পের আবহ হল, কথাসূত্রে আর একটি গল্প এল, তার কথাসূত্রে আর একটি গল্প এল—এইরকম ক'রে অবশেষে এক একটি ক'রে গল্প শেষ হলে পরিশেষে মূল গল্পের সমাপ্তি এল। এই রকমে, গল্পের তাঁত বুনে আখ্যায়িকা বা বড় গল্প গঠিত হল বলে এ ধরনের গল্পের সাধারণ নাম হয়েছিল 'তন্ত্রাখ্যান' বা 'তন্ত্র-আখ্যায়িকা'। পাঁচটি বিখ্যাত তন্ত্রাখ্যানের সংগ্রহ বলে সংস্কৃত সাহিত্যের সবচেয়ে সমাদৃত ও বিখ্যাত বই 'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' (সংক্ষেপে 'পঞ্চতন্ত্র') নাম পেয়েছে। পঞ্চতন্ত্রেরই অনেক পরবর্তী এবং কিছু সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল 'হিতোপদেশ'। আধুনিক বাংলা গল্পের গোড়ার দিকে হিতোপদেশের অনুবাদ পাঠ্যপুস্তকরূপে চলিত হয়ে বাংলা গল্পরীতিতে কিছু ছাপ রাখতে পেরেছিল।

প্রাচীনতর উপনিষদগুলি লেখা হবার পরেই সংস্কৃত গল্পের সরল ব্যাখ্যান-রীতির একটা শাখা নির্গত হয়েছিল যাকে বলা হয় সূত্র-রীতি। এ রীতিকে বলতে পারি, এখনকার 'ইতর' ভাষায়, মিনি-গল্প। এতে বাক্যটি—অর্থাৎ বাক্যটির আশায়—যথাসম্ভব অল্প কথায় প্রকাশ করা হয়। কর্তা যদি সহজবোধ্য হয় তবে উহা থাকে। পূর্ববর্তী সূত্রের কন্টেক্সটে যে কোনো পদ—কর্তা কর্ম ক্রিয়া—উহা থাকে। এ পদ্ধতি অবশ্য জ্ঞাতব্য টেকনিকাল বিষয় সহজে মনে রাখার এবং শিক্ষানুশিষ্ট ক্রমে প্রচারিত রাখবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল। পাণিনির এই ব্যাকরণ সূত্র-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ব্যাপারটা কী, একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। পর পর ছয়টি সূত্র উদ্ধৃত করছি, সম্প্রদান কারকের প্রয়োগ বিষয়ে। প্রথমটি যথাসম্ভব পরিপূর্ণ বাক্য, পরের সূত্রগুলিতে বিধেয়ংশ উহ, প্রথম সূত্র থেকে তা বুঝে নিতে হবে।

কর্মণা যমভিপ্রতিস সম্প্রদানম্। ১.৪.৩২।

(=কর্মের দ্বারা যার দিকে এগিয়ে যায় সে সম্প্রদান।)—এখানে অভিপ্রতি ক্রিয়ার কর্তা সহজবোধ্য অতএব উহ।

কচ্যর্থ্যাণাং প্রিয়মাণঃ। ১.৪.৩৩।

(কচি-অর্থকদের বেলায় যে প্রীত হচ্ছে—সেও সম্প্রদান)—এখানে 'কচ্যর্থ্যাণাং' পদের বিশেষ্য, 'ধাতুনাং' সহজবোধ্য বলে উহ।

গ্নাঘহুঙ্ শপাং জীপ্তমানঃ। ১.৪.৩৪।

(= 'গ্নাঘ, হু, শপ্'-দের বেলায় যাকে জ্ঞানানো হবে—সে সম্প্রদান।)

ধারেক্তমর্ণঃ। ১.৪.৩৫।

(= 'ধারি' ধাতুর বেলায় যে খাতক—সে সম্প্রদান।)

স্পৃহেরীপ্সিতঃ। ১.৪.৩৬।

(= 'স্পৃহি'-র বেলায় যাকে চাওয়া হয়—সে সম্প্রদান।)

বাংলার একদা একরকম সূত্র-পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছিল। তবে তা সংস্কৃত সূত্র-পদ্ধতি থেকে আসে নি। বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধকদের ছোট ছোট কড়চা বইগুলি এই রকম সূত্র-পদ্ধতিতে রচিত। তাতে ঈশানদের রচনার প্রভাব থাকা সম্ভব বলে মনে করি।

আখ্যান ব্যাখ্যান ও নৃত্য ছাড়া আরও একরকম গল্পরীতি প্রাচীনকালে দেখা দিয়েছিল। সে হল প্রশস্তির রীতি। এ রীতি গোড়া থেকেই সাহিত্য-ঘেঁষা, পরে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যগ্রন্থ রীতি। এ রীতির সব চেয়ে পুরানো নিদর্শন হল অশোকের-অমুশাসন। কিন্তু তার ভাষা সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত। কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও অশোক-অমুশাসনের আগে—অমুশাসন না হোক, ওই ধরনের সাহিত্য শিল্পের রচনারীতি—সংস্কৃতে অবশ্যই ছিল। এ অমুমানের সমর্থন অশোক-অমুশাসনের মধ্যেই আছে। অশোক-অমুশাসন পড়লে অনেক সময় মনে হয় যেন অবিস্মৃত সংস্কৃতই পড়ছি। যেমন,

পুরা মহানসমুসি দেবানাং প্রিয়সু প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ অনুদিবসো বহুনি প্রাপশতসহস্রানি
আরভিসিহু স্থপট্টায়ে। সো ইদানি যদা অয় ধর্মদিবী লিখিতা তদা ত্রয়ঃ বো প্রাণা হস্তান্তি ময়ুরো
হুবি যুগো ১।

সংস্কৃতে অনুবাদ দিই।

পুরা মহানসে দেবানাং প্রিয়সু প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ অনুদিবসঃ বহুনি প্রাপশতসহস্রানি আলভাস্ত
স্থপার্থায়। সঃ ইদানীং যদা অয়ং ধর্মলিপী লিখিতা তদা ত্রয়ঃ বো প্রাণা হস্তান্তে ময়ুরৌ য়ে যুগঃ ১।

প্রশস্তির ভাষা চিঠিপত্রে অনুকৃত হতে থাকে প্রায় তখন থেকেই। সব চেয়ে পুরানো চিঠিপত্রের
নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রাকৃতে লেখা চীনা তুর্কি স্থানে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র চিঠিপত্রের মুসাবিদার
সংস্কৃত পত্রলিখন-প্রণালীর অনুকরণ হত। বাংলাতেও তাই হয়ে এসেছে।

অশোকের পর থেকে প্রশস্তির রচনা পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষার ছায়া আরও গভীর হয়ে পড়েছে।
অশোকের প্রায় দুশ বছর পরবর্তী কলিঙ্গরাজ খারবেলের প্রশস্তি থেকে তার প্রমাণ দিচ্ছি।

অইরেণ মহারাজেন মহামেঘবাহনেন চেতিরাজবংশবন্ধনেন পসথসুভলক্থনেন চতুরস্তু-লুঠন-
গুণউপিতেন কলিঙ্গাধিপতিনা সিরি-খারবেলেন পন্দরসবসুসানি সিরিকডারসরীরবতা কীড়িতা কুমার-
কীড়িকা।

(=ঐর মহারাজ মহামেঘবাহন চেতিরাজ-বংশবর্ধন, প্রশস্ত শুভ-লক্ষণ চতুরস্তু-লুঠন-গুণোপেত
কলিঙ্গাধিপতি লীখারবেল পনের বছর বালবিসু-শরীরে খেলেছিলেন ছেলে-খেলা।)

সংস্কৃতে লেখা প্রশস্তি-অমুশাসন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। যে নিদর্শন মিলেছে
তাতে গোড়া থেকেই সংস্কৃত গল্পরীতির পরিচিত রূপটি—অর্থাৎ সমাসবহুল অভিধানশব্দকটকিত দীর্ঘ
বাক্যরীতি—পরিস্ফুট। প্রাচীনতম প্রশস্তি-অমুশাসন থেকেই উদাহরণ দিই। সুদীর্ঘ বাক্য। প্রথম অংশ
বিনষ্ট, মধ্য অংশে মাঝে মাঝে ভাঙা আছে, তাই শেষ অংশ থেকে খানিকটা বলি, তবে শেষ পর্যন্ত নয়।

যথার্থ্যহস্তাক্ষরায়োজিতোজিতধর্মাহুরাগশকার্ধ্যগাক্ষবন্তায়াত্তানাং বিজ্ঞানাং মহতীনাং পারণ-
ধারণ বিজ্ঞানপ্রয়োগাবাসবিপুলকীর্তিনা তুরগগজরথচর্যাসিচর্মনিযুক্তা...তিপরবললাঘব-
সৌষ্টবক্রিয়েণ অহরহর্দানমানানবমানশীলেন স্থূললক্ষনেন যথাবৎপ্রাষ্টে বলিষ্ঠতাগৈঃ
কনকরজতবজ্রবৈদ্যুতরত্নোপচয়বিশুদ্ধমানকোশেন ক্ষুটলমুমধুরচিত্রকাস্তশব্দসময়োধারালং কৃত-
গম্ভপম্ভ [কাব্যবিধান প্রবীণে] ন প্রমাণমনাস্তানন্বরগতিবর্গসারসত্বাদিভিঃ পরমলক্ষণ-
বাক্তনৈরুপেতকাস্তমূর্তিনা স্বয়মধিগতমহান্বত্পনাত্মা নরেন্দ্রকন্তাস্বয়ংবরানেকমালা প্রাপ্তদারী
মহান্বত্পন কৃতদারী বর্ষসহস্রায় গোত্রাক্ষণ.....

পত্রলিখন রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে। সেও প্রাকৃত লেখা এবং ভারতের বাইরে। সংস্কৃত লেখা কোন চিঠিপত্রের খাটি নিদর্শন পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে মিলেছে বলে আমরা জানা নেই। যাই হোক প্রাকৃত লেখা চিঠিপত্রগুলি সবই রাজকর্মঘটিত, সুতরাং তাতে একটা সাহিত্যিক রীতির ছাপ আছে। সে ছাপ স্পষ্ট চিঠির উপক্রমে এবং উপসংহারে অর্থাৎ বাজে অংশে। এই বাজে অংশের চও আমাদের পত্রলিখিত লিখনপদ্ধতিতেও অনুসৃত হয়ে এসেছে। প্রাকৃত লেখা চিঠির একটা উদাহরণ দিই। এক রাজকর্মচারী উচ্চতর এক রাজকর্মচারীকে লিখেছেন।

কাঠের মলাটের উপরে ঠিকানা

ভট্টরঙ্গ চোব্বো-সোংচক পদমূলংমি বিয়লিদবো

(= ভট্টরক চোব্বো-সোংচকের পদমূলে খুলতে হবে।)

ভিতরে পাঠ

ভট্টরঙ্গ প্রিয়দেবমংহুশং দেবমংহুশংপুজিতং প্রচক্ক বোধিসত্ত্ব

(= ভট্টরক প্রিয়দেবমহুশ দেবমহুশংপুজিত প্রত্যক্ক-বোধিসত্ত্ব)

মহচোব্বো সোংচক পদমূলংমি চোব্বো য়িলি নমিল্গ্‌অএ স্চ নমকেরো

(= মহাচোব্বো-সোংচকের পদমূলে চোব্বো য়িলি (পত্নী) নমিল্গার সঙ্গে নমস্কার)

করেন্তি দিবা শরির অরোগিয় চ প্রেবেন্তি বহ অগ্রমেণে এবং চ বিঞতি স্চ

(= করছে স্বস্থশরীর ও আরোগ্য কামনা করছে অনেক অপরিমাণ আর এই নিবেদন করছে যে)

বহ চিরকল হম নশকিদম তেহি বন্তি লেখপহড প্রেবংনএ...

(= অনেক দীর্ঘকাল হল না পেরেছি ওখানের কাছে চিঠি-উপহার পাঠাতে)...

সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প ষ্টাইল বলে যা আমরা জানি তার শুরু কখন ঠিক বলা যায় না, তবে তার প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন রুদ্রদামের গির্নার শিলালেখ যার একটু অংশ আগে উদ্ধৃত করেছি। এখানে উল্লেখ আবশ্যক মনে করি, পত্রের সঙ্গে 'গল্প'। কথাটি এইখানেই পেয়েছি।

গোড়া থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে—বৈদিক সাহিত্যে নয়—পত্রের ও গল্পের মধ্যে জাতের ভেদ আছে। সে জাতের বিচার ছন্দোবদ্ধ নিয়ে নয়, অলঙ্কারবাহুল্য নিয়েও নয়। সে হল লেখকের ধাত ও লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে। গল্প লেখেন কবি, তাঁর উদ্দেশ্য শ্রোতার কাছে নিজের অনুভব ও ইমোশন প্রকাশ করে আত্মবিস্তার করা। গল্প লেখককেও সংস্কৃত সাহিত্যে কবি বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর কবিগিরি একটা মোটা অংশই পাণ্ডিত্য ফলানো। তিনি চান তাঁর রচনায় শ্রোতাকে বিমূঢ় করে দিতে, অভিভূত করে দিতে। তাই অবোধতা—অস্বস্ত দুঃকহতা—গল্প রচনার একটা বড় গুণ বলে গণ্য হত। ভেবে দেখলে বোকা যাবে গল্প সাহিত্যের এ গুণপাশ প্রশস্তি-নিবন্ধ পথ ধরেই এসেছে রাজকীয় অভিজ্ঞান নিয়ে। বাংলার সাহিত্যিক গল্পের প্রসঙ্গে সংস্কৃত গল্প রচনার দুঃকহতা স্বরণীয়।

মধ্য ভারতীয় আর্ষ ভাষার সাহিত্যে গল্পের সম্বন্ধে নতুন কথা বেশি বলবার নেই। অশোকের অনুশাসনের উল্লেখ করেছি। তার ভাষা সরল শোভন অথচ সাহিত্যিক। হয়ত তার পিছনে প্রাচীনতর সংস্কৃত সাহিত্যের গল্পরীতি ছিল, যদিও সে রীতির কোন নিদর্শন আমরা পাই নি। (এখানে মতাস্করেরও উল্লেখ করি। অশোকের আগে রাজ্যশাসন বলে কিছু এসেছে ছিল বলে প্রমাণ নেই। হখামনীবীর পণ্ডিত

মহাত্মাদের অশুশাসনের আদর্শ যে অশোক খানিকটা অশুসরণ করেছিলেন সে কথাও ঠিক। অশোকের অপর আদর্শ ছিল বোধ হয় সেকালের ধর্ম-প্রবক্তাদের ব্যাখ্যান।) অশোকের পরে পাই পানিতে প্রাচীন গল্প স্তম্ভগুলি। এগুলিতে ধর্মব্যাখ্যান পদ্ধতির এক অভিনব সাহিত্যিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সে অভিনবতা হল বাগ্মিতা অর্থাৎ oratory; বহু লোককে যথাসম্ভব প্রকাশে শিক্ষা দেওয়া। এ রীতি উপনিষদের রীতি থেকে স্বতন্ত্র। উপনিষদের ব্যাখ্যান-রীতি সহজ সরল, সাহিত্যরস অর্থাৎ আড়ম্বর বর্জিত। সে ব্যাখ্যান দেওয়া হত নির্জনে, স্বল্পসংখ্যক শ্রোতার কাছে। সেই কারণে পালি গল্প স্তম্ভে কৃত্রিমতা বেশ খানিকটা আছে। অনেকে মনে করেন পালি গল্প স্তম্ভের পশ্চাতেও সংস্কৃত আদর্শ ছিল। কেননা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে যে গল্পরীতি পাই তা একদিকে পালি অপর দিকে সংস্কৃত আদর্শ নির্দেশ করে। বৌদ্ধ সংস্কৃত গল্প স্তম্ভগুলি সবই পালি স্তম্ভের পরবর্তী কালের রচনা নয়।

বৈদিক সাহিত্যে যে সরল গল্প বলার ভঙ্গিটি ছিল তার পরবর্তী রূপের প্রতিফলন অবশ্যই হয়েছিল প্রাকৃতিক অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায়। কিন্তু তার কোন প্রাচীন গল্পরূপ আমাদের হস্তগত হয় নি, হয়েছে সংক্ষিপ্ত পদ্যরূপে—অর্থাৎ জাতকের শ্লোকগুলিতে। পালি জাতকের গল্প গল্পগুলি আমরা সাধারণতঃ এই জাতীয় গল্পের প্রাচীনতম রূপ বলে ধরে থাকি। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। জাতকের গল্প অংশ লেখা হয়েছিল সিংহলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে। তবুও সেগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রতিচ্ছায়া অবিলুপ্ত নয়।

প্রাকৃতিক সহজ সরল গল্প লেখার ঠাইল দাঁড় করিয়েছিলেন জৈন লেখকেরা। তাঁদের অবলম্বিত ভাষা ছিল বিশুদ্ধ অর্ধমাগধী অথবা অল্প বিস্তর অর্ধমাগধী মিশ্রিত মাহারাষ্ট্রী অথবা শৌরসেনী। এ রীতির একটু উদাহরণ দিই। উদাহরণটিতে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত পদের ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো।

অস্তি উজ্জেনী নাম নয়রী। তখ চ বসুমিত্তো নাম গহবস্তু পরিবসতি। ভজ্জা সে ধনসিরী নাম
(=আছে উজ্জয়িনী নামে নগরী। তথায় বসুমিত্ত নামে গৃহস্থ বাস করে। ভাষা তার ধনশ্রী নাম)
পুত্তো সে ধনবসু ধূয়া সে বসুদত্তা। তেন চ বসুমিত্ত-সখবাহেন কোসম্বী-বসুব্বসুস ধনদেব-সখবাহসুস
(=পুত্র তার ধনবসু কন্যা তার বসুদত্তা। সেই বসুমিত্ত সখবাহ কোসাম্বী-নিবাসী ধনদেব-
সখবাহকে)

বাণিজ্জপসঙ্গেন আগয়সুস ধূয়া বসুদত্তা দিন্না।

(=বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আগত, কন্যা বসুদত্তাকে দিলে।)

প্রাকৃত গল্পের এই স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক রীতি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় চলে এসেছিল মৌখিক গল্প বলার রীতিতে। যে দু একটি ভাষায় গোড়ার দিকেই গল্প লেখা গল্পের চলন হয়েছিল সেখানে এই রীতির অশুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সাহিত্যে প্রথম থেকেই পুরাপুরি গল্পের কারবার। গল্পের প্রকাশে ব্যবহার কিঞ্চিৎ দেখা দিয়েছিল প্রশস্তি-অশুশাসন লিপিতে সংস্কৃতের সুযোগী হিসাবে শুধু দুটি প্রত্যন্ত ভাষায়—দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মারাঠীতে আর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে উড়িয়ায়। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর দুই একটি শিলালেখ প্রাচীন মারাঠী ও প্রাচীন উড়িয়া গল্প বাক্যরচনার সামান্য নিদর্শন মিলেছে। সাহিত্যে যার এমন রচনায় ধারাবাহিক গল্পের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে প্রথম উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় প্রাচীন গুজরাটী-রাজস্থানীতে বেশি করে এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তীয় প্রাচীন মৈথিলীতে কিঞ্চিৎ—ত্রয়োদশ-চতুর্দশ

শতাব্দী থেকে। উত্তর-পূর্ব প্রান্তীয় অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক গল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় আরও পরে, যথাক্রমে বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে।

প্রাচীন গল্পরাচী গল্পের একটি নিদর্শন খোনাই। গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৪১১ সংকতে অর্থাৎ ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। পূর্বে উদ্ধৃত প্রাকৃত গল্পের ছাঁদের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

ইহী তি জম্বুদীপমাহি ভরতক্ষেত্র মাহি মগধ নামি জনপদ ছই। তিহী বিজয়বতী নামি
(= এই যে জম্বুদীপ মাঝে ভরতক্ষেত্র (ভার) মাঝে মগধ নামে জনপদ আছে। সেখানে বিজয়বতী নামে)

নগরী তিহী নরবর্ম নামি রাজা রতিসুন্দরী নামি পটমহাদেবী হুংতী। হরিদন্ত নামি পুত্র হুংতউ।

(= নগর সেখানে নরবর্ম নামে রাজা রতিসুন্দরী নামে পাটরাণী ছিল। হরিদন্ত নামে পুত্র ছিল।)
যতিসাগরাদিক অনেক মহামাত্য হুংতা। অনেক দিবসি রাজেন্দ্র আগই সভামাহি ধর্মবিচার-
(= যতিসাগর আদি অনেক মহামাত্য ছিল। একদিন রাজেন্দ্রের আগে সভামাঝে ধর্মবিচার-)
বিষই আলাপু নীপনউ। তএ একি কাহিউ ধর্ম দাক্ষিণ্যোদার্যাদিকহং গুণই করী হয়ই।
(= বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল। সেখানে একজন বললে, ধর্ম দাক্ষিণ্য ঔদার্য প্রভৃতি গুণের দ্বারা হয়।) ইত্যাদি।

প্রাচীন মৈথিলীতে যে গল্প রচনাটি পাওয়া গেছে তার রীতি বলা যায় কবিত্বময় বা ছন্দিত গল্প (rhythmic prose)। যেমন, সন্ধ্যা বর্ণনা

আদিত্য সংসারক চিন্তাকই অস্তাচল গই অপগত ভউঅহ | ভ্রমরহি পদ্ম তেজল |

(= আদিত্য সংসারের চিন্তা করে অস্তাচলে গিয়ে অপগত হলেন | ভ্রমরেরা পদ্ম ত্যাগ করলে)

অনি আকাশ অঙ্ককার করীআ ঙউ | আদিত্যকে ভঞ্জে লুকাএল অঙ্ককার

(= যেন আকাশ অঙ্ককার করে এল | আদিত্যের ভয়ে লুকানো অঙ্ককার)

অছ সে মিলিত ভউ | তদনন্তর ভউ কইসন | ধুমক সম্ভার।

(= ছিল সে মিলিত হল | তারপর হল কেমন | ধূমের সম্ভার)

গোক সকার | চটকক কোলাহল | নক্ষত্রক উপগম | দীপক উজ্জ্বল।

(= গোকর গমন | চটকের কোলাহল | নক্ষত্রের উপগম | দীপের প্রজ্জ্বলন)

শ্রোত্রিয়াদিক প্রাণায়াম | ...

(= শ্রোত্রিয়দের প্রাণায়াম।)...

বাংলা-অসমিয়াতে সর্ব প্রাচীন গল্পরচনা যা পাওয়া যায় তা পত্র-দলিল। গ্রন্থাকারে গল্পরচনা পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। এ বিষয়ে অসমিয়া বাংলার অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা বলে ধরে নেওয়া যায় এমন বাংলা গল্পগ্রন্থ হল দু'একটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বৈক্য কড়চা-বই এক একখানি কড়চাজাতীয় বড় গ্রন্থ—বাজালী খ্রীষ্টানের লেখা। বৈক্য ও খ্রীষ্টানরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য বই প্রথম লিখেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চিঠিলেখার ঠাইলের একটি ভালো এবং খাঁটি নিদর্শন উদ্ধৃত আছে ত্রিপুরাবৃত্তীতে।

পত্রটির ভাষা যেমন লক্ষণীয় তার বস্তু তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। সেকালে এক দেশে থেকে আর দেশে রাষ্ট্রনৈতিক পত্র ফরাসীতে অথবা সংস্কৃতে লেখা হত। কিন্তু পূর্বোক্তর ভারতে বাংলাই চলত। এই 'রহস্ত-পত্রে' (অর্থাৎ confidential letter-এ) পত্রের আরম্ভ, শিরোনামা অংশ, যথাযোগ্য আড়ম্বরপূর্ণ সংস্কৃতে লেখা। পত্রটি এই—

শ্রুতি নিস্তলনিরন্তরামিতদানমানসস্থানমানিতানেকনিবৃত্তাস্বজনগণগীর্য়মানমশোবাক্যহিমকরধনী-
কৃতাস্বর-নিবন্ধকোশকরবীরমস্তমাতঙ্গনিকায় প্রতিমবিপক্ষবহুবিদ্রাবজনবীরমহিলানয়ননির্গচ্ছদধুনিকর-
প্রতাপতপনতাপতিরোভূততিমিরততিস্বজনপদ-চতুঃপদীকৃতধর্মধর্মাবতারজি.....পবিত্রীকৃতবিশ্বস্তর শ্রীশ্রীকৃত
বহুমানিকাদেব-রাজবরাবরেষু লেখনম্। রহস্তপত্রমিদম্।

পরং সমাচার এহি জনঘোষ এমন প্রসিক হৈয়াছে যে মগলের বৈপরীত্য চেষ্টাতে বেদোক্ত
ধর্ম রক্ষা পাই না। ইকারণ তদ্ প্রতিকারার্থ ব্যাপার করিতে যদি তোমার মনে ভাল
ভাসে তবে তোমার সহিতে যে যে বরলোকের হার্দতা আছে তান সমেত সমলোচন করিয়া
যথাবৃত্ত সামার্থ্য শক্তি আমার ঠাই বিশেষিয়া লিখিবায়। সমস্ত লোক ঈশ্বর অধীন
তথাপি যেমনে আপন দেশতে অন্যে পরাভব ব্যতিরেকে স্বচ্ছন্দে রাজ্য চেষ্টা করিতে পারি
তথা যথেষ্ট ব্যবহারতে অন্য সাপেক্ষ নয় তাক প্রতি সর্বথা যত্ন করিতে সমুচিত হয়।
বাকী সমাচার শ্রীরত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস মুখে জ্ঞাত হৈবার। কিমধিকবিস্তৃতমেধিতি।

শক ১৬৩৩ মাস কার্তিক তেরিফ ৫ ॥

চিঠিটি লেখা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে। এর প্রায় তিরিশ
চল্লিশ বছর আগে লেখা একটি ধর্মবিচারের সংক্ষিপ্ত রায় আমাদের ভাষার পুরানো ভাণ্ডারে একটি দুর্লভ বস্তু।
সেটি বলছি। এক বাঙালী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর সঙ্গে দুজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিজস্বের শাস্ত্রের মূল্য নিয়ে
বিচার হয়েছিল। বিচারক ছিলেন এক মুসলমান ফকীর। রায় তাঁরই।

আজ্জার সাখ্যাত শ্রীকৃষ্ণদাস সন্ন্যাসি ও সিবরাম ও রতিরাম ভট্টাচার্য ইহারা শাস্ত্রের বিচার
করিল তাহাতে সন্ন্যাসির বিচার উক্তয় ভট্টাচার্যের বিচারেত থাকীয়া কীন্ত আমার সান্ত্র-
ধরানে দুই সান্ত্র ইহার ঘরে বাতিল দুইজন ইহারা মূলহিদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত গল্প-রচনার ভঙ্গির একটিমাত্র খাটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেটি
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শ্রীমুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে হাল্‌হেডের কাগজপত্র
থেকে আবিষ্কার করেছিলেন। গল্পটির আরম্ভ এই রকম।

মোকাম ভোজপুর। শ্রীমুত ভোজরাজা। তাহার কন্যা নাম শ্রীমতী মৌনাবতী। বোড়শ-
বরিস্তা। বড় সুন্দরী। মুখ চন্দ্রতুল্য। কেশ মেঘের রঙ্গ। চকু আকর্ষ্য পর্যন্ত। মুখ্য ভ্রূর
ধনুকের নেয়ায়। গুণ রক্তিমের বর্ণ। হস্ত পদ্মের মণাল। স্তন দাড়িম ফল। রূপলাবণ্য বিদ্যুৎ
ছটা। তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরী। সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পণ
করিয়াছে রাজ্যের মধ্যে যে কথা কথাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।

প্রথম দীর্ঘ বাক্যটির ছাঁদ প্রাচীন মৈথিলীর যে উদাহরণ তুলিয়েছি তার অনুরূপ।

আধুনিক বাংলা গল্পের সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ প্রতিষ্ঠার কলে। এ কথাটি অন্তর্ভাবেও বলা যায়।

বাংলা গণ্ডের জন্মেই—অর্থাৎ ব্যবহারিক ভাষাকার্যের জন্মেই—মুদ্রায়ন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছিল আমাদের দেশে। এ কথা আমরা জানি, তবে বাংলা গণ্ডের ইতিহাস আলোচনায় এ তথ্যটি মনে রাখি না। মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপিত হল শাসন-কার্যের জন্মে,—ইস্তাহার, বিজ্ঞপ্তি, আইনের ধারা, কার্যবিধি, রিপোর্ট, ফর্ম ইত্যাদি কাগজপত্র বহু সংখ্যায় প্রস্তুত করবার জন্মে। সেই সঙ্গে ব্যবহারিক ভাষা শিখবার জন্মেও ব্যাকরণ অভিধান পাঠ্যগ্রন্থ ইত্যাদির ছাপাবার উদ্দেশ্যে মুদ্রায়ন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। স্বতরাং আধুনিক বাংলা গণ্ডের প্রধানত দুটি প্রয়োজনে—ব্যবহারে ও শিক্ষায়। এই দুটি প্রয়োজনে ব্যবহৃত গণ্ড দুই ভিন্নধারা অনুসরণ করেছিল। সে দুই ভিন্ন ধারা প্রায় গোড়া থেকেই ভিন্নথাতে বয়ে এসেছিল। সে হল পত্রদলিলের ধারা আর ব্যাখ্যানের ধারা। মুদ্রায়ন্ত্র প্রবর্তনের পরে বাংলা গণ্ডের এই দুধারার যে রূপভেদ ঘটল তাকে আমি বলি মুন্সিয়ানা ধারা ও পণ্ডিত ধারা। দুধারাই সাধু ভাষার। তবে মুন্সিয়ানায় ফারসীর প্রভাব অল্লাধিক বিদ্যমান এবং এতে কথা ভাষার প্রভাব এড়াবার চেষ্টা নেই। আর পণ্ডিতিতে সংস্কৃতে প্রভাব অত্যন্ত বিদ্যমান, বলতে পারি ক্রমবর্ধমান এবং এতে কথাভাষা এড়াবার প্রযত্ন সচেষ্ট।

সেকালের ধনীরা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্মে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুষতেন। কলিকাতার ধনীরা এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। ধনীদের সভায় সংস্কৃতেরই মান, বাংলা ভাষাকে তার অনুগত হয়েই ধনী সভায় ঠাই পেতে হত। অন্য দিক থেকেও সংস্কৃতের মর্যাদা খুব বেড়ে গেল। এদেশে কিছু পণ্ডিত ইংরেজ চাকরি নিয়ে এলেন। তাঁরা সংস্কৃত বিদ্যার পক্ষপাতী হলেন। উইলিয়ম কেরি এদেশে এসেছিলেন পাদরি হয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে। তিনি বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করালেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনিও ক্রমশ সংস্কৃতের পক্ষপাতী হলেন। বাইবেলের দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কৃতের ছাপ বেশি করে পড়ল।

স্বতরাং মুন্সিয়ানার কদর দিন দিন কমতে লাগল। অবশেষ যখন শাসন ও রাজস্ব কার্যে ফারসীর ব্যবহার উঠে গেল তখন থেকে সাধুভাষা থেকে মুন্সিয়ানা রীতি নিকশিত হল বলা যায়। তবুও বেশ রয়ে গিয়েছিল। সে বেশ ফারসী শব্দের যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহারে এবং ‘আমারদের, আমাদের, আমারদের’ ইত্যাদিতে বগী বিভক্তির পর ‘দের’ বিভক্তির ব্যবহারে। এই শেষের লক্ষণ অনুসারে অক্ষয়কুমার দত্তের রীতি মুন্সিয়ানা, বিভাসাগরের রীতি পণ্ডিত।

অক্ষয়কুমার গোড়ার দিকে ‘আমারদের’ লিখতেন (যেমন, ‘বাহুবল্লব সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ দ্বিতীয় ভাগে, ১৮৫৩)। পরে তা লিখতেন না (যেমন ‘ধর্মনীতি’ প্রথম ভাগে, ১৮৫৬)।

অক্ষয়কুমারের রচনার যে নিদর্শনটুকু উদ্ধৃত করছি তাতে ষারকানাথ ঠাকুর কোম্পানির ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া সম্বন্ধে লেখক স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন। এ রচনা প্রথমে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৭৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যে প্রকার বাণিজ্য বিষয়ক বিপত্তি ঘটনা হয়, তাহার ফল কারণ বিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিকট প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার একমাত্র হেতু। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অর্থ লোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতির শাসন অবহেলন পূর্বক অতি প্রবল নিকট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী কার্য করাতেই এই সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, এবং এই

নিমিত্তে তাঁহারদিগকেও স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারদিগের অসম্মত ও মানভ্রংশ হইল, স্বয়ং বাণিজ্যাগারের কর্ম বন্ধ হইল, সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং তাঁহারা জন-সমাজে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিচিত হইয়া সকলের অনাদরনীয়, ও অবিশ্রুত হইলেন। যদি তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে তাঁহাদের বশবর্তী রাখিয়া স্ব স্ব অর্থ সামর্থ্য ও আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্বক আপন আপন বাণিজ্য-কার্য্য নির্বাহ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থ ও লোকহিতার্থী হইয়া যথা নিয়মে ব্যাঙ্কের কর্ম সম্পন্ন করিতেন, তবে এ প্রকার দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না, এবং তাঁহারদিগকেও এরূপ লজ্জা ও ক্লেশপ্রাপ্ত হইতে হইত না।
(বাহুবল্লভ, দ্বিতীয় ভাগ)

অক্ষয়কুমার অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা রূপ নিজে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। তাঁর কোন কোন গ্রন্থের পরিশিষ্টে এমন শব্দের তালিকা দেওয়া আছে। যেমন,

Polygamy—অধিবেদন। Elements—রূঢ় পদার্থ। Political economy—লোকাযাজ্য-বিধান। Individuality—ব্যক্তিগ্রাহিতা। Ideality—শোভানুভাবকতা। Equilibrium—সমসংস্থান। Eventuality—ঘটনানুভাবকতা। Constructiveness—নির্মিত্বসা। Combativeness—প্রতিবিধিত্বসা। Science of Government—রাজনীতি। Revolution—রাজবিপ্লব। Philo-progenitiveness—অপত্যস্নেহ। ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের গল্পরীতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি। আজ শুধু একটি কথা বলেই শেষ করছি। অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ধাপে ধাপে। তাঁর প্রথম গল্প রচনা ‘ভূগোল’এর ভাষার সঙ্গে ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’এর ভাষা তুলনা করলে তা বোধগম্য হবে। বিদ্যাসাগর বাংলা গল্পে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাঁর প্রথম বই ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’তেই। বিদ্যাসাগর গোড়া থেকেই সিন্ধুহস্ত ॥

সাহিত্যে স্টাইল

জিজ্ঞাসালাল নাথ

লাটিন 'স্টাইলাস' থেকে স্টাইল শব্দটি উদ্ভূত। প্রথমে স্টাইল বলতে বোঝাত অস্থি বা ধাতুনির্মিত এক ধরনের ছুঁছলো লিখবার উপাদান যা মোমের উপর দাগ কাটবার কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ক্লাসিক্যাল লাতিনেই ক্রমশ স্টাইলসের অর্থপ্রসার ঘটতে থাকে। আদিতে লেখকের লিখবার বিশিষ্ট ঢঙ, তার পরে লেখার বা কথার ব্যক্তিমাহুষের প্রকাশরীতিই সাধারণ ভাবে স্টাইল বলে অভিহিত হতে থাকে। আধুনিক ইংরেজিতে স্টাইল শব্দটি আরও অর্থব্যবহালাভ করেছে। ক্যাসীর মতো ইংরেজিতেও স্টাইল বলতে বোঝায় 'ভালো ভাবে নিজেকে প্রকাশ করা', শুধুমাত্র সাহিত্যে নয়, অন্যান্য শিল্প, এমনকি জীবনচর্চার ক্ষেত্রেও স্টাইলের অবাধ প্রয়োগ দেখা যায়। সাহিত্যে স্টাইলের দুটো অর্থ আমাদের মুখ্য বিবেচ্য—প্রথম লিখবার বিশিষ্ট কোনো রীতি, দ্বিতীয় ভালো লিখবার ভঙ্গি।

প্রকাশের বিশিষ্ট ঢঙ বা ভঙ্গি সাহিত্যের সকল বিভাগকেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করলেও স্টাইলের আলোচনা মুখ্যত গদ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। প্রকাশের জগতে স্পষ্টতা এবং সংহতি প্রধান বিবেচ্য হলেও বিষয় অনুসারে রচনার চাকতা এবং অন্তরঙ্গতার সঞ্চার হয়েছে কিনা তাও দেখা হয়। বস্তু বাস্তব রূপ মাত্র নয়, আবেগমিশ্রিত মার্যরূপই বস্তুকে সৃষ্টির জগতে উদ্ভীর্ণ করে। 'বস্তু থেকে সেই মার্যাতো সত্যভরো/তুমি আমার আপনি রচে আপন করো।'—এর চাইতে বড় সত্য সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আর কিছু হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে আবেগময় অনুভূতি থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি এবং অপরের অন্তরে আবেগসঞ্চারের সামর্থ্যের মধ্যেই তার সার্থকতা। সাহিত্যের মতো জীবনেও এ আবেগময়তার প্রভাব অপরিমীম। আবেগময় কখন ও লেখনভঙ্গির সাহায্যে এডল্ফ হিটলার একদিন আরমান জাতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, যেমন ভাষা দিয়েছিলেন উইনস্টন চার্চিল ইংরেজ জাতির অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে তাদের বিষন্নতম এবং আনন্দিত মুহূর্তে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিবেকানন্দের সাহিত্যে জাতীয় জীবনের বার্ষতার অনুভূতি এবং ভবিষ্যৎ আশাবাদী স্বপ্ন আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশিত। বস্তুবাদী কম্যুনিষ্ট পর্যন্ত বলবার বা লিখবার বিশিষ্ট ভঙ্গিকে বুর্জোয়া ভাববিলাস বলে উড়িয়ে দেন নি। ভাষাতাত্ত্বিক এবং সমালোচকদের উচিত স্টাইলের স্টাইল আরম্ভ করা, কিংবা স্টাইল যেমন লিখতেন সে বাক্য লিখতে শেখো—এ ধরনের উক্তির মধ্যে স্টাইলের মূল্য এবং প্রভাব কম্যুনিষ্ট সমাজেও স্বীকৃত।

কথা উঠতে পারে শুধু মাত্র বিষয়গৌরবের জগতই কোনো কোনো রচনা মানবমনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কার্ল মার্কসের রচনা আধুনিক চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে যে নতুন বেদের মর্যাদা লাভ করেছে তা তাঁর স্টাইলের জন্ত নয় নিশ্চয়ই। স্বেচ্ছাবোধের মতো সচেতন স্টাইলসম্পন্ন লেখক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে মহত্তম লেখক নিখুঁত শব্দ প্রয়োগ করার প্রয়াসের চাইতে বৃহত্তর বিষয় চিন্তার মগ্ন থাকেন বেশি। এ মত যুক্তিনির্ভর সন্দেহ নেই, কিন্তু চরম সত্য বলে স্বীকার করা চলে না। স্বর্ট, জিকেল অথবা ব্যালজাকের রচনার কোনো কোনো স্থানে অসতর্কতা এমনকি নিম্নমানের পরিচয়ও মিলে, কিন্তু আলোকিত মুহূর্তে তাঁদের রচনা মহত্ত্বের যে তুঙ্গ শীর্ষ স্পর্শ করেছে তার ভিত্তিতে তাঁদের উৎকৃষ্ট

স্টাইল। শব্দচন্দ্রের অনন্তসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে অভিনব জীবনদৃষ্টির কথা স্বীকার ক'রে নিলেও তাঁর স্টাইলের দুর্নিবার আকর্ষণের কথা অস্বীকার করা যাবে কি? সেক্সপীয়রের বিকলদেহ ও প্রেটের দুর্বলতা, অগভীর চরিত্র সৃষ্টি কিংবা উপরিতলবিহারী আইডিয়া সৃষ্টির অভিজোগ আনা হয়েছে। এ ধরনের অভিজোগকারীরাও তাঁর ভাষাভঙ্গির বহুশ্রমের যাদুপ্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারেন নি। বিশ্বসাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা হোয়েস, ভার্জিল, পোপ, রেসাইন (Racine) এমনকি রুবেয়াঁরের মতো দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিভাসম্পন্ন লেখকও শুধুমাত্র স্টাইলের গুণ সাহিত্যজগতে অরণীয়তা অর্জন করেছেন। অসংলগ্ন ব্যঞ্জনাহীন শব্দ নয়, যে শব্দ অর্থব্যঞ্জনার তীব্র শক্তিতে জগতকে নাড়া দিতে পারে সে ধরনের শব্দনির্ভর স্টাইল সাহিত্যজগতে মূল্যসমৃদ্ধ বিবেচিত হবে নিশ্চয়ই। মানুষ যতকাল আবেগপ্রবণ থাকবে ততকাল এ ব্যঞ্জনা প্রধান শব্দসমৃদ্ধ স্টাইলের প্রভাব তার পক্ষে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

প্রেটের সমকাল থেকে একটি প্রশ্ন উঠেছে—স্টাইলকে কি বর্ণনীয় বিষয়বস্তু থেকে আলাদা করা যায়? প্রেটো মনে করতেন সত্যিকারের সৌন্দর্য বা পরিপূর্ণতা নির্ভর করে স্বপ্ন ও বাস্তব, ছায়া ও কায়া এবং দেহ-আত্মার সামঞ্জস্যময় সমন্বয়ের ওপর। লেখকের আন্তরিক বক্তব্য যদি কিছু থাকে তা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা তিনি পাবেনই। এই হিসেবে স্টাইল-সহজাত, প্রেরণালব্ধ এবং তার প্রকাশ স্বতস্ফূর্ত।

এ মত মূল্যবান কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য নয়। স্টাইল শিল্পবোধজাত এবং এর সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে লেখকের সচেতন প্রয়াস—এ মতেরও সবল সমর্থক দেখা যায় এরিস্টটলের আমল থেকে। কবি এবং গদ্য লেখকদের নিজেদের রচনা নিয়ে মক্কা করতে দেখা যায় বহুকাল যাবৎ। আত্মসমৃষ্টি লাভ করা পর্যন্ত তাঁরা কোনো যায়গা পাল্টান, বাদ দেন, একটিকে বাদ দিয়ে তার যায়গায় অন্য শব্দ সংযোগ করেন। কীটস, রুবেয়াঁর এবং রবীন্দ্রনাথের মতো স্টাইলসম্পন্ন লেখকও সচেতন শব্দশিল্পী, ভাস্করের মতো বহু আয়াস স্বীকার ক'রে তাঁরা শিল্পসামর্থ্য অর্জন করেছেন। তাঁদের গ্রন্থন প্রক্রিয়া অনেক স্থলে এত চমৎকার সার্থকতা লাভ করেছে যে পাঠকের মনে হয় ভাববস্তু এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আবার উল্টোটোও দেখা যায়। কোনো কোনো রচনা পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে হয় লেখক তাঁর স্টাইলের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়েছেন শুধু তাঁর ভাবদৈন্ত্য ঢাকবার জন্তে।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্টাইলকে ভাষার নান্দনিক রূপ বলতে বাধা নেই। অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার প্রকাশ মুহূর্তে ভাববস্তু ভাষাদেহে এ ধরনের রূপ গ্রহণ করে। সত্যিকারের স্টাইল সম্পন্ন লেখক নিভৃত আলাপচারী নন, তিনি সামাজিক—সমাজমন স্পর্শ করাই তার লক্ষ্য। বৃহত্তর সমাজমন আকর্ষণ করতে গেলে তাঁকে রচনায় স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল হতে হয় (প্রাচ্য এবং পশ্চাত্যের মহাকাবিদের রচনা স্মর্তব্য)। আড়ম্বর-প্রিয় লেখকেরা লেখেন তাঁদের সংকীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর জন্ত। প্রচলিত বাগবিধিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন বাগবিধি সৃষ্টি ক'রে নির্বাচিত পাঠকমনকে আকর্ষণ করবার দিকেই তাঁদের ঝোঁক বেশি। জ্ঞান কিংবা চিন্তার গভীরতা তাদের ভাষাকে দুর্বল করে না, এ দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির পশ্চাতে থাকে পাঠক মনে চমক সৃষ্টির একটি সুগোপন ইচ্ছা। এ প্রয়াস থেকে সৃষ্টি হয় কোনো বিশেষ রীতির প্রতি অত্যধিক আসক্তি (mannerism) কিংবা কৌশল যা স্টাইলের জগতে কৌতূহলের লক্ষণাক্রান্ত—স্টাইলের অন্তরতম পরিচয় নয়। ইদানীংকালে স্টাইলের এ কৃত্রিমতা বাংলা সাহিত্যকে যে নিম্নাণ ক'রে তুলেছে তা কারো অজানা নয়।

যথোপযুক্ত স্টাইল সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক পাঠক-অন্তরে যা সঞ্চারিত করতে চান তা জ্ঞান নয়— আনন্দ, এটা বলাই বাহুল্য। জ্ঞানের বিষয়ও যে স্টাইল-সম্পন্ন লেখক সঞ্চারিত করেন না তা নয়, তবে সেটা ঘটে থাকে আত্মবিক্রমিক ভাবে, আনন্দ পরিবেশনটাই মুখ্য। এ কারণে স্টাইলকে সাহিত্যজগতে আটের অন্তর্ভুক্ত সামগ্রী বলে অভিহিত করা যায়। নিছক উপস্থাপনা বা বিবৃতির স্তর অতিক্রম ক'রে রচনা যখন সাহিত্যের কোঠায় উন্নীত হয় তখনই স্টাইলের প্রশ্ন ওঠে। ভাষা এবং সাহিত্যের সম্পর্কটা অনেকটা বাস্তবিক, যেহেতু ভাষার অগ্রগতিতে সাহিত্যের সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইঙ্গিত সাহিত্যকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ শব্দ বা শব্দ-সম্পর্ক খুঁজে বার করতে হয় স্টাইল-সম্পন্ন লেখককে। এ ধরনের শব্দ পাওয়া একান্ত অসম্ভব হলে তাঁকে নিজেই শব্দ সৃষ্টি করতে হয় বা ধার করতে হয় কিংবা অপর কোনো ভাষা থেকে আশ্রয় ক'রে নিতে হয়। সাহিত্যিক প্রকাশের জন্য ভাষা-উৎসের সমৃদ্ধি ছাড়া কোনো ভাষার স্টাইলই উন্নত হতে পারে নি। শব্দই স্টাইলের কাঁচা মাল বলে স্টাইলের অগ্রগতিতে বহু দেশের সাহিত্য বিদেশী শব্দকে আশ্রয় করেছে। ইংরেজি সাহিত্যের বিপুল প্রকাশ-ক্ষমতার পশ্চাতে রয়েছে কেল্টিক, টিউটনিক, ল্যাটিন, গ্রীক, আরো কোনো কোনো যুরোপীয় এবং প্রাচ্য ভাষা থেকে ব্যাপক গ্রহণ। আধুনিক কথ্য ভাষার উন্নতির মূলেও একই। গত শতাব্দীতে বাংলা ভাষার দ্রুত অগ্রগতির মূলেও রয়েছে বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ। এ ভাবে অপর ভাষাগোষ্ঠীর শব্দের স্বাক্ষরকরণের দ্বারা স্টাইল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে—বিভিন্ন সাহিত্যের স্টাইল আলোচনায় এটা দেখা গেছে।

তা হলে দেখা গেল স্টাইলের অস্তিত্ব নির্ভরশীল প্রথমত, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিস্তীর্ণ শব্দ সম্ভারের ওপর—যে শব্দসম্ভার অনেক সময় সৃষ্টি হয় সংস্কৃতি প্রসারের প্রয়োজনে। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত শব্দ, বাগধারা এবং প্রকাশবাক্য অভিধার সঙ্গে অমুদ্রিত যুক্ত—যা অতীত ব্যবহারের স্বতিকে আলোড়িত করে—স্টাইল তার ওপরও নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, আবেগের স্পন্দনের সঙ্গে তাল রেখে তদোপযোগী শব্দ ব্যবহারের ওপর এবং সর্বশেষে সূক্ষ্ম অলংকার প্রয়োগের ওপর। বলা বাহুল্য, মনের বিচিত্র ভাবানুভূতিকে সুনিয়ন্ত্রিত রূপ দিতে কিংবা তীব্র ক'রে তুলতে বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগের প্রয়োজন বিভিন্ন যুগের স্টাইল সম্পন্ন লেখকদের নিকট অপরিহার্য মনে হয়েছে।

সুতরাং রচনার স্টাইলের আবির্ভাব শুধুমাত্র লেখকের অমুদ্রিত প্রবাসমূলক—এ কথা স্বীকার করা যাবে কি ক'রে? আসলে স্টাইল এক ধরনের শিল্পকর্ম এবং স্টাইল সম্পন্ন লেখকও শিল্পী—স্টাইলের সমস্তকে এ ভাবে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা ভালো। অগাধ শিল্পীর মতো তাঁরও আয়ত্তে আছে কাঁচামাল এবং শিল্পের নানা উপাদান। এগুলির সাহায্যে সাহিত্যশিল্পী প্রয়াসের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্টাইল গড়ে তোলেন। কোনো সময় সে স্টাইল সৃষ্টির উৎসে থাকে লেখকের শক্তি এবং আবেগ, আবার কোনো সময় লেখক দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আয়াস স্বীকার ক'রে শিল্প-বিবেকসম্মত একটি স্টাইল সৃষ্টি করেন। আবার কষ্টান্ত্রিত স্টাইল সৃষ্টির অস্তিত্বও দুর্নিরীক্ষ নয়। অবশ্য স্টাইলের উৎকর্ষ বিচারে উপাদান বা প্রক্রিয়াটা বিবেচ্য নয়—বিবেচ্য তার শৈল্পিক পরিকল্পনা, সমন্বিত রূপ এবং পরিণত প্রভাব। কোনো সময় স্টাইল হতে পারে নিকৃষ্টাপ এবং বাহ্যাবলম্বিত, স্বকুমার, স্থির বা উন্নতশীর্ণ। এ ছাড়া আছে সাবান এবং প্রাণবন্ত স্টাইল—যা পাঠকের সমগ্র সত্তাকে শুধু অভিভূত করে না দুনিবার বেগে আকর্ষণ করে সামনের দিকে। রচনার স্টাইলের আবির্ভাব হতে পারে মৌলিক কোনো শক্তিরূপে অথবা ছোটখাট বিচার

বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করবার মতো প্রতিস্পর্ধী রূপে। একজন লেখক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন—‘উত্তর-স্বরীরা মহৎ সাহিত্য কর্মকে বিচার করবে শুধু স্টাইলের জন্য—যেহেতু লেখকের সত্যিকারের নিজস্বতা বলতে আর কিছু থাকে না, থাকে শুধু স্টাইল।’ স্টাইলের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সুতরাং সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে স্টাইলের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রগতি ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। সাহিত্যে স্টাইল সে বস্তু যার সাহায্যে একজন লেখকের ব্যক্তিত্ব অপর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এদিক থেকে স্টাইলের সমস্তাৎ ব্যক্তিত্বের সমস্তাৎ বলতে বাধা নেই। স্টাইল সম্পর্কিত আলোচনায় পরবর্তী প্রশ্ন ওঠে—কোন ধরনের রচনা মানুষের ভাবানুভূতিকে গভীরভাবে জাগ্রত করে? উত্তরে বলা যায়—ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যদি অন্তরঙ্গ হয় তা হলে খুব তথ্যপূর্ণ কিংবা যুক্তিপূর্ণ নৈব্যক্তিক রচনাও পাঠক মনকে অভিভূত করতে পারে। শুধুমাত্র নিছক বিবৃতি নয়, আকর্ষণীয় রূপে বলতে পারার মধ্যে রয়েছে স্টাইলের সত্যিকারের পরিচয়। স্টাইল শব্দসম্ভার্যে বিভূষিত ব্যক্তিত্ব, কথা নির্ভর চরিত্র। হস্তাক্ষরের মধ্যে যদি চরিত্রের প্রকাশ ঘটে থাকে স্টাইলের মধ্যে সে প্রকাশ আরো স্বয়ংস্ফূট। স্টাইল রচনার ব্যাকরণগত বা শব্দগত কৌশলমাত্র নয়, লেখকের আত্মার প্রতিভাস। এ কারণে দেখা যায় যে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতি পাঠক অন্ধাশীল নয় তাঁর বক্তব্যের প্রতিও তারা বিমূখ। এরিস্টটল বলেছিলেন—লেখকের সহানুভূতি এবং ব্যক্তিত্বই তাঁকে পাঠকপ্রিয় করে। লঙ্গিনাস (Lenginus) কথাটাকে আরও সুন্দর করে বলেছিলেন—*Height of style is the echo of a great personality*—উজ্জ্বলতম স্টাইল মহৎ ব্যক্তিত্বেরই প্রতিধ্বনি।

কোনো কোনো বিজ্ঞানের মতো কথা এবং রচনা শিল্পেরও দুটো দিক আছে—একটি ব্যবহারিক অপরটি বিগুহ। ব্যবহারিক রচনার এবং মুখের কথার বাস্তব লক্ষ্য স্পষ্ট—যেমন, ভোটের জন্য ক্যানভাস করা, জুরির উদ্দেশ্যে বিচারকের বক্তব্য, সরকারী স্মারকলিপি রচনা কিংবা প্রচারকার্য অথবা অর্থকরী লেখা। এ ধরনের লেখা শ্রোতার পক্ষে উপযোগী না হলে মূল্যহীন। কিন্তু বিগুহ সাহিত্যশ্রষ্টা তাঁদের জন্য লেখেন যাদের তিনি জানেন না, জানবার কোনো উপায়ও নেই, এমনকি ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্যও লেখক লিখে থাকেন (আজি হতে শতবর্ষ পরে। কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/কৌতুহলভরে)। নিজের মনের আনন্দেই তিনি লিখে থাকেন, অবশ্য পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করবার গোপন প্রবৃত্তিও যে তাঁর মনে থাকে না একথা জোর করে বলা যায় না। যে শ্রোতৃবৃন্দের জন্য তিনি লিখে থাকেন তাঁর কাছে তাঁরা আদর্শ শ্রোতা। তাঁদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা বিষয়ে লেখক অবশ্যই মনোযোগী হবেন। কিন্তু শুধুমাত্র পাঠকের মনোরঞ্জননের জন্য নিজের কচিবিরুদ্ধ রচনা বিগুহ সাহিত্যরচয়িতার নিকট আত্মপ্রবঞ্চনা এমন কি বেষ্ঠাবৃত্তির সামিল।

উজ্জ্বলতম স্টাইল সৃষ্টির জন্য বিগুহ সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কতগুলি চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য অর্জন করা। রচনার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য লেখকের যে চরিত্রসৃষ্টির সহায়ক এখন তা আলোচনা করা যেতে পারে।

সাধারণত দেখা যায় দুটি বৈশিষ্ট্য রচনাকে পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় করে—স্পষ্টতা এবং সংক্ষিপ্ততা। যে লেখকের রচনা ভঙ্গিদোষে দুষ্ট কিংবা অস্পষ্ট তার মর্মগ্রহণে পাঠককে অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার

করতে হয়। এ কারণে রচনার স্পষ্টতার প্রয়োজনীয়তা এত অভিনন্দিত। দ্বিতীয়ত, বক্তব্যকে পল্লবিত ক'রে প্রকাশ করা হলে তার সারগ্রহণে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়। এ জন্য বাহ্যিক বর্জিত সংহত প্রকাশ স্টাইলের অন্যতম গুণ বলে স্বীকৃত। ফরাসী স্টাইলের যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা আনাতল ফ্রান্স উল্লেখ করেছেন সে তিনটিই 'স্পষ্টতা' (Charity) ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই বলে রচনার অস্পষ্টতাকে একদম এড়িয়ে যাওয়া কি সম্ভব? আইনস্টাইনের শূন্য ভাবধারা কিংবা প্রস্তের মনস্তত্ত্বের প্রকাশ যে একটু জটিল হবে তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আপত্তি ওঠে তখন যখন কোনো দার্শনিক ভাবাপন্ন লেখক উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যকে স্পষ্ট না ক'রে অনাবশ্যক জটিল ক'রে তোলেন কিংবা বিজ্ঞান বিষয়ক আবোধা শব্দ প্রয়োগের সাহায্যে রচনাকে দুর্বল এবং আয়ত্তের অতীত বিষয়ে পরিণত করেন। এ ছাড়া ভাবচিন্তার অসামঞ্জস্য এবং শব্দ ব্যবহারে অস্বাচ্ছন্দ্যের জটিল অস্পষ্টতা সৃষ্টি হতে পারে। অস্পষ্টতার উৎস হিসেবে রচনায় এ দুটি দুর্বলতা অবশ্য একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। লেখকের অহং পরায়ণ বিবেচনাহীন ধারণাও (অর্থাৎ লেখক যখন মনে করেন সমস্ত পাঠক তাঁর সামনে জ্ঞানী) অনেক সময় রচনার অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে। অনেক কথাকে এক সঙ্গে একটি বাক্যে প্রকাশের প্রয়াসের ফলে কিংবা বাক্যের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলেও রচনার অস্পষ্টতা দেখা দেয়। আড়ম্বর সৃষ্টি প্রয়াস রচনাকে অনেক সময় দুর্বোধ্য করে। আড়ম্বরপ্রিয়তা বাক্‌চাতুরীর দোসর হিসেবে বহুকাল যাবৎ পাঠক মনে ধোঁকা দিচ্ছে। তথাপি এ দুটি রচনা কৌশলের ভেতর এমন একটি চমক আছে যা পাঠক সহজে অতিক্রম করতে পারে না।

স্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতা স্টাইলের অন্যতম গুণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাও আছে। স্পষ্ট রচনা সহজ এবং বৈচিত্র্যহীন বলে অনেক সময় পাঠক মনকে আকর্ষণ করে না। সুতরাং স্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সরসতা সঞ্চার ক'রে রচনাকে নবীনতাধর্মী রমণীয় ক'রে তোলা দরকার। গোল্ডস্মিথ, মেকলে কিংবা রামেন্দ্রচন্দ্রের অথবা হরপ্রসাদের রচনাভঙ্গি স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হলেও আকর্ষণীয়, যেহেতু তাঁদের বাচনভঙ্গি সরস, বর্ণনীয় বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, নবীনতাধর্মী। স্বচ্ছতাকে প্রাণবন্ত এবং আনন্দময় ক'রে তুলতে হলে অনেক সময় অলংকার প্রয়োগও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ওঠে কোন উপায়ে স্টাইলে স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা এনে রচনাকে পাঠকপ্রিয় করা যায়? একমাত্র উপায় পাঠকের প্রতি লেখকের সেবার মনোভাব। রচনার সাহায্যে পাঠকের সেবা করা যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তা হলে রচনাকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করবার জন্য অবশ্যই তিনি যত্নবান হবেন। আর যদি পাঠক মনে চমক সৃষ্টি লেখকের লক্ষ্য হয় তা হলে রচনারীতিতে ঐচ্ছল্যের দীপ্তি এনেও তা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হবে না। এ ছাড়া রচনায় অস্পষ্টতা ঘটে অনেক সময় লেখকের অসামর্থ্যের জন্য নয়, বরং উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য। স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে ভাবগভীরতা সৃষ্টির সাহায্যে অপরের প্রশংসা পাওয়ার লোভ, কিংবা ধ্বনি ঐশ্বর্য বা আলাংকারিক ঐশ্বর্যের সাহায্যে রচনাকে প্রসাধিত করবার প্রয়াস এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা-উদ্ভূত। ভাববস্ত্র মনে স্বচ্ছ রূপ পরিগ্রহ করা পর্যন্ত লেখককে বারে বারে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে; তার পর স্পষ্ট স্বর পরম্পরায় তাদের বিদ্রুপ করা প্রয়োজন; শব্দ বাক্য এবং অঙ্কুচ্ছেদকে যথাসম্ভব জটিলতাবর্জিত সরল রূপ দিতে হবে, একই সঙ্গে অনেক কথা বলবার লোভ ত্যাগ করতে হবে, ভাবপ্রকাশে সর্বপ্রকার অসঙ্গতিমুক্ত হতে হবে। সর্বোপরি লেখককে পাঠকের কল্যাণ এবং সহানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। মল্লিকার

মতো সার্থক নাট্যকার তাঁর রীধুনিকে নিজের নাটক পড়ে শোনাতেন, স্টাইলের ডাবলিনবাসী প্রকাশক স্টাইলের প্রফ পড়ে শোনাতেন উচ্চৈশ্বরে তাঁর ছজন ভৃত্যকে।

স্টাইলের উৎকর্ষ বাড়ার জন্য রচনায় সংযম এবং সংহতি নানা দিক থেকে প্রয়োজনীয়। ভালো লেখক সাধারণত তাঁকেই মনে করা হয় রচনায় কতটুকু এবং কি বাদ দিতে হবে সে সম্পর্কে যার ধারণা স্পষ্ট। যিনি লেখেন কম এবং রচনার উৎকর্ষ বাড়ার জন্য বারে বারে সে লেখাকে সংশোধন করেন তিনিই অনেকের নিকট ভালো লেখক বলে স্বীকৃত। রচনার প্রাচুর্য বিরাট প্রতিভার পরিচায়ক এবং রচনার স্বচ্ছতা প্রতিভা দৈন্তের সূচক বলে কোনো কোনো মহলের ধারণা হলেও সংযত এবং সংহত প্রকাশের মধ্যেও অসামান্য শক্তির পরিচয় থাকে—এটাও অস্বীকার করা যায় না। আসলে সংক্ষেপে লেখার অর্থ কম লেখা নয়, বরং লেখককে ভালো ক'রে লেখার জন্য তৈরি করা। রচনার ক্ষেত্রে এ মিতব্যয়িতার ভেতর শুধুমাত্র যে বাস্তবদৃষ্টি আছে তা নয়, শিল্পদৃষ্টিও আছে। সংহতি রচনায় এনে দিতে পারে সৌন্দর্য, শক্তি এবং গতি। সংক্ষিপ্ত রচনায় থাকে লেখকের দ্রুত চিন্তার পরিচয়, যেহেতু এটা সাধারণত দেখা যায়, যে সমস্ত লেখক বা বক্তার চিন্তার গতি প্রথমে তাদের রচনা বা বক্তৃতা দীর্ঘায়ত হয়। এ ছাড়া সংক্ষিপ্ত লেখায় থাকে অনেক না-বলা কথার ব্যঙ্গনা যা পাঠক নিজের কল্পনার সাহায্যে ভরাট ক'রে নিতে পারে। বঙ্কিমের 'প্রদীপ নিভিয়া গেল' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'যেন ডম্বাচ্ছাদিত বহি'—এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গনাগর্ভ বর্ণনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কথাটি স্বতোবিরোধী মনে হলেও সত্য, যেহেতু ভালো লেখক একমাত্র তাঁকেই বলা যায় যিনি শুধু কি লিখতে হবে নয়, কি না লিখতে হবে তাও জানেন। যার চিন্তার স্বচ্ছতা আছে একমাত্র তিনিই সংক্ষেপে লিখতে পারেন।

স্পষ্টতার মতো সংক্ষিপ্ততারও সীমাবদ্ধতা আছে। রচনা যদি খুব জমাট বাঁধা হয়, একটি মাত্র শব্দের মর্মগ্রহণে অসতর্কতা সমগ্র রচনাটির মর্মগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। বক্তৃতা সম্পর্কে এটা আরো বেশি সত্য। এ ছাড়া খুব ঘনীভূত রচনায় পাঠকের মনোযোগ এক যায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় বলে স্বাধীন কল্পনা পাখা মেলবার অবকাশ পায় না। এ অবস্থায় পাঠক অস্পষ্টতার মূহুর্তর পরিবেশে নিজের মানসমুক্তির জন্য হাঁপিয়ে উঠেন।

এ ছাড়া স্টাইলের উৎকর্ষ বিচারে সংক্ষিপ্ততার চাইতেও বৈচিত্র্য অনেক বেশি মূল্যবান। রচনার মজি-মেজাজে, অস্থূতিতে স্বরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি লেখক এবং পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রয়োজন। যেহেতু একই ধরনের কথা শুনতে শুনতে পাঠকের ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। বাঁচবার জন্য জীবনে যেমন তেমনি সাহিত্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টির দরকার, কারণ বহুমুখিতা জীবনের মতো সাহিত্যেরও ধর্ম।

সাহিত্যের আর দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য : নাগরিক বৈদগ্ধ্য এবং সরলতা। নাগরিক বৈদগ্ধ্য বলতে বোঝায় সে ধরনের বাচনভঙ্গি যার মধ্যে পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক ঔক্ণত্য বা অমসৃণতা নেই, বরং থাকে একটা বিনম্র মনোভাব যা লেখকের কৃত্রিমতাহীন সরলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের বৈদগ্ধ্য লেখক এবং পাঠকের মধ্যে সহানুভূতির সূত্রটিকে খুব জোরালো ক'রে তোলে—যা সাহিত্যের সার্থকতার পক্ষে খুবই মূল্যবান। রচনার এ মসৃণ লাভপোষ সঙ্গে নারীর কোমলতীর তুলনা করা ভাল। এর মধ্যে আছে লেখকের সে অহমিকার বিসর্জন—যে অহমিকা অপরের ওপর নিজের অহংভাব চাপিয়ে দেবার প্রয়াস থেকে উদ্ধৃত।

এ প্রসঙ্গে এটাও স্বরণ রাখা প্রয়োজন, লেখকের পাণ্ডিত্যভিমান এবং কল্পিততা পাঠকের প্রতি সহানুভূতি এবং সৌজস্যের অভাব সূচনা করে। স্টাইলে সরলতা সৃষ্টি এর থেকে প্রতিকারের একমাত্র উপায়। সরল স্টাইলে সেই ভাষা ব্যবহৃত হবে যা বাস্তব কথনভঙ্গি থেকে খুব দূরবর্তী নয়, আবার খুব নিকটবর্তীও নয়। সত্যিকারের ভালো স্টাইলের ভেতর লেখকের নিজস্ব একটি স্বরের বেশ ধ্বনিত হয়—যেমন বঙ্কিমের ঝড়ু স্টাইলে বৃষ্টির সঙ্গে আবেগের মিশ্রিত স্বর, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধ্বনি বা স্টাইলে সৌন্দর্য্যভূতির স্বচ্ছতা, শরৎচন্দ্রের জীবনস্পর্শী স্টাইলে আবেগপ্রধান মানবপ্রীতি।

ভালো স্টাইলের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যও স্বরণীয়। সুইকটের মতো যথাস্থানে যথায় শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে সত্যিকারের স্টাইলের পরিচয়। ভালো স্টাইলের চরিত্র-নির্গম প্রসঙ্গে এ মত খুবই বৃষ্টিগ্রাহ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ মত মেনে নিলে বর্ণৈশ্বর্যময় কাব্যধর্মী স্টাইলের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হয়। এ মতের বিচারে ইংরেজি সাহিত্যে টমাস ব্রাউন বা স্কাটল্যান্ডের স্টাইল এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বা বলেন্দ্রনাথের স্টাইল মূল্যহীন হয়ে পড়ে। প্রসাধনহীন সাদামাঠা স্টাইল আটের সৌন্দর্য্যবর্জিত—পাঠকের নিকট একঘেয়ে আবেদনহীন মনে হয়। সুতরাং স্টাইল সম্পর্কিত সুইকটের চমৎকার সংজ্ঞা সত্ত্বেও সাহিত্যের সঙ্গে অসুভূতিগ্রাহ্য সৌন্দর্য্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই—এ কথা বলা চলে না।

স্টাইলকে আলোকিত এবং পাঠকপ্রিয় ক'রে তোলে আর দু'টি গুণ : সূক্ষ্মিত হান্তরস এবং আনন্দরস। সূক্ষ্মিত হান্তরস নাগরিক বৈদগ্ধ্যেরই একটি প্রকারভেদ। এ ধরনের রসবোধ ছাড়া নাগরিক বৈদগ্ধ্যলাভ সম্ভব নয়, কিন্তু কিছুমাত্র নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অধিকারী না হয়েও মানুষ চমৎকার হান্তরসের স্রষ্টা হতে পারেন। অবশ্য এ দুইয়ের একত্র সমন্বয়ে স্টাইল উজ্জল দ্যুতি লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলে এই দুটি গুণের অপকৃপ গঙ্গা-ঘসুনা সঙ্গম পাঠক যাত্রেরই মনকে নিমেষে আকর্ষণ করে। আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিপূর্ণ নিম্ন পর্যায়ের হান্তরস অজ্ঞাতসারে পাঠকমনে তিক্ততার সৃষ্টি করে রচনার মানকে নিম্নাভিমুখী করে। সূক্ষ্মিত হান্তরস পাঠকমনের ক্লান্তি দূর করে, আর হলে-ভরা ব্যঙ্গরস হুড়হুড়ি দিয়ে পাঠকমনের সরসতা নষ্ট করে। হিংসা-ঈর্ষা-অশ্রুয়া প্রসূত ঘৃণা সৃষ্টিকারী বিদ্রূপাত্মক স্টাইলে লিখিত সাহিত্য পাঠকসমাজে কখনও শ্রদ্ধার আসন পায় নি। কোনো কোনো মহৎ প্রতিভাবান লেখক নিকৃষ্ট হান্তরসের সাহায্যে চিত্তচমৎকার স্টাইলের সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও সাধারণত দেখা যায় ভালো স্টাইল সূক্ষ্মিত হান্তরসের আশ্রয়েই সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচনা সাহিত্যে এ সত্য বিশেষভাবে লক্ষিতব্য (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা এ প্রসঙ্গে স্বরণীয়)।

সূক্ষ্মিত হান্তরসের মতো আনন্দরসের সৃষ্টিও স্টাইলকে উপভোগ্য ক'রে তোলে পাঠক সমাজে। আনন্দরস সৃষ্টির সাহায্যে স্টাইলের উজ্জলতা বৃদ্ধির প্রয়াস ইংরেজি, বাংলা বা জার্মান সাহিত্যে তেমন দেখা যায় না যেমন দেখা যায় ফরাসী সাহিত্যে। মনটেইনের মতো ফরাসী লেখক আনন্দিত স্টাইল সৃষ্টির সাহায্যে পাঠকমনকে যেভাবে অনায়াসে জয় করেছেন তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বেশি দেখা যায় না। ইদানীংকালে আনন্দরসাস্রিত রম্যরচনার আবির্ভাব ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করেছে। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিস উল্লেখ্য। আনন্দ পরিবেশনটা মুখ্য এবং যাত্রাতিবিক্ত হলে রচনা বিষয় গুরুত্ব হারিয়ে লঘুতাধর্মী হতে বাধ্য—যেমন দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালে এক শ্রেণীর রম্যতাধর্মী রচনায়।

লেখকের সত্যতা স্টাইলের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধির অগ্র্যতম কারণ বলে স্বীকৃত। রচনায় লেখকের সত্যতার প্রমাণ কি ভাবে নির্ণয় করা যাবে? লেখকের অহুভূতির তীব্রতম প্রকাশের ভেতর সে প্রমাণ লক্ষিতব্য। আনন্দময় অহুভূতির প্রকাশে লেখক যেমন উচ্ছ্বসিত হবেন, তেমন নিন্দনীয় বিষয়বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশে তিনি নির্মমভাবে কঠোরতম ভাষা ব্যবহার করবেন। এর ব্যতিক্রম হলে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। পাঠক মনের ওপর প্রভাব সৃষ্টির জন্য অতিরঞ্জিত বর্ণনার আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তির মধ্যেও সত্যতার অভাব দেখা যায়। চারু প্রকাশের জন্য বর্ণনীয় বিষয়কে বিকৃত ক'রে প্রকাশ করবার প্রয়াসও লেখকের সত্যতার অভাবজনিত। সাহিত্য যতদিন লেখকদের সাধনার বস্তু ছিল ততদিন সত্যতার অভাবটা অন্তত দেখা যায় নি। বুদ্ধিবৃত্তি এবং বাক্‌চাতুর্যের ওপর আত্যাত্তিক প্রাধান্য দেবার পরের থেকেই সাহিত্য স্বাভাবিক স্ফূর্তি হারিয়ে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। Books Cannot be moral or immoral, only well or badly written—সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষ্য নির্ণয়ে ওসকার ওয়াইল্ডের এ ঘোষণার মধ্যে বুদ্ধির চমক আছে, কিন্তু এ মতবাদ আত্মবঞ্চনামূলক। ব্যঙ্গরসিক ওয়াইল্ড হয়ত লঘুকৌতুক-প্রণোদিত হয়ে এ মত প্রকাশ করেছিলেন, অথচ আধুনিক সাহিত্যজগতে এর প্রভাব এবং পরিণতি বিবাদময়। বার্নার্ড শ'র মতো সমাজতত্ত্ববাদের একদা বলিষ্ঠ প্রবক্তাও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিবাদের নিকট আত্মবিক্রীত। লিটন স্ট্র্যাচিও লেখক-জীবনের পরিণতিতে বুদ্ধিকে সত্যের ওপর স্থান দিয়ে স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছেন। প্রথম চৌধুরী থেকে শুরু ক'রে এ যুগের অনেক লেখক বুদ্ধিচর্চার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের ধার বাড়িয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার কতটুকু বাড়িয়েছেন তা চিন্তার যোগ্য। বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য স্বীকার্য, তবে বুদ্ধির চারুত্বের খেলা লেখকের আন্তরিক সত্যতাকে অভিভূত ক'রে সাহিত্যকে প্রাণহীন ক'রে তুললে সে সাহিত্য বৃহত্তর পাঠকসমাজে আবেদন হারায়।

বলিষ্ঠ স্টাইল সৃষ্টিতে লেখকের মৌলিক প্রতিভা একান্তভাবে স্বীকৃত হলেও ঘনিষ্ঠ বাস্তব প্রীতি স্টাইলে শক্তি সঞ্চার করে—এটাও অস্বীকার করা যায় না। জীবনের জটিলতা এবং সংস্কার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবারও প্রতীক ধর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা হলেও সাহিত্যে বিমূর্ত ভাবের প্রতিফলনের চাইতে বাস্তব ধর্মিতার মূল্য বেশি। ইদানীং সাহিত্যের আকর্ষণীয়তা বাড়ার জন্য প্রতীকধর্মী শব্দ প্রয়োগের রৌক অনেক বেড়েছে। এ প্রবণতা যথাস্থানে যথাযথ শব্দপ্রয়োগে অক্ষমতা কিংবা ভাণের আশ্রয় গ্রহণ করবার প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। বিমূর্ত শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বর্ণনীয় সংক্ষিপ্ততা আনা হয়ত বা সম্ভব, তবে এটা মনে রাখা দরকার উৎকৃষ্ট স্টাইল সৃষ্টির জন্য সংক্ষিপ্ততার চাইতে স্পষ্টতার মূল্য বেশি। স্টাইলের শক্তি বৃদ্ধিতে বাস্তবতার মূল্য স্বীকৃত হলেও তার সীমাবদ্ধতাকেও অস্বীকার করা যায় না। যথার্থ্য এবং বাস্তব ঘনিষ্ঠতা অনেক সময় বৈচিত্র্য সৃষ্টি বিরোধী। আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা পূর্ব যুগ থেকে অনেক বেশি। কিন্তু সে বাস্তবতা হ'ল অতি তুচ্ছ এমন কি অপ্রয়োজনীয় বস্তু-উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যহীন চটকদার কথোপকথন—যার ভেতর প্রবেশ ক'রে পাঠক অহুভব করেন যেন একটি জটিল মাকড়সার জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। টলস্টয় তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের পরিণতিতে গোগোলের এমন কি তাঁর নিজের উপন্যাসের অনাবশ্যক ডিটেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। অনেক সময় দেখা যায় অত্যন্ত স্পর্শক্রম এবং সৃষ্টিশীল চেতনার সাহায্যে কোনো কোনো লেখক অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এমন কি অযথার্থ উপাদানের সাহায্যেও চমৎকার স্টাইল সৃষ্টি করেছেন—যেমন মেকলে তাঁর ইতিহাসে এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

ঐতিহাসিক উপায়ে। তা হলেও স্টাইলে প্রকৃত শক্তি সঞ্চারের জগৎ স্পষ্টতা এবং বাস্তবতার মূল্য অব্যাহত করা যাবে না।

স্টাইলের সৌন্দর্য এবং সৌকুমার্য বৃদ্ধিতে অলংকার প্রয়োগের মূল্য অসামান্য—এ কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অলংকৃত স্টাইল একদিকে লাভ করে সূর্যলোকের আলোকদীপ্তি আর একদিকে বনের পাখির কলঙন মৃদুতা। হারবার্ট রীডের মতো সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন—অলংকার স্টাইলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও যুক্তি নির্ভর গল্পের ক্ষেত্রে অলংকারের কোনো উপযোগিতা নেই। কিন্তু এরিস্টটল থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু লেখক গল্প স্টাইলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অলংকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। অলংকৃত স্টাইল স্পষ্টতা হারায় না, অথচ সাধারণ বর্ণনা অথবা বিবৃতির স্তর অতিক্রম করে পাঠকের কাছে পরম আনন্দ হতে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা মিশ্রিত রবীন্দ্রনাথের অপূর্ণ গল্প স্টাইলের কথা মনে পড়ে। বাংলা গল্পে এ রূপ চর্চাকে অনুসরণ করে স্বাভাবিক লাভ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। একটু কাব্যধর্মী হলেও এ ভবিষ্যৎ গল্পরীতির সরসতা উপেক্ষণীয় নয়। রসকবীর নেহাৎ গল্পধর্মী ব্যক্তিরাই স্টাইলের একান্ত গল্পধর্মিতা হ্রাস পছন্দ করবেন, কিন্তু কাব্যসৌন্দর্যহীন গল্প বর্ণহীন-নিশ্চাণ—এটা স্বীকার করা যাবে কি করে? কবিতার গল্পের রূপতা পাঠকমনকে পীড়িত করে, কিন্তু গল্পরীতিতে অলংকার প্রয়োগের সাহায্যে কাব্যসৌন্দর্যের অবতারণা পাঠকমনকে সৌন্দর্যশ্রী এবং জীবনের ক্ষণমাধুর্যের দিকে আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্কাটুত্র্যাও এবং ফ্লোরেন্স এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিমান গল্পলেখক কাব্যের সরসতার সঙ্গে ব্যঙ্গোক্তি, রোমান্সের সঙ্গে নির্মম বাস্তবতার সংমিশ্রণে যে আকর্ষণীয় স্টাইলের সৃষ্টি করেছেন আধুনিক সাহিত্যে তা তুলনা রহিত। এরিস্টটলের মতো জনসনও বলেছেন, যথার্থ ভাবে প্রযুক্ত হলে রূপকাক্রান্ত বাক্য স্টাইলের উৎকর্ষ বাড়ায়, যেহেতু এ ধরনের কথা আইভিয়ার সম্প্রসারণে, অর্থের নতুন দ্রুতি সঞ্চারে এবং আনন্দময় অনুভূতি সৃষ্টিতে অপরিহার্য।

গল্প কবিতার মতো ছন্দময় নয়, কিন্তু ধ্বনিময়। ছন্দস্পন্দ ছাড়া কোনো স্টাইলে মাধুর্য সঞ্চারিত হয় না। ছন্দ স্পন্দহীন গল্প নীরস, আবেদনহীন। (বিজ্ঞানাগরের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা গল্প স্বরগীর্ণ)। কবিতার ধ্বনিময়তা এবং গল্পের স্বচ্ছতা—এ দুয়ের সংমিশ্রণে গল্প স্টাইল আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি প্রয়াসে গল্পে কাব্যের অশ্রুত রাগিনী যাতে ধ্বনিত হয়ে না ওঠে সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। রাসকিনের শব্দময় দৃষ্ট বর্ণনার কাব্যধর্মী কল্পনা এবং কবিতাময় ছন্দস্পন্দ যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তাতে সে রচনাকে কবিতা বলেই ভুল হয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’র স্টাইল। অন্তঃপ্রকৃতিতে কুংসিং এবং সুন্দর—এ দুই ধরনের গল্পই ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। স্টাইল সম্পন্ন লেখক নিপুণ জহরীর মতো এ দুই জাত থেকে বেছে শব্দ ব্যবহার করলেন—যাতে বাক্যটি অর্থময়তা এবং ছন্দস্পন্দের দিক থেকে আকর্ষণীয় হয়, উচ্চারণের দিক থেকে অনাগ্রাস সাধ্য হয়। ইতস্তত কাব্যধর্মী রচনার আবির্ভাব গল্পরীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও উৎকৃষ্ট আবেগধর্মী গল্পে এ ধরনের অনুপ্রবেশ হরদম দেখা যায় এবং এ রচনাবৈচিত্র্য অজান্তেই পাঠকের মনে তৃপ্তি এনে দেয়।

এখন যে কয়েকটি উপায়ের সাহায্যে রচনাকে স্টাইল সম্পন্ন করে তোলা যায় তা নির্দেশ করেও আলোচনার পদ্বিমুখিতা ঘটানো যেতে পারে।

প্রথম আইডিয়াটি মাথায় আসা মাত্র খুব ক্ষুণ্ণভাবে রচনাটি সমাপ্ত না করে লিখবার আগে মনের মধ্যে বিষয়টি অল্পাধিকার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া ভালো। বিশেষ করে যে রচনার কঠিন চিন্তার প্রয়োজন তা লেখা শুরু করবার আগেই সেবে নেওয়া উচিত, যেহেতু চিন্তাধারা স্পষ্ট না হলে স্টাইলে অব্যক্ত অস্পষ্টতা এবং বিশৃঙ্খলা আসতে পারে। দ্বিতীয়ত স্টাইলকে, সর্বাক্ষরিত করতে হলে রচনার শেষে সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন। আবেগ এবং উৎসাহের প্রাবল্যে লেখা তাড়াতাড়ি শেষ হলেও রচনার শেষে সচেতন বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করে লেখক নিজেই সে রচনার অনেক দোষ-দুর্বলতা আবিষ্কার করতে পারেন। এ সম্পর্কে লেখক-সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে—'Write in haste and revise at leisure'। কি লেখা হয়েছে ভুলে যেতে যে সময়ের প্রয়োজন তার পরে নতুন দৃষ্টির সাহায্যে সংশোধন করাটাই প্রশস্ত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টাইল সম্পন্ন লেখকেরা নিজেদের রচনার পরিমার্জনা এবং সংশোধনে যে সময় ধৈর্য এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে ছোটখাট একখানি বই হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রাচুর্য বিশ্বয়কর হলেও রচনার সংশোধন এবং পরিমার্জনে তিনি যে কত সময় এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপি দেখলেই তা বোঝা যায়। স্ট্রাট্‌ব্রাও তাঁর স্মৃতি কথাকে (Me'moires) ত্রিশ বৎসরেরও বেশি পরিমার্জনা করেছিলেন। টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস'এর মতো বৃহদাকার বই কপি করা হয়েছিল সাতবার। একটি শব্দ পরিবর্তন করবার জন্য তিনি অনেক সময় টেলিগ্রাম পাঠাতেন। জার্মানিয়া উল্ফ The Waves-এর অংশ বিশেষ লিখেছিলেন অস্তুতপক্ষে কুড়িবার। অস্তুত আটটি প্রফ না পেলে আনাতল ফ্রান্স সন্তুষ্ট হতেন না। আর বালজাক তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে চাইতেন সাতাশ বার। তার জন্য বড় পরিমাণে অর্থব্যয় হচ্ছে বলে তিনি গৌরব বোধ করতেন। রচনারীতিতে সম্পূর্ণতা আনবার প্রচেষ্টা অনেক সময় লেখকের বাস্তবিক পরিণত হয়—এটাও অবশ্য দেখা গেছে। শোনা যায়, ক্রশো নাকি তাঁর ছোট চিলে ঘর থেকে ছুটে যেতেন ছেড়ে-দেওয়া একটি নোট ফিরে পাওয়ার জন্যে এবং ফিরে পেলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করতে বসে যেতেন। পল-লুই-কোরিয়ার (Paul-Louis-Courier) একখানি চিঠির মুসাবিদা করতেন অস্তুতপক্ষে সতের বার।

ভালো স্টাইল সম্পন্ন লেখা যে কত আয়াস সাধা এর থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সংশোধন রচনার পরিমার্জনাই যে শুধু সহায়ক তা নয়, রচনার সংহত রূপের জন্যও এর সহায়তা অপরিহার্য। কিপলিং ছাপবার আগে তাঁর গল্পগুলিকে তিন থেকে পাঁচ বৎসর রেখে প্রতি বৎসর সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করতেন। এ প্রক্রিয়াকে তিনি বলতেন Higher editing।

রচনাকে নিখুঁত করবার উদ্দেশ্যে সংশোধন করবার অতিরিক্ত বাস্তবিকপ্রস্তুতা অনেক সময় অর্থহীন পরিণতি লাভ করে। দ্বিতীয় বারের হোক বা তার অনেক পরেরই হোক—লেখকের চিন্তা যে প্রথম বারের চিন্তা থেকে ভালো হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এ ছাড়া বারে বারে পরিমার্জনা রচনার স্বতন্ত্রতাকে বিনষ্ট করে ক্লাস্তিকর ভ্রমসংশোধনে পরিণত করে। Isocrates তাঁর Panegyric কে দশ থেকে পনেরো বছর পরিমার্জনা করেও প্রথম সারির লেখক হিসেবে পরিগণিত হন নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের Prelude অথবা ফিটজারেল্ডের ওমর খৈয়ামের সংশোধিত সংস্করণগুলি প্রথম প্রকাশ থেকে পাঠককে কম আনন্দ দিয়েছে। সুতরাং সংশোধন করতে জানা মাত্র নয়, কোথায় সংশোধন করা থেকে খাঙ্ক হতে হবে তা জানার মূল্যও খুব বেশি।

তথ্যপ্রধান রচনার লেখক তথ্যপুঞ্জের চাপে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে স্থনির্বাচিত তথ্যের সাহায্যে বিষয়বস্তুকে রূপ দেবেন। তা না হলে এ ধরনের রচনারীতি বিশৃঙ্খল হতে বাধ্য। তথ্যপুঞ্জের নির্বাচন দক্ষতার গুণে গিবন অত্যন্ত আনন্দিত মনে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস রচনা করেছিলেন। অথচ তাঁর সমকালীন লেখক মন্টেস্কুই (Montesquie) তাঁর *L' Esprit des Lois* গ্রন্থ সমাপ্ত করবার পর এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে রূপকথা ছাড়া তিনি আর কোনো গভীর ভাববিষয়ক বই পড়তে পারতেন না। দ্বিতীয়ত তথ্যপুঞ্জ যেখানে খুব বেশি সে স্থানে তথ্যসংগ্রহ হবার পূর্বেই রচনা শুরু করা উচিত। না হলে দীর্ঘকাল তথ্যসংগ্রহের পর দেখা যাবে প্রথম দিককার তথ্যগুলি তাঁর স্মৃতিপথ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সংশোধনের সময় যে তথ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তা তিনি সংযোজন করতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় তথ্যপূর্ণ রচনাকালে লেখক নিজেকে ভারবাহী রুষ্কের মতো অনুভব করবেন না। বরং রচনার মধ্যে নিজের মৌলিক চিন্তার সমাবেশ করবার অবকাশ পাবেন। এ ভাবে অগ্রসর হলে তথ্যপূর্ণ রচনার স্টাইল নিষ্প্রাণ না হয়ে লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত বিরাট তথ্যপুঞ্জকে সংহত রূপ দিতে যেমন নির্বাচন দক্ষতা এবং পরিমিতি বোধের প্রয়োজন তেমনি স্বল্প তথ্যকে দীর্ঘায়ত রূপ দিতে লেখকের বিশেষ শক্তির দরকার। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের স্বল্পথ্যাত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বক্সিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এর মতো যুগান্তকারী উপন্যাস রচনা করেছিলেন। মাধু আরনুদ Sorhab and Rustam-এর মতো বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন একটি ফরাসী জার্নালে প্রকাশিত ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কতগুলি প্রবন্ধকে ভিত্তি করে।

সত্যি কথা বলতে কি, ক্লান্ত দেহ এবং ক্ষীণকায় মন নিয়ে আর যাই হোক ভালো স্টাইল সম্পন্ন লেখা চলে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিই হোন, সুদক্ষ অশ্বচালক বা গাড়ির চালকই হোন—সকলেই কর্মক্ষেত্রে হালকা থাকতে চেষ্টা করেন। একমাত্র পাণ্ডিত্যভিমাত্রীরা তথ্যপুঞ্জের চাপে নিজেকে মনকে ভারাক্রান্ত রাখতে ভালোবাসেন বলে তাঁদের রচনা মূল্যায়ন সন্দেহেও আবেদনহীন, প্রাণহীন হয়ে পড়ে। রচনাকে ভালো স্টাইলে প্রকাশ করে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন একমাত্র সে লেখক যিনি নিজের শক্তিমত্তা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। বলা বাহুল্য, এ শক্তিমত্তা মৌলিক প্রতিভাসম্পত্তি স্বতন্ত্র। সেক্সপীয়র বা মিল্টন, বক্সিম বা রবীন্দ্রনাথ, এমন কি দ্বিতীয় সারির লেখক যেমন ল্যাঙর বা প্রমথ চৌধুরী ইচ্ছা করলেও তাঁদের মৌলিক প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন না।

সর্বশেষ বক্তব্য, উপদেশ বা নির্দেশ দিয়ে কাউকে যেমন স্টাইল শিক্ষা দেওয়া যায় না। তেমনি স্টাইল সম্পর্কীয় বই বা আলোচনা পড়ে স্টাইলের উৎকর্ষ বাড়ানোও সম্ভব নয়। ভালো স্টাইলে লেখার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন লেখকের মৌলিক স্বতন্ত্র প্রতিভা।

এমান পল্লী :

Walter Raleigh—*Style*, London, 1904

F. L. Lucas—*Style*, Third Edition, London, 1956

D. N. Ghosh—*Essays on Literary Types & Theories*, Second Edition, Calcutta, 1965

সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গল্প, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩

গ্রন্থসমালোচনা

বাংলা সমালোচনা পরিচয় । সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত । এ. সুখার্মী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ২ বক্সিং চ্যাটার্জী
স্ট্রীট কলকাতা ১২ । মূল্য সাড়ে বারো টাকা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা গল্পভাষা মননশীল আলোচনা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই বাংলা সমালোচনার উদ্ভব হল। সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত পঠনপাঠন এবং সেই সাহিত্যের মূল্যায়নের ইচ্ছা থেকেই সমালোচনার উৎপত্তি হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্যাপক শিক্ষাদীক্ষার ফলে ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রভূত জ্ঞান লাভ করলেন এবং ওই সব সাহিত্য নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিশেষ প্রবণতা দেখালেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁদের আগ্রহ দেখা গেল। শুধু কেবল নিজে জ্ঞান ও বোঝা নয়, সকলকে জ্ঞানতে ও বোঝাতে হবে। এই ইচ্ছা থেকেই সাহিত্যসমালোচনা শুরু হল। উনিশ শতকের রসসাহিত্য যেমন পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রেরণায় উদ্ভূত হয়েছিল, সমালোচনাসাহিত্যও তেমনি প্রধানত পাশ্চাত্য সমালোচনার আদর্শেই রচিত হয়েছিল। মুষ্টিমের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত সাহিত্যসমালোচনার প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র প্রয়োগ করতে তেমন উৎসাহী কেউ ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অনীহা এবং মধুসূদনের বিরূপতা স্মরণীয়।

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত আলোচ্য গ্রন্থে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত একটি সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন। ডক্টর সেনগুপ্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি সাহিত্যিকদের উপর তাঁর বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা রসগ্রাহী পাঠকদের কাছে বহু-সমাদৃত হয়েছে। পরিণত বয়সে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র নিয়ে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা ক'রে চলেছেন। 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়'এর মধ্যে তিনি যেভাবে সমালোচনাসাহিত্যের আলোচনা করেছেন এবং যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা অস্বাভাবিক বলে বোঝা যায় যে সমালোচকরূপে তিনি বস্তুনিষ্ঠ, আবেগ-আতিশয়াবজিত এবং সাহিত্যের প্রাণময় রূপের সন্ধানী। সাহিত্য-আলোচনায় নীতিবোধের প্রাধান্য কিংবা জাতীয় ভাবাবেগের প্রেরণা তিনি সমর্থন করেন না। মূল্যবিচারে তিনি অতিমাত্রায় স্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে তাঁর স্পষ্টবাদিতা প্রায় রূঢ়ভাষিতায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত সাহিত্যখ্যাতি তাঁর স্বাধীন যত্নমত প্রকাশকে প্রতিহত করতে পারে নি। অনেক বহুপ্রতিষ্ঠিত সমালোচককেও তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমালোচনার ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওই আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু গ্রন্থের আলোচ্যবিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত নয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি বিশেষ মূল্যবান; কারণ ওই পরিচ্ছেদে তিনি সমালোচনার স্বরূপ ও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। রোমাটিক, ক্লাসিক্যাল, রিয়ালিস্ট, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সমালোচনা রীতি আলোচনা ক'রে তিনি সমালোচকের কি কি গুণ থাকা দরকার তাও উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু ক'রে প্রধান প্রধান সমালোচকদের সমালোচনার ধারা নিয়ে তিনি বিচার বিশ্লেষণ

করেছেন। প্রত্যেক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনার বিশিষ্ট রীতি উল্লেখ ক'রে তাঁর রচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনারীতি কতখানি সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে ডক্টর সেনগুপ্ত সেই আলোচনা করেছেন। সমালোচনার স্বত্ব ও প্রয়োগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে বিস্তৃত হওয়ার ফলে একই বিষয়ের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমোত্তর সমালোচনা এবং রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা বিষয়ক পরিচ্ছেদগুলির নাম করা যায়। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থেও তিনি তাঁদের সম্পর্কে অনেকখানি নতুন আলোকপাত করলেন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনাই বেশি করা হয়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্য'এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 'আধুনিক সাহিত্য'এর আলোচনা বাদ গিয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী সমালোচকদের সম্পর্কে লেখকের বিচার ও সিদ্ধান্ত হয়তো সব জায়গায় সকলে সমর্থন করবেন না। চাক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার সম্পর্কে ডক্টর সেনগুপ্ত হয়তো স্রব্ধিচার করেন নি। লেখক সঙ্গত কারণেই ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যরসাত্মক সমালোচনায় ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ডক্টর সেনগুপ্ত ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমুরাগী শিষ্য হলেও গুরুর সমালোচনায় গুরুর সঙ্গে কিছু কিছু দোষের উল্লেখও করেছেন। ডক্টর সেনগুপ্তের আলোচনায় সর্বত্র এই স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রয়েছে।

অজিতকুমার ঘোষ

নাট্যকার মধুসূদন। ক্ষেত্র ৩৩। গ্রন্থনিম্ন ১৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯। দায় আট টাকা পঞ্চাশ পরমা
মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প। ক্ষেত্র ৩৩। এ. কে. সরকার এণ্ড কোং ১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট
কলকাতা ১২। দায় পনেরো টাকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের স্থানটি বিতর্কাতীত মহিমায় সূচিহিত, কালের আঘাতে সে আসন বিচলিত হবার আশঙ্কা নেই। স্বল্পপরিমিত সাহিত্যিক জীবনে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক মহাকাব্য তাঁর রচনা। পত্রকাব্যের ক্ষেত্রে তিনি একক। নাট্যকার মধুসূদন তাঁর গোণ পরিচয় হলেও ট্রাজেডির মর্মরহস্ত উন্মোচনে, প্রহসনকে সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নয়নে তিনিই পথিকৃৎ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা সাহিত্যের আত্মিক মুক্তিলাভ তাঁর হাতেই ঘটেছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংযোগে মুক্তচিন্তের প্রেরণায় ও নূতন মূল্যবোধের স্বীকৃতিতে সেই আধুনিক দৃষ্টির দিগন্ত প্রসারিত। মধুসূদন সেই সাহিত্যযজ্ঞের প্রথম ঋত্বিক। সন্দেহ নেই, যুগপ্রয়োজনে তাঁর যুগশ্রষ্টার এই ঐতিহাসিক ভূমিকা। একটি যুগের অভীশা ও বেদনা তাঁর হৃদয়ে সমুদ্রকল্লোল জাগিয়েছিল, তারই সংগীত তিনি গুনিয়েছেন বিচিত্র রাগিনীতে। তাই ক্লাসিক কবিমানসের অধিকারীকেও লিখতে হয়েছে প্রহসন ও গীতিকবিতা। তাই 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' বা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েও বিদ্রোহী মনের স্বজন-সুখা তৃপ্ত হতে পারে নি। বন্দী বিহঙ্গের ডানায় সেদিনের চঞ্চল জীবনোন্মাস চোখে দূরাভিসারের স্বপ্ন। ক্ষমতার চেয়েও তাই হয়তো তার আকাঙ্ক্ষা বড়, স্থিতির চেয়ে চলিষ্ণুতার প্রতি আকর্ষণ।

কিন্তু মহৎ প্রতিভা যুগের মধ্যেই নিঃশেষিত নন, শুধু যুগমূল্যেই তাঁর সম্যক সীমা নির্ধারিত হতে পারে না। বিশিষ্ট সমালোচক ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত মধুসূদনের সাহিত্যবিচারে এই মূলমন্ত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রজ্ঞাভাজন হয়েছেন : 'যে শক্তিতে তিনি যুগের এবং চিরকালীন, সেই শক্তির উৎস নিশ্চয়ই কেবল যুগের সত্য নয়, ব্যক্তির সত্যও।' যে মানসিকতা থেকে ব্যক্তিবন্দনায় যুগচিন্তের অভিষেক, তাকে নিজের সঙ্গেও সংগ্রাম করতে হয়। তাই যদিও মধুসূদন মহাপাপী রাবণকে তাঁর মহাকাব্যের নায়ক রূপে গ্রহণ করেন, তবু তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ভুলতে পারেন না; ইতিহাসের প্রতিশ্রুতি সঙ্গেও কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ব্যক্তিক টাঁজেডি হয়ে ওঠে। ডক্টর গুপ্ত সঙ্গত ভাবেই যুগ ও ব্যক্তির ভূমিকা মিলিয়ে মধুসূদনের শিল্পীব্যক্তিত্বের সন্ধান করেছেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাফল্য অসামান্য।

শিল্পীর মানসলোক আবিষ্কার সমালোচকের লক্ষ্য। মধুসূদনের কাব্য ও নাট্যকৃতির ব্যাখ্যার আলোকে সে দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছেন। মধুসূদনের ঠেংরেজি কবিতার বিদ্বত আলোচনায় সমালোচকের রসদৃষ্টির স্পর্শ। গ্রন্থসমালোচনার অকিংকরতার মধ্যেও মধুসূদনের শিল্পীসত্তার যুক্তির রূপনির্দেশে তিনি অত্রান্ত। 'বীরাক্ষনা' কবি-আত্মার বেদনারক্টিম প্রকাশ নয়, যুগচেতনার উল্লাস—সমালোচকের একপ বিচারও যুক্তিসিদ্ধ। মধুসূদনের অসমাপ্ত রচনা ও জীবন-গোধূলির কবিতাগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে তিনি একদিকে যেমন তথ্যাত্মক থেকে মধুসূদনের পূর্ণ পরিচয় রেখেছেন, অন্যদিকে মধুসূদনের প্রবণতা ও ক্ষমতার সীমায়তি নির্দেশও করেছেন। এ কাজ যথার্থরূপেই সত্যসন্ধানী সাহিত্যসমালোচকের। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বরূপ আলোকিত করতে গিয়ে তিনি তাঁর পরিণত সৃষ্টির নেপথ্য ভূমিও আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

ডক্টর গুপ্তের আলোচনার দুটি দিক বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ সাহিত্য-ইতিহাসের সুবিশ্লেষিত পটভূমিটি তিনি সর্বদাই সামনে রেখে চলেন, ফলে তাঁর দৃষ্টি ইতিহাসনিষ্ঠ—স্বচ্ছ ও মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি রচনার গঠনশৈলীর নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি দেহ ও আত্মার রূপ-পরিচয়টি স্পষ্ট করে তোলেন। সমালোচনা পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যে মধু-চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থ দুটি মূল্যবান বিবেচিত হবে। বিষয়-বিশ্লেষে, বক্তব্য সমালোচা গ্রন্থ দুটি স্বাধীন, কিন্তু মধুসূদনের শিল্পীসত্তার উদ্ঘাটনে পরস্পরের পরিপূরক। পাঠক একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে লাভবান হবেন।

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

মেঘদূত। হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিন্সিপাল ১০০এ রাসবিহারী অ্যাডিনিটি কলকাতা ২১। মূল্য পাঁচ টাকা।

সঙ্ক্যারাগ। হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যভীর্ষ ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট কলকাতা ৬। দাম আড়াই টাকা।

'মেঘদূত' গ্রন্থের 'প্রাথমিক আলোচনা' লিখকে অনুবাদক প্রক্টর শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন। কালিদাসের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে অনুবাদক বিভিন্ন উপাদানের প্রামাণিকতা নিয়ে সূত্র সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করেছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ কালিদাসের কাল—Berriedale Keith-এর এই মতটিকেই তিনি সমর্থন করেছেন। মেঘদূতের বিষয়বস্তুর উপাদান কল্পনার সম্ভাবিত প্রভাব সম্বন্ধেও লেখক হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিসম্মত আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন।

হোরেস হেম্যান উইনসন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভামহের কাব্যালংকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির মতের উল্লেখ ও আলোচনা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞান শকুন্তলা সম্বন্ধে গোটের স্বপ্রসিদ্ধ উক্তিটি যে 'মেঘদূত' সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য অমুবাদক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসিকসত্তা তা স্পষ্টরূপে ক'রে প্রকাশ করেছে। মেঘদূতের বিভিন্ন সংকলনের সমবেত শ্লোকসংখ্যা ১২৭টির মধ্য থেকে বিচারপূর্বক ১১৫ + ২ মোট ১১৭টি শ্লোককে অভিযুক্ত সম্মত বলে গ্রহণ ক'রে তিনি তারই অমুবাদ করেছেন।

মেঘদূতের বিষয়বস্তু বা সাহিত্যমূল্য নিয়ে নূতন ক'রে আলোচনার কোনো অবকাশ গ্রহণ এখন নিশ্চয়োজ্ঞান। 'মেঘদূত' বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে—বাংলাভাষাতেও বহু অমুবাদ আছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দের সার্থক অমুবাদ খুব কমই হয়েছে। বাংলাছন্দের পর্ববিভাগসম্মত স্বরূপকে স্বীকার ক'রে অমুবাদক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপদীছন্দে 'মেঘদূত' অমুবাদ করেছেন। অমুবাদের ভাষা সাবঙ্গীল ও ছন্দোগত ক্রটিমুক্ত। প্রতিটি অমুবাদের সঙ্গে মূল শ্লোকটির সংযোজনা গ্রন্থটির মূল্য বিশেষ বাড়িয়ে দিয়েছে। বহুলচিহ্নশোভিত হয়ে এবং ভালো কাগজে ছাপা ও সুশোভন বীধাই থাকায় পাঠক মাত্রেই কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

মোট বত্রিশ কবিতার সংকলন এই 'সন্ধ্যারাগ' কাব্যগ্রন্থটি শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সন্ধ্যারাগের একটি বহুবর্ণ চিত্রলেখ। প্রকৃতি ও মানবকে উপলক্ষ্য ক'রে কবিস্বপ্নের স্বকুমার অমুভূতির একটি পেলব স্পর্শ পাঠকদের দান করেছেন। উগ্র আধুনিক ভাবারীতির কোনো তীব্র ঝাঁজ এতে নেই, সেই সঙ্গে নেই তাত্ত্বিকতার বুদ্ধিগ্রাহ্য গুরুত্ব কিংবা প্রচারধর্মিতার ধ্বজা। একটি অনাড়ম্বর অথচ গভীর জীবন গ্রহণের মাধুর্য প্রতিটি কবিতায় সমুচ্ছল হয়ে উঠেছে। রচনারীতিতে কোনো আড়ষ্টতা নেই, নেই ভাবাদর্শে কোনো কষ্ট কল্পনা। একটি পরিচ্ছন্ন মনের প্রতিফলনে প্রতিটি কবিতাই উজ্জল। ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষণীয়—গদ্য কবিতাও আছে। 'তুমি' কবিতাটি দাম্পত্য প্রেমের সুমধুর কবিতা। এর রসমাধুর্য বিশ শতকের প্রথম দিকেই বলতে গেলে বেশ দীপ্ত ছিল তার পর নিশ্চিত হয়ে এসেছে। এ যুগে অন্নদাশঙ্কর রায়ের কিছু কবিতায় এর স্বাদ পাওয়া যায়। নূতন ক'রে পাওয়া গেল—এই কবিতার '(২) তুমি কেমনটি' অংশ—'তোমার সবই আমার ভালো লাগে/...সেই আবছায়া আধারে তোমার আবছায়া রূপ/চোখের উজ্জল আভা/কত ভালো লাগে!/ তুমি যেন মঁার আকাশের শুকতারি/ কিংবা 'হঠাৎ আবিষ্কার করি/তুমি কখন ঘরের কাজ ফেলে/ঠাই নিয়েছ এসে/আমার ঠিক পিছনটিতে/সে কি উপদ্রব? /মোটেই নয়।/কাজের নীরসতার মাঝখানে/ তা আনে আনন্দের অপূর্ব আনন্দ,/তুমি যেন হঠাৎ আসা দক্ষিণ হাওয়া।/

সমুদ্রের উপর লেখা কয়েকটি কবিতায় কবির সমুদ্রপ্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল। 'কাশ্মীর' 'দেবতা' 'বারাণসী' 'সারনাথ' 'চুম্পুরাণী' 'অন্নদিনে' ইত্যাদি নামেই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য স্বীকার্য। মিনি কবিতা রচনাতেও কবির দক্ষতা কম নয়—'দ্বিতীয়ার চাঁদ যেন/প্রদীপের আলো।/কে গো তুমি জালো? /এতখানি আকাশেতে/এতটুকু আলো, /কত লাগে ভালো।'

উমা রায়

সূর্য্যাবর্ত । সম্পাদনা দেবভূলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এণবিশ সেন, শশধর রায় । অক্টোবর ৩৩ঃ বীহু সেন হাওড়া ১।

মূল্য এক টাকা

ভারত ভাগের ফলে বঙ্গভূমি বিখণ্ডিত । ওপারের বাণী এপারে এসে পৌছায় না আবার এপারের কথা ওপারে বলে না । অথবা দুধারেই বাংলা ভাষায় কথা বলা, গান গাওয়া, সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে ; দুধারেই পূর্বসূরী মহামনীষী পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সমানেই চলেছে । অথচ জানা বা জানানো যাচ্ছে না ওদের বা আমাদের ভাব ও ভাবনা । পূর্ববাংলার কবিরা রবীন্দ্রনাথকে কতখানি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন তারই পরিচয় পাওয়া গেল এই 'সূর্য্যাবর্ত' পুস্তিকাটিতে । রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত পূর্ববঙ্গের মোট চোদ্দজন কবির পনেরোটি কবিতার সংকলন এটি । প্রায় মিনি আকারের ৩০ পৃষ্ঠার এই সংকলনগ্রন্থটি সম্পাদকত্রয় প্রকাশ ক'রে পশ্চিম পারের বঙ্গবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন । যে রাষ্ট্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রচলনে বাধার নির্দেশ এসেছিল সেখানেই কবিকণ্ঠে রবীন্দ্র-বন্দনা কত উচ্চাঙ্গের তা এই সংকলনটি প্রকাশিত না হলে জানার উপায় ছিল না । সেই হিসাবে এই পুস্তিকাটি বিশেষ মূল্যবান । আশা করা যায় আমাদের অবক্ষয়িত ও অনাস্থায়ী যুবচৈতন্যকে নবচেতনায় উদ্বোধিত করবে এবং রবি-প্রদক্ষিণ পথে সূর্য্যপ্রণামে দীক্ষিত করবে ।

অথও বঙ্গের তথা বিশ্বমানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ ।

সংকলনের এক কবির কথাতেই তো তাই বলতে পারা যায়—

'গোত্র ধর্ম জাত রঙ—সবার উপর
জেনেছিলে সত্য এক ; মানুষ মন্দর—
মিথো স্বর্গ দেবত্ব অসার,
গৌরবের অর্ঘ-ডালা যারে ঢেলে দিলে বার বার,
সে মানুষ, জীবন-দেবতা তোমার ।'

এবং এই জন্তেই অপর আর এক কবি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য ক'রে এই সঙ্কল্পে লিখেছেন—

'আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো' ।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

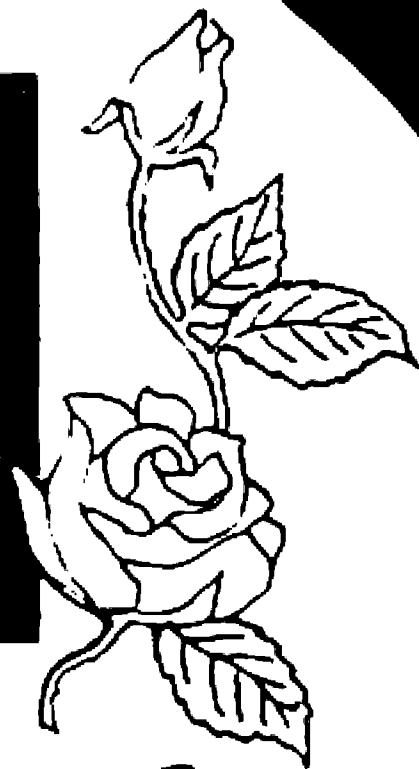
সম্পাদকীয়

দেড়শত বছর পূর্বের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১লা শ্রাবণ অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ১২ই আশ্বিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই দুই মনীষীর সাহিত্যসাধনার ফলশ্রুতিতেই বর্তমান বাংলাগণের বনিয়াদ রচিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের মানসিকতায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নবনব উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক চৈতন্যের আলোক এবং বিদ্যাসাগরের চেতনায় নবীন কর্মে রূপায়িত হ'ল শাস্ত্রীয়শিক্ষা ও আধুনিক সমাজবোধ। উভয়েই কিন্তু ছিলেন যুক্তিবাদী এবং বাকবও। যদিও অক্ষয়কুমার দত্ত মনে করেছিলেন যে বিধবা-বিবাহ প্রয়োজন সেটা সামাজিক যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করাই যথেষ্ট তার জন্যে প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলার জন্যে শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর যুক্তিবাদী এবং শাস্ত্রীয় ধারায় চিন্তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় আস্থানীল ছিলেন। রামমোহন থেকে যে নবজাগৃতির আলোকধারা বঙ্গের হৃদয়-আকাশকে উদ্ভাসিত করেছে তার একটি বিশেষ দিক যুক্তিবাদিতায়। সেই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সীলা-বক্তৃতামালার অন্ত্যতম আলোচনা 'উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ'। সেই অধ্যায়টি আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশ করা হ'ল যার মধ্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় প্রদত্ত। 'বাংলা গণের আদিকথা ও অক্ষয়-ঈশ্বর' প্রসঙ্গে প্রবীণ ভাষাসাহিত্যসাধক তাঁর প্রবন্ধে সুন্দরভাবে স্বল্পপরিসরে প্রামাণিক উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড়শত বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত প্রবন্ধটি আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশ ক'রে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেড়শত জন্মবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হ'ল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম বারো বছরে সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই সভায় ও পত্রিকায় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রটি বিশ্বভারতীর অবগতিক্রমে এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'আশ্রয়-প্রদীপ' চিত্রটি রবীন্দ্রভারতী-সমিতির সৌজন্মে প্রকাশিত হ'ল।

এত কামল স্মার্ম জৌন্দর্য বিকশিত হয়

নিশির স্নিগ্ধ সত্তা
প্রসুতিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভার উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহত্ৰী
এই মেখেই তো।



মাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরঙ্গ

মাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়



লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
মুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে



শুধু ডেকার্স নয় সুরুরি পরিচায়ক

Editor : Ramendranath Mullick

Published by Sri Bhabaranjan De from 6/4 Dwarkanath Tagore Lane Calcutta-7
and Printed by him at National Printing Works, 33D Madan Mitra Lane Cal-6

ବିଷୟ
ବିଷୟ
ବିଷୟ



ববৌজ্ঞভাবতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

TH HOUSE OF THE TAGORES

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ও পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতবাহী
গ্রন্থের পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ২'০০

STUDIES IN AESTHETICS

প্রবাসজীবন চৌধুরী

বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সৌন্দর্যবর্ণন,
শিল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পসুস্থিতি, কীটসের সৌন্দর্যচেতনা,
ভারতীয় নৌস্বভাবের আলোকে মেটো ও অ্যারিস্টটলীয়
মতবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত। মূল্য ১০'০০

TAGORE ON LITERATURE-AND
AESTHETICS

প্রবাসজীবন চৌধুরী

সৌন্দর্যবর্ণনের আলোকে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের গভীর
আলোচনা। ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত। মূল্য ৮'০০

A CRITIQUE OF THE THEORIES
OF VIPARYAYA

ননীলাল সেন

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক একটি ভুলিল গ্রন্থ বা সমস্ত
হল 'বিপর্যয়'। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের
তত্ত্বাত্মক-মাত্রেরই সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ১৫'০০

STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY

মানস রায়চৌধুরী

সঙ্গীত-শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনে স্বরসাধনার প্রভাব ও মানসিক
পরিমণ্ডল বিষয়ে তথ্যবহুল বিশ্লেষণ। মূল্য ১৫'০০

INDIAN CLASSICAL DANCES

বালকৃষ্ণ মেনন

ভারতীয় নৃত্যকলায় বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ-
কলা নির্দেশিত। বহু চিত্রসুচিত। মূল্য ২৫'০০

REFORM AND REGENERATION
IN BENGAL, 1774-1823

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১০'০০

SOCIOLOGY OF PLANNING

শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১০'০০

রবীন্দ্র-স্মৃতিস্মিত

রবীন্দ্র-রচনার উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতিসম্ভার।

মূল্য ১২'০০

স্বাক্ষরনাথ ঠাকুরের জীবনী

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ৫'০০

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ৮'০০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

রবীন্দ্র-আলোকে মৃত্যুজিজ্ঞাসার বিশদ ব্যাখ্যা।

মূল্য ৬'০০

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পদাবলী ও রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার আলোচনা।

মূল্য ৫'০০

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিজ্ঞা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মূল্য ৩'০০

গান্ধীমানস

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন

ও নির্মলকুমার বসু

গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মূল্য ৩'০০

সঙ্গীতচর্চিকা

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি-সহ মূল্যবান গ্রন্থের দুইখণ্ড একত্রে প্রকাশ। মূল্য ১৫'০০

শিল্পতত্ত্ব

বেনিডেটো ক্রোচে

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য-অনুদিত ক্রোচের 'শিল্পতত্ত্ব' ও
'শিল্পতত্ত্ব ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়ের একত্রে প্রকাশ। মূল্য ১৫'০০

চৈতন্যোদয়

হরিশ্চন্দ্র সান্যাল

মানবজীবনের চেতনা-উদ্বোধনের শাস্ত্রীয় পথালোচনা। মূল্য ১'০০

জ্ঞানদর্পণ

হরিশ্চন্দ্র সান্যাল

নীতিশাস্ত্র ও ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে তথ্যবহুল আলোচনা। মূল্য ৩'০০

। বঙ্গবন্ধু ।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

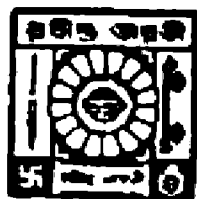
সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো কলিকাতা-২ ও ১০০এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২২

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭ • অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭০

সম্পাদক
সম্মেলনাথ মল্লিক



রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে স্বদেশ সত্য
তাহার উপরে নাই



শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা-৯

রচনাবলী সিরিজ

গিরিশ রচনাবলী

গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী চারখণ্ডে সংকলিত হচ্ছে।
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, এতে আছে ২১টি নাটক ও ৭টি
গল্পরচনা [২০'০০] ডঃ স্বদেশীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
সম্পাদিত। ডঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক গিরিশ জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি
আলোচিত।

মধুসূদন রচনাবলী

মধুসূদনের সমগ্র রচনা (ইংরেজী সহ) এক খণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র
ভণ্ড সম্পাদিত। [১৫'০০]

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা। ডঃ স্বদেশীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ও
দ্বিজেন্দ্র-জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।

[১ম—১২'৫০; ২য়—১৫'০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

সমগ্র রচনা একখণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র ভণ্ড সম্পাদিত; দীনবন্ধু-
জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [১০'০০]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্রের সমগ্র উপস্থাপন একখণ্ডে। শ্রীঃযোগেশচন্দ্র বাগল
সম্পাদিত। রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।

[১০'০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

বঙ্কিমের সমগ্র উপস্থাপন প্রথম খণ্ডে। [দ্বিতীয় প্রকাশিতব্য—
১৫'০০]। দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ [১৭'৫০]।
তৃতীয় খণ্ডে বঙ্কিমের সমগ্র ইংরেজি রচনা একখণ্ডে। [১৫'০০]
শ্রীঃযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্কিম জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি
আলোচিত।

সম্পূর্ণ তালিকার অস্ত্র লিখুন—

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

Stephen N. Hay

ASIAN IDEAS OF EAST AND WEST

*Tagore and his Critics in
Japan, China and India*

This work examines the lives and
writings of eighty-four Chinese,
Japanese and Indian intellectuals as
they responded to Tagore's message
and thereby revealed their own extra-
ordinarily diverse attitudes in indige-
nous cultural traditions, Asian unity
and Western civilization and im-
perialism.

Rs. 90

Sudhindranath Datta

THE WORLD OF TWILIGHT

Essays and Poems

The essays combine a highly developed
critical sense based on a wide know-
ledge of European literature with a
deep involvement in the renaissance
of Bengali culture which is associated
with the name of Tagore. 'Sudhin
exemplified to a high degree the possi-
bility of marrying Indian and Western
values and ways of thought...who did
not know him in the flesh will meet
him in these pages.'—*from the Foreword*
by Malcolm Muggeridge

Rs 30

OXFORD

University Press

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীশ্রী মজুমদার

অবনীন্দ্রনাথ সাংগীতিকরূপে কতটা সাক্ষাৎ করেছেন
এই গ্রন্থে তা আলাচলি। ২'০০

অনভাষ ও ভাবসম্প্রতিষ্ঠা ॥ ফ্রেডরিস হার্বার্ট ব্রেডলি

Appearance and Reality গ্রন্থের প্রাথমিক অনুবাদ।
অনুবাদক : শ্রী জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। ৮'০০

আত্মজীবনী ॥ মহাবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহাবি-রচিত এই মহামূল্য গ্রন্থানিতে
অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ১২'০০

নাট্যসংগ্রহ ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত বাঙালী নাটক সংকলিত হয়েছে এই
গ্রন্থে। ১৪'০০ ; পোস্তন ১০'০০

নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বর্তমান শ্রীশিক্ষা-বিচার, সমাজ, আদর্শ, ভ্রাতৃত্ব, প্যাটেল-
বিল, বঙ্গনারী—কঃ পদ্মা ইত্যাদি নিবন্ধ। লেখিকার স্বকীয়
জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। ২'০০

পূর্ণকুন্ত ॥ শ্রীমানী চন্দ

দীর্ঘকালের কাহিনী। অনেকটা ডায়ারির ভঙ্গিতে লেখা।
১৯১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ববীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত। ৫'০০

বাংলার স্ত্রী-আচার ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব, বিবাহ-কালীন ও
বিবাহ উত্তর স্ত্রী-আচার সমূহের মনোহারী বিবরণ। ১'০০

বৌদ্ধদেব দেবদেবী ॥ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

বৌদ্ধ মূর্তিমাণ্ড এবং বৌদ্ধতাত্ত্বিক দেবদেবী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ
আলোচনা। ৩'০০

কিম্বাদি ॥ শ্রীমানী চন্দ

কম্বোজ-বঙ্গী ভ্রমণের কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুন্ত' গ্রন্থের
স্তায় সুখপাঠ। ৩'০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেন, কলিকাতা ৭

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

: প্রাপ্তিস্থান :

পাতিরাই, কলেজ স্ট্রীট

৬

অগাধ পত্রিকা স্টলে

: কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ :

ববীন্দ্র-নাট্যধারা

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

১০'০০

সাধনা ও সংস্কৃতি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৪'৫০

ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য

সঞ্জীবকুমার বসু

৮'০০

স্মৃতিস্মরণ অতীত

সঞ্জীবকুমার বসু

৪'০০

বাংলা কাব্য পাশ্চাত্য প্রভাব

ডক্টর উজ্জয়কুমার মজুমদার

১২'০০

আধুনিক বিশ্ব-নাট্যপ্রতিভা

অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

১০'০০

: প্রাপ্তিস্থান :

বইপাড়ার সমস্ত দোকান

সংস্কৃতি প্রকাশন

১০ হেষ্টিংস স্ট্রীট কলিকাতা ১

ফোন : ২১-৩১০০

SOOR, NEOGI, COOMAR & COMPANY Private Limited

Whole salers of Sanitary-wares & Tube-well requisites

Deaiers in : GAS, STEAM & BOILER PIPES, P.V.C. PIPES AND FITTINGS

Head Office : 39, College Street, Calcutta-12

PHONE : 34-0152/53

Brancheś :

4, Raja Woodmunt Street, Calcutta-1

Phone Nos. 22-5292/22-0302

Fraser Road,
Patna-1

Pan Bazar,
Gauhati

Manglabag
Cuttack-1

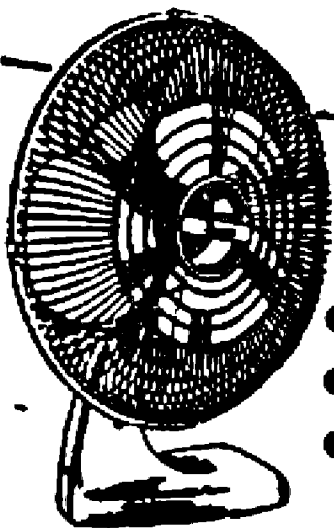
Estd. 1908

LAST FOR A LIFE TIME

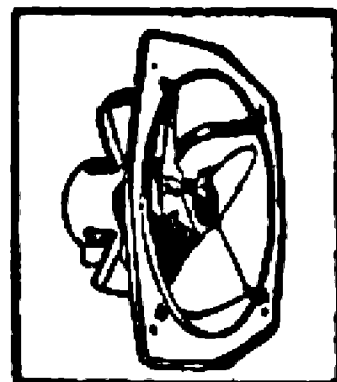
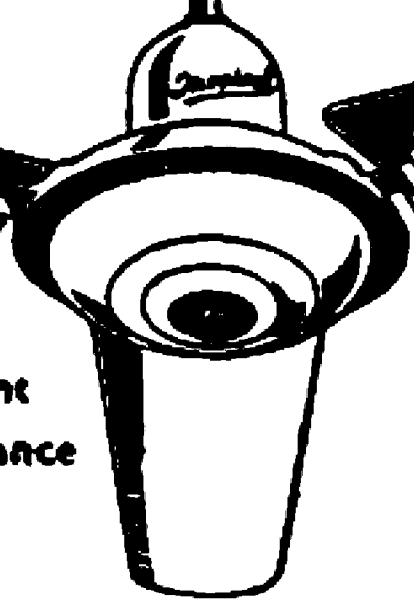
Tropical

DE LUXE CEILING AND
TABLE FANS

PEDESTAL AND
EXHAUST FANS



- Sturdy and elegant
- Smooth performance
- Low current consumption.



OMF-9-67

MANUFACTURED BY BHARAT ELECTRICAL INDUSTRIES LTD. Calcutta-1.

AGENT THE ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD., Calcutta ● Bombay ● Madras ● Delhi ● Kanpur

সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমগ্র রচনার একত্রিত সংকলন সুকান্ত সমগ্র ॥ ১৫'০০ নতুন কবিতাগ্রন্থ বিষ্ণু দে ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে ॥ ৫'০০ অরুণ মিত্র মঞ্চের বাইরে মাটিতে ॥ ৪'৫০ মণীন্দ্র রায় জামায় রক্তের দাগ ॥ ৪'০০ আধুনিকতা ও একালের বাংলা কবিতা ৪'০০ মৃগাক্ষ রায় কবিতার কথা ॥ ৩'০০ কৃষ্ণ ধর আধুনিক কবিতার উৎস ॥ ৩'০০	মুজাফ্ফর আহমদ প্রবন্ধ সংকলন ॥ ৮'০০ নেপাল মজুমদার সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ॥ ১০'০০ অবন্তীকুমার সান্যাল রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতি ॥ ৫'০০ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ॥ ৮'০০ ডঃ মতী ঘোষ বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ ॥ ৫'০০ প্রভাতকুমার গোস্বামী হাজার বছরের বাংলা গান ॥ ১৫'০০ ডঃ শিশিরকুমার মিত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্র ॥ ৩'০০ ডঃ সুনীল সেন রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ ৩'০০ দেবপ্রভ মৃধোপাধ্যায় বাঘ ও অজম্বা ॥ ৬'৫০
সান্ন্যস্ত লাইব্রেরী ২০৬ বিধান সরণী । কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৪-৫৪২২	

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা নিরঙ্গবলী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র । রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা প্রতি জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয় । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা । বার্ষিক গ্রাহক ঠান্ডা চার টাকা । পত্রিকা 'সার্টিফিকেট অব পোস্টিং' রেখে গ্রাহকদের দায়িত্বে পাঠানো হয় । রেজিষ্ট্রি ভাণ্ডার সাত টাকা । সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যার প্রকাশিত হয় । গ্রন্থসমালোচনার অন্তে দু'কপি পুস্তক পাঠাতে হয় । বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বিক্রয়কেন্দ্রে, বিভিন্ন পত্রিকাস্টলে এবং পত্রিকা সিন্ডিকেট অফিসে (১২/১ লিওনে স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬) খুচরা সংখ্যা পাওয়া যায় । রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা কার্যালয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৪ হারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-৫২৪১	রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা পুরাতন সংখ্যা প্রথম বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায় । দ্বিতীয় বর্ষ । ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পাওয়া যায় । তৃতীয় বর্ষ । ১ম, ৩য় ও ৪র্থ তিনটি সংখ্যা পাওয়া যায় । চতুর্থ বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায় । পঞ্চম বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায় । ষষ্ঠ বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায় । সপ্তম বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায় । অষ্টম বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া যায় । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা । রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
--	--

ববীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা • কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭

সূচীপত্র

চিঠিপত্র	ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২১
শিল্পপ্রসঙ্গে	তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২২২
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র	শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়	২২৫
দেশবন্ধু চিত্তবজ্র	স্বধাংস্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৩
ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্টাঙ্গত্ববাদ	রমা চৌধুরী	৩১৭
ববীন্দ্রনাথের মানবিকতা	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৩
গান্ধী-চেতনার বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি	দীপককুমার বড়ুয়া	৩৩১
সাহিত্যশিল্পী বালেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৫৫
ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিভাসাগরের 'সীতার বনবাস'	নবীনচন্দ্র জ্ঞান	৩৬১
সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্বরূপে	অজিতকুমার ঘোষ	৩৭৮
গ্রন্থসমালোচনা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৮৫
	সুধীরকুমার নন্দী	৩৮৬
	ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৩৮৭
	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৩৮৮
		৩৯২

সম্পাদকীয়

চি অ নু চী

শ্রদ্ধাঙ্গিনীর সাদী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতুলনীয় ইতিহাসপূর্ণ

বাংলা র তাঁত বস্ত্র

উৎসবে এবং নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করুন

॥ সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান ॥

- দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভাস' কো-অপারেটিভ সোসাইটি
লিমিটেড :

৬৭, বজ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ও শাখাকেন্দ্র সমূহ।

- গভর্ণমেন্ট সেলস এম্পারিয়াম :

৭/১, লিগুসে স্ট্রীট, কলিকাতা ; ১২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা ;

১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা ; ১৮/এ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (সাউথ) হাওড়া



ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଙ୍କ ସାଥୀ

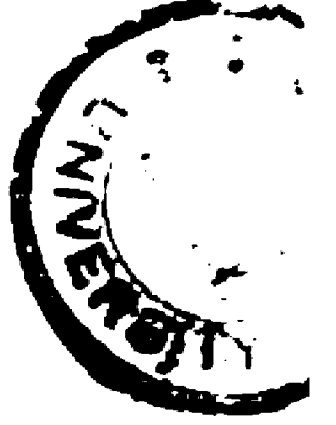
ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা • কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭

চিঠিপত্র রায়মানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ও

প্রকাশ্যে



আপনার ও আমার অনুরোধ জানিয়ে স্বরেনকে^১ পত্র লিখেছি—তার জবাব পাই নি। সম্প্রতি স্বরেনের বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্তই কঠিন হয়ে উঠেছে, খুব সম্ভব সেই জন্যে অন্য কিছুতে সে মন দিতে পারবে না।

কৃপালিনি^২ “শেষের কবিতা” তর্জমায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। প্রথম অংশ কতকটা করেছে, মনে হয় তো ভালোই হয়েছে। তার কবিতা তর্জমার ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল। গোটা দুয়েক করেও দিয়েছি। এ কাজ তাকে খুব ধীরে ধীরে করতে হয়, প্রথম কারণ তর্জমা করা সহজ নয়, দ্বিতীয় কারণ বাংলা ভাষায় তার দখল কাঁচা। এক সুবিধে ইংরেজি ভাষায় তার কলম চলে সহজে—অমিত রায়ের মতোই সে অক্লোনিয়ন। আপনি তাকে অনুরোধ করলে হয় ত সে কাজটা সম্পন্ন করতেও পারে—বলতে পারি নে। এখন সে ছুটিতে আছে।

আজকাল আমার মন সকল প্রকার কর্তব্যের থেকে সরে এসেছে—ভাঙার তোলা জীর্ণ নৌকোর মতো, অতি লঘু দায়িত্বও স্বীকার করতে সে নারাজ—দিনাবসানের রায়মান আলোটুকুকে রেখেছি নিষ্কৃতির সন্ধানে। ইতি ১৪ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ স্বরেন। স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ কৃপালিনি। শ্রীকৃষ্ণ কৃপালিনি

শিরপ্রসঙ্গে

তারাকশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বাগ্রে এই তীর্থভূমি ও তীর্থমন্দিরকে প্রণাম ও আপনাদের সকলকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও নমস্কার নিবেদন করি।

প্রত্যেক অমুষ্ঠানেই সেই অমুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথির কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশের একটি চাক নীতি আছে। এই অমুষ্ঠানে আজ আমার কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশ যাত্র সেই নীতি-অনুসারীই নয় ; সে প্রকাশের আরও কারণ আছে। সেটি হল এই—চিত্রশিল্পে আমি অনধিকারী, এবং আজ একজন অনধিকারীকে আপনারা এই উদ্বোধন কর্ম করবার জন্ত আহ্বান করে এনেছেন আপনাদের আমার প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও ঔদার্য্যবশতই, সেই কারণেই আমার কৃতজ্ঞতা গভীরতর। আপনাদের এই প্রীতি ও উদারতাকে ধন্যবাদ জানাই।

জননী সরস্বতীর জ্ঞান ও আনন্দলোকে বহু মহল ; সেই মহলগুলিতে দেবতার চরণ পূজা-কর্মেরও রীতি-পদ্ধতি ভিন্নতর ; একের সঙ্গে অপরের পদ্ধতিতে কোনই মিল নেই। তা সত্ত্বেও সব জায়গার কর্মের মূল উদ্দেশ্য এককে আবিষ্কার ও এককে প্রকাশ। ভিন্ন ভিন্ন মহলে সেই একই দিনে দিনে বার বার আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়ে চলেছেন। সৃষ্টিকর্তার এই বৃহৎ সৃষ্টিরও হয়তো যা উদ্দেশ্য এই আবিষ্কার ও প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয়তো তাই। অসীম ও অনন্ত, রূপের বেষ্টনীতে নিজেকে আবদ্ধ করে প্রকাশিত করতে চাচ্ছেন ; আর তাঁর যারা সেবক, যারা রসিক, যারা জিজ্ঞাসু তাঁরা সেই রূপের অন্তরবাসীকে তার অর্থ-সমেত আবিষ্কার ও প্রকাশের চেষ্টা করছেন।

প্রাণহীন ও প্রাণময় সমস্ত অস্তিত্বের বিশেষ মূর্তির মধ্যে যিনি বা যা অবশ্যই অবস্থিত, তিনি বা যা সেই 'বস্তু' সেই বিশেষ অস্তিত্বের আধারে তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ; তাকে পৃথক করা যায় না ; তিনি বা সে আবার প্রাণময় যাত্নুষের 'অহং'য়ের মধ্যেও আসন করে রয়েছেন। নিজের ভিতরে এবং নিজের বাইরে বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রসারে প্রসারিত কোটি কোটি বিশেষের মধ্যে সেই অবিশেষকে নিঃসংশয়ে জানবার, আবিষ্কার করবার ও বুঝবার উদ্দেশ্য কালে কালে যাত্নুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবলভাবে ও অতি তীব্রভাবে ক্রিয়া করেছে। কিন্তু তাকে 'এই পেয়েছি' বলে হাতের মুঠোয় ধরে কেউ কিছু কোনদিন দেখাতে পারেন নি অথবা তাকে পাওয়ার কোন প্রমাণ কেউ দাখিল করতে পারেন নি। এর কারণ হল তাকে পাওয়ার কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না।

অথচ প্রমাণ দেওয়া যায় না বলে পাওয়াটা তো মিথ্যে নয় ! পাওয়াটা যে মিথ্যে নয় এরই বা প্রমাণ কোথায় ? বলাই বাহুল্য এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের একাধিক অলৌকিক কাহিনী শুনেও তা বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণ আছে ; এক আধটি নয়, দীর্ঘকালব্যাপী এই স্রবৃহৎ মানব-সভ্যতার মধ্যে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে লক্ষ যাত্নুষ সমগ্র জীবন দিয়ে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

সমগ্র জীবনের অজস্র ও পরিমাণহীন দুঃখ ও কষ্টভোগের মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের অস্বিষ্ট তাঁদের হেলায় পরিত্যক্ত সমস্ত স্রুতের চেয়ে বড়।

এ সাধনা করেছেন জ্ঞানী, যোগী, সন্ন্যাসী, এ সাধনা করেছেন গৃহী, সাধক ও ভক্ত, আবার এ সাধনা করেছেন কবি ও শিল্পী। যোগী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, সাধক, ভক্তরা সকল বিশেষ অস্তিত্বের অন্তরালে আমাদের সকল জ্ঞানের পারে, আমাদের অগোচরীভূত হয়ে অবস্থিত সেই অবিশেষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন আপন আপন অস্তরের মধ্যে; কেউ কেউ সেই অবিশেষের সামান্য মাত্র স্পর্শ লাভে কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন। আবার কোথাও ভক্তরা সেই অবিশেষকে বিশেষ মূর্তির আধারে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু শিল্পীদের পথ ভিন্ন যদিও উদ্দেশ্য এক। সেই পরমার্থকে আন্বাদ করবার তপস্যা তাঁদেরও। কিন্তু সে বিপরীত পথে। তাঁরা বিশেষ রূপের মধ্যেই সেই সনাতন অবিশেষকে প্রত্যক্ষ করবার তপস্যা করেন। যারা অবিশেষকে অবিশেষরূপেই আন্বাদ করেছেন তাঁরা, লোক পরম্পরা আমরা শুনে আসছি, কখনও কখনও কাউকে কাউকে সেই অবিশেষ উপলব্ধির আন্বাদ প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। তবে তাঁরা সব ক্ষেত্রেই পথের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, এই পথে যাও অনশ্রমনা হয়ে, তার আন্বাদ মিলবে। শিল্পীরা এ কথা বলেন না। তাঁরা শুধু সেই অবিশেষকে বিশেষের মধ্যে আন্বাদ করবার ও প্রায় প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবার ও সেই সঙ্গে দেখাবার তপস্যা করেন। সে কাজ তাঁরা করেন কখনও কথার পর কথা গোঁথে, কখনও রঙ ও রেখার সমন্বিত আধারে, কখনও বা স্রুতের ইন্দ্রজালের পথে। তাঁরা সেই অবিশেষকে বিশেষ মূর্তির আধারে বন্দী করে অপরকে দেখাতে চান। কখনও কখনও তা আন্বাদ করে মনে হয় সেই অবিশেষ, যিনি বাক্য ও মনের অতীত, তিনি সেই বিশেষ মূর্তির মধ্যে চিরকালের জন্য বন্দীও বরণ করে পরম তৃপ্তিলাভ করেছেন।

আমি শিল্পের যে মহলে দীর্ঘকাল কাজ করেছি তা ভাষার জগৎ। রঙ ও রেখার জগৎ সম্পর্কে আমার ষাট-একষাট বছর বয়স পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তার পূর্বে মহৎ শ্রষ্টাদের ছবি দেখেছি, তাদের অসামান্যতায় বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি, এই পর্যন্ত। ১৯৬১।৬২ সালে অকস্মাৎ রক্তচাপের অস্থিরতা-জনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে বেশ কিছুকাল শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। এই অসুস্থতার পটভূমিতে একদিকে ছিল শারীরিক ক্লৈবা এবং অন্যদিকে ছিল এক একান্ত পরমাত্মীয় প্রিয়তমজনের অবশ্যস্তাবী আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল ভবিতবাতা। এই দুইয়ে মিলে দেহ-মন-সমন্বিত অস্তিত্ব তখন বিপর্যাস্ত, রক্তচাপের অস্থিরতায় কাতর ও জর্জর। সেই অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে থাকতে শূন্যদৃষ্টি দেওয়ালের গায়ে আটকে যেত। মন দেওয়ালের গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানান অস্পষ্ট আভাস অবলম্বন করে নানান মূর্তি কল্পনায় রচনা করত। সেই কল্পনাকে একদিন রঙ ও তুলি দিয়ে স্পষ্ট অবয়ব দিতে গিয়ে দেওয়ালের গায়েই ছবি আঁকতে আরম্ভ করে ছবি আঁকার খেলা শুরু করলাম। সেই ছবি আঁকা খেলার মধ্য দিয়ে ছবি আঁকা কতখানি হল জানি না, কিন্তু আমার নিজের কাছেই একান্ত বিশ্বাসের কথা, এই ছবি আঁকার খেলা খেলতে খেলতেই, আমার যে রক্তচাপের আকস্মিক অস্থিরতা বিভিন্ন চিকিৎসাতে উপশম হচ্ছিল না, তা সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গেল। তুলি-রঙের খেলা খেলতে খেলতে আমি রোগমুক্ত হলাম। সেই রোগমুক্তির পথে আমি পরমাত্মীয়ের আসন্ন মৃত্যুভয়কে ও নিজের রোগজর্জরতাকে সহ্য করবার শক্তি অর্জন করলাম।

আজ এই মুহূর্তে এক নবীন রূপলোকের বহু দ্বারের সম্মুখে পরম প্রকার ও নম্রতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেন হচ্ছে—রঙ তুলি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে আমি একদিন অসুস্থতার মধ্যে আরোগ্যকে লাভ করেছিলাম ; আর যেখানে রঙ ও বেথার পথে রূপ ও রূপের অন্তরবাসী অর্থকে আবিষ্কার ও প্রকাশের সাধনা একান্ত ও একাগ্র সেখানে এই লাভ কতদূর যেতে পারে !

মহাকবির নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও তাঁদের সমসাময়িক বহু বিশিষ্ট ও গুণী শিল্পশ্রষ্টার শিল্পকর্ম পরম প্রকা ও সজাগ প্রেমের সঙ্গে সঞ্চিত হয়ে আছে। সেই ধারাতেই ইতিহাসের অনিবার্যতার এসেছেন আধুনিক ও সমকালীন শিল্পশ্রষ্টার দল। প্রত্যাশা করব আমাদের পূর্বসূরীরা, ধারা আমাদের পিতাদের সমসাময়িক, তাঁরা যেমন একদা এই সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকে ও মহিমাকে নিজের ধ্যান ও আনন্দের দ্বারা মৃতিমস্ত করেছিলেন, আজ এই কালে যে শ্রষ্টারা আমাদের সমকালীন, আমাদের বহু, সতীর্থ অথবা অমুজ্জতুল্য তাঁরাও তাঁদের ধ্যান ও আনন্দের পথে সেই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও মহিমাকে আবিষ্কার ও প্রকাশের তপস্তা করেছেন। যে হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ চিরকাল আবৃত থাকে শতবর্ষ পূর্বেও যেমন আমাদের শ্রষ্টারা মর্শন করেছেন ও দেখিয়েছেন আজও আমাদের এই জটিল ও সংকটময় কালে তাকেই আমাদের শ্রষ্টারা অবশ্যই দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন।

সেই সনাতন, সেই প্রাচীন অথচ অতি নবীনকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করবার আনন্দময় কর্মে আপনাদের সকলকে আমার সহযাত্রী হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আমার সম্মুখের সমসাময়িক কালের শিল্পশ্রষ্টাদের রচনা করা রূপলোকের বহু দ্বার উন্মোচন করছি। এ আনন্দ যজ্ঞে আপনারা আমার সঙ্গী হোন। কামনা করি আজ যে নবীন সমকালীন রূপলোককে আনন্দ করব সেই নবীন যেন সনাতন আনন্দলোকের অংশ হয়ে স্থির স্থিতি লাভ করে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়াই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমরা যদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি—প্রকাশবৈচিত্র্যে প্রকৃতি যেন বলমল করছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র থেকে আরম্ভ ক'রে, তৃণ গুল্ম উদ্ভিদ, সমগ্র প্রাণীজগৎ এবং সবার উপরে মানুষ—সকলেই নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল।

যা ছিল অস্তুর্নিহিত, বাইরে তাকে প্রকাশ ক'রে দেওয়াই প্রকৃতির কাজ।

ছোট একটি ফলের বীজ—মাটিতে পড়লেই তার অঙ্কুরোদগম হবে, ছোট ছোট কচি কচি পাতা গজাবে, তার পর সে গাছ হয়ে ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে। এমনি ক'রে আবার তার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকবে।

মানবপ্রকৃতিও একদিক দিয়ে মনে হয় যেন তারই প্রতিধ্বনি।

মানুষও ধীরে ধীরে বড় হয়ে নিজেকে প্রকাশিত করবে। সে তার শৈশব অতিক্রম ক'রে কিশোর হবে, তার পর হবে যুবক, তার পর একটি পরিপূর্ণ মানুষ।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবিত প্রাণীর কোথায় যেন একটু পার্থক্য আছে।

সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করছে সেই প্রকাশের ধারা কিন্তু দুটি। একটি ধারা তার কর্ম, আর একটি ধারা তার সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলে।

দ্বিতীয় ধারাটি তার ভাবের প্রকাশ।

কোনও ভাব বা ভাবনাই মানুষের মনে কোনোদিন চাপা থাকে না। সে ভাব তার প্রকাশিত হবেই।

আপনার দুঃখ বা সুখ—মনে আপনার যে ভাবের উদয় হোক দুঃখ প্রকাশিত হবে চোখের জলে, কিংবা মুখের ভাষায়। সুখ বা আনন্দ প্রকাশিত হবে মুখের হাসিতে।

মনের ভাব তাকে প্রকাশ করতে হবেই।

এই প্রকাশের ব্যাকুলতায় মানুষ আর একটি মানুষকে খুঁজে বেড়ায়।

মানুষ খোঁজে তার মনের মানুষকে।

বন্ধু খোঁজে বন্ধুকে। স্বামী খোঁজে স্ত্রীকে। স্ত্রী খোঁজে স্বামীকে।

এ হ'ল ব্যক্তিগত প্রকাশ।

আবার আর এক ধরনের প্রকাশ আছে—যে প্রকাশ মানুষের কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, শিল্পকলায়, মানুষের সংস্কৃতিতে।

এই প্রকাশ হ'ল বৃহৎ ভাবের প্রকাশ।

এই প্রকাশ দেশ ভেদে মানুষ ভেদে বিভিন্ন।

যে-দেশের মানুষের ঠিক যেমনটি প্রয়োজন, সে দেশের সকলের অলঙ্কা সেই ভাব সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

সে ভাব যেন আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়।

তার পর সৃজনীপ্রতিভাসম্পন্ন হৃদয়ের কাছে সেই ভাব তার প্রকাশ প্রার্থনা করে। বলে, আমাকে তুমি প্রকাশ কর।

এ-ভাব সকলে প্রকাশ করতে পারে না। সৃজনীপ্রতিভা নিয়ে তাঁরা জয়গ্রহণ করেন—সে কাজ শুধু তাঁদেরই। তাঁরাই শুধু পারেন সেই ভাবকে প্রকাশ করতে। এবং সে প্রকাশের তখন অবলম্বন হয় কাব্য, সাহিত্য, নাটক, শিল্পকলা প্রভৃতি এমন কতকগুলি বস্তু যা সর্বসাধারণের আয়ত্বাধীন নয়। সেগুলি প্রকাশ করেন বিশিষ্ট গুণীজন এবং তাই থেকে আনন্দ লাভ করেন সর্বজনসাধারণ।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই যে মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে এখানে প্রকাশ করাটাই আসল লক্ষ্য নয়।

বাড়ীর যিনি কর্তা, গৃহের যিনি গৃহিনী—কাজের মধ্যে নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করাটাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ঘরের কাজের মধ্য দিয়ে তিনি নানা অভিপ্রায় সাধন করেন আর সেই সব অভিপ্রায় তাঁর কাজের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে তাঁর আসল চরিত্রটিকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়।

ধরুন, বাড়ীতে যেদিন একটা উৎসবের আয়োজন—অর্থাৎ বিবাহের মতো একটা মঙ্গল অকুষ্ঠান চলেছে, সেদিন একদিকে বিবাহের মাসুলিক আচার-আচরণ চলেছে, আবার অন্য দিকে চলেছে আর একটা সমারোহ। সে সমারোহ তার হৃদয়কে জানিয়ে দেবার জন্ত। তার হৃদয় যে আনন্দিত, সেই কথাটা সকলকে না জানিয়ে সে থাকতে পারে না। তাই চারিদিকে আলো জ্বলে, বাঁশী বাজে, বাজনা বাজে, ঘর-দোর সাজানো হয় ফুলে পাতায়। এবং এমনি করে সে তার হৃদয়ের আনন্দকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়, নিজের আনন্দকে সকলের মধ্যে সত্তা করে তুলতে চায়।

সন্তানকে মা চিরকাল ভালোবাসে—সে কথা সবাই জানে। সে জন্মে মা সেবা করে সন্তানের। সেবা শুধু কাজ করে ক্ষান্ত হয় না। সন্তানকে সে নানা রঙের সাজে পোষাকে সাজায়, কত রকমের আদরে যত্নে খেলায়, হাসিতে, অনাবশ্যক কথায় নিজের মনের আনন্দকে মাধুর্য্যকে প্রকাশ করতে থাকে।

এই থেকে বুঝতে পারা যায়—এই আমাদের হৃদয়ের ধর্ম।

সে আপনার আবেগকে বাইরের জগতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়।

যে-বাড়ীতে আমরা বাস করি সে-বাড়ীতে মাত্র চারটা দেয়াল আর একটা ছাত থাকলেই চলে না, সে বাড়ীটাকে আমরা নানা রকম ভাবে সাজাই। ছবি দিয়ে কালেক্টার দিয়ে যার যেমন সাধা—বাড়ীটির চারিদিকে আমরা আমাদের মনের রং লাগাই।

যে দেশে বাস করি সে দেশটাকে শুধু মাটি, গাছপালা, নদী, পাহাড় ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। সে দেশকে আমরা ‘মা’ বলে সম্বোধন করি। ‘মা’ অর্থাৎ দেশ-জননী না বললে আমরা আমাদের হৃদয়কে বাইরে দেখতে পাই না। হৃদয় হয় উদাসীন। এবং হৃদয়ের উদাসীনতাই মৃত্যু।

সত্যের সঙ্গে এমনি করেই আমরা রসের সম্পর্ক পাতাই।

এমনি করেই হৃদয়ের আনন্দকে আমরা নানান উপাদানে প্রকাশ করে থাকি।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কথা বলবো বলেই এত কথা আমাকে বলতে হ'ল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন প্রতিভাবান নট এবং নাট্যকার।

কেমন ক'রে তিনি নট এবং নাট্যকার হলেন সেই কথা বলতে হলে আমাদের অনেকখানি পিছু হেটে যেতে হবে।

গিরিশচন্দ্রের জন্মস্থান কলকাতা শহরের উত্তর প্রান্ত বাগবাজারে।

গঙ্গার ওপরেই বাগবাজার।

গিরিশচন্দ্র দেখেছেন—প্রতিদিন প্রভাতে তখনকার দিনের পুণ্যার্থী নরনারী ভক্তি বসাপ্রস্তু কণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে গঙ্গাস্নানে চলেছে। মন্দিরে মন্দিরে কাসর ঘণ্টা বাজছে।

অপরাহ্নবেলায় কত উৎসব, কত আনন্দ, কত সংকীর্তন।

নিজের বাড়ীতে শ্রীধর-বিগ্রহের নিত্য সেবার আয়োজন।

যাত্রাে গিরিশচন্দ্রের দূর সম্পর্কের এক পিতামহী স্ত্রী স্ত্রী তাকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবতের কত বিচিত্র কাহিনী শোনাতে।

সেই থেকে গিরিশচন্দ্রের মনে বাংলার এই ধর্মভাবটি দৃঢ় বন্ধমূল হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ জীবনগতির এইখানেই হয় সূত্রপাত।

বাংলাদেশে তখন যাত্রা পাচালী কবিগানের খুব প্রচলন ছিল। পূজাপার্বণে আমোদে-উৎসবে এই সবই ছিল তখনকার দিনের বাঙালীর আনন্দের উৎস—ভাববসের অভিব্যক্তি।

যাত্রার প্রচলন আমরা প্রথমে পেয়েছি চৈতন্য ভাগবতে। নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে রাম ও কৃষ্ণলীলার অভিনয় করতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁর যৌবনকালে স্বয়ং যাত্রার অভিনয় করেছেন।

তাঁর পরবর্তীকালে কিছুদিনের জন্য যাত্রাগান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আবার তাঁর গতিদান করলেন বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম সুবল অধিকারী ও জয়দেব কেন্দুলীর শিবুরাম অধিকারী।

এই যাত্রার নাম ছিল কালীয়দমন যাত্রা।

তাঁর পর রামচরিত নিয়ে পালাগান লেখা হ'ল। তাঁর নাম হ'ল রামযাত্রা।

লোচন অধিকারী শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস লীলা অভিনয় করে যাত্রার একটা রূপান্তর ঘটালেন।

তাঁর নিমাই সন্ন্যাস ছিল দেশপ্রসিদ্ধ।

সেই সময় এলো কথকতা।

এই কথকতার প্রথম প্রবক্তা হলেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামের গঙ্গাধর শিরোমণি।

এই গঙ্গাধর শিরোমণি পুরাণ পাট করতেন প্রথমে। তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ আর ব্যাখ্যা শুনে সকলেই মোহিত হয়ে যেতো।

একদিন তাঁর সেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আসরে গিয়ে দেখেন—লোকজন তেমন আসে নি।

জিজ্ঞাসা করলেন—এর কারণ কি? এ রকম তো হয় না কোনোদিন।

কে একজন বললে, ওপাড়ায় রামায়ণ গান হচ্ছে যে! সেখানেই যত লোক গিয়ে জড়ো হয়েছে।

গঙ্গাধর শিরোমণি কিছুকণ কি যেন ভাবলেন, তার পর বলে দিলেন সবাইকে—আগামীকাল এইখানে আসবেন আপনারা। আমি আপনাদের রামায়ণ গান শোনাবো।

করলেনও তাই।

দিনের পর দিন তিনি তাঁর কণ্ঠে মনের মাধুরী মিশিয়ে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কোনোদিন রামায়ণ গান, কোনোদিন ভাগবত, কোনোদিন বা মহাভারতের নতুন নতুন সুমধুর আখ্যায়িকা অবলম্বন করে এমন মনোরম উচ্চিতে শ্রোতাদের মনোহরণ করতে লাগলেন যে সেখান ছেড়ে কেউ উঠতে চাইলেন না। যত্নমুগ্ধ হয়ে শুনে লাগলো তাঁর ভাবের অপরূপ প্রকাশ।

এই সময় তারই ভাবানুকরণে আরও কতকগুলি কথক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল, গ্রামে গ্রামে কথকতা করে তারা এই কথকতাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে জনপ্রিয় করে তুললেন।

এই সব ইতিকথার অবতারণা করলাম শুধু এই জন্য যে গিরিশচন্দ্র—যাঁর কথা আমি বলতে বসেছি—তিনি একদিন তাঁর বন্ধুমহলে একদিন এই কথকতার খুব প্রশংসা করছিলেন। বন্ধুরা তাঁর কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

তারই কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র তাঁর কথাটাকে প্রমাণ করবার জন্য তাঁর বন্ধু সংগীত-রচয়িতা কেদারনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে একটি আসর পেতে বসলেন। কথকতার আসর। ‘ঋচরিত্র’ অবলম্বন করে তিনি নিজেই রচনা করলেন একটি অভিনব পালাগান। তার পর নানারকমের হাবভাব দেখিয়ে—যেখানে ঠিক যে রকমটি প্রয়োজন ঠিক সেই রকম ভাবের অভিযুক্তি দেখিয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে একেবারে মাতিয়ে তুললেন।

সবাই মুগ্ধ চমৎকৃত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে নাট্যরচনায় উৎসাহিত করে তুললেন।

কলকাতা শহরে তখন নাট্য আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে।

রামনারায়ণের ‘কুসিনকুল সর্কস্ব’ অভিনীত হ’ল।

যদিও সেটি নাটক নামের যোগা নয় তবু পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁর নাম অগ্রগণ্য।

তার পর হ’ল সংস্কৃত নাটকের অভিনয়। ইংরেজি নাটকের অভিনয়।

এই ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের বাড়াবাড়ি তখনকার দিনেও কয়েকজন ছাত্রের আত্মমর্য্যাদায় লাগলো। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করে বললেন—যেমন করেই হোক বাংলা নাটকের অভিনয় করতেই হবে।

বাংলা নাটক চাই।

চাই বললেই তো পাওয়া যায় না।

বেলগাছিয়ায় নাট্যশালা স্থাপিত হ’ল। পাইকপাড়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগবাজারের কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী আর যত্ননাথ চাট্টোয়ার সহযোগিতায় বেলগাছিয়ায় সুসজ্জিত বাগানবাড়ীতে রাজ নারায়ণের ‘রত্নাবলী’ নাটকের অভিনয় হতে লাগলো।

তার ইংরেজি অনুবাদ করবার জন্য ডাক পড়লো মাইকেল মধুসূদনের।

এই বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে মাইকেল মধুসূদনের অতুলনীয় প্রতিভা ফুটে উঠলো।

সেখানে গিরিশচন্দ্র ছিলেন শুধু দর্শক এবং শ্রোতা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদনের বাংলা নাটক সেখানে অভিনীত হ’ল।

চারিদিক প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো।

বাংলার ছোট লাট স্যার ফ্রেডরিক হালিডে বাগবাজারের কেশব গাঙ্গুলীকে বললেন ভারতীয় গায়িক। গিরিশচন্দ্রের প্রতিবেশী কেশবচন্দ্রের প্রশংসায় গিরিশচন্দ্র গৌরব বোধ করলেন। তাঁরও মনে তখন অভিনেতা হবার বাসনা জেগে উঠলো।

দেখতে দেখতে কলকাতায় চারটি নাট্যশালা স্থাপিত হ'ল। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে 'প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'। বেলগাছিয়ায় একটি। পাথুরিয়াঘাটায় 'বঙ্গ নাট্যালয়'—বরং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। বৌবাজারে আর একটি। সেখানে নাট্যকার মনোমোহন বসুর নাটক অভিনীত হতে লাগলো।

এই সময় বাংলার নবজাগরণের সন্ধিক্ষণ। ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের প্রতিভা তখন জ্বলজ্বালমান। সেই সময় দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব।

মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন বাগবাজারের জামাই। তাঁর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের হ'ল বন্ধুত্ব। গিরিশচন্দ্র এই সব থিয়েটারের হলেন নিয়মিত দর্শক।

গিরিশচন্দ্র বলতেন—এঁরা সকলেই ভদ্র, শিক্ষিত এবং সভ্য। তাই এখানকার নাটকগুলিও ভদ্র। কচির দিক দিয়ে উন্নত। নাট্যমঞ্চের ডিসিপ্লিনও যথেষ্ট পোক্ত। কেউ জোরে জোরে কথা বলবে না। অভিনেতারা দর্শকের দিকে পেছন ফিরবে না। সভ্যভাবে চলাফেরা করবে। ক্রুদ্ধ ভীষ্ম যুদ্ধ করতে করতে দাঁতে দাঁত ঘষবে না, চোখ রাঙাবে না।

হ্যাঁ, তবে মুচ্ছা যাবার অধিকার ছিল। তাও কিন্তু খুব সংযতভাবে।

শুধু দৃশ্য পটের বাহার, সাজসজ্জামের চমক ছিল যথেষ্ট।

গিরিশচন্দ্রের মতে তাঁদের অভিনয়ের চেয়ে বাইরের সাজসজ্জার আড়ম্বরটাই ছিল বেশি।

গিরিশচন্দ্র মুগ্ধ হলেন মাইকেল আর দীনবন্ধু মিত্রের নাটক দেখে। আর কেশব গাঙ্গুলীর অভিনয়।

নাটকের দিকে অভিনয়ের দিকে মন ছুটলো গিরিশচন্দ্রের।

কিন্তু সংসারে এলো অনতিক্রম্য বাধা। বাবা মারা গেলেন। বিরাট সংসারের বোঝা এসে পড়লো মাথায়। শুধু সাংসারিক বোঝা নয়, মামলা মোকদ্দমা—অনেক কিছু।

মাতুষের জীবন বড় বিচিত্র। কোন্ ঘটনার সংঘাতে কোন্ দিক দিয়ে যে জীবনের গতি ফিরে যায় কেউ কিছু বলতে পারে না। মামলা বাধলো আত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে। আদালতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র যদি মিথ্যা বলতেন হারত বা জরী হতেন, কিন্তু মিথ্যা তিনি বললেন না। তার ফলে যে আঘাত তিনি পেলেন সেই আঘাত তাঁকে করে তুললো বিদ্রোহী। তখন থেকে যে জীবন তিনি যাপন করতে শুরু করলেন তাকে ঠিক ভদ্র জীবনযাপন বলে না। কোনোদিকে ভ্রক্ষেপ নেই, চললেন তিনি সেই শ্রোতে গা ঢেলে দিয়ে।

আমাদের দেশের রীতিই হচ্ছে—কোনও খ্যাতিমান ব্যক্তির জীবনী লিখতে গিয়ে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দোষত্রুটিগুলো উপেক্ষা করে যাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী কালের জীবনের এবং জীবনযাপনের ধারা ছিল সাধারণ ধারা থেকে একটু স্বতন্ত্র।

তিনি যখন বিয়েটারে অভিনয় করছেন, নাটক রচনা করছেন, তাঁর খ্যাতি বাংলার সর্বত্র যখন ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তাঁর জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ। অযাচিতভাবে তাঁর যে করুণা তিনি পেয়েছিলেন সেরকম করুণা জীবনে ক'জনই বা পেয়ে থাকে।

‘চৈতন্যলীলা’র অভিনয় হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে গেছেন, চৈতন্য সেজেছেন—নটী বিনোদিনী। বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তিনি তন্ময় হয়ে গিয়ে নাচতে নাচতে বলতেন—হরি গুরু, গুরু হরি! বল মা হরি গুরু, গুরু হরি! আসল নকল তুই এক করে দিলি মা, আসল নকল তুই এক করে দিলি।

তার পর বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন—‘তোমার চৈতন্য হোক!’ চৈতন্য তার হয়েছিল।

ধন্য হয়েছিল বিনোদিনী আর ধন্য হয়েছিল নাট্যকার জগাইবেশী গিরিশচন্দ্র।

ঠাকুর তাঁকে ভৈরব বলতেন।

বলেছিলেন—রোজ একবার করে মাকে ডাকবি।

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন—ডাকবার সময় কোথায়?

ঠাকুর বলেছিলেন—খাবার সময় একবার ডাকবি।

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন—অন্তর্নিবাসন দোকানের সিঁড়ি, কচুরি খেয়ে দিন কাটে, সে সময় মাকে ডাকা উচিত নয়।

‘তবে রাত্রে শোবার সময়—নয় তো ঘুম থেকে ওঠবার সময় ডাকবি।’

গিরিশচন্দ্র হেসেছিলেন।

‘বলেছ বেশ। কোথায় কোন্ বারবনিতার ঘরে তারই শয্যায় শুয়ে মাকে ডাকা বুঝি ভালো? ছাখো, মদ, গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকি, মাকে ডাকার কথা মনেই থাকবে না আমার।’

শ্রীরামকৃষ্ণ রাগ করেন নি। বলেছিলেন—তা হলে আমাকে ব'কল্যা দিয়ে দে। আমিই তোমার হয়ে মাকে ডাকবো।

কে এমন ভাগ্যবান পৃথিবীতে? এ কৃপা কে পায়?

এরই সূত্র ধরে কত অপূর্ণ অদ্ভুত ঘটনা যে ঘটেছে তাঁদের জীবনে সে সব কথা বলতে গেলে ফুরাবে না। এককথায় শুধু এইটুকু বলা চলে যে—যাঁর কৃপায় পল্লী গিরি লঙ্ঘন করে, মুক বাচাল হয়—এ সেই তাঁরই অযাচিত অনুগ্রহ। তাঁরই করুণায় গিরিশচন্দ্র মহাকবি। গিরিশচন্দ্র অপাপবিদ্ধ চির স্মরণীয় নট-নাট্যকার।

পরমহংসদেবের স্নেহধন্য বিনোদিনীর জীবনও তাই। সেও তাঁর অযাচিত কৃপালাভ করেছিল।

গিরিশচন্দ্র একটির পর একটি নাটক রচনা করে বলেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে অভিনয় করছেন। দেশের যেকোনো হাওয়া বইছে সেই দিকেই যেন ছুটেছে তাঁর মন। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। নাইবার খাবার অবসর নেই। এমন সময় তিনি লিখলেন—‘চৈতন্যলীলা’। কে সাজবে চৈতন্যদেব?

গিরিশচন্দ্র নিজের হাতে করে গড়ে পিটে মাহুশ করলেন বিনোদিনীকে।

তাকেই দিলেন চৈতন্যদেবের পাট।

এইবার বিনোদিনীর নিজের কথাতেই বলি—

বিনোদিনী বলছে—

আমার মতো পতিতার দ্বারা সে দেবচরিত্র যতদূর সম্ভব কচিসম্মত হোক—এইটিই চাইতেন গিরিশচন্দ্র। বারবার বলতেন—‘আমি যেন সত্য গৌরপাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন। পতিতের ওপর তাঁর অসীম দয়া।

আমার মনে বড় আশঙ্কা হত, আমি দিবারাত্রি ডাকতাম—‘হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পবিত্রাকে দয়া করুন!’

যেদিন প্রথম অভিনয় করি তার আগের রাতে আমি ঘুমোতে পারি নি। প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যাকুল উদ্বেগ। সকালে উঠে গঙ্গায় স্নান করলাম। পরে ১০৮ ভূর্গানাম লিখে তাঁর চরণে নিবেদন করলাম। মহাপ্রভু যেন আমার এই মহাসঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর রূপালাভ করতে পারি!

তার পর চৈতন্তের বাল্যলীলা অভিনয় করবার সময় ‘রাধা বই কেউ নাইকো আমার। আমি রাধা নামে বাজাই বাঁশী’। এই বলে গান ধরে যতই এগিয়ে যাই ততই যেন একটা পরম শাস্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলতে লাগলো।

মালিনীর কাছ থেকে মালা নিয়ে সেটি গলায় পরে মালিনীকে বলতাম—‘কি দেখো মালিনী?’

সেই সময় আমার চোখ যেন বাইরের দৃষ্টি হারিয়ে ভেতরে চলে যেতো। আমি বাইরের কিছুই দেখতে পেতাম না। আমি যেন হৃদয়ের মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম দেখতে লাগলাম। আমার মনে হ’ল—চোখের সামনে গৌরানন্দ যেন এসে দাঁড়ালেন। তিনিই যেন কথা বলছেন। আমি শুধু তাঁর কথা শুনে শুনে বলে যাচ্ছি। আমার দেহমন রোমাঙ্কিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—মন প্রাণ আনন্দে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে—চারিদিক যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। অপরূপ অদ্ভুত সে অগ্নুভূতি—বলে বুঝানো যায় না।

তার পর বলতাম— ‘গয়াধামে হেরিলাম বিহ্বলান

বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতেছে মধুপান

কত শত কোটি অশরীরি প্রাণী।’

তখন মনে হ’ত অলু কেউ আমার অন্তরের ভেতর থেকে কথাগুলো বলছে। তখন আমার জ্ঞান থাকতো না।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে শচীমাতার কাছে বিদায় গ্রহণ করবার সময় বলতাম—

কৃষ্ণ বলে কৈদো মা জননী

কৈদো না নিমাই বলে।

কৃষ্ণ বলে কৈদিলে সকল পাবে

কৈদিলে নিমাই বলে

নিমাই হারাবে, কৃষ্ণ নাহি পাবে।

তখন যেরূপা এমন ডুকরে ডুকরে কঁদে উঠতো যে আমার বুকের ভেতরটা ওর ওর করতো। তার ওপর শচীমাতার আর্ত ক্রন্দনে আমাকে এমন অভিভূত করে দিতো যে আমি চোখের জলে বুক ভাসাতাম। তার পর যখন সন্ন্যাসীর বেশ পরে নেচে নেচে গান গাইতাম—

হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?

ভবে আমি একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখো পদে ।

তখন এক-একদিন আমি যেন সতাই উন্মাদ হয়ে যেতাম । জ্ঞান হারিয়ে মুচ্ছিত হয়ে পড়তাম । আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়তো ।

একটা দিনের কথা আমার মনে আছে ।

ফাদার ল'কো এসেছেন প্লে দেখতে । আমি মুচ্ছিত হয়ে পড়েছি । গিরিশ ঘোষ মশাই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আমার কাছে । যখন আমার চৈতন্য হ'ল, দেখলাম—গৌরবর্ণ এক দাড়িওয়া ভদ্রলোক আমার পাশে বসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলতোভাবে আঁচুল চালাচ্ছে ।

আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম । তিনিও প্রণাম করলেন । বললেন—এক মাস জল খাও তুমি ।

জল খেলাম । দেখলাম—অনুদিন যেরকম দুর্বল হয়ে পড়ি সেদিন সেরকম দুর্বল নই ।

কত ভক্ত কত জ্ঞানীশ্রী পণ্ডিত যে চৈতন্যলীলা দেখতে এসে আমাকে অজ্ঞান আশীর্বাদ করে গেছেন তার অন্ত নেই । কেউ কেউ বা এমন কাজ করে বসতেন—যা দেখলে আমার নিজেরই লজ্জা হ'ত । আমাকেই শ্রীচৈতন্য ভেবে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন ।

একদিন কে যেন প্রণাম করলেন । প্রণাম করবামাত্র আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম । জ্ঞান বইলো অথচ মনে হলো যেন জ্ঞান নেই । পরম আনন্দে ভরে গেছে সমস্ত অন্তর । মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেমন যেন একটি হিমশীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে । অপরূপ অদ্বুত সে অমুভূতি ।

পরমহংসদেবের ককণার কথা তো আগেই বলেছি । তিনি অনেকবার এসেছেন চৈতন্যলীলা দেখতে । যতবার এসেছেন ততবারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন—‘তোমার চৈতন্য হোক !’

কিন্তু এ-সব হয়েছে কার কল্যাণে ?—কার ককণায় ? কে রচনা করেছিলেন সেই প্রাণ মাতানো নাট্যলীলা—যা আপামরসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, অলক্ষ্যে শুধু হৃদয় স্পর্শ করে নি । আনন্দের শিহরণ—চৈতন্যের আলোক প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল অপর্যাপ্তভাবে ।

বাংলার নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব যেন বিধিনির্দিষ্ট ।

যুগের প্রয়োজনে তিনি এসেছিলেন । তাই যুগোপযোগী নাটক রচনা করে গেছেন ।

তিনি আক্ষেপ করে বলতেন—এ যুগে সুশিক্ষিত দর্শকের সংখ্যা বড় কম । সংখ্যায় যদি তারা বেশি হ'ত আমার নাটকগুলির চেহারা হ'ত অন্যরকম । নাটক ও নাট্যশালার আরও উন্নতি করা সম্ভব হ'ত ।

গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা । এই নিষ্ঠা ছিল বলেই তাঁর নাটকের যে-সব চরিত্র যুগের ফসল, শুধু সত্যের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য তারা সে যুগকে অতিক্রম করে আজও অগ্নান ।

দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘দেশবন্ধু’ এই অভিধাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত কবিতায় ‘অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার’—স্বদেশাচার্য্যার বাণীমূর্ত্তিকে প্রণাম জানিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ মরছে এই উপমাটি চালু হয় নি যেমন হয়েছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে ‘স মহাত্মা স্বতর্জিত’ এই অভিজ্ঞানটি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রশস্ত ললাটে স্বয়ং দেশনেতার তিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন কবি, বরণ করে নিয়েছিলেন বরপুত্র সন্তোষ মহাজন-প্রাক্ষণে। মনে পড়ে সেইদিনটির কথা—১৯২৫ সালের একটি নিদাঘ তপ্ত দিন, মহাপ্রয়াণ করলেন এক মহাস্তপুরুষ যিনি ছিলেন সে যুগের বৈদিক কবির ভাষায় ‘এষ দেবো বিশ্বকর্মা’ আর এ যুগের বিশ্বকবি বললেন—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ

মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

চিন্তরঞ্জন নামটি তাঁর সার্থক হয়েছিল। আমাদের ছাত্রাবস্থায় তাঁকে দেখেছি, শুনেছি তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী, পড়েছি তাঁর লেখা, এমন করে বাংলার কথা ভেবেছে কে, এমন করে জীবন মহার্গবের সাগর সংগীত উদ্বেলিত করেছে কাকে, সিদ্ধ শুধু বন্দনীয় নয়, বিশ্ব শুধু মাহেশ্বরী নয়—

আজিকে পাতিয়া কান শুনেছি তোমার গান

হে অর্গব আলোষেরা প্রভাতের মাঝে !

এ কি কথা, এ কি স্বর প্রাণ মোর ভরপুর

বুঝিতে পারি না শুধু কি জানি কি বাজে

তব গীত মুখরিত প্রভাতেব মাঝে।

আজকের কবিতারসগ্রাহীর কাছে ‘রোমান্টিক এক্সট্রাড্যাগাঙ্কা’ বটে কিন্তু মনের আকুলতা ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়ছে, তিনি ডাকছেন তাঁর জীবন বহ্নভক, সাধন দুর্লভকে।

এস আমার মৃত্যুগয়, এস আমার অবিনাশি

বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও, অভয় তোমার বাণি।

মহামৃত্যুগয় মন্ত্রের উপাসক চিন্তরঞ্জনকে, কবির্মনীষী চিন্তরঞ্জনকে প্রণাম। ১৮৭০-১৯২৫ এই সীমিত সময় পরিক্রমার মধ্যেই তাঁর আগমন, তাঁর ব্যাপ্তি, তাঁর জাগরণ, তাঁর বিক্ষোভ, তাঁর ভিরোধান। এরই মধ্যে পুষ্পের কোরকসম ফুটে উঠেছে মানুষ চিন্তরঞ্জন, ভোগী চিন্তরঞ্জন, ত্যাগী চিন্তরঞ্জন, ব্যাবিষ্টার চিন্তরঞ্জন, সাহিত্য-রসরসিক চিন্তরঞ্জন, লোকহিতপ্রাণ চিন্তরঞ্জন, স্বাদেশিক চিন্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন। বয়সের হিসাবে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কর্মীজ্ঞানী গুণীভূক্ত এই মানুষটি ইতিহাসের সীমারেখা ছাড়িয়ে চলে গেলো, কিন্তু রেখে গেলো মহাকালের দরবারে এমন এক ছাড়পত্র যা ভবিষ্যৎবংশীয়দের কাছে একটি অনির্বচনীয় সংহিতা, যা জীবনযুদ্ধে হতাশ মনের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে এনে দিতে পারে শুধু আশা উৎসাহ উদ্দীপনা ব্যঞ্জন নয়, একটা মহৎ জীবনের মহিমাল সৌরভ, একটু স্মরিত ধূপের স্বগন্ধ, আত্মার বন্ধনহীন অনন্তের গান।

জানি, আজ এসব কথা তোলা যানেই স্বীকার করে নেওয়া যে তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন এই তো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। শ্রাদ্ধের দিনের তাৎপর্য যে মুখোমুখি মৃত্যুর সামনে বসে আমরা বলি যে তাঁকে আমরা ভালোবাসি, তিনি মরেন নি, তিনি আছেন, আমার স্মৃতিতে আছেন, প্রীতিতে আছেন, জ্ঞানে আছেন, ধ্যানে আছেন, মননে আছেন, নিদিধ্যাসনে আছেন। দেহ মরণশীল হলেও চেতনার সত্তা বীজে অমর, অর্থাৎ in dimeusion, though not in space.

যে যুগে চিত্তরঞ্জনর আবির্ভাব, যে যুগ বিস্তারের যুগ, বিশ্লেষণের যুগ, বিপ্লবের যুগ। বাঙালী তখন বিশ্বরূপ দেখছে অর্থাৎ তার জাতীয় জীবনে বাহির দুয়ারের কপাট খুলেছে, প্রতীচীর দুর্বার শক্তি তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, নতুন দিনের স্বপ্ন, নতুন রস, নতুন চিন্তা, নতুন আলোক—সে পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করছে, তার রসবস্তুকে সংগ্রহ করছে—এ এক অপূর্ব সমীকরণের যুগ। মাত্র একযুগ পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে, মননের ইতিহাসে এসেছে এক ঋতু পরিবর্তনের পদধ্বনি, শিক্ষার নতুন রীতিনীতি গৃহীত হচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাবালক হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। মধুসূদন বসু বিদ্যাসাগর জাতির সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ‘ত্রিশরণ’। রবীন্দ্রনাথ সবে ক্রমে ক্রমে পায়ে পায়ে এগুচ্ছেন তাঁর চির সার্থকতার তীরে। রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের আশুকুল্যে ও কেশব সেনের বাগ্মিতায় যার প্রতিপত্তি, সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন শতদলে টলমল করছে। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সে যুগে জীবনে এসেছে একটা নতুন স্বীকৃতি, নতুন দিগদর্শন। দেশের জ্ঞানীশুণী চিন্তাশীল মনস্বীরা আত্মসম্বিৎ ফিরে পাচ্ছেন। ভারতপথ-পথিক বাংলাদেশ নতুন গল্প শুনেছে, নতুন কথা বলছে, নতুন রহস্যে জেগে উঠছে। এক রসসঞ্জীবনী প্রাণবন্তা দুকূল ছাপিয়ে চলেছে। বহুকালের বহু বৃহস্পতির মননে ভরা, রক্তে ভরা এই বঙ্গ দেশ। চিত্তরঞ্জন সেই মাটিরই মানুষ—সেই ভেড়িডড, ইতিড, মেলানিড, রক্তের চাঞ্চল্য নিয়েই জন্মে ছিলেন, এমনি একটি আবেগ চঞ্চল সুপ্রসিদ্ধ পরিবারে—বিক্রমপুরের তেলিরবাগের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবারে। কালীমোহন, দুর্গামোহন, ভুবনমোহন এই তিন কুতী ভ্রাতার কথা সেদিনকার যৌথ পরিবারের দিনে সকলেই জানতো—পুণ্যে বিশাল বরিশালের তখন তাঁরা অধিবাসী, সকলেই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন ও আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। দুর্গামোহন চলে আসেন কলকাতায় প্র্যাকটিশ করতে এবং তাঁরই পটলডাঙ্গার বাসায় চিত্তরঞ্জনের জন্ম ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর। তাঁর পিতা ভুবনমোহন। রসা রোডের বিখ্যাত বাটীর সূত্রপাত হয় কালীমোহনের মাধ্যমে—সেবাসদনের পেছনে শিব মন্দিরটি আজও তাঁর কৌলিক প্রধায় পুনরাগমনের স্মৃতি বহন করে। তিনি তাঁর ভ্রাতা দুর্গামোহনের মতো হয়তো উগ্র ব্রাহ্ম ছিলেন না। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহনও ছিলেন আইনজ্ঞ তবে এ্যাটর্নি এবং সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল সুবিদিত। ‘ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন’ নামক পত্রিকাটি নানা দিক দিয়েই তখনকার শিক্ষিত সমাজের চিন্তাধারাকে প্রতিকলিত করতো এবং এর কৃতিত্ব ছিল ভুবনমোহনের। মতবৈধের জন্ম পরে তিনি ‘বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন’ নামেও একটি কাগজ বার করেন। দেশবন্ধু-স্মৃতি গ্রন্থকার হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের লেখায় পড়ি যে দাশ পরিবারের পরোপকার ও দান প্রবৃত্তিটি বংশানুক্রমে প্রচলিত ছিল এবং দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের মতো এঁরা অন্ত লোকের দুঃখ কষ্ট দেখলে বিচলিত হতেন এবং নিজের বা পরিবারের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই সাধ্যাতিবিস্ত দান করতেন। চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও এই গুণ বিশেষভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। লভ্যকার বাঙালী চিরকালই এক সমন্বয়

সন্ধানী সংস্কৃতির পূজারী—এ তার সবার পরশে পবিত্র করা মনের ঝঙ্কা না কর্গনাশ। ভেদবুদ্ধির সর্বনাশ। বিস্তার, জ্ঞানি না, তবে সাহিত্যে, সাধনায় সংস্কৃতিতে আমরা শুধু ভারতপথ-পথিক নই, বিশ্বপথ পথিকও। ইতিহাসের গভীরে তার সত্যকার সস্তাটিকে বিশ্লিষ্ট করে বেস্তার দৃষ্টি দিয়ে যিনি আমাদের ভাবুক মনের ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করতে চেয়েছেন তিনিই জানেন যে আমাদের জয়যাত্রা সেইদিনই হয়েছে, যেদিন আমরা স্বপ্ন দেখেছি ভূমার, যেদিন আমরা বেরিয়ে পড়েছি ভল্লশূলশলা নিয়ে নয়, আদর্শ নিয়ে, চিন্তা নিয়ে, ধ্যানধারণা নিয়ে, সেবার যন্ত্র নিয়ে, দরিত্রকে নারায়ণ জ্ঞান করে। ঈয়েনবীয়ান্ ফর্মুলা দিয়ে বাংলার ইতিহাসকে প্রতীক করে অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রূপটি বহির্জগতেও কিছুটা ধরা পড়ে ইতিহাসের পাতায় পাল-সেন যুগে, বৈষ্ণব মধ্যযুগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগে—শুধু নবাবুর ইকুবনে বাংলার স্তামল সমৃদ্ধির বা প্রাকৃত-পৈঙ্গলে তার ভোজন বিলাসের কিছুই দেখি না, দেখি তাকে যোগিনীচক্রের মূলাধারে, বরবতুরে আংকরে, ভাষায় ভাষায় গিঠে, পাগানের মন্দির গাড়ে, হরউজীর বর্ণমালায়, আবার পরিহাস কেশবের মন্দিরের অঙ্গনে রক্তাক্ত বিপ্লবে। শুধু জয়দেব, ধোয়ী, শরণরা নয়, শুধু গর্গ, দর্ভপাণি লোয়ুধমিশ্র, চন্দ্রগৌমী বসুবন্ধু, সন্ধ্যাকর নন্দী, গুরব মিশ্র কেদার মিশ্র, দীপকর অতীশ, তারানাথ রাই নয়, ভুস্ক চণ্ডালীকে গৃহিণী করতেও সে পশ্চাৎপদ হয় নি, মন্দিরে মসজিদে পথ ঢাকলেও এক গুরুর সহজ ডাক সে ভোলে নি। তাই শৈবশাক্ত দিন পেরিয়ে, বঙ্গালী কোলনৌ মর্যাদাকে পিছে রেখে, মঙ্গলকাবোর রসপান করে, দম্ভজমর্দন দেবকে নমস্কার করে সে চলেছিল দাক্ষিণাত্যে, নীলাচলে, বৃন্দাবনে, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখী মহাস্তীকে সঙ্গী নিয়ে; যখন ইসলামের চওবেগ প্রচণ্ড আঘাতে খণ্ড খণ্ড করছে দেশকে দশকে। মহাযুদ্ধের মাধ্যমে জাতির চেতনাকে এগিয়ে দিয়েছিল এক অপূর্ব ঐক্যের মঞ্চে—চণ্ডালও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হয় হরিভক্তি পরায়ণ হলে। বাঙালীর মহাভারতী সাধনা নতুন নয়, শুধু নবকলেবর পেলে ঊনবিংশতাব্দীতে যে যুগ রামমোহন থেকে স্বভাষচন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তারই একজন বিশিষ্ট দেশনায়ক, লোকনায়ক, উত্তর সাধক—দেশবন্ধু চিন্তন। এই যুগের শিল্পী, কবি, কর্মী নেতা, সাহিত্যিক সকলেই দেশমাতৃকার এক যজ্ঞ সম্ভব মূর্তি গড়ে তুলতে চাইলেন, পূর্ণাহতির সমিধ সংগ্রহে বন্ধ পরিকর হলেন, প্রতীচীর জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রয়োগ বিজ্ঞা, যান্ত্রিক সুবিধার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইলেন, অমূল্যলনের ছন্দ, কর্মযোগের ব্যাখ্যা, ভাগবত জীবনের প্রয়াস, নূতন গীতাঞ্জলি, জীব ও শিবের সেবার সূত্র। উপরের উজ্জ্বলতার নিয়ে গড়ে উঠলো এক নিষ্ঠা, এক তপস্বী, এক সমীকরণের চেষ্টা যার পুরোহিত রামমোহন রামকৃষ্ণ বিজ্ঞাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল ভূদেব কেশব বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্র চিন্তন শ্রীঅরবিন্দ স্বভাষচন্দ্র প্রভৃতি। যে যেকিকে পেরেছেন এই সম্মিলিত চিন্তবৃত্তির উদ্বোধন করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর অষ্টপাদ পর্যন্ত। তারই একটি উজ্জলতম প্রকাশ চিন্তন দাশ। আজ আমরা বলি যুগ বদলেছে, সমাজ বিপর্যস্ত, দেশ স্বাধীন তবু আমরা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ও সম্যক ফলভোগ করি নি, কান্নায় মন ক্লান্ত, পরাজিত মনোভাবে উগ্রহিংসায় আমরা বিপর্যস্ত, নদীর এপার ওপার হয়ে গেছে আলাদা, ছেলেরা পায় না শিক্ষা, মেয়েরা পায় নি পতি, জীবন আরাম বিহীন, শ্রদ্ধা শান্তি নিষ্ঠা এ সব কথা হয়েছে ছেঁড়া পাতায় টুকরো—বুড়ু জনগণ কোন গণপতির কোন নিধিপতির, কোন প্রিয়পতির স্বরণ করবে, কোন মন্ত্রের নেবে শরণ।

চিন্তনের অনশতবার্ষিকী বর্ষে এই কথাটাই আমাদের মনকে পীড়িত করে তুলছে—সময়ের

পরিক্রমায়, ভাববিনিময়ে, আদর্শের রূপান্তরে আজকের তরুণ সমাজ নতুন সন্ধান দেবে, নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের নৃত্র খুঁজবে, নতুন দর্শনের হোতা উদ্গাতা হবে, নতুন ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ করবে, ডায়ালেকটিকসের সাহায্য নেবে—এ কথা শুধু যুক্তিসিদ্ধ নয় স্বয়ং নিভর, কিন্তু ইতিহাস যানেই ধারাবাহিকতা, আবার পুত্রের পিছনে যেমন আছি আমি, তেমনি আমার পিছনে আছেন আমার পিতা—অতীত কূলকোটা শুধু ব্যঙ্গোন্মীষ সত্য নয় জীবনদর্শনেরও ইঙ্গিত। ইতিহাস বা বিপ্লব কোনো একটা বিশেষ দিনে, বিশেষ ঘটনা নিয়ে জেগে ওঠে না বিশ্বতির অতল তল থেকে। সেই ইতিহাসের ধারায় যারা এসেছেন দীপ নিয়ে, মালা নিয়ে, পূজার থালা নিয়ে, আত্মোৎসর্গের নৈবেদ্য নিয়ে, প্রাণ নিয়ে তাঁদের আমরা ভুললে যে আমাদের পিতৃগণকে অসম্মান করা হবে।

চিন্তরঞ্জন ব্যারিষ্টার হবে এসে হাইকোর্টে প্র্যাকটিসে বসলেন ২৩ বছর বয়সে ১৮৯৩-৯৪ সালে। বিলাতে তাঁর সহকর্মী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তবে তাঁর ছাত্রাবস্থা ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ থেকে। এর পিতাও চেয়েছিলেন যে ইনি আই সি এস পরীক্ষা দিন। দিয়েওছিলেন, কিন্তু বিধি নির্দিষ্ট কি প্রতিবন্ধক ঘটলো যাতে অস্বাভাবিক পরীক্ষায় বসলেন না তিনি। দেশমাতৃকার ভূমায় যী মৃতি তাঁকে বিচলিত করে দিলে এই বেবড়লড চাকুরীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে। চিন্তরঞ্জনও এই সময় আই সি এস পরীক্ষার অকৃতকার্য হয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করে চলে এলেন। চিন্তরঞ্জনের জীবনে বিলাতে দুটি ঘটনা ঘটে—যাকে বলা যেতে পারে—*Coming events cast their shadows before*—একটি ভারতীয় হিন্দুদের চুক্তিবদ্ধ দাস (Indenteared labourer) বলে অভিহিত করায়, ম্যাকলীন নামে একজন এম্ পি চিন্তরঞ্জন কর্তৃক ধিকৃত হন এই বলে যে একজন ইংরাজের মুখে এ কথা শোভা পায় না, কারণ ভারতবর্ষ বাহুবলে বিজিত নয়। আর একটি ঘটনা দাদাভাই নৌরজীর পার্লামেন্টে প্রবেশ সম্বন্ধে। ব্যারিষ্টার চিন্তরঞ্জনের প্রথম কর্মজীবনে নানা বাধা এসে পড়েছিল—পিতার গুরু ঋণভার, ইনসলভেন্সি নেওয়া ইত্যাদি। ব্যবসায় প্রথম দিকে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তা ছাড়া তাঁর মনের আবেগচঞ্চল 'Bohemian spirit'—তাঁকে কাব্যপ্রণী করেছিল। কবি চিন্তরঞ্জন ব্যারিষ্টার চিন্তরঞ্জনের পশার প্রতিপত্তির ছায়ার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়েই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালক' প্রকাশিত হয়।

তোমার ও প্রেম সখি ! শাবিত কৃপাণ
দিবানিশি করিতেছে হৃদি-রক্তপান ।
নিত্য নব হৃথ ভরে বলসিছে রবি করে
রক্তনীর অঙ্ককারে সে আলো নির্বাণ ।
তোমার ও প্রেম সখি ! ভূমঙ্গের মত
জীবন জড়িয়ে মোর আছে অবিরত ।
প্রতি নিঃশ্বাসেই তার বরিষে মরণ ধার ;
আকুল চূষন আর, দংশিছে মতত ।

তাঁর 'বার বিলাসিনী' কবিতাটির রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'কে স্মরণ করিয়ে দিলেও সেই গভীরতায় পৌছায় নি, যদিও এক হিসাবে 'lyric cry' একই ধরনের মানসিক চেতনায় আঘাত দেয়—

ওগো, আমি যৌবনে যোগিনী

এ বিশ্ব লাগনা ছাই সর্বাক্ষে মাথিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্কবাহিনী ।
মর্মহীন কর্মহীন কলঙ্কবাহিনী
চিরদিন যৌবনে যোগিনী ।

ব্রাহ্মসমাজের নীতিবাগীশরা সমালোচনার মুখর ও নখর হয়ে উঠেছিলেন । এই কবিতার রবীন্দ্র-প্রভাব আছে কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের রূপৈশ্বর্য ঠিক তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি বরং চিন্তনরত্নের স্বকীয়তাই এখানে সুস্পষ্ট । চিন্তনরত্নের শিল্পীসত্তায় ভাবতত্ত্বরত্নতাই প্রধান উপাদান তাই জানগর্ত 'ব্রাহ্মসঙ্গীত'এর চেয়ে তিনি ভাবাবেগপ্রসূত বৈষ্ণব গীতিকবিতা ও গানের পক্ষপাতী ছিলেন—এর মধ্যে কোনো অবহেলা বা অবজ্ঞার স্থর দেখি না, এ হচ্ছে মানসিক প্রবণতার ধারা—সেখানে তিনি ভক্তসাধক নিছক জ্ঞানমার্গের পথিক নন—কর্মযোগী হয়ে গেছেন বৈরাগ্য শ্রীভূষিত ভক্তযোগী ।

নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা বহিতে নারি বোঝার ভার ।
(আমার) সকল অঙ্গ ইাকিয়ে ওঠে নয়নে হেরি অঙ্ককার ।
সেই যে শিরে মোহনচূড়া, সেই মূর্তি হেরব বলে
পরান বড় অভিলষী ।
ধাকা হয়ে দাঁড়াও হে আলো করি কুঞ্জ দুয়ার
এস আমার পরশমানিক বেদ-বেদান্ত কাজ কি আর । (অন্তর্ধামী)

কীর্তনে যেমন তাঁর অনুরাগ ছিল প্রচুর তেমনি তাঁর কাছে প্রিয় ছিলেন স্বদেশী যাত্রাওয়ালা শ্রমের মুকুন্দরাম দাস । এই যাত্রাটির দেশাত্মবোধক গানগুলির প্রভাব সেদিনকার বিপ্লবী তরুণ মনে কি প্রতিক্রিয়া করেছিল তার সম্যক বিচার বোধ হয় করা হয় নি । যাত্রাদলের গান বলেই আমরা হয়তো সেগুলিকে অপাত্তের না হোক একটু পিছনে রেখেছি, কিন্তু যুগমানসের সৃষ্টিতে তার অবদান সামান্য নয় । চিন্তনরত্ন এ কথা বুঝতেন শুধু তার intuitive sense দিয়ে নয়—মনের আত্মীয়তার যোগেও । বিদ্রোহী কবি নজরুলও তেমনি তাঁর প্রিয় ছিল । চিন্তনামায় কবি এক অপকল্প চিত্র এঁকেছেন—

লক্ষী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী
শিব মাথালেন ত্যাগের বিভূতি, কর্ণে গরল দানি ।
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাশি
দিলেন অমিত-তেজ ভাস্কর মৃগাক দিল হাসি ।
চির-গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাদি,
প্রতাপ-শিবাজী দানিল মস্ত, দিল উকীষ বাশি ।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষা ভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারি দিল মন্দার মালা, মানব মাথাল ধুলি ।
নিখিল-চিন্ত-রত্নন তুমি উদিলে নিখিল ছানি—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী ।

দাস পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সম্পর্ক এই সময় জন্ম-জন্মাট । তরুণ ব্যারিষ্টার চিন্তনরত্নকে প্রায়ই

দেখা যার জোড়াসাঁকোতে, বিকালের দিকে কোট ফেরত। তখন মজলদেব ভিড় নেই, সিনিয়রদের সঙ্গে 'কনসালটেশনের' তাড়া নেই। চিত্তরঞ্জন চলেছেন স্বাক্ষরকানাক ঠাকুর লেনে মহর্ষি ভবনে (এই নামকরণ তখনও হয় নি), সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই বলছেন, কবিজায়া মৃণালিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করে—কাকিয়া, আমি এসেছি, নুচি-মাংসর ব্যবস্থা করুন। ঠাকুর ভগিনী অমলা দেবী তখন মাঝে মাঝে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গিনী হতেন। কবির তখন শিলাইদহের যুগ—অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিশ্বের ঐশ্বর্য কুটে বের হচ্ছে আর ঠাকুরবাড়ীতে তখন খামখেয়ালী সভার বৈঠক বসছে ঘন ঘন। এর আগে ছিল 'বিশ্বজন সমাগম', পরে 'বিচিত্রা'র আসর। অভাগতদের মধ্যে দেখি চিত্তরঞ্জন দাস, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি। আর রবীন্দ্রনাথের গান, গল্প, আবৃত্তি মাতিয়ে রাখতো সকলকে। আহারের ব্যবস্থাটাও হ'ত পরিপাটি যেমন 'ধূপধূনা রত্নচৌকি সহযোগে তাকিয়ে আশ্রয় করিয়া, রেশমবস্ত্রমণ্ডিত জলচৌকিতে জলপান' বা 'ফরাসে বসিয়া প্লেটপাত্রে যোগলাইখানা' কখনো 'টেবিলে জলপান'।

তবে এ কথাও ঠিক যে কবিগুরু সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের অনেক বিষয়েই মত পার্থক্য পরে হয়েছিল—কাব্যাদর্শ, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি। 'নারায়ণ' পত্রিকাতে এ বিষয়ে বহু বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে। কবি তাঁর কোনো উত্তর দিয়েছেন বলে জানা নেই। 'নারায়ণে'ও তার কোনো লেখা কোনো দিন প্রকাশিত করেন নি। ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে কবি বলছেন—'চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আমার কলকাতায় যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চলছে।...এ কথা কেউ যেন মনে না করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে।' (চিঠিপত্র ২) কারণ কবি স্বীকার করেছেন যে 'চিত্তর সঙ্গে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল'। শ্রদ্ধা অর্পণ দেবীর লেখাতে (মাস্তুল চিত্তরঞ্জন) পড়ি যে 'বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নিবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়'। অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রদ্ধার প্রথম চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' যখন নবীন ও কাঁচাদের উৎসাহিত করছিলেন, আধমরাদের আঘাত দিয়ে বাঁচাতে তখন 'নারায়ণ' চেয়েছিল বাঙালীকে প্রথম তার নিজস্ব উত্তরাধিকারের প্রতি সচেতন করতে—Back to the Virgin Soil। 'নারায়ণ'এর প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটি স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের, চিত্তরঞ্জনের নিজের 'বাংলা কবিতার প্রাণধারা' বা 'বাংলার গীতিকবিতা' নারায়ণের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তাঁর প্রথম জীবনে 'বারবিলাসিনী' কবিতাটি যেমন তুমুল আন্দোলন তুলেছিল, নারায়ণের যুগে 'ভালিয়' গল্পটিও তেমনি। কবি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা 'অযুক্তিমৎ' হবে না। 'মালক'এর কথা পূর্বেই বলেছি, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মালা'—একত্রিশটি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন চিত্তরঞ্জনের মালককে কবিসভায় সাদর অভ্যর্থনাই আনিয়েছিলেন—তাঁর প্রশস্তিতে 'অসামান্য' বলেই এই কবিতাগুলিকে বরণ করা হয়েছে—আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে কাব্যাদর্শের নূতন সীমার ও সীমানার এই ধরনের romantic extravaganza ভাবাবেগসমৃদ্ধ হলেও, সংশয়ে জালায় তীক্ষ্ণ অনুভবে অনুপ্রাণিত হলেও, জীবনযন্ত্রণার প্রকৃতরূপ ফুটিয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। চিত্তরঞ্জন সুইনবার্ণের প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন কিন্তু তার অস্তরে আর একটি গভীরতর স্বয়ং স্রষ্টা ছিল—সেটিকে বলা যেতে পারে—Thirst for the infinite—নেতি নয়, ইতিয়ং স্বয়ং, একটা গভীর সর্বাস্তিবাদের ছায়া, সংশয়, সন্দেহ, বিতর্ক পেরিয়ে—আজকের কিয়র্কেগার্ড, জ'্যাপল সাত্তের বা কামুর অস্তিবাদ নয়—ভারতবর্ষের

নিজস্ব ভাষা—আছেন, তিনি আছেন, আকাশে বাতাসে, মানুষের মনে, সমাজের কল্যাণে, বিবর্তনে, যুদ্ধে বিগ্রহে, সর্বত্র, সর্বগ, শিবময় হয়ে—ইনিই নরের অগ্নি বা নারায়ণ। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘মালা’তে সেই প্রশান্ত প্রত্যয়ের স্বর বেজে উঠেছে, প্রেমের প্রদীপ তিনি জ্বল দিয়েছেন বাতাসনে আত্মনিবেদনের মাঝে, যার সম্পূর্ণ মূর্তি সাগর সঙ্গীতে—

আমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞী—বাজাও আমারে দিবস রজনী ভরি আলোকে আধারে।
এই সাগর সঙ্গীতেই মহাপ্রকৃতিকে ডেকে কবি বলছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘আমারে কর তোমার বীণা, লহগো লহ তুলে’।

চিন্তরঞ্জন যখন বলেন—

আজিকে পাতিয়া কান শুনেছি তোমার গান
হে অর্ঘব আলো ঘেরা প্রভাতের মাঝে।
একি কথা, একি স্বর প্রাণ মোর ভরপুর
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে।

এখানে সমুদ্রের মতই একটা গভীরতা ও বিশ্বাসের ছন্দ পাই।

‘হে মোর আজন্ম সখা, কাণারী আমার আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।’

শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদে এটি পরিবর্তিত হয়েছে একটি সন্ধানী সাধকের আকুলতার—

Pilot Eternal, friend unknown embraced

O ! take me to thy shoreless self at last.

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে আমরা এই চিন্তরঞ্জনকে ভুলেছি, তিনি কি শুধু সরণিতে, সদনে না মর্মর মূর্তিতে।
এই তো ধ্যানী চিন্তরঞ্জনের চিন্তসাধনা।

বিদ্যায় বিহীন নিশা অশনি বরজে ছিন্নভিন্ন বন্ধে তব মরণ গরজে।
উন্নত তরঙ্গে তব অমৃত বর্ণিনী বিস্তারি অসংখ্যের ফণা অনন্ত বদ্বিনী।
ঘন ঘোর ঝঞ্জা বায়ু আধার পরশে ভীষণ ভৈরব এ কি প্রলয় বরষে।

তখন কবি তাকে ডাকছেন—

‘এস তবে মৃত্যু রূপে ওগো সিকুরাজ আবরিত বন্ধ মাঝে তুমি রবে আজ।’

শ্রীঅরবিন্দ চিন্তরঞ্জনের ‘সাগর সঙ্গীত’এর অনুবাদ করেছিলেন।

এ কথা প্রায় সাহিত্যিক মহলে অনেকেই জানেন, কিন্তু স্বয়ং চিন্তরঞ্জনও এর একটি অনুবাদ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের (Collected Poems and Plays vol. ii published by Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1949) সংকলনে এটি সংগৃহীত আছে। কিন্তু মাত্রাজের গণেশ এণ্ড কোংও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯২৩ সালে চিন্তরঞ্জন ও শ্রীঅরবিন্দের যুগ্ম নামে। ১৯৫৯ সালে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোংও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত একটি ইংরাজি অনুবাদের কিছু অংশ বা পাণ্ডুলিপিও আমাকে দেখিয়েছেন শ্রীযুক্ত গুহরায় (তার দাদা ছিলেন আসামের উকীল এবং এক সময়ে দেশবন্ধু-গুজ চিন্তরঞ্জনের গৃহলিখক)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে

দেশবন্ধু নিজের অমৃতবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে এবং শ্রীঅরবিন্দ দেশবন্ধুর ভাব ও ভাষা রেখে কাব্যটিকে ইংরাজিতে নূতন করে অমৃতবাদ করেছিলেন—

শ্রীঅরবিন্দ কৃত অমৃতবাদ (পৃ: ২৪২ Collected Poems and Plays)

O thou unhopd for elusive wonder of the skies
Stand still one moment ! I will lead thee and bind
With music to the chambers of my mind
Behold how calm today this sea before me lies
And quivering with what tremulous heart of dreams
In the pale glimmer of the faint moon-beams.

‘O thou unhopd, O wondrous wanton of the skies’ এই পাঠও আমি দেখেছি। তবে শ্রীঅরবিন্দের জীবিতকালে ১৯৪২ সালে অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত ‘Songs of the Sea’ই প্রামাণিক এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বা চিত্তরঞ্জন ছাড়া জে. এ. চ্যাপম্যানও এর একটি অমৃতবাদ প্রকাশ করেন।

অমৃত অমৃতবাদ—

Unhopd for, wondrous one, ever elusive,
Wait awhile that I weave thee in my song
The calm sea lapped in dreams
Trembles today in the pale light of the moon.

আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে যে কবি মনীবী বাস করেন, তিনিই যুগে যুগে প্রকাশবান হন ব্যক্তি মানসের মধ্য দিয়ে—বাক্যের, ছন্দের, ভঙ্গির নানা ইঙ্গিতে। কবির হৃদয় মনের বীণায়ন্ত্রী অড়ময় নয়—এ হচ্ছে প্রাণবান—এর স্বর এগিয়ে চলেছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে—একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হয়, সে কোথাও স্থির হয়ে নেই, কোথাও গিয়ে সে থামে না, সে সাগরতরঙ্গের মতো তুলবে নাচবে, চলবে অভিসারে। কবির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নরূপিনী আছেন তারই প্রেরণায় যন্ত্র উচ্চারণ করে চলেন রূপকার— ‘কোন পূজা লাগি বল এত আয়োজন।’

কেন ? কেন ?—কোন বাস্তবের জন্ত, কোন দায়িত্বের জন্ত। এ হচ্ছে মানুষের চিরন্তন কান্না, সে দেখতে চায়, সে বুঝতে চায়, সে জানতে চায়। এই তার অন্তর্গত সংকল্পের ধারা—সেইজন্ত সে ছোটো জগৎগ্রাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু যে—সে বলে দেখা দাও, দাও—শ্রীঅরবিন্দ তাই বললেন—Vision is the characteristic power of the poet, as is the discriminative thought the gift of the philosopher and analytic observation the natural gift of the scientist—কবি করেন দর্শন, দার্শনিক করেন বিচার আর বিজ্ঞানী করেন বিশ্লেষণ—পরিপূর্ণ সত্যের এই ত্রিকায় মূর্তি। তাই মাটিতে জীবন আরম্ভ যেমন, আকাশের অনন্তে তেমনি তার পরিসমাপ্তি। পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে কেউ যদি সূর্যকে দেখে সে দর্শন সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু যে সূর্যের আলোকে পৃথিবীকে দর্শন করে তার দর্শন সত্যতর, আর পৃথিবীর অল্পপরমাণুতে যে সূর্যের তেজস্ক্রিয়াকে অমৃতভব করে তার দর্শন সত্যতর।

- সাধারণতঃ এই ধরনের কাব্যপ্রচেষ্টাকে বলা হয় রোমান্টিক ধর্মী, বলা হয় এ হচ্ছে এক ধরনের উচ্ছ্বাস যা যুগযুগান্তর সঙ্গ যুক্ত নয়, hard hitting নয়, নেই এতে pragmatic approach, objective assessment বা subjective idolisation। আজ তো ideologyকেই out dated করে দেওয়া হচ্ছে, ধর্মে কাব্যে শিল্পে শুধু নয়, প্রাত্যহিক জীবনে। The greatest poets are those who had a large and powerful interpretative and intuitive vision and whose poetry arises out of the revelatory utterance of it. তাঁর স্থবিখ্যাত The Future Poetry গ্রন্থে কবিতাকে মন্ত্রের পর্যায়েই ফেলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী কবি চিন্তরঞ্জন প্রাচীন যন্ত্রপ্রভা কবিঋষিদের পথই অনুসরণ করেছিলেন। কবি শুধু craftsman নন বা জীবন চিত্রকার নন, তিনি গুহ্যঃ স্নেহ রীতি রেখা নিয়েই মাথা ঘামান না—তাঁকে মনে রাখতে হবে বৃহত্তর জীবনের অন্ত আত্মপূহা, মহত্তর প্রকাশের অন্ত ব্যাকুলতা, নব প্রসববেদনার কায়া। কবি চিন্তরঞ্জন এই দিক দিয়ে সার্থক। 'অন্তর্যামী'তে এরই পরিচয় পাই বৃহত্তর, মহত্তর সন্ধানে যাত্রা, যিনি সাথী, যিনি সাক্ষী—

সকল গণনা মাঝে তোমারেই গুণি সকল গানের মাঝে তব গান গুনি।

একে idealistic longing বা অস্তুর আকৃতি বললেই শেষ কথা বলা হ'ল না। এখানে আত্মসমর্পণের স্বরের সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের বীজও আছে।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য পত্রিকা 'নারায়ণ'এর প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও প্রকাশ মহিমার কথা সদাই মনে পড়ে। তার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদ্বর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে প্রিয়ম্বদা দেবী, স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কিরণশংকর রায় (তিনি 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর পিলায়েদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন), হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতি ছিলেন। গোবিন্দ দাসের কথা পূর্বেই বলেছি। তাঁর নূতন ধরনের দশাবতার স্তোত্রের 'নারায়ণ' নামে কবিতাটি সত্যিই স্মরণীয়। 'নারায়ণ' প্রকাশিত বঙ্কিম সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য—চিন্তরঞ্জনের কথায়—বঙ্কিমচন্দ্র একটি ব্যক্তি নহেন একটি যুগ।

চিন্তরঞ্জনের জীবনের সবচেয়ে অর্থকরী (দুই দিক দিয়ে) দিকটির কথা এখনও অনুপস্থাপিত রয়ে গেছে, সেটি জীবিকার দিক বটে কিন্তু সেখানেও জীবনদেবতার আশ্রান তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। বিলাতে থাকা কালেই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ, পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা, দাদাভাই নৌরজীর পার্লামেন্ট সদস্য অভিযানে দুজনকেই দেখি। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সিন্‌কিন মূভমেণ্টের ডক্টর। দেশে ফিরে ব্যারিষ্টারী করবার সময় প্রথম প্রথম চিন্তরঞ্জনের পশার না জমলেও, স্বদেশী আন্দোলন ও তার পরে কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক মর্দম্যায় শুধু তাঁর আইন জ্ঞান, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিচার তর্কশক্তি, বক্তৃতার ক্ষমতাই প্রকাশ পায় না, একজন সং, নির্লোভ, স্বদেশ-হিতব্রত, মহাপ্রাণ মানুষ হিসাবেও তিনি প্রতিভাত হ'ন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁর সব পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ মর্দম্যায় কথা না বললে তাঁর জীবনের একটা সক্রিয় অধ্যায়ের কথা অসুস্থ থেকে যায়। তখন তথাকথিত কংগ্রেস পলিটিক্সে রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একাধিপত্য ফিরোজশাহ মেহেতার, দাদাভাই নৌরজীর, গোপালকৃষ্ণ গোখলের। ওদিকে আছেন লাল-বাল-পাল অর্থাৎ লাল। লালপত রায়, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল (যাকে Sir Valentine Chirol

বলতেন—Stormy petrel of Indian politics)। এমন সময় কলকাতার এলেন শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে—এ আগমন নয়, এ হ'ল আবির্ভাব। সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্, যুগান্তর—কর্মযোগিন্ ধর্মের যুগ আরম্ভ হ'ল। বাংলার মাটি, বাংলার জল উথলে উঠলো ভাগিরথী পদ্মায় মেঘনার ত্রিস্রোতায় ত্রয়পুত্রে ভৈরবে আত্মীয়ীতে। কবি, কর্মী, বাগ্মী, উকীল, ব্যারিষ্টার সবাই চলেছেন সেই 'সবার পরশে পবিত্র করা' তীর্থ জলে স্নান করতে। রণভেরী বেজে উঠলো। বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে রাজরোষ পড়লো—চিত্তরঞ্জন চললেন সেই মর্কটমার ভার নিয়ে। বিপিনচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—I honestly consider this prosecution of Bande Matarm to be unjust and injurious—বিপিনচন্দ্র কিছু বললেন না সাক্ষ্য দিতে গিয়ে—প্রমাণের অভাবে শ্রীঅরবিন্দ পেলেন মুক্তি আর আদালত অবমাননার জন্য বিপিনচন্দ্রের ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হ'ল। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। বন্দেমাতরম মর্কটমায় ছাড়া পাওয়ার পর ১২ জুলাই টিউটে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেন—আপনি আমাদের বড় ফাঁকি দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজিতে জবাব দেন—Not for long। এই সাক্ষাতের একটি সুন্দর ছবি আমরা পাই শ্রদ্ধের চাকু দস্তের কাছে—'অরবিন্দ ছাড়া পাওয়ার দিনটাই বাদে একদিন দুপুর বেলা আমরা—শ্রীঅরবিন্দ, ঠর মেজদা, স্ববোধ, নীরদ ও আমি খুব হৈ হৈ করছি এমন সময় দরওয়ান এসে বললে—রবিবাবু এসেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি সামনের হলে বেরিয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ দুবাহু প্রসারিত করে অরবিন্দকে বুকে টেনে নিলেন, কবির চোখ দুটি ছলছল করছিল।' রবীন্দ্রনাথকে অরবিন্দ যে বলেছিলেন 'Not for long' তা শীঘ্রই সত্য হয়ে উঠলো। শ্রীঅরবিন্দ আবার ধৃত হলেন, বিখ্যাত Alipere Conspiracy Case-এ। তার ইতিহাস সবারই জানা। কিন্তু তারই মধ্যে চিত্তরঞ্জন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। জজের আদালতে এই মামলার বিচার চলেছিল ১২৬ দিন, জেরা করা হয়েছিল ২০০ সাক্ষীকে, আটচল্লিশদিন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সরকার পক্ষের কৌশলি নটনের বাক যুদ্ধ চলেছিল, চারহাজার Exhibit দাখিল হয় যার মধ্যে পাঁচশত বোমা বিস্ফোরক ছিল এবং এই বিচারে তিনি শুধু প্রমাণাভাবে সন্দেহের স্থযোগে নয়, সম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের আবেগদীপ্ত সে ভাষণ, সে অপূর্ব উক্তি আজও দেশের লোক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে—My appeal to you is this, that long after the controversy will be hushed in Silence, long after this turmoil and the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and reechoed, not only in India but across distant seas and lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of History.' আমরা কল্পনা করতে পারি, সেদিনের আদালতে উচ্চাসনে উপবিষ্ট বিচারপতি থেকে জুড়ি, এসেসর, উকীল, আমলা, পিয়াদা, সাক্ষী, জনতা কিভাবে অভিভূত হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণে। সব কোলাহল যখন স্তব্ধ, সব আন্দোলন বাদানুবাদ যখন নিঃশব্দ তখন কবি চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের মাধ্যমে ইতিহাসের এক হৃদয়-যথিত বাণী উচ্চারণ করলেন। নিজের

মধ্যে সেই অগ্নিকণা, সেই ভাবপ্রবণতা, সেই চিন্তার আবেদন ছিল বলেই চিন্তনরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দের ও অন্য রাজদ্রোহীদের মকদ্দমায় একাগ্রচিত্তে, নিজের স্বার্থ বা অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে এই ধরনের অনন্ত সাধারণ আবেদন করতে পেরেছিলেন মহাকালের দরবারে, ইতিহাসের বৃহৎ বিচারশালায়, যেন পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্রের উদ্ভাস্ত মঙ্গপাঠ করছেন—অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ—সেই অগ্রণীকে যিনি পুরোডাগে স্থিত, তাঁকে আবাহন জানাচ্ছেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব হিসাবে তাঁর নাম তখন থেকেই সুপ্রচলিত—শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরেও—দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুইয়েতেই—দিল্লী চলেছেন, ডুমরাও চলেছেন, ঢাকায় চলেছেন, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহে আলিপুর বড়োয়ামামলায় আপীলের প্রসঙ্গে চিফ জাস্টিস বিশেষ করে লেখেন—I desire in particular to place on record my high appreciation of the manner in which the case was presented to the Court by its leading advocate Mr. C. R. Das. স্তার লরেন্স জেনকিন্সের এই প্রশস্তি তাঁর ব্যাবিষ্টারীজীবনের সাক্ষ্যের ইঙ্গিত সূচনা করে। তাঁর বহু মকদ্দমায় প্রতিপক্ষ নটন সাহেব বলেছিলেন—His was a household name as an eminent defence counsel. Among Indian lawyers he more than any one else excelled in political cases....But one cannot help asking oneself what would have been Aurobindo's fate if here had been no C. R. Das to work free for him.

এর পরের অধ্যায়েই দেখি রাজনীতিজ্ঞ চিন্তনরঞ্জনকে যিনি ক্রমশঃ ত্যাগী চিন্তনরঞ্জে পর্যবসিত হলেন। এই রূপান্তর ও গোত্রান্তরও যেন একটি চলচ্চিত্রের শেষ দৃষ্ট—যবনিকা পাতের পূর্বে। ১৯১৭ সাল থেকেই চিন্তনরঞ্জনকে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় হতে দেখি। এর অর্থ এই নয় যে তিনি এর পূর্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি। ১৯০৬ সাল থেকেই কংগ্রেসে নানা ভাঙাগড়া ও ওঠাপড়ার ইতিহাসের কথা আমরা জানি, যা থেকে ‘মডারেট’ ও চরমপন্থীদের জন্ম—স্বরাটের ও ভাঙনের কথাও শুনি, অরবিন্দ তিলক—তখনই তাঁরা বলেছেন—

এসেছে আদেশ,

বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হ'ল শেষ।

আর পুরোনো সঙ্কয় নিয়ে শুধু ফিরে ফিরে বেচাকেনা চলে না—তবু তা, না, না করেই এবং যুদ্ধ বাধার দরুণই কংগ্রেস নীতি আবেদন-নিবেদনের খালা ও ডেপুটেশনের পালা শেষে মতেজ, তীক্ষ্ণ বা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। ১৯১৭ সাল থেকেই আবার সেই অস্তুর্দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—বিলাতে ইংরাজ সরকারও ভারতবর্ষে নূতন ধরনের শাসন পদ্ধতি চালু করবার জন্য উত্তোঙ্গ হন—মণ্টফোর্ড রিফর্মের কথা সবাই শুনেছেন, কুপল্যাওর প্রস্তাবাবলীর কথাও। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা ঐ শাসন সংস্কার গ্রহণে উৎসাহী—তখন চিন্তনরঞ্জনের কণ্ঠকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—No leader is any thing. The strength belongs to the nation. কলকাতায় কংগ্রেস, মিসেস বৈশাখকে নিয়ে আন্দোলন, তাঁর হোমরুল মুভমেন্ট, রাউলাট কমিটির রিপোর্ট, গান্ধীজীর আবির্ভাব, জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁর নিন্দাসূচক তুর্য়ধ্বনি ও উপাধিত্যাগ, ১৯১৯ সালের সত্যগ্রহ, বম্বেতে বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন, দিল্লীতে কংগ্রেস—এইসব ঘটনার পর ঘটনা চিন্তনরঞ্জনকে ভারত চিত্তহারায়েই এগিয়ে দিলে—সর্বভারতীয় নেতা।

হিসাবে—এর মধ্যে রোলট আইন এসেছে, হয়েছে সত্যগ্রহ আন্দোলন এবং ভারতীয় বর্ষভূতা যার অল্পসন্ধান কার্ণে দ্বিবিজয়ী ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনর স্বর্ণপ্রসবিনী সময় দিতে হয়েছিল যালের পর মাস। তার পর বঙ্গো কলকাতার বিশেষ অধিবেশন—দিকে দিকে রোল উঠলো গান্ধীজী, গান্ধীজী। কিন্তু চিত্তরঞ্জন পরে গান্ধীপন্থী হলেও সম্পূর্ণ তাঁর পন্থা কোনো দিনই যেনে নেন নি—I accept non-co-operation as a political creed but I differ with the Mahatma as to the means of achieving it. যদি বাগচি মহাশয়ের কাছে শুনি যে কলকাতা কংগ্রেসে তিনি গান্ধীজীকে মিষ্টার গান্ধী বললে জনতা থেকে যখন আপত্তি ওঠে তখন চিত্তরঞ্জন গর্জন করে বলেন—Why Mahatma? Unless I realize the man as such, I am not going to utter the word Mahatma like a bird taught. তিনি নতুন শাসনতন্ত্রে কাউন্সিল বর্জনের বিপক্ষে সেদিনও ছিলেন, পরেও তার বিরোধিতা করে স্বরাজ্য পার্টি গঠনে সমর্থ হন। কলকাতার ১৯২০ থেকে আরম্ভ করে যে উন্নাদনা, জনজাগৃতি ও চাঞ্চল্যের শুরু হয় তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তার তরুণ সহকারী সুভাষচন্দ্র। সঙ্গে অবশ্য আরো অনেকে ছিলেন—স্বরণীয় ও বরণীয় তাঁরা, যেমন বিগ ফাইভের দল—পঞ্চপাণ্ডব, তা ছাড়া ছিলেন অপরাজের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং সাহিত্যসেবী আরো অনেকে। আমরা তখন ছাত্র, সে সব দিনের দুর্জয় চেতনা আজও অল্পপ্রাণিত করে আমাদের, বিশেষ করে যখন ভাবি যে বাংলার আর দুই মনীষী তেজস্বী দ্বিপাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাগুরু আশুতোষ দাঁড়িয়ে ছিলেন অস্ত্রদিকে, যাকে আজকের ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ (hungry ও angry) তরুণ-তরুণীরা বলবেন—এস্টাবলিশমেন্ট। আজ যারা নানা ভাবে উগ্রপন্থী, নানা স্লোগান ব্যবহার করেন, উদ্বেজনার অগ্নিকাণ্ডে নিজেদের এগিয়ে দেন তাঁদের ভ্যালু-জাজমেন্ট বা ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে একমত হয়েও এই কথা শুধু করজোড়ে নিবেদন করবার আছে যে আমরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে, বিচ্ছিন্নতা বোধে, হতাশায় ডুবে গেলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয় না—এটি হচ্ছে চঞ্চলা নদীর মতো—এগিয়ে চল, লাফিয়ে চল, আবার লুকিয়ে পড়ে বালুচরের মধ্যে, তার ফলস্বরূপ কিছু অব্যাহত, জাতির প্রাণরসের জোগান দেয়—এই ধারাবাহিকতা বেয়েই এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন—দিয়ে গেছেন তাঁর অমের আশা, অপরাপ রূপকম্প, দেশের ও দশের জন্ত ভালোবাসা। যুগ বদলাক, কাল সীমিত হোক, নতুন মানদণ্ডে বিচার হোক, কি আমার প্রের, কি আমার প্রের, কোন পথ শ্রেষ্ঠ, কোন পথ বাহ্য, আমার পূর্ব-স্বরীদের কাছে কতটুকু নেবো, তাঁদের স্মৃতিতে কতটুকু দেবো, তবু এই চলমান ধারার প্রত্যেকটি বীরকে প্রণাম জানিয়ে যাবো, এই তো প্রত্যেক সদাচারী মানবায়নবীর প্রার্থনা। সনাতন সেতমাহর উত্তম স্তাং পুনর্নব। যিনি সনাতন তিনিই অস্ত পুনর্নব। যুগ বদলায়, যুগযজ্ঞার মান বদলায়, কিন্তু মানুষ বদলায় না ভালোবাসার ‘হার্ডকোর’ থেকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের শেষ পরিচয়ের সীমা এইখানে ঘন্থে নয়, আঘাতে নয়, ব্যাঘাতে নয়—একে রোমান্টিক এক্সট্রাড্যাগাঞ্জা বলি, প্রাচীন পন্থী জনসংযোগ বলি, ওই হচ্ছে আসল আইডেন্টিফিকেশন। এই দৃষ্টর প্রাণবন্ত প্রেমই ছিল চিত্তরঞ্জনর।

চিত্তরঞ্জনর সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যায় যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের মতো চেয়েছিলেন এমন এক ভারতবর্ষের সূচনা করতে যা নিজের দীপ্তিতে হবে দীপ্তিমান পরের দার করা কথায় সাজানো নয়, পশ্চিমের আদর্শে অল্পপ্রাণিত নয় শুধু ‘Vain and sycophantic mimicry of an alien race’ নয় (কথাগুলি লর্ড রোনাল্ডশের The Heart of Arjavartha থেকে নেওয়া পৃ ১৫৩) বা যা আনন্দকুমার স্বামী বলেছেন

শিক্ষিতজনরা এই বিদ্রোহকে মনে করতো—‘is a struggle for spiritual and mental freedom from the domination of an alien ideal—not so much the material as the moral and spiritual subjection of Indian civilisation that in the end impoverishes humanity (Preface to Essays in National Idealism). সেইজন্মই লর্ড রোনাল্ডশে বলেন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে Panegyries of the past—(এটা রোলট কমিটিও বলেছেন) যেমন গীতা, আনন্দমঠ, স্বামীজীর কিছু লেখা যা তখনকান দিনের বিপ্লবীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো—একটা বড় অংশ ছিল। সমালোচকরা ভুল করেন যে সব যুগেই এটার প্রয়োজন আছে জাতীয় চেতনাকে সম্পূর্ণ বুঝতে ও যুগোপযুগী ভাবে উদ্ভূত করতে।

নাগপুর কংগ্রেসের পর ব্যারিষ্টার পঞ্চাশহাজারী চিন্তরঞ্জন, নেমে এলেন পথে। ভারতবর্ষ ত্যাগের মূল্য দিয়েছে চিরকাল—এ যেন আর এক নদের নিমাই সর্বস্ব ত্যাগ করলেন আর এক রাজপুত্র কষ্টা পরলেন। সাতকড়িপতি রায়েব ‘দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বৎসর’ একটি যজ্ঞ সম্ভব মূর্তির পটভূমিকা এঁকে দেয়, যিনি ত্যাগরাজ। ১৯১১, ১৮ই জামুয়ারী তাঁর নব নামকরণ হল—দেশবন্ধু। দিয়েছিলেন তারই গুণমুগ্ধ এক বন্ধু, পরে নায়ক ও ‘সারভেট’ এটিকে সাদরে গ্রহণ করে এবং পরে মুখে মুখে এমন ভাবে প্রচলিত হয় যে ‘দেশবন্ধু’ বললেই আমরা ও আশা করি আমাদের উত্তরপুরুষরা—কে তিনি, কি তিনি, বুঝতে পারবে। পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথই এটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অরবিন্দ সম্পর্কে। ‘দেশবন্ধু’ কথা আর একটি অর্থ চণ্ডাল—কিন্তু চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ কবিভক্তি পরায়ণ; শুনি দেশবন্ধু নাকি নিজেই বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি তো চণ্ডালই, পরাধীন ভারতে সবাই চণ্ডাল। বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে অরবিন্দের যুগ থেকেই চিন্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল—কত দিক দিয়ে যে এঁদের তিনি সাহায্য করেছেন তা বলা যায় না। সেদিন ভারতবর্ষে এসে মহারাজ জৈলোকানাথ চক্রবর্তী ঐশ্বর্য্য বাসন্তী দেবীর কাছে প্রণাম জানিয়ে সে কথা অসঙ্কোচে স্বীকার করে গেছেন। তিলক স্বরাজ্য ফাওর জন্ত অর্থ সংগ্রহ, চাঁদপুরের কুলী ধর্মঘট, প্রিন্স অব ওয়েলস আগমনে হরতাল আয়োজন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ, বাসন্তী দেবীকে লেখা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েব চিঠি (দেশবন্ধুর কারাদণ্ড সংবাদে), পরে কাউন্সিল ক্যাপচার প্রোগ্রাম, স্বরাজ্যাদল গঠন, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আইন সভায় বার বার সরকারের পরাজয়—সেদিন বাংলার চমকপ্রদ ঘটনাবলীর পরিচয় দেয়। গোপীনাথ সাহার প্রাণদণ্ড সম্পর্কে সিরাজগঞ্জের সভায় প্রস্তাব ও পরে লর্ড বারকেন হেডকে লক্ষ্য করে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে ফরিদপুর ভাষণ দেশবন্ধুর আর এক দিক। চিন্তরঞ্জন সম্বন্ধে আরো কত কথা অকথিত রইলো, আরো কত আখ্যান আছে তাঁর সম্বন্ধে, কিন্তু শেষ হুঁট কথার উল্লেখ না করে এই প্রবন্ধের শেষ করা যায় না। সেটির একটি হচ্ছে—তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাটি বাঙালী। ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণের প্রথমেই তিনি নিবেদন করলেন ‘আজ বাঙালীর মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহংকার তাহা আমার নাই। কিন্তু আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছি।’ চিন্তরঞ্জন এই ভাষণটির নাম দিয়েছিলেন—‘বাংলার কথা’। রাজনৈতিক মহাসভায় তিনি বাংলার কথা বললেন কেন—তার জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন—‘সমগ্র জীবনটাকে টুকরো টুকরো করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সাধনের স্বভাব বিরুদ্ধ……বাঙালীকে যে অমায়ুষ বলে সে আমার বাংলাকে

জানে না।...বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, বাঙালী—বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে...বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে।'

নজরুলের 'চিন্তনামা'র চারিটি লাইন স্মরণে আসছে—

তোমারে দেখিয়া কাহারে হৃদয়ে জাগেনিকে। সন্দেহ
হিন্দু বা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি—
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি।

শাস্তাত্ম্য ইণ্ডিয়ানালিজম সংক্ষেপে তিনি তাঁর মত উল্লেখ করেন। শিক্ষানীতির পরিবর্তনের কথাও বলেন। তাঁরই কথায়—

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে ?
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিল
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন
তোমার সঙ্গীতে তারে ফোটালে কেমন।
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল
বিচ্ছিন্ন আলোকে গন্ধে করিছে আকুল
সমস্ত জনম যেন আনন্দ রাগিনী
তব গীতে গুণে সিদ্ধ দিবস যামিনী।

মনে পড়ছে নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের কথা—I felt that I had found a leader and I meant to follow him. আমি আজ প্রস্তুত আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন—মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছু নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর (পত্রাবলী স্বভাষচন্দ্র বসু)। এই দেশবন্ধুকেই প্রণাম জানাই।

রামানুজের বিশিষ্টত্ববাদ

রমা চৌধুরী

রামানুজের জীবনী, সময় ও রচনাবলী

আম্মরি কেশবভট্ট ও কাস্তিমতীর পুত্র রামানুজ ১৩৮ শকাব্দ অথবা ১০১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মতভেদে তাঁর পিতার নাম কেশব সোমযাজী ও মাতার নাম ভূদেবী। তিনি প্রথমে যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত-শিক্ষা করেন। কিন্তু যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন বলে রামানুজ তাঁর শিক্ষায় অধিকদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। এই সময়ে একটি ঘটনায় রামানুজের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—‘তন্ত যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিপী’ (১-৬-৭)।

শঙ্কর তাঁর ছান্দোগ্য-ভাষ্যে ‘কপ্যাসং’ শব্দটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন—‘তন্ত যথা কপে: মর্কটশাস: কপ্যাস:। আসেকপবেশনার্থন্ত করণে ঘঞ, কপিপৃষ্ঠান্ত: যেনোপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ততেজস্বি এবমন্ত দেবস্তাক্ষিপী উপমিতোপমত্যাং ন হীনোপমা।’

অর্থাৎ কপি বা মর্কটের পৃষ্ঠাধভাগের মতো বক্রবর্গ যে পুণ্ডরীক, তাই মতো লোহিত তাঁর দুই চক্ষু। এ স্থলে মর্কটের পৃষ্ঠাধভাগের সঙ্গে পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের সঙ্গে চক্ষুদ্বয় উপমিত হয়েছে বলে তাদের নিকৃষ্টতা উপলক্ষিত হয় নি।

কিন্তু রামানুজ এই ব্যাখ্যার সন্তুষ্ট না হয়ে বলেন যে, যে কোনো প্রকারেই হোক, পরমপবিত্র পরমেশ্বরকে জঘন্য কপিপৃষ্ঠের সঙ্গে তুলিত করা ঘোরতর অগ্ৰায়—এবং গুরুর অহুরোধে তিনি ‘কপ্যাস্তং’ কথাটির একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দেন। সুদর্শন ভট্ট বিরচিত রামানুজ-ভাষ্যের প্রথ্যাত ‘ব্রহ্মপ্রকাশিকা টীকার’ (ব্রহ্মসূত্র-রামানুজ-ভাষ্য ১-১-২১ এবং শঙ্করভাষ্য ১-১-২০তে এই মন্তব্যটি আছে) সেই তিনটি ব্যাখ্যা আছে—(১) কং পিবতীতি কপি: আদিত্য:, তেন আশ্রিতে ক্ষিপাতে বিকাশতে ইতি কপ্যাসং। (২) কং পিবতীতি কপি: নালং, তস্মিন্ আন্তে ইতি কপ্যাসং। (৩) কং জলং তত্র আন্তে কপ্যাসং মলিনহম্।

অর্থাৎ ‘কপ্যাসং’ শব্দটির অর্থ হয় ‘সূর্য-বিকশিত’ বা প্রস্ফুটিত, নয় ‘নালহ’ বা অতি শোভন, নয় ‘জলহ’ এবং এই তিনটিই পুণ্ডরীকের বিশেষণ।

রামানুজের অপূর্ব বিদ্যাবস্তার বিষয় শুনে, সুবিখ্যাত পণ্ডিত যামুনাচার্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসাহিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রামানুজ সেখানে উপস্থিত হবার পূর্বেই যামুনাচার্য দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, রামানুজ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে আচার্যের তিনটি অঙ্গুলি আকৃঙ্কিত হয়ে আছে। প্রশ্ন ক’রে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর তিনটি আশা অপূর্ণ থাকতেই এই অবস্থা হয়েছে। রামানুজ সেই আশা পূর্ণ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করাতে সেই অঙ্গুলি তিনটিও স্বাভাবিক ধারণ করে। এই প্রতিজ্ঞানুসারে রামানুজ তাঁর প্রথ্যাত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ‘শ্রীভাষ্য’ রচনা করেন।

রামানুজ বিবাহিত হলেও গার্হস্থ্যশ্রম পরিত্যাগ ক’রে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং নিজেকে ‘যতিরাজ’ এই নামে পরিচিত হন। কথিত আছে যে, তিনি দেশবিশেষ পরিভ্রমণ ক’রে জ্ঞানবলে দ্বিবিজয় করেন।

রামানুজের প্রখ্যাততম গ্রন্থ তাঁর অপূর্ব ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীভাষ্য'। প্রবাদ এই যে, দিগ্বিজয় বাপদেশে রামানুজ কানীধামে উপস্থিত হলে, স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাঁর 'কপ্যাসং' শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের নাম দেন 'শ্রীভাষ্য'। 'শ্রীভাষ্য'এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে অদ্বৈতমতবাদের বিস্তৃত বিবরণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ খণ্ডন আছে। এই ভাষ্যটিই বৈষ্ণব-বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বজনমান্য ভাষ্য, এবং এরই জন্য রামানুজ শঙ্করের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমালোচক রূপে যুগে যুগে বন্দিত হচ্চেন।

'বেদান্তসার' ও 'বেদান্তদীপ'ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। 'বেদান্তসারে' অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ সবল ভাবে সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা আছে এবং অদ্বৈতবাদখণ্ডনের কোনোরূপ প্রচেষ্টা নেই। 'বেদান্তদীপ' অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তিনি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য', 'বেদার্থসংগ্রহ', 'নিতাক্রম বা নিত্যগ্রন্থ' এবং 'গণ্ডত্রয়' (শরণাগতি-গণ্ড, বৈকুণ্ঠ-গণ্ড ও শ্রীরঙ্গ-গণ্ড) রচনা করেন।

রামানুজের মতবাদ

রামানুজের মতবাদের দুটি প্রধান দিক—গঠনমূলক (constructive) বা স্বমত-স্থাপন এবং ধ্বংসমূলক (destructive) বা পরমত অর্থাৎ প্রধানতঃ অদ্বৈতমতখণ্ডন। প্রথম দিক থেকে রামানুজের মতবাদ বহুলাংশে নিশ্চার্কের মতবাদের অনুরূপ বলে এই শেষোক্ত মতবাদ আলোচনা কালেই সে বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করা হবে এবং উভয়ের বৈসাদৃশ্যও দর্শিত হবে। কিন্তু নিশ্চার্ক-বেদান্তে রামানুজ-বেদান্তের স্পষ্ট অদ্বৈতমতখণ্ডন প্রচেষ্টা একেবারেই নেই। সেজন্য রামানুজের স্বমত সম্বন্ধে এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত এবং অদ্বৈতমতখণ্ডন বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণী দান করা হবে।

ব্রহ্ম

রামানুজের মতে ব্রহ্ম সর্বোচ্চ তত্ত্ব, সন্দেহ নেই; কিন্তু একমাত্র তত্ত্ব নয়। রামানুজ ত্রিতত্ত্ববাদী—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, চিৎ বা জীব এবং অচিৎ বা জগৎ—এই তিনটি তত্ত্ব। ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ সমভাবে সত্য। তা হলে ব্রহ্মকে 'সর্বোচ্চ' বা 'সর্বশ্রেষ্ঠ' তত্ত্ব বলা যায় কিরূপে? তার উত্তর এই যে, এক্ষেত্রে 'সর্বোচ্চ' বা 'সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটি একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। সাধারণতঃ 'সর্বোচ্চ' শব্দ দ্বারা আমরা ক্রমবর্ধমান পরিমাণ বুঝি। যেমন আমরা বলি—উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম বা সর্বোচ্চ। বৃক্ষটি উচ্চ, অট্টালিকাটি উচ্চতর, পর্বতটি উচ্চতম। এ স্থলে একই গুণ 'উচ্চতা' বৃক্ষে যে পরিমাণে আছে, অট্টালিকার তার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং পর্বতে তার অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আছে। এ রূপে 'উচ্চতার' দিক থেকে বৃক্ষ, অট্টালিকা ও পর্বতের মধ্যে গুণগত কোনো ভেদ নেই—যেহেতু একই গুণ 'উচ্চতা' তিনটির মধ্যেই আছে—কিন্তু পরিমাণগত ভেদ আছে, যেহেতু সেই একই গুণ 'উচ্চতা' তিনটির মধ্যেই বিভিন্ন পরিমাণে আছে।

একই ভাবে ব্রহ্মকে 'সর্বোচ্চ' তত্ত্ব বা সত্য বললে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, 'সত্যতা' গুণটি ব্রহ্মে অধিক পরিমাণে, জীবজগতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে নিহিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সমভাবে সত্য, জীবজগৎ ব্রহ্মের অপেক্ষা অল্প সত্য নয়।

এ রূপে বৈদান্তিকগণ সত্যের পরিমাণভেদ (Degrees of Reality) স্বীকার করেন না। কিন্তু একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকেরা সত্যের পরিমাণভেদ স্বীকার না করলেও প্রকারভেদ স্বীকার করেন—কারণ

তাদের মতে প্রকারের দিক থেকে তিনটি সত্য—ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। একত্ববাদী বৈদান্তিকেরা অবশ্য সত্যের পরিমাণভেদ বা প্রকারভেদ কোনোটাই স্বীকার করেন না, কারণ তাঁদের মতে প্রকারের দিক থেকে সত্য একটিই—ব্রহ্ম। যাই হোক রামানুজ প্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকদের মতে ব্রহ্মকে ‘সর্বোচ্চ’ তত্ত্ব বা সত্য বলার অর্থ কেবল এই যে, জীবজগৎ ব্রহ্মের কার্য, অংশ, গুণ ও দেহরূপে ব্রহ্মের ন্যায় সমান সত্য হলেও সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মানুগত, ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মাধীন।

ব্রহ্ম এক

রামানুজের মতেও ব্রহ্ম ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ কারণ জীবজগতের সত্যতা ও নিত্যতা তাঁর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের হানি ঘটাতে পারে না। জীবজগৎ ব্রহ্মানুগত ও ব্রহ্মাধীনরূপেই সত্য, ব্রহ্মের বাহিরে বা ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে নয়। বস্তুতঃ সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগতভেদ আছে—জীবজগৎ তাঁর স্বগতভেদ। সেজন্য তারা ব্রহ্মের ন্যায় সত্য হলেও ব্রহ্মের ‘দ্বিতীয়’ নয়। যেমন পত্রপুষ্পাদি বৃক্ষের স্বগতভেদ, কিন্তু তা হলেও তাদের দ্বিতীয় বৃক্ষ ত বলা যায় না—সেজন্য অনায়াসে বলা চলে যে, উদ্ভানে বৃক্ষটি ‘একমেবাদ্বিতীয়’ বা সে স্থানে কেবল একটিমাত্র বৃক্ষই আছে।

ব্রহ্ম সর্বিশেষ

এ রূপে রামানুজের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ নন সর্বিশেষ।

ব্রহ্ম সগুণ

পুনরায় ব্রহ্ম নিগুণ নন, সগুণ। অবশ্য আমরা সগুণ-শ্রুতি ও নিগুণ-শ্রুতি—উভয় প্রকার শ্রুতিই পাঠ। যেমন—‘পরাস্মৈ শক্তির্বিবিধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকৌ জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।’ (শ্বেতাশ্বতর ৬-৮)।

‘এষ আত্মাপহতপাপ্না বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যাকামঃ সত্যাসংকল্পঃ।’ (ছান্দোগ্য ৮-১-৫)। ‘সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ’ (শ্বেতাশ্বতর ৬-১১)।

এ স্থলে সগুণ-শ্রুতি ও নিগুণ-শ্রুতি যথাক্রমে এই জোড়না করে যে, ব্রহ্ম এক পক্ষে অনন্ত কল্যাণগুণের আকর এবং অন্যপক্ষে সমস্ত হেয়গুণবিবর্জিত। রামানুজ তাঁর ‘শ্রীভাগ্য’এ ‘ব্রহ্ম’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিচ্ছেন—‘ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরন্ত-নিখিল-দোষোহনবধিকাতিশয়াসংখ্যায়-কল্যাণ-গুণ-গণঃ পূরুষোত্তমোহভিধীয়তে ; সর্বত্র বৃহৎ-গুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ বৃহৎ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রান-বধিকাতিশয়ঃ-সোহন্তমুখ্যোহর্থঃ, স চ সর্বেশ্বর এব, অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ।’ (১-১-১ পৃঃ ৫)

অর্থাৎ যিনি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ

ব্রহ্মের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ মুখ্য এবং সেজন্য তাঁকে সংক্ষেপে ‘সচ্চিদানন্দ’ রূপে অভিহিত করা হয়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ একাধারে ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ—ব্রহ্ম কেবল সৎ নন, সত্যবান ; কেবল জ্ঞান নন, জ্ঞাতা ; কেবল আনন্দ নন, আনন্দময়। সৎ ও সত্যবান রূপে তিনি স্বয়ং নিত্য ও সকল বস্তুর অস্তিত্বের কারণ ; জ্ঞান ও জ্ঞাতা রূপে তিনি স্বয়ং সর্বজ্ঞ ও সকল জীবের জ্ঞানদাতা ; আনন্দ ও আনন্দময়রূপে তিনি স্বয়ং আনন্দাকর ও সকলের আনন্দের কারণ।

ব্রহ্মের বিবিধ গুণাবলী

ব্রহ্মের গুণাবলী দু'প্রকারের : ভীষণ ও মধুর। তাঁর ভীষণ গুণের উল্লেখ ক'রে রামানুজ 'ত্রীভাণ্ডে' বলছেন—'যহক্ৰম্ বেদান্ত-বাক্যানি নিবিশেষ-জ্ঞানৈকরস-বস্তু-মাত্র-প্রতিপাদনপরানি, 'সদেব সৌম্যোদয়গ্রামসীং' ইত্যোবমাদীনীতি, তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদন-মুখেন সচ্ছন্দবাচ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো জগত্পাদনং, জগন্নিমিত্তং সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পঃ, সর্বাস্তকরঃ, সর্বাধারতা, সর্বনিয়মননিত্যাগনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং ক্লেশস্ত জগতস্তদাত্মকতাক প্রতিপাদ্য, এবজ্জুতব্রহ্মাত্মকঃ 'স্বম্ অসি' ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যাশদেশায় প্রবৃক্তত্বাং প্রকরণস্ত।' (১-১-১, পৃ: ১২৬)।

ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাঁর 'বেদান্তসার'এ রামানুজ বলছেন—'আত্মভূতং ব্রহ্ম সর্বদা নিরস্ত-নিখিল-দোষ-গন্ধানবধিকাতিশয়াসংখ্যো-জ্ঞানানন্দ্যুপরি-মিতোদার-গুণসাগরমবতিষ্ঠত ইতি ব্রহ্মৈব জগন্নিমিত্তমুপাদনং চৈতি।' (১-১-২, পৃ: ১২)।

ব্রহ্ম নির্বিকার

ব্রহ্মের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে চিৎ ও অচিৎ অন্যতম। চিৎ শক্তির বিক্ষেপ দ্বারা তিনি জীব এবং অচিৎ শক্তির বিক্ষেপ দ্বারা তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। এ রূপে জীবজগৎ পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ মাত্র ব'লে জীবজগৎ 'সৃষ্ট' হলেও নিত্য, যেহেতু এ স্থলে 'সৃষ্টির' অর্থ 'অভিব্যক্তি', নূতন সৃজন নয়। অতএব রামানুজ পরিণামবাদী। কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্গনাভ যেমন তন্তুর কারণ হয়েও স্বয়ং তন্তুতে পরিণত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম জীবজগতের কারণ হয়েও স্বয়ং নির্বিকার ও অপরিবর্তিতই থাকেন।

ব্রহ্ম সক্রিয়

ব্রহ্ম নির্বিকার হলেও নিষ্ক্রিয় নন। জীবের দিক থেকে তাঁর দুটি প্রধান কার্য—সৃষ্টি ও মুক্তি। তিনি জীবের কর্মাকুসারে জগৎ সৃষ্টি ক'রে জীবকে প্রেরণ করেন; পুনরায় জীবের সাধনে পরিতুষ্ট হয়ে তাকে সংসারচক্র থেকে মুক্তও করেন। জীবের প্রয়োজনের জন্তই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন, নিজের প্রয়োজনের জন্ত নয়, কারণ তিনি স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত ও আপ্তকাম। সেজন্য নিজের দিক থেকে সৃষ্টি তাঁর লীলা বা ক্রীড়াই মাত্র। এ সহস্র আলোচনা নিম্নার্কে-বেদান্ত প্রপঞ্চনাকালে করা হবে।

ব্রহ্ম জগন্মীন ও জগদতিরিক্ত

ব্রহ্ম জগন্মীন (Immanent) হয়েও জগদতিরিক্ত (Transcendent)। জগৎ ব্রহ্মের পরিণামরূপে ওতঃপ্রোতভাবে ব্রহ্মাত্মক—পৃথিবীর ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি ক্ষুদ্র জগতে ব্রহ্মের অনন্তরূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেতে পারে না। সেজন্য ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত।

ব্রহ্ম পুরুষোত্তম

রামানুজের মতে ব্রহ্ম পুরুষোত্তম, যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'Personal God', শব্দের 'Impersonal Absolute' নন। কারণ তিনি যে কোনো পুরুষেরই মতো সত্ত্ব ও সক্রিয়—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যে সকল অপূর্ব, মহামহিমময় গুণ ও শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, সে সকলই অনন্তগুণ অধিকভাবে এই পুরুষোত্তম, পুরুষশ্রেষ্ঠে আছে; এবং উপরন্তু অত্যাগত অসংখ্য, অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অনির্বচনীয় গুণ ও শক্তির একমাত্র আধারও তিনি। পুনরায় তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্যই নিবটতম ব্যক্তিগত সম্পর্ক—তিনি কেবল

রামানুজের বিশিষ্টাষ্টৈতবাদ

৩২১

- আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানের বস্তু নন, প্রকৃতি ও প্রীতির পাত্রও সেই সঙ্গে। সেদিক থেকেও ব্রহ্ম 'Personal God' বা পুরুষোত্তম।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অতির

রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনোরূপ প্রভেদ নেই। প্রকৃতপক্ষে শব্দের ব্যবহারিক স্তরগত 'ঈশ্বর' ও রামানুজের পারমার্থিক স্তরগত 'ব্রহ্ম' একই তত্ত্ব। প্রভেদ এই যে, শব্দের মতে পারমার্থিক স্তরে 'ঈশ্বর' বাধিত ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যান; কিন্তু রামানুজের মতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য এবং কোনো স্তরেই বাধিত হয়ে যান না।

ব্রহ্ম বিষ্ণু বা নারায়ণ

রামানুজ 'ব্রহ্ম'কে 'পুরুষোত্তম', 'বিষ্ণু' বা 'নারায়ণ' নামে পূজা নিবেদন করেছেন।

অচিৎ। জীবের স্বরূপ, ভূপ, পরিমাণ, সংখ্যা ও প্রকার ভেদ

এ বিষয়ে রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকেরা একমত। রামানুজও বলেছেন যে, জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণুপরিমাণ, বহুসংখ্যক ও বহুমুখভেদে চতুপ্রকার। বহুজীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্থবৃষ্টি, মূর্ছা ও মরণরূপ অবস্থাপঞ্চক এবং স্বর্গ, নরক ও অপবর্গরূপ অদৃষ্টত্রয় সম্বন্ধেও মতভেদ নেই।

অচিৎ

রামানুজের মতে অচিৎ তিন প্রকারের—প্রকৃতি, কাল ও শুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধতত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব বা 'শুদ্ধতত্ত্ব' নিম্বার্কের 'অপ্রাকৃতের' অরূপ। শুদ্ধসত্ত্ব বা 'শুদ্ধতত্ত্ব' 'প্রকৃতির' স্তায় ত্রিগুণাত্মক নয়, কেবল সত্ত্বগুণাত্মক।

এ স্থলে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বৈষ্ণব বৈদান্তিকদের শুদ্ধসত্ত্ব বা 'শুদ্ধতত্ত্ব', 'অপ্রাকৃত' প্রমুখ তত্ত্বটিকে 'অচিৎ' তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, তাকে জড় বলে গ্রহণ করা হয় না, অজড় বস্তুই বলা হয়।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতবাদপ্রপঞ্চনাকারী 'যতীন্দ্র-মত-দীপিকায়' এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বলা আছে—

'দ্রব্যং দ্বিবিধম্। জড়মজড়মিতি। জড়ং চ দ্বিধা। প্রকৃতিঃ কালশ্চেতি। অজড়ং তু দ্বিবিধম্। পরাক্-প্রত্যগিতি। অজড়ং পরাগপি তথা। নিত্যবিভূতি-ধর্মভূতজ্ঞানং চেতি। প্রত্যাগপি দ্বিবিধঃ জীবেশ্বর-ভেদাৎ (পৃ: ২-৩)।' অর্থাৎ দ্রব্য দ্বিবিধ—জড় ও অজড়। জড় দ্বিবিধ—প্রকৃতি ও কাল। অজড় দ্বিবিধ—পরাক্ (পরোক্ষ) ও প্রত্যক্ (প্রত্যক্ষ)। পরাক্ অজড় দ্বিবিধ—নিত্যবিভূতি ও ধর্মভূতজ্ঞান। প্রত্যক্ অজড় দ্বিবিধ—জীব ও ঈশ্বর।

'তানি চ দ্রব্যানি ষট্—প্রকৃতি-কাল-শুদ্ধসত্ত্ব-ধর্মভূতজ্ঞান-জীবেশ্বর ভেদাৎ। তত্র জড়াজড়-রূপয়োবিভক্তয়োর্মধ্যে জড়ত্ব-লক্ষণমুচ্যতে—অমিশ্রসত্ত্বরহিতং জড়ম্। তদ্বিবিধম্—প্রকৃতি-কাল-ভেদাৎ।' (পৃ: ৩৬)। অর্থাৎ দ্রব্য ছয় প্রকারের—প্রকৃতি, কাল, শুদ্ধসত্ত্ব, ধর্মভূতজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর। এদের মধ্যে প্রকৃতি ও কাল জড়। যা কেবল সত্ত্বগুণাত্মক নয়—তাই জড়।

কাল

'কাল নাম গুণত্রয়রহিতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ।'

কাল গুণত্রয়রহিত জড়দ্রব্যবিশেষ। কাল নিত্য ও বিভূ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেদে কাল

ত্রিবিধ। কাল থেকেই 'যুগপৎ', 'ক্ষিপ্ৰ' ও 'অচির' এবং 'নিমেষ', 'কাষ্ঠা', 'কলা', 'মূহূর্ত', 'দিবস', 'পক্ষ', 'মাস', 'ঋতু', 'অয়ন' ও 'সংবৎসর' প্রমুখ ব্যবহারসিদ্ধি হয়। পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, তিরিশ কাষ্ঠায় এক কলা, তিরিশ কলায় এক মূহূর্ত, তিরিশ মূহূর্তে এক দিবস, পনেরো দিবসে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক সংবৎসর।

গুণস্ব

'গুণস্ব-ধর্মভূতজ্ঞান-জীবের-সাধারণ লক্ষণমজ্জত্বম্। অজ্জড়ং নাম স্বয়ংপ্রকাশত্বম্।'

গুণস্ব বা গুণত্ব ধর্মভূতজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর সকলেই অজ্জড়। যা স্বয়ংপ্রকাশ, তাই অজ্জড়। তবে গুণস্ব বা গুণত্ব ও ধর্মভূতজ্ঞান 'পরাক্' অথবা স্বয়ংপ্রকাশ হলেও এ দুটি অপরের নিকটেই প্রকাশিত হয়, নিজের নিকটে নয়। বহুকালে গুণস্বের প্রকাশ নেই, স্বষ্টিকালে ধর্মভূতজ্ঞানের।

'গুণস্ব নাম ত্রিগুণ-দ্রব্য-বাতিরিক্তত্বে সতি সর্ববস্তুর নিঃশেষাবিহীনবৃত্তিদেশবিজাতীয়াত্বম্।' (পৃ: ৫১)। গুণস্ব বা নিত্যবিভূতি গুণস্বগুণসম্পন্ন। অবিহীন-নিবৃত্তি না হলে গুণস্বের প্রকাশ হয় না।

স্বরজ্যোতমগুণাশ্রিত্য প্রকৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরের যে জগৎ রূপে প্রকাশ তার নাম 'লীলাবিভূতি'। একই ভাবে গুণস্বের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে বৈকুণ্ঠরূপে প্রকাশ, তার নাম 'নিত্যবিভূতি'। এই বিভূতি উচ্চপ্রদেশে অনন্ত, অধঃপ্রদেশে পরিচ্ছিন্ন। গুণস্ব বা নিত্যবিভূতি অচেতন হয়েও স্বয়ংপ্রকাশ—'অচেতনা স্বয়ংপ্রকাশ চ'। প্রগাঢ় আনন্দময় বলে এর অপর নাম আনন্দ, পঞ্চোপনিষৎমন্ত্রপ্রতিপাদ্য বলে এ পঞ্চোপনিষদাশ্রিত্য অপ্রাকৃত-পঞ্চশক্তিময় বলে এ পঞ্চশক্তিময়। এই গুণস্ব বা নিত্যবিভূতি ঈশ্বর, নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্তগণের ভোগ্য বা শরীরাদি; ভোগোপকরণ বা চন্দন, কুসুম, বস্ত্র, ভূষণ, আয়ুধ প্রভৃতি; এবং ভোগস্থান বা গোপুর, পুরপ্রাকার, মণ্ডপ, বিমানোচ্চান প্রভৃতির উপাদান কারণ।

ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ। ব্রহ্ম ও জীবজগৎ তির্য্যক্

ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ আলোচনা কালে রামানুজ কারণ ও কার্য, অংশী ও অংশ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আত্মা ও দেহ, রাজা ও প্রজা প্রভৃতি নানারূপ উপমা প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং আত্মা ও দেহের উপমা দুটিই তাঁর বিশেষ প্রিয় এবং এ দুটির বারংবার উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ কারণ-কার্য সম্বন্ধ

উপরের উপমাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এ দুটি বস্তুর মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই আছে। যেমন কার্য কারণেরই রূপান্তর, অংশ সমগ্র অংশীরই অন্যতম একটি বিভাগ, বিশেষণ বিশেষ্যের গুণ এবং দেহ আত্মার উপর নির্ভরশীল বলে কার্য ও কারণ, অংশ ও অংশী, বিশেষণ ও বিশেষ্য, দেহ ও আত্মা একপক্ষে অভিন্ন। কিন্তু অন্যপক্ষে সেই সঙ্গে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই গুণ ও শক্তি ভিন্ন বলে তারা অভিন্ন হয়েও ভিন্ন। সেজন্য তাদের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্বীকার্য।

রামানুজও একই ভাবে ব্রহ্ম ও জীবজগৎকে কোনো কোনো স্থলে অভিন্ন এবং কোনো কোনো স্থলে ভিন্ন বলেছেন। যেমন 'ত্রীভাষ্য'এর ২-১-১৫ শ্লোকে তিনি কার্য-কারণ উপমার উল্লেখ করে বলেছেন— 'অন্যত্র পরমকারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্তত্বং জগতঃ' (পৃ: ৭০)।

রামানুজের বিশিষ্টাঐতবাদ

৩২৩

১- ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ দেহি-দেহ-সম্বন্ধ

এই একই শূত্রে শরীরী বা আত্মা ও দেহের উপমা প্রদান করেও রামানুজ বলছেন—

‘তদেতৎ কার্যাবস্থন্তু কারণাবস্থন্তু চ চিদচিদ্বস্তনঃ সকলন্তু স্থূলন্তু সূক্ষ্মন্তু চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্ পরন্তু চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু সিদ্ধং স্মারিতম্। অচিদ্বস্তনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণ-বচনাৎ চিদচিদ্বস্তশরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছব্দবাচ্যমিতি।’ (পৃ: ৭৬)

অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অনন্ত বা অভিন্ন, কারণ সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্ট কারণরূপ ব্রহ্মই স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্ট কার্যরূপ জগৎ—ব্রহ্মই জীবজগতের আত্মা ও অন্তর্যামী। একপে জীবজগতের আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মই বিভিন্ন নামরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন বলে, ব্রহ্মই ‘জগৎ’ শব্দবাচ্য।

এইভাবে কার্য-কারণের ‘অনন্তত্ব’ স্বীকার করলেও, রামানুজ শব্দ ও ভাবের যে অর্থে এই ‘অনন্তত্বকে’ গ্রহণ করেছেন, সেই অর্থে করেন নি। সেজন্য তিনি বলছেন—

‘যে তু কার্য-কারণয়োঃ নান্যত্বং কার্যন্তু মিথ্যাস্বাপ্নয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং কার্য-কারণয়োঃ নান্যত্বং সিধ্যতি, সত্য-মিথ্যার্থয়োঃ কৈবল্যপন্থঃ, তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা শূন্যং। যে চ কার্যমপি পারমাধিকমভ্যুপায়ন্ত এব জীব-ব্রহ্মণোরোপাধিকমত্বং স্বাভাবিকং চানন্তত্বম্ অচিদব্রহ্মণোঃ স্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি...।’ (২-১-১৫, পৃ: ৭৮)

অর্থাৎ ঐত-সম্প্রদায়ের মতে কারণ ও কার্য অনন্ত বা অভিন্ন, যেহেতু কার্য মিথ্যা। কিন্তু সত্য কারণ ও মিথ্যা কার্যের মধ্যে একত্ব ও অভিন্নত্ব সম্ভব কি ক’রে? একই ভাবে ভাবের সম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের অন্তত্ব বা ভিন্নত্ব ঔপাধিক, অনন্তত্ব বা অভিন্নত্ব স্বাভাবিক। জগৎ ও ব্রহ্মের ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব দুই স্বাভাবিক—এই মতই অযৌক্তিক।

রামানুজের মতে দুটি বস্তুর মধ্যে অনন্তত্ব বা অভিন্নত্ব কেবল সেক্ষেত্রেই সম্ভব যে ক্ষেত্রে সেই দুটি বস্তু একই বস্তুর দুটি বিভিন্ন অবস্থান্তরই মাত্র, যেরূপ ব্রহ্ম ও জীবজগৎ।

দ্বিতীয়তঃ অন্তপক্ষে রামানুজ ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদের কথাও বলেছেন। যেমন ‘ত্রীডাক্ষে’ (২-১-২২) তিনি বলছেন—‘প্রত্যাগাত্মনো হি ভেদেন নির্দিষ্টতে পরং ব্রহ্ম।’

পুনরায় ২-১-১৪ শূত্রে তিনি বলছেন—‘শ্রাদেবঃ বিভাগঃ জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ।’ (পৃ: ৩৩)

এই শূত্রেই তিনি রাজা ও প্রজার উপমা প্রদান ক’রে বলছেন—‘লোকবৎ যথা লোকে রাজ-শাসনাত্মবর্তিনাং তদতিবর্তিনাঞ্চ রাজাত্মগ্রহ-নিগ্রহ-কৃতসুখ-দুঃখযোগোহপি ন সশরীত্বমাত্রেণ শাসকে রাজ্ঞাপি শাসনাত্মবৃত্ত্যতিবৃত্তি-নিমিত্ত-সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তব্যপ্রসঙ্গঃ।’ (পৃ: ৩৪)। অর্থাৎ পৃথিবীতে দেখা যায় যে, প্রজাগণ রাজার অগ্রহ ও নিগ্রহের পাত্র হয়ে সুখ ও দুঃখ উপভোগ করলে তা রাজাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। একই ভাবে, ভিন্ন স্বভাব জীবের সুখদুঃখ ব্রহ্মকেও স্পর্শ করে না।

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ অংশি-অংশ সম্বন্ধ

তৃতীয়তঃ ২-৩-৪২ শূত্রে রামানুজ জীব যে ব্রহ্মের অংশ তা প্রমাণ করবার জন্য ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথাও স্পষ্ট বলেছেন—

‘ব্রহ্মাংশ ইতি। কৃতঃ? অন্তথা চ একত্বেন ব্যাপদেশাৎ। উত্তরথা হি ব্যাপদেশো দৃষ্টতে।

নামাত্মব্যাপদেশস্তাবৎ শ্রষ্টৃৎ-সৃষ্ট্যত্ম-নিয়ন্তৃৎ-নিরাম্যত্ম-সর্বজ্ঞত্বজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-ওকৃত্যওকৃত্য-কল্যাণ-

গুণাকারত্ব-তদ্বিশ্রীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাভির্ভূতে । অগ্ৰথা চ অভেদেন ব্যাপদেশোহপি 'তৎ স্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদিভির্ভূতে । অপি-দাশকিতবাদিস্বপাধীয়াতে একে—'ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাশ ব্রহ্মে কিতবাঃ' ইত্যর্থ-বর্ণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিস্বপাধীয়াতে । ততশ্চ সর্বজীব-ব্যাপিৎসেনাভেদো ব্যাপদিশ্রুতে ইত্যর্থঃ । এবমুভয়ব্যাপদেশমুখ্যত্বসিকরে জীবোহয়ং ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপগম্যত্বাঃ । ন চ ভেদব্যাপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অগ্ৰথাসিদ্ধত্বম্ ব্রহ্ম-স্বজ্যত্ব-তন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব-তৎসংহার্যত্ব-তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য-ধর্মার্থ কামমোক্ষরূপ-পুরুষার্থ-ভাস্কাদয়স্তংকৃতশ্চ জীবব্রহ্মর্গোভেদঃ প্রত্যক্ষাত্মগোচর-ত্বেনাগ্ৰথাসিদ্ধঃ ।...অত উভয়-ব্যাপদেশোপপত্তয়ে জীবোহয়ং ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্ ।'

অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের যতের বিরুদ্ধে রামানুজ এ স্থলে প্রমাণ করতে প্রচেষ্টা করছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ এবং অংশী ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন । সেজন্য শাস্ত্রে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ ও অভেদ উভয়ের কথাই বলা আছে । যেমন ভেদের দিক থেকে ব্রহ্ম স্রষ্টা, জীব সৃজ্য ; ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়াম্য ; ব্রহ্ম সর্বজ, জীব অজ ; ব্রহ্ম স্বাধীন, জীব পরাধীন ; ব্রহ্ম শুদ্ধ, জীব অশুদ্ধ ; ব্রহ্ম কল্যাণগুণাকর, জীব তদ্বিশ্রীত ; ব্রহ্ম পতি, জীব সেবক ; ব্রহ্ম শরীরী, জীব শরীর ; ব্রহ্ম অঙ্গী, জীব অঙ্গ ; ব্রহ্ম আশ্রয়, জীব আশ্রিত ; ব্রহ্ম পালক, জীব পালিত ; ব্রহ্ম সংহারক, জীব সংহার্য ; ব্রহ্ম উপাস্ত, জীব উপাসক ; ব্রহ্ম অহুগ্রাহক, জীব অহুগ্রহীত (২-৩-৪২) প্রভৃতি । একই ভাবে অভেদের দিক থেকে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সমগ্র জীবজগতের আত্মা এবং সেরূপে জীবজগৎ থেকে অভিন্ন । সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য । এই কারণে জীবজগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলে স্বীকার করতে হয়, কারণ অংশী ও অংশের সম্বন্ধ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, ভেদাভেদ সম্বন্ধ ।

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ

শ্রীভাষ্যের ১-১-১ সূত্রেও (পৃ: ২৩৪) রামানুজ প্রকৃত পক্ষে এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথাই বলেছেন—

(১) অচিদ্বস্তনশ্চিদ্বস্তনঃ পরশ্চ চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চৈশিত্ত্বত্বেন স্বরূপবিবেকমাহঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ । (পৃ: ২৩৪)

'এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিৎচিৎতোঃ পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্বিতিং পরমপুরুষস্ত চাত্মত্বমাহঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ (পৃ: ২৩৭) ।

(২) 'এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্ব-বস্ত-শরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কারণা-বস্থ-জগদ্রূপণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবৈত্যাহঃ ।' (পৃ: ২৩৮)

(১) অচিৎ ভোগ্য, চিৎ ভোক্তা, পরব্রহ্ম নিয়ন্তা—সেজন্য কোনো কোনো প্রতিবাক্য অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপগত ভেদের কথা বলেছেন ।

এ রূপে ভোক্তরূপ চিৎ এবং ভোগ্যরূপ অচিৎ সর্বাবস্থাতেই পরমপুরুষ পরব্রহ্মের শরীর এবং সেজন্য তাঁরই দ্বারা পরিচালিত ! এই কারণে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয় । অতএব কোনো কোনো প্রতিবাক্যে পরমপুরুষ পরব্রহ্মকে 'আত্মা' রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ।

(২) এ রূপে সর্বাবস্থাতেই চিৎ ও অচিৎ পরমপুরুষ পরব্রহ্মের শরীর ব'লে চিৎ ও অচিৎ তাঁর ধর্ম ।

হুতরাং জগতের কার্যাবস্থা এবং কারণাবস্থা উভয়বস্থাতেই পরমপুরুষ পরব্রহ্মই জগৎ রূপে অবস্থান করেন। অতএব কোনো কোনো প্রতিবাক্যে কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা উভয়বস্থাতেই জগৎকে পরব্রহ্মরূপেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রতিপক্ষে যে চিৎ, অচিৎ ও পরব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপগত ভেদের কথা বলা হয়েছে, তাই এ স্থলেও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

‘অত্রাপি শ্রুতান্তরসিক্ষিতচিত্তোঃ পরমপুরুষস্ত চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ।’ (পৃ: ২৩২)

এ রূপে এ স্থলে রামানুজ দুই প্রকারের প্রতি বাক্যের অবতারণা করেছেন। প্রথম প্রকার হ’ল—ভোক্ত-ভোগা-নিয়ন্তৃ-প্রতি। এই প্রকার প্রতিবাক্যের মধ্যে কোনো কোনোটি জীবজগৎ ও ব্রহ্মের ভেদ, কোনো কোনোটি পুনরায় অভেদ প্রতিপাদিত করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার হ’ল—স্বজ্ঞা-স্রষ্টৃ-প্রতি। এ স্থলেও ভেদ ও অভেদ বাক্য দুই পাওয়া যায়। সেজন্য শরীরী-শরীর, বিশেষ্য-বিশেষণের মধ্যে যেরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ (১-১-১; পৃ: ২৩০)।

অনেকে হয়ত আশ্চর্যান্বিত হতে পারেন যে, রামানুজ যে কেবল অভেদবাদ ও ভেদবাদই অযৌক্তিক বলে বর্জন করেছেন, তাই নয়—সেই সঙ্গে ভেদাভেদবাদেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন, (১-১-১, পৃ: ২২৮-২৩০) যেমন তিনি বলেছেন—‘যদপি কৈচ্ছিত্ত্বকৃত্ত্বম্—ভেদাভেদয়োর্বিরোধ ন বিত্ত্বত ইতি, তদযুক্তম্। ন হি শীতোষ্ণ-তম-প্রকাশাদিবদ্ভেদাভেদবেকশ্চিন্ বস্তুনি সংগচ্ছেতে।’ (১-১-১, পৃ: ৩১৮)

‘অতএব জীবন্তাপি ব্রহ্মণা ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি’। (১-১-১, পৃ: ৩২৮)

অবশ্য এই ভেদাভেদবাদ অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাস্করীয় ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদ (১-১-১, পৃ: ২২২, ২৪৫, ৩০৪; ২-১-১৫, পৃ: ৭৮)। কিন্তু এক স্থলে তিনি ‘স্বাভাবিক-ভেদাভেদ’এরও সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এই মতানুসারে ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপগত ভেদ স্বীকৃত হয় বলে ব্রহ্ম স্বভাবতঃই শুদ্ধ, জীব স্বভাবতঃই দোষগুণসম্পন্ন—এই স্বীকার করতে হয়। সেস্থলে এই দুজনের মধ্যে পুনরায় স্বরূপগত অভেদ সম্ভবপর কি ক’রে? (১-১-১, পৃ: ২২২)। কিন্তু এই সাধারণ ভেদাভেদবাদ ও রামানুজীয় ভেদাভেদবাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রামানুজ বলেছেন—একমাত্র আত্মা ও দেহ বা বিশেষ্য ও বিশেষণের উপমা গ্রহণ করলে, এই দুই সমস্তা থেকে পরিভ্রাণ লাভ সম্ভবপর হতে পারে (১-১-১, পৃ: ২৩০)। এ স্থলে রামানুজ ‘অপৃথকসিদ্ধি’ (১-১-১, পৃ: ২৩৭) এবং ‘সামান্যাদিকরণ্য’ এই দুটি তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে আপাতদৃষ্টে বিরোধ

রামানুজ এইভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ভেদাভেদের কথাই বিশেষ জোয়ের সঙ্গে বলেছেন; পুনরায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেদাভেদবাদকেও অযৌক্তিক বলেছেন। সেজন্য ধারণা হওয়া আশ্চর্য নয় যে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে রামানুজের মতবাদ বিরোধদোষদুই।

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে এই সম্বন্ধে রামানুজের মতবাদ

নিম্নলিখিতরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে—ত্রিতত্ত্ববাদী রামানুজের মতে অচিৎ, চিৎ ও ত্রন্ধের মধ্যে ভোগা, ভোক্তা ও নিয়ন্তা সম্বন্ধ। প্রথমতঃ অচিৎ ভোগা, চিৎ ভোক্তা। জ্ঞানস্বরূপ জীবের কর্মফলভোগের ক্ষেত্রে এই জগৎ—সকাম কর্মের ফল পুনর্জন্ম, নিকাম কর্মের ফল মোক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ অচিৎ ও চিৎ নিয়ন্তা ত্রন্ধকর্তৃক নিয়ন্ত-নিয়ন্ত্রিত। সেদিক থেকে জীবজগৎ ত্রন্ধ থেকে ভিন্ন। জীব অণুমাত্র, ত্রন্ধ বিভূ; জগৎ জড়, ত্রন্ধ জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু ভিন্ন হলেও তারা ত্রন্ধ থেকে অভিন্নও। ত্রন্ধ কারণ, অংশী, বিশেষ্য, আত্মা; জীবজগৎ যথাক্রমে কার্য, অংশ, বিশেষণ ও দেহ। এবং কারণ ও কার্য, অংশী ও অংশ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আত্মা ও দেহ, ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, কারণ তারা অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংশ্লিষ্ট।

ত্রন্ধ ও জীবজগতের মধ্যে 'অপৃথকসিদ্ধি'

দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যদি একরূপ সম্বন্ধ থাকে যে, একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্বই সম্ভবপর নয়, তা হলে সেই সম্বন্ধকে 'অপৃথকসিদ্ধি' বা 'অপৃথকস্থিতি' বলা হয়। যেমন অংশহীন অংশী ও অংশিহীন অংশ সম্ভবপর নয়; গুণহীন দ্রব্য ও দ্রব্যহীন গুণও অসম্ভব; দেহহীন আত্মা ও আত্মা হীন দেহও দৃষ্ট হয় না। সেজন্য অংশী ও অংশ, দ্রব্য বা বিশেষ্য ও গুণ বা বিশেষণ, আত্মা ও দেহ পরস্পরভিন্ন হয়েও অপৃথকসিদ্ধ বা অপৃথকস্থিতরূপে অভিন্ন বা এক। একই ভাবে জীবজগৎও ত্রন্ধের অংশ, বিশেষণ ও দেহরূপে ত্রন্ধ থেকে ভিন্ন হয়েও অপৃথকসিদ্ধরূপে ত্রন্ধ থেকে অভিন্ন। এ স্থলে 'অভিন্নত্ব' শব্দের অর্থ: Identity নয়, Inseparability বা Organic Relation অর্থাৎ পরস্পরাশ্রয়িত্ব। ত্রন্ধ ও জীবজগৎ একটি Organic, Synthetic, Concrete Whole.

অবশ্য ত্রন্ধের দিক থেকে তাঁর জীবজগতে প্রকাশ বা পরিণতি সাধারণ প্রয়োজন বা অভাবমূলক নয়, তাঁর স্বভাব বা আনন্দমূলক; এবং জীবের দিক থেকে কর্মবাদানুসারে ন্যায়ধর্মাত্মক। তা সত্ত্বেও জীবজগৎ যেমন সম্পূর্ণরূপেই ত্রন্ধের উপর নির্ভরশীল, ত্রন্ধ তেমনি সেই একই অর্থে জীবজগতের উপর নির্ভরশীল না হলেও, জীবজগৎ ও ত্রন্ধ ঘনিষ্ঠতম অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ—এই অর্থেই ত্রন্ধ ও জীবজগৎ সম্বন্ধে রয়েছে একটি পরিপূর্ণ অর্থও সত্য এবং সেই দিক থেকেই ত্রন্ধ ও জীবজগৎ অভিন্ন।

জীব যে ত্রন্ধের অংশ এবং তদ্রূপে ত্রন্ধ থেকে ভিন্নাভিন্ন—এই তত্ত্বটি প্রমাণ কালে (২-৩-৪৫) রামানুজ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন—

'প্রকাশাদিবং জীবঃ পরমাত্মনোহংশ, যথা অগ্ন্যাদিত্যাদিভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি যথা গবান্ব-গুরুকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদি-বিশিষ্টানাং বস্তুনাং গোত্বাদিনী বিশেষণান্তঃশাঃ, যথা বা দেহিনো দেবমহুগাদি-দেহোহংশঃ তদ্বৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বং হংশত্বম্, বিশিষ্টশৈক্যস্ত বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথাচ বিবেচকাঃ বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোহয়ম্, বিশেষণাংশোহয়মিতি ব্যপদিশস্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃশাংশিভেপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে। এবং জীব-পরয়োবিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদোপপত্ততে।...যথাভূতো জীবঃ ন তথাভূতঃ পরঃ। যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্তথাভূতঃ, তথা প্রভাস্বানীয়াং স্বাংশাজ্জীবাং অংশী পরোহপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীবপরয়োবিশেষণবিশেষ্যত্বকৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাপ্রিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্তন্তে। অভেদনির্দেশান্ত পৃথক্‌সিদ্ধান্‌ইবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্যন্তত্বমাপ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপত্তন্তে।'

অর্থাৎ প্রভারূপ প্রকাশ যেরূপ অগ্নি, সূর্য প্রভৃতির অংশ, গোত্ব যেরূপ গোর অংশ, দেহ যেরূপ

দেহীয় অংশ, সেরূপ জীবও ত্রক্ষের অংশ। সুতরাং বিশেষণও বিশেষ্যের অংশবিশেষই মাত্র। কিন্তু বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে একরূপ অংশ-অংশী সম্বন্ধ থাকলেও, তাদের মধ্যে স্বভাবগত ভেদও আছে। একই ভাবে জীব ও ত্রক্ষের মধ্যেও একপক্ষে স্বভাবভেদ বিদ্যমান—জীব যে প্রকার, পরমায়া ঠিক সেই প্রকার নয়; যেমন প্রভা প্রভাবান বস্তু থেকে ভিন্ন, তেমনি জীবও ত্রক্ষ থেকে ভিন্ন। অন্যপক্ষে জীব ও ত্রক্ষের মধ্যে অপৃথকসিদ্ধিরূপ সম্বন্ধ আছে বলে, সেই অর্থে উভয়ে অভিন্ন। অর্থাৎ বিশেষণরূপ জীবের পক্ষে বিশেষ্যরূপ ত্রক্ষ থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান অসম্ভব। সেজন্য জীব ত্রক্ষ থেকে অভিন্ন।

কিন্তু একরূপ কেবল ‘অপৃথকসিদ্ধি’ রূপ ভবের উপর জোর দিলে এখানে ত্রাস্ত ধারণার উদ্বেক হতে পারে। যেমন আয়া ও দেহের উপমার কথাই ধরা যাক। প্রকৃত পক্ষে আয়া ও দেহ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেবল পরস্পরাশ্রয়ী রূপে অপৃথক মাত্র। সেজন্য যদি বলা হয় যে, ত্রক্ষ ও জীবজগৎ কেবল অপৃথকসিদ্ধিরূপেই অভিন্ন, তা হলে হয়ত মনে হতে পারে যে ত্রক্ষ ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্ন, কিন্তু জীবজগৎ ত্রক্ষাশ্রিত বলে ত্রক্ষ থেকে অপৃথক ও সেই অর্থেই কেবল অভিন্ন। কিন্তু রামানুজের মতে জীবজগৎ স্বরূপতঃও ত্রক্ষ থেকে অভিন্ন, কেবল অপৃথকসিদ্ধিরূপেই নয়।

ত্রক্ষ ও জীবজগতের মধ্যে ‘সামান্যাদিকরণ্য’

এখানে রামানুজ ‘সামান্যাদিকরণ্য’ রূপ ভবের উল্লেখ করেছেন (১-১-১, পৃ: ২৩০), এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের সুপ্রসিদ্ধ ‘তত্ত্বমসি’ (৬-৮-৭ ইত্যাদি) বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ত্রক্ষ ও জীবজগতের স্বরূপতঃ অভিন্নতা ও ধর্মতঃ ভিন্নতার কথা স্পষ্ট করে বলেছেন।

‘সামান্যাদিকরণ্যের’ অর্থ হ’ল এই যে, দুটি আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুর অভিন্নতা একটি বাক্যে প্রতিপাদিত হলে বুঝতে হবে যে, তারা একই অধিকরণে গৃহ্য, নতুবা বাক্যটি বিরোধদোষহুই হয়ে পড়ে।

যেমন একটি বাক্য আছে: ‘দত্তী কুণ্ডলী’ (শ্রীভাষ্য ১-১-১, পৃ: ২৩০)। এক্ষেত্রে দত্তধারী ব্যক্তি ও কুণ্ডল-পরিহিত ব্যক্তিকে বিভিন্ন বলে মনে হলেও, তাঁরা একই অভিন্ন ব্যক্তির দুটি ভিন্ন রূপই মাত্র। অর্থাৎ দত্তিগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কুণ্ডলিগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি সেই একই। অথবা উভয় ব্যক্তিই গুণতঃ ভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন।

সেজন্য রামানুজ বলেছেন—‘তত্ত্বমশ্চাদিবাক্যে, সামান্যাদিকরণ্যং ন নির্বিশেষ-বৈশ্বক্যপরম্, ‘তৎ’-‘ত্বম্’-পদয়োঃ সর্বিশেষ-ত্রক্ষাভিধারিত্বাৎ। ‘তৎ’-পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসংকল্পং জগৎকারণং ত্রক্ষ পরামুশতি। ‘তৎ’-সামান্যাদিকরণং ‘ত্বম্’-পদঞ্চ অচিদ্বিশিষ্ট-জীবশরীরকং ত্রক্ষ প্রতিপাদয়তি।’ (১-১-১ পৃ: ২২১)।

রামানুজ ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের অর্থও একই ভাবে করেছেন।

‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের অর্থ। শব্দের মত

শব্দের মতে ‘তত্ত্বমসি’ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬-৬-৭ ইত্যাদি) বা ‘তিনিই (ত্রক্ষই) তুমি (জীব)’—এই সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে ত্রক্ষই জীব অর্থাৎ ত্রক্ষ ও জীব অভিন্ন। এ স্থলে ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ এই দুটি শব্দের মূখ্য অর্থ: ‘ত্রক্ষ’ ও ‘জীব’ গ্রহণ করলে চলবে না, কারণ ‘ত্রক্ষ’ ও ‘জীব’ ভিন্নস্বভাব বলে তাঁদের ঐক্য বা অভিন্নতা অসম্ভব। যেমন আমরা অনায়াসে বলতে পারি: ‘ক’ই ‘ক’। কিন্তু যদি আমরা বলি: ‘ক’ই ‘খ’, তবে বাক্যটি বিরোধ-দোষহুই হয়ে পড়বে—কারণ ‘ক’ কেবল ‘ক’ই হতে পারে, এক

ভিন্ন বস্তু 'ক' অস্ত্র ভিন্ন বস্তু 'খ' হতে পারে কি করে? একই বস্তু 'ক' ও 'ক'য়ের মধ্যেই কেবল অভিন্নতা সম্ভব, দুই ভিন্ন বস্তু 'ক' ও 'খ'য়ের মধ্যে কদাপি নয়। যেমন আমরা বলতে পারি—'পদ্মই পদ্ম'; কিন্তু 'পদ্মই প্রসন্ন' বলা বাতুলতাই মাত্র।

যদি বলা হয় 'বলই কুণ্ডল' তা হলে আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটি একটি অর্থহীন ভ্রমসঙ্কুল স্ববিরোধ-দোষহুই বিবৃতিই মাত্র, যেহেতু সকলেই জানেন যে, বলয় এক বস্তু, কুণ্ডল অস্ত্র এক বিভিন্ন বস্তু; সেজন্য উভয়কে একই বস্তু বলা চলে না কোনো ক্রমেই। অতএব এই বাক্যটিকে একটি অর্থযুক্ত, ভ্রমশূন্য, স্ববিরোধদোষহীন বাক্য বলে গ্রহণ করিবার একটি মাত্র উপায়ই আছে—বলয় ও কুণ্ডলের 'বলয়ত্ব' ও 'কুণ্ডলত্ব' রূপ বিশেষ বিশেষ বাহ্যিক গুণদ্বয় বর্জন ক'রে তাদের অস্ত্রনিহিত সাধারণ স্বরূপ বা সত্তাকেই মাত্র গ্রহণ করা। বস্তুতঃ বলয়ও স্বর্ণস্বরূপ, কুণ্ডলও স্বর্ণস্বরূপ এবং সেই দিক থেকে এই স্বরূপের দিক থেকে তারা নিশ্চয়ই অভিন্ন। সুতরাং এক্ষেত্রে 'বলয়ত্ব' ও 'কুণ্ডলত্ব' রূপ বিশেষ বিশেষ বাহ্যিক গুণদ্বয়কে বাদ দিয়ে, 'স্বর্ণত্ব' রূপ অস্ত্রনিহিত সাধারণ স্বরূপকেই কেবল রাখতে হবে এবং বলতে হবে—'স্বর্ণই স্বর্ণ'। এ ছাড়া আর উপায় কি? একই ভাবে 'ব্রহ্মই জীব' বলাও স্ববিরোধী উক্তিই মাত্র। আমাদের বলা উচিত 'ব্রহ্মই ব্রহ্ম' অথবা 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই উপাধিরহিত ব্রহ্ম'।

এ রূপে শব্দের মতে প্রত্যেক Judgment বা বাক্যই Analytic এবং Identity-Judgment বা Subject ও Predicate বা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের একার্থবিধায়ক। সুতরাং এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ নিরূপাধিক ও সর্ববিশেষণরহিত ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম। এই অর্থেই কেবল স্ববিরোধ-দোষের কবলগ্রস্ত না হয়ে আমরা অনাগ্রাসে বলতে পারি—'তিনিই তুমি', 'পরব্রহ্মই পরব্রহ্ম'।

এ রূপে শব্দের মতে যদি একটি বাক্যে দুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বস্তুর অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা হয়, তা হলে এই অর্থই বুঝতে হবে যে, ঐ দুটি বস্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু দেশ-কাল-ধর্ম প্রমুখ উপাধিযোগে আপাততঃ ভিন্ন বলে প্রতীত হচ্ছে মাত্র। সেজন্য এই সকল উপাধি বর্জন ক'রে কেবলমাত্র বস্তুস্বরূপ বা সত্তাকেই এখানে গ্রহণ করতে হবে।

রামানুজের মত

কিন্তু রামানুজের মতে শব্দরাত্নায়াসী অর্থ স্বীকার করলে পুনরুক্তি দোষের উদ্ভব হয়। 'ক' যে 'ক'—অস্ত্র কিছুই নয়, তা ত সর্বজনবিদিত সত্য—সে কথা পুনরায় অনর্থক বলার প্রয়োজন কি? 'পদ্মই পদ্ম', 'রামই রাম'—এরূপ বলাই বাতুলতামাত্র। সেজন্য দুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভিন্নস্থাপনকারী বাক্যের এরূপ অদ্বৈতবেদান্তসম্মত অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অমুচিত। বরং বলা উচিত—'লোহিত পদ্ম', 'রঘুপতিই সীতাপতি'। অর্থাৎ লোহিতগুণবিশিষ্ট পদ্মই পদ্মগুণবিশিষ্ট পদ্ম, রঘুপতি রামই সীতাপতি রাম অথবা রঘুপতিত্ব-গুণ-বিশিষ্ট রাম ও সীতাপতিত্ব গুণ-বিশিষ্ট রাম এক ও অভিন্ন, অথবা উভয় রামই ধর্মতঃ ভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। এ হলে 'রঘুপতিত্ব' ও 'সীতাপতিত্ব' এই দুটি গুণ কিন্তু বর্জন করলে চলবে না, কারণ তা হলে সমগ্র বাক্যটি কেবল মাত্র অর্থশূন্য পুনরুক্তিতেই পর্যবসিত হবে। সেজন্য দুই ভিন্নগুণবিশিষ্ট বস্তুর স্বরূপতঃ অভিন্নতাই এরূপ বাক্যের প্রকৃত অর্থ।

এ রূপে রামানুজের মতে বাক্য বা Judgment analytic, identity-judgment নয়, synthetic, identity-in-difference judgment। অর্থাৎ এ রূপ বাক্যে একই বস্তুর দুটি বিভিন্ন

জগের কথা বলা হয়। সেজন্য 'তত্ত্বমসি' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, 'তৎ' বা পরমাশ্বাই 'ত্বম্' বা জীবাশ্বা। অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বপ্রমুখ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবজগৎগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

রামানুজ 'সামানাদিকরণের' সংজ্ঞা-প্রদান ক'রে বলেছেন—'প্রকারত্বগ্ৰাবস্থিতৈকবস্তুরপরাং সামানাদিকরণস্য।' (১-১-১, পৃ: ২২১)। অর্থাৎ একই বস্তুর দুই প্রকার অবস্থার মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই হ'ল 'সামানাদিকরণ্য।' অতএব জীব ব্রহ্ম থেকে ধর্মত: ভিন্ন হলেও স্বরূপত: অভিন্ন।

এ রূপে রামানুজের নানা আপাতবিরুদ্ধ উক্তির প্রকৃত সারার্থ সংগ্রহ করলে বলা চলে যে, তাঁর মতে—(১) জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ধর্মত: ভিন্ন। (২) কিন্তু ব্রহ্ম আধার বা আশ্রয়; জীবজগৎ আধেয় বা আশ্রিত; ব্রহ্ম অংশী বা সমগ্র সত্তা, জীবজগৎ অংশ মাত্র; ব্রহ্ম দ্রব্য বা বিশেষ্য, জীবজগৎ গুণ বা বিশেষণ; ব্রহ্ম আত্মা বা শরীরী, জীবজগৎ দেহ বা শরীর। সেজন্য জীবজগৎ ধর্মত: ভিন্ন হলেও সম্পূর্ণ-রূপে ব্রহ্মাশ্রয়ী ও পৃথকসত্তাহীন, এবং এই অর্থে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ও অপৃথকসিদ্ধ। (৩) পুনরায় জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বরূপত:ও অভিন্ন।

রামানুজ এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ সবই বলেছেন—জীবের ক্ষুদ্র জীবধর্মের দিক থেকে, সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মস্বরূপের দিক থেকে সে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন এবং পরিশেষে এই ভাবে সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন।

প্রখ্যাত পণ্ডিত মাধবাচার্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' এই কথাই বলেছেন—'কিমত্র তৎসং ভেদঃ, অভেদঃ, উভয়াশ্রয়কং বা সর্বং তত্ত্বম্। তত্র সর্বশরীরতয়া সর্বপ্রকারং ব্রহ্মৈবাবস্থিতমিত্যভেদোহভ্যু-পেক্ষতে; একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাভেনাবস্থিতমিতি ভেদাভেদৌ; চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপ-স্বভাব-বৈলক্ষণ্যাদসংকরাচ্চ ভেদঃ।' (পৃ: ৪৫-৬, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংস্করণ)

অর্থাৎ রামানুজ-মতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ সবই আছে। প্রথমত: সর্বপ্রকার বস্তুই ব্রহ্মের শরীর রূপে অবস্থিত ব'লে সর্বপ্রকার বস্তুই ব্রহ্মরূপে অবস্থিত এবং এই ভাবে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। দ্বিতীয়ত: একই ব্রহ্ম নানাবিধ ভাবে চিৎ ও অচিৎ রূপে অবস্থিত বলে নানাভাবে অবস্থিত; এবং এই ভাবে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন। তৃতীয়ত: ব্রহ্ম ও জীবজগতের স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য আছে এবং ব্রহ্ম ও জীবজগৎ পরস্পর অমিশ্রিত এবং এই ভাবে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন।

স্বয়ং রামানুজ 'শ্রীভাক্তে' দু-একস্থলে (২-১-১৪, পৃ: ৩৩) এবং মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' জীবৈশ্বরের স্বভাব ও স্বরূপভেদের কথা বললেও (পৃ: ৩২), রামানুজ অন্যান্য স্থলে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে 'অভেদ', 'অনন্তত্ব', 'তাদাত্ম্য' প্রভৃতির কথা বলেছেন। বিশেষ ক'রে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থপ্রপঞ্চনা কালে তিনি স্পষ্টতমভাবে বলেছেন যে, 'তৎ' ও 'ত্বম্', ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে 'সামানাদিকরণ্য' সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধের সংজ্ঞাদান ক'রে তিনি বলেছেন যে, একই বস্তুর দুটি ভিন্ন অবস্থা বা দুটি বিভিন্নগুণবিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে অভিন্নত্ব-সম্বন্ধই হ'ল 'সামানাদিকরণ্য' সম্বন্ধ। সেজন্য জীবজগৎ ঈশ্বরস্বরূপেরই রূপান্তর বা অবস্থান্তরই মাত্র বলে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে ঈশ্বর ও জীবজগতের অভেদ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও জীব-জগৎ স্বরূপত: অভিন্ন, কিন্তু ধর্মত: ভিন্ন—এই মতই সমীচীন।

বস্তুত: অশ্বৈতবেদান্তের অভেদবাদধ্বননের উৎসাহে রামানুজ অনেক ক্ষেত্রেই স্বীয় বিশ্বাসের

প্রতিকূলে ভেদের উপর অগ্ৰাঘ্য জোর দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেজন্যই যে, তিনি ভেদবাদী বা জীববৈশেষিকের স্বরূপভেদ অচ্যুতমোদন করেন—তা বলা অযৌক্তিক। উপরন্তু অভেদবাদীগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত আপত্তির পরও যে তিনি ভেদ অপেক্ষা অভেদের উপরই জোর দিয়েছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মতবাদের ‘বিশিষ্টাঐত্ববাদ’ নামটিতে। এই নামে ‘ভেদ’ বা ‘ঐত্ব’ শব্দের উল্লেখমাত্র নেই!

যা হোক রামানুজের মতে ‘অপৃথকসিদ্ধি’ রূপ সম্বন্ধের দিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ব’লে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। কিন্তু ‘সামান্যাদিকরণ্য’রূপ সম্বন্ধের দিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলেই ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। সুতরাং এও বলা চলে যে, সম্বন্ধটি দ্বিতীয় সম্বন্ধেরই ফল-স্বরূপ। অর্থাৎ জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ধর্মতঃ ভিন্ন হয়েও স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং সেজন্যই ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অপৃথকসিদ্ধ বা অচ্ছেদ্য বন্ধনে চিরাবদ্ধ।

এ রূপে রামানুজের মতে ভেদের দিক থেকে তত্ত্ব তিনটি—ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। কিন্তু চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মাত্মক ব’লে অভেদের দিক থেকে তত্ত্ব মাত্র একটি চিদ্‌চিদ্‌-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। যেমন বাষ্টির দিক থেকে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্প—এই পাঁচটি তত্ত্ব। কিন্তু সমষ্টির দিক থেকে মূল-কাণ্ড-শাখা-পত্র-পুষ্প-বিশিষ্ট-বৃক্ষ—এই একটি মাত্র তত্ত্ব।

সেজন্য রামানুজের মতবাদকে ‘বিশিষ্টাঐত্ববাদ’ বলা হয়। অর্থাৎ ‘বিশিষ্ট’ বা ধর্মতঃ ভিন্ন বস্তুর স্বরূপতঃ ‘অঐত্ব’ বা অভিন্নত্ব। অথবা নানাত্ব বা জীবজগৎ ‘বিশিষ্ট’ ‘অঐত্ব’ বা এক ব্রহ্মই চরম সত্য।

মুক্তি

রামানুজের মতে মুক্তি জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা জীবত্বের বিনাশ নয়, উপরন্তু পূর্ণতম বিকাশ। মুক্তি কেবল জীবের ক্ষুদ্র ‘আমিত্ব’ বা ‘অহং-মম’ ভাবেরই ধ্বংসসূচক, জীবসত্তার নয়, যেহেতু মোক্ষকালেও জীব ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না, ভিন্নাভিন্নই থাকে। বন্ধাবস্থায় জীবের স্বরূপ ও গুণ পূর্ণ প্রকাশিত হতে পারে না। কারণ আপাতদৃষ্টিতে দেহ-মন-সংযুক্ত জীব অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপোপলব্ধিতে অসমর্থ হয়ে জড়-দেহ মনের ধর্ম অজড় চিৎস্বরূপ আত্মায় আরোপ করে এবং ফলে নিজেকে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি ও দেহ মনের ধর্ম জন্মমৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি, ক্ষয়পরিণাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অধীন বলে গ্রহণপূর্বক অশেষ দুঃখভাগী হয়। পুনরায় জীব অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে মনে করে; ক্ষুদ্র ‘আমিত্বের’ গতিতে আবদ্ধ হয়ে সকাম-কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তারই অবশ্যজ্ঞাবী ফলস্বরূপ পুনঃপুনঃ ভয়জন্মাস্তরভাগী হয়ে সংসার চক্রে অনন্তকাল বিঘণিত হয়। মোক্ষ জীবের ঈদৃশ ক্ষুদ্র ‘আমিত্বের’ বিনাশ, কিন্তু তার প্রকৃত ‘জীবত্বের’ বিকাশ।

জীবত্বের বিকাশ অর্থ জীবের প্রকৃত স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ, নির্বাধপ্রকাশ ও পরিপূর্ণ উপলব্ধি। স্বরূপের দিক থেকে জীব প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, কিন্তু বন্ধাবস্থায়, সাংসারিক জীবনকালে জীব নিজের এই সংস্বরূপ, নিত্য রূপটি উপলব্ধি না ক’রে নিজেকে অনিত্য বা জন্ম-মৃত্যুভোগী মনে করে; নিজের চিৎস্বরূপ উপলব্ধি না ক’রে নিজেকে জড় দেহ-মনের সঙ্গে একোভূত মনে করে; এবং নিজের এই আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি না ক’রে নিজেকে পার্থিব শোক-ক্লেশাধীন মনে করে। একমাত্র মোক্ষকালেই জীব নিজের প্রকৃত, শাস্ত, জন্ম-বৃদ্ধি-মরণ-বিহীন, বিজ্ঞানঘন, আনন্দময় রূপটি পূর্ণ অচ্যুত্ব ক’রে ধন্য হয়। গুণের দিক থেকে রামানুজ-মতে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোকৃত্ব, অণুত্ব ও বহুত্ব জীবের স্বাভাবিক ধর্ম ব’লে মুক্তিকালেও এই ধর্মগুলি

অমুহুর্ত থাকে—কেবল তাই নয়, সেই সময়ে এদের পরিপূর্ণ রূপটিও জীব উপলব্ধি করে। বন্ধুজীবও জ্ঞাতা কিন্তু অল্পজ্ঞ, কৰ্তা কিন্তু স্বল্পশক্তি, ভোক্তা কিন্তু দুঃখী। একমাত্র মুক্তজীবই জ্ঞাতা ও সৰ্বজ্ঞ; কৰ্তা ও সৰ্বশক্তিমান; ভোক্তা ও পরিপূর্ণ আনন্দময়।

মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ

এইভাবে আত্মস্বরূপোপলব্ধি ক'রে জীব ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধি করে। 'ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির' অর্থ ব্রহ্মসাদৃশ্যোপলব্ধি। স্বীয় স্বরূপ ও গুণের পূর্ণতম, প্রকৃষ্টতম বিকাশ প্রত্যক্ষ অমুহুর্ত ক'রে জীব ব্রহ্মেরই গ্ৰায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং ব্রহ্মের সমস্ত গুণভাগী রূপটি প্রত্যক্ষোপলব্ধি করে। কেবল দুটি বিষয়ে সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নই থাকে।

প্রথমতঃ ব্রহ্ম বিভূ, মুক্তজীবও অণু—কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অণুজ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম বলে বন্ধ-মুক্তি-নির্বিশেষে জীব সর্বদাই অণুপরিমাণ।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম স্থিতি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা। জীব অন্ত্যন্ত বিষয়ে ব্রহ্মের গ্ৰায় সৰ্বশক্তিমান হলেও এই দিকে সে শক্তিহীন। এই দুই দিক ব্যতীত অন্ত্যন্ত সকল দিক থেকেই মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ ও ব্রহ্মতুল্য।

সুতরাং পূর্বেই যা বলা হয়েছে, মুক্তজীবও ব্রহ্মভিন্ন, ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্ম-শাসিত। সকল জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের আকর হয়েও সে ব্রহ্মের চিরদাস ও চিরসেবক।

মুক্তজীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন

শঙ্করের অষ্টৈতমতের বিরুদ্ধে রামানুজ বারংবার মুক্তজীবের ব্রহ্মভিন্নতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন শ্রীভাষ্যের ১-১-১ শ্লোকে তিনি বলছেন—'মুক্তস্ত স্বরূপমাহ। তন্তাবঃ ব্রহ্মণা ভাবঃ, স্বভাবঃ নতু স্বরূপৈক্যম্'। (পৃ: ১৬৬)। অর্থাৎ মুক্তজীব ব্রহ্মের ভাব বা স্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মসাদৃশ্য উপলব্ধি করে, ব্রহ্মস্বরূপৈক্য নয়।

এ স্থলে রামানুজ 'স্বভাব' ও 'স্বরূপ' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন (পৃ: ৩৭)। সাধারণ অর্থে এ দুটিকে সমার্থক বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি 'স্বভাব' অর্থে সাদৃশ্য বা ভিন্নাভিন্নতা এবং 'স্বরূপ' অর্থে অভিন্নতা গ্রহণ করেছেন এবং সেই অর্থেই তিনি বলছেন যে, মুক্তজীব 'ব্রহ্মস্বভাব' বা ব্রহ্মসদৃশ, কিন্তু 'ব্রহ্মস্বরূপ' বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন নয়। সে জন্য এ স্থলে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, মুক্তজীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। কারণ পূর্বেই বলা হচ্ছে না যে, মুক্তজীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রামানুজের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, ধর্মতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। সেজন্য মুক্তজীবও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, ধর্মতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন—অর্থাৎ সংক্ষেপে মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ।

বিদেহমুক্তিবাদ

রামানুজ বিদেহমুক্তিবাদী। তাঁর মতে জীবের সঙ্গে জড় দেহমনের ও জড়জগতের বন্ধাবস্থাকালীন সম্বন্ধ অজ্ঞানপ্রসূত ও তজ্জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা হলেও যতদিন পর্যন্ত অন্ততঃ জীব স্বয়ং সেই বন্ধনকে সত্য বলে মনে করে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জীব আপাতদৃষ্টিতে দেহমন-বন্ধ সাংসারিক জীবন যাপন করে ততদিন পর্যন্ত তার স্বরূপ ও গুণের বাধাহীন প্রকাশ ও উপলব্ধি তার পক্ষে সম্ভব নয়। উপরন্তু, সেই অবস্থায় দেহমনের অবস্থা, ধর্মাদিও সে স্বীয় আত্মায় আরোপ না ক'রে পারে না। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা, বেদনাভোগ প্রভৃতি দেহমনেরই অবস্থা ও ধর্ম। সেজন্য দেহধারী জীব এই সব অবস্থা, ধর্মাদি নিজের অবস্থা ও ধর্মাদি বলেই গ্রহণ ক'রে নিজেকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, রোগগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, বেদনাক্লিষ্ট বলে মনে করে।

এমন কি, মহাজ্ঞানী সাধকবৃন্দও এই সাংসারিক অবস্থা থেকে নিস্তার লাভ করেন না। যদিও তাঁরা জড়দেহ মন ও অজড় আত্মার মধ্যে পার্থক্য অবগত আছেন, তথাপি তাঁরা দেহমনের অবস্থা, ধর্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে সমর্থ হন না এবং দেহমনের দ্বারা অভিভূতও না হয়ে পারেন না—ফলে, এমন কি তাঁরাও ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট হন এবং বেদনাদি অহুভব করেন। সেজন্য মৃত্যুর পরই পার্থিব দেহশৃঙ্খলমুক্ত জীব মুক্তিলাভ করে, দেহবিশিষ্ট সংসারী জীব নয়। মুক্তিলাভের উপায় বা সাধনাবলীর যথাযথ পালনের দ্বারা সে মুক্তির অধিকারী হয়, এবং ফলে তার সমস্ত প্রাক্তন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মের ফল নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে যায়; কেবল প্রারম্ভ কর্মের বা যে কর্ম ফলপ্রদানে আরম্ভ করেছে সেই কর্মের ফল ধ্বংস হয় না, কারণ কেবল ভোগ দ্বারাই এরূপ কর্মের ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হতে পারে। সেজন্য প্রারম্ভ কর্মের ফলস্বরূপ যে বর্তমান দেহ, সেই দেহপাতের পূর্ব পর্যন্ত তাকে সংসারে অবস্থান করতে হয়। দেহপাতের পর সে মুক্তিলাভ করে, অর্থাৎ তার নূন দেহও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং সে জন্মজন্মান্তর বা সংসারচক্র থেকে শাস্বত নিষ্কৃতি লাভ করে। সুতরাং প্রারম্ভকর্মের ফলস্বরূপ এই দেহকে 'চরমদেহ' বলা হয়। চরমদেহধারী জীবও বহুজীব। অতএব রামানুজ-মতে বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি।

শ্রীভাষ্যের লঘুসিদ্ধান্তে রামানুজ অদ্বৈতবেদান্তসম্মত জীবমুক্তিবাদ খণ্ডন করেছেন (পৃ: ১৯-২০)। তিনি এ স্থলে বলেছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তমতে অদ্বৈতজ্ঞানই মুক্তির সাধন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে অদ্বৈতজ্ঞানোদয়ের পরেও জ্ঞানী দ্বৈতদর্শন করেন অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে মুক্ত হন না। সুতরাং সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, জীবমুক্তি অসম্ভব।

অন্যান্য বৈদান্তিকদের মতো রামানুজও বলেছেন যে, মুক্তি কেবল দুঃখাভাবই নয় পরিপূর্ণ আনন্দ-ধন অবস্থা। ব্রহ্মসদৃশ মুক্তজীব ব্রহ্মেরই স্থায় আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময়।

কমল:

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তার আবিষ্কার করলেন। এখানেই তাঁর সাধন জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। তাঁর মতিগতি, তাঁর মনের আকৃতির সঙ্গে এই উপলব্ধি সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। তিনি স্বভাবত কবি, তাঁর হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তিনি বিশ্বসত্তাকে শুধু জেনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তিনি তাঁকে অতিরিক্তভাবে পেতে চাইলেন। কিন্তু যে সত্তাকে তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি শুধু প্রচ্ছন্ন সত্তা নন, এক নৈব্যক্তিক সত্তা। তাঁকে পেতে হলে তাঁর সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন; কিন্তু যিনি নৈব্যক্তিক সত্তা তাঁর সহিত এই প্রকৃতির ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়।

এই ভাবে তিনি এক দোটানার মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর হৃদয় চায় বিশ্বসত্তার প্রকৃতি এমন হক যাতে তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয়; কিন্তু উপলব্ধি তাঁর যে পরিচয় এনে দিল তা বলে তিনি নৈব্যক্তিক সত্তা। এর সমাধান কি? উপলব্ধিকে অস্বীকার করে নিয়ে কি তিনি বিশ্বসত্তার উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করবেন? তাঁর মন তাও করতে চায় না। এই সমস্যার সমাধান তিনি এক অভিনব পথে করলেন। এ বিষয়ে মনে হয় তিনি প্রকৃতির কাছ হতে সমাধানের সূত্র পেয়েছিলেন কারণ একটি সহজলভ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য হতেই তার উৎপত্তি। সমাধানের এই সূত্রটি তাঁর একটি কবিতার মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

সেই কবিতার বিষয়টি হল এই। আকাশের সূর্য এত বিরাট যে তা কল্পনা করা যায় না। তা এমন প্রচণ্ড শক্তির আধার যে আকাশের মতই অস্বহীন পরিবেশ চাই তাকে ধারণ করবার জন্য। যা এত বিরাট, যার জ্যোতি কোটি কোটি মাইল অতিক্রম করে মহাকাশের এক বিশাল অংশ উদ্ভাসিত করে, তার কাছে পৃথিবীর বক্ষে অবস্থিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলি একান্তই উপেক্ষণীয়। প্রভাতকালে তৃণ খণ্ডের আগার যে শিশিরবিন্দুকে লক্ষ্যমান দেখা যায় তা এমনি একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু। কাজেই তার সূর্যের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছা হলে তা পূরণ করা সম্ভব নয়, কারণ সূর্য এত বিরাট যে তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা উচিত নয়। কিন্তু কবি এখানেও প্রীতির সম্বন্ধ ঘটেছে দেখতে পান। তিনি বলেন তা না হলে শিশিরকণা সূর্যের কিরণকে প্রতিকলিত করতে পারে কি করে?

তিনি তাই বলেছেন, তা এত ক্ষুদ্র আর তপন এত বিরাট যে তার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করবার কথা শিশিরবিন্দু ভাবতেই পারে না। তাই সে সূর্যের স্বপ্ন দেখেই তৃপ্তি খোজে। সে দুঃখ করে বলে :

‘হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিতে কে বা।

ওগো তপন তোমার স্বপ্ন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা।’^{২৮}

সূর্য তখন তাকে প্রত্যুত্তরে বলে যে সে বিরাট হলেও সে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন

করবার ক্ষমতা রাখে। শুধু ক্ষমতা রাখে না, তার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে উৎসুক ; তা না হলে শিশিরবিন্দুর বক্ষে প্রতিফলিত হয়ে এমন ঝলমল করবে কেন ? তাই সে উত্তর দেয় :

‘আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,

তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো।’

এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্তার সমাধান সূত্র পেয়েছিলেন। এটা মনে করার সপক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। আমরা দেখব তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সমস্তার যে সমাধান করেছেন তাও এই পথেই। স্বর্ষের এখানে দুটি ভূমিকা কল্পিত হয়েছে। একটি নৈব্যক্তিক ভূমিকা। সেখানে তার কাজ বিশ্বে কিরণ ছড়ানো। অণুটি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তার ভূমিকা। সেখানে তা শিশিরবিন্দুর মত ক্ষুদ্র জিনিসের সহিতও মিতালি করবার ক্ষমতা রাখে এবং করতে উৎসুক। আমরা দেখব তিনি যে দোটারনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার সমাধানও করেছিলেন অল্পরূপ পথে। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বিশ্বসত্তার যুগপৎ দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ ঘটে। একটি নৈব্যক্তিক প্রকাশ ; সেখানে তিনি এক বিরাট নৈব্যক্তিক মহাশক্তি হিসাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অপরটি ব্যক্তিরূপে প্রকাশ ; সেখানে তিনি ভদ্র বিশেষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসুক। এ বিষয় সবিস্তারে আলোচনা পরে যথাস্থানে হবে। তার আগে তিনি বিশ্বসত্তার ব্যক্তিরূপে প্রকাশ কি ভাবে উপলব্ধি করলেন তার আলোচনা ক’রে নেওয়া প্রয়োজন।

ভদ্র বিশেষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে উৎসুক পরম সত্তার ব্যক্তিরূপে যে প্রকাশ, তাকে ঘিরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্ব। ঠিক বলতে কি তিনি তাঁকেই ‘জীবনদেবতা’ নাম দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। তিনি কবির সমগ্র জীবনের কর্ণধার। তিনি নির্লিপ্ত অথচ কবির জীবনতরী অলঙ্ঘ্য হাল ধরে তাঁর জীবনকে নিত্য গড়ে তুলতে আনন্দ পান। কাজেই তিনি জীবনশিল্পীও বটেন। তাই তিনি বলেছেন : ‘এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অহুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি ‘জীবনদেবতা’ নাম দিয়াছি।’^{২২}

ভক্তের সঙ্গে এই জীবনদেবতার সম্বন্ধটি অনেকটা নাট্যপরিচালকের সঙ্গে মঞ্চশিল্পীর সম্বন্ধের সহিত তুলনীয়। উভয়েই ব্যক্তিরূপী সত্তা, উভয়ের মধ্যেই একটি প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান। পরিচালক নিজের অভিনয় করেন না, শিল্পী করেন। শিল্পী ভালো অভিনয় করলে তিনি তৃপ্তি পান, আনন্দ পান। শিল্পীর ভিতর দিয়ে পরিচালক নিজের তৃপ্তি খোঁজেন। সেইরূপ জীবনদেবতা কবির জীবনশিল্পীরূপে তাঁর জীবনকে মনের মত ক’রে গড়ে তুলতে আনন্দ পান। এই জগত্বেই বিশ্বসত্তার এই প্রকাশকে তিনি আনন্দের প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন।

এই জীবনদেবতা-তত্ত্বটি যুক্তি দিয়ে গড়ে তোলা একটি দার্শনিক তত্ত্ব নয়। প্রথমে ধীরে ধীরে তাঁর মতিগতির পথে তাঁর মনে ঊকি ঝুঁকি দিয়ে পরে হঠাৎ একদিন একটি দিব্য অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি এ বিষয় তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।^{৩০} এখানে সংক্ষেপে তার একটি বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

ঘটনাটি যখন ঘটে তখন তিনি পৈত্রিক জমিদারীর তত্ত্বাবধানের কাজে উত্তর বঙ্গে ঘুরতেন। সম্ভবত ঘটনাটি ঘটে তাঁদের পতিসরের কাছারি বাড়ীতে অবস্থান কালে। সেদিন সকালে প্রাতঃকালীন কাজকর্ম শেষ ক'রে এসে তিনি কুঠিবাড়ীতে ফিরে এসেছেন। স্নানের পূর্বে তিনি দোতলায় এক জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কাছেই বাজার। তার পাশে একটি মরা নদীতে প্রথম বর্ষণের জল জোয়ার এনেছে। হঠাৎ তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে একটি অমুভূতি আগল। তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর সমগ্র জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্য ক'রে একটি যোগসূত্র যেন রয়েছে। তাঁর মনে হল তাঁরই অন্তরে একটি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তা রয়েছেন এবং তিনি কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করছেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল যে একটি বিশেষ সত্তা তাঁকে এবং তাঁর বিশ্বকে ব্যাখ্য ক'রে আছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁর পূর্ণতম প্রকাশের সন্ধান করছেন।^{৩১}

এঁরই তিনি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়েছেন। মনে হয় 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' শীর্ষক কবিতাটি এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা। এই সত্তা তাঁর জীবনের কর্ণধার, তিনি কবির জীবনকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ইনি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হয়ে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠান নিয়েছেন যেন নিজেরই গরজে। ইনি ত্রিভুবনেশ্বর হয়েও ভক্তের সহিত প্রেমের বন্ধনে মিলিত হতে চান, কারণ ভক্তের জীবনকে সার্থকতা মণ্ডিত ক'রে তাঁর নিজেরই তৃপ্তি। তাই কবি বলেছেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপলব্ধির সমর্থন অন্তর্যমি কিছু পেয়েছিলেন। সে কথাও তিনি হিবার্ট বক্তৃতা মালায় উল্লেখ করেছেন। দুজায়গা হতে এই সমর্থনের উল্লেখ আছে। একটি হল উপনিষদের এক তাৎপর্যপূর্ণ বাণী এবং অপরটি হল বাংলার বাউলের সাধনতত্ত্ব। উপনিষদের সমর্থনের কথাটাই প্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বেতান্তের উপনিষদে একটি শ্লোক আছে। তার বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায় এই—দুটি পাখী আছে; তারা পরস্পরের সখা এবং এক সঙ্গে একই বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের একটি স্বপ্নাহ কল ভক্ষণ করছে, অপরটি ভক্ষণ না ক'রে বসে আছে।^{৩২} এই শ্লোকের মনে হয় একটি রূপক অর্থ আছে। মানুষের মধ্যে যেন দুটি সত্তা ক্রিয়া করে। একটি ভোগ করে এবং অপরটি বিকারহীন চিন্তে তার সাক্ষ্য হয়ে বসে থাকে। একটি জীবাত্মা এবং অন্যটি অন্তর্যামী আত্মা। শ্লোকে বর্ণিত বৃক্ষ যেন মানুষের দেহ, আর যে পাখী কল আবাদ করছে সে যেন ব্যক্তি মানুষ এবং যেটি উদাসীন বসে রয়েছে তা যেন পরমাত্মার সমস্থানীয়।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদেবতা-তত্ত্বের সমর্থন পেয়েছিলেন। যিনি ব্রহ্মরূপে অসীম এবং নৈব্যক্তিক সত্তা তিনি ব্যক্তির হৃদয়ে সীমায় আবদ্ধ হয়ে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হিসাবে ধরা দেন। এটি সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশের স্বীকৃতি বলেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, অসীমের সঙ্গে সীমাবদ্ধ

৩১ I felt sure that some Being who comprehended me and my world, was seeking his best expression in all my experiences, hinting them into an ever widening individuality which is a spiritual work of art.
—Religion of Man, The Vision.

ব্যক্তি মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের এটি একটি চিত্র। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে এই দুটি পাখীই আছে ; একটি হল বাস্তব যা সংসার করে এবং অপরটি হল মানসিক এবং অরূপ যা আনন্দ অনুভব করে।

রবীন্দ্রনাথ বাউল সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বের কথাও তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। এই সম্প্রদায় পরমসত্তাকে ব্যক্তিতে ভূষিত ক'রে মানুষরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ক'রে তাঁর পূজা করে। তাঁকে তারা নরনারায়ণ বলে, কারণ তিনি দেবতা হয়েও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য মানুষের মনে ধরা দেন। তাঁকে তারা তাই 'মনের মানুষ' বলে ; কারণ তাদের বিশ্বাস অরূপ আকারে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন। এই প্রসঙ্গে এক বাউল কবির একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় তার অনুবাদ দিয়েছেন :

তুমি হলে নরনারায়ণ।

এটা ভ্রান্তি নয় এ কথা সত্য।

তোমার মধ্যে অসীম সীমাকে খোঁজে,

পরিপূর্ণ জ্ঞান খোঁজে প্রেমকে।

আর যখন রূপের সঙ্গে অরূপ

প্রেমের বন্ধনে সংযুক্ত হয়

তখন প্রেম ভক্তি রূপে সার্থক হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বের আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বিশ্বসত্তারই এক ব্যক্তিরূপী প্রকাশ। তিনি অরূপ। তাই তাঁকে কোথাও 'অঙ্ককার ঘরের রাজা' বলে কল্পনা করেছেন, কোথাও 'অরূপরতন' বলেছেন। হৃদয়ের নিভৃত্তে তাঁকে একাকী পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। বিষয়টি তাঁর একাধিক প্রতীকধর্মী নাটকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার এখানে সবিস্তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি তাঁর প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন এই বলে যে ইনি সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত থাকলেও অন্তরের মধ্যে তাঁর আনন্দরূপকে উপলব্ধি করা যায়। এঁকেই তিনি 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতায় সীমার মাঝে অসীম বলে বর্ণনা করেছেন। যেখানে তিনি অসীম সেখানে তিনি বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে নৈব্যক্তিক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করছেন ; আর যেখানে তিনি অন্তর মনের মধ্যে ধরা দিয়েছেন সেখানে নিজেকে সীমার মধ্যে বেঁধে ব্যক্তিরূপী সত্তায় পরিণত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রতীক ধর্মী নাটক 'অরূপরতন'এর ভূমিকা হতে তাঁর এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে—আপন অন্তরের আনন্দরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে তুমুল মতবিরোধ আছে। বিতর্কের মধ্যে প্রকাশ করবার এখানে প্রয়োজন নেই। তবে উপরের ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য কিনা, তার সমর্থনে কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সমর্থন রবীন্দ্রনাথের নিজের বচন হতে উদ্ধৃত করাই সুক্টিযুক্ত। শ্রদ্ধাকার যখন নিজেরই ভাষা বেখে গেছেন তখন তাকেই সব থেকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের প্রতিপাত্ত হল বিশ্বস্তা ও জীবনদেবতা একই সত্তার দুই পর্যায়ে ভিন্ন প্রকাশ। একটি সর্বব্যাপী নৈব্যক্তিক সত্তারূপে, অপরটি ব্যক্তিরূপী ভক্তের সঙ্গে প্রীতির বিনিময়ে উৎসুক সত্তারূপে। মনে হয় তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে উল্লিখিত একটি মন্তব্য হতে এমন ধারণা হতে পারে যে বিশ্বদেবতা এবং জীবনদেবতা পৃথক সত্তা। মন্তব্যটি হল এই—'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহ চন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অশুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলে মনের মানুষ।'

মনে হয় একই বিশ্বস্তার দুই ভিন্নরূপে যে প্রকাশ এখানে তাদের পার্থক্য সূচিত করবার জন্যই এই মন্তব্য করা হয়েছে। তাঁরা যে একেবারে দুটি ভিন্ন সত্তা, তা এখানে স্পষ্টরূপে বলা হয় নি। অপরপক্ষে দেখা যায় তাঁর বিভিন্ন উক্তিতে তাঁদের একত্বই সূচিত হয়েছে। তার কিছু প্রমাণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় তা একরকম স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, যে শক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করছেন হতে পারে তা জীবনদেবতা হতে অভিন্ন, কিন্তু ব্যক্তিরূপে তিনি আমার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু।^{৩৩}

তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'সৌন্দর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা একই সত্তা, তবে তাঁদের ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্নরূপে প্রকাশ ঘটে থাকে। তিনি সেখানে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির বক্ষে যে এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তার একটা তাৎপর্য আছে। তা হল তাঁর ধারণায় ভক্তের নিকট পাঠানো প্রীতির নিদর্শন। তাঁর ধারণায় পরমসত্তার দুই বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ ঘটে। একটি প্রকাশ আছে বিশ্বের নিয়ামক শক্তিরূপে। তাকে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ বলেছেন। এখানে তিনি নৈব্যক্তিক সত্তার মত কাজ করেন। এখানে বিশ্ব নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত। এখানে মানুষ সে নিয়ম চলতে বাধ্য। তার ব্যতিক্রম নেই। আর একটি প্রকাশ আছে যাকে তিনি আনন্দরূপে প্রকাশ বলেছেন। এখানে বিশ্বস্তার জগৎ জুড়ে নানা সৌন্দর্যের নিদর্শন স্থাপন ক'রে যেন ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন, আমার প্রেম তোমায় দিচ্ছি, তোমার প্রেম আমাকে দাও। এখানে তিনি ব্যক্তিরূপী মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেন, কিন্তু ভক্ত এখানে ইচ্ছা করলে সাড়া দিতে পারে, নাও পারে। কারণ জোর ক'রে তো প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। তবে সাড়া না দিলে সে পরম সত্তার আনন্দরূপের পরিচয় পায় না। তিনি এখানে বন্ধুর বেশে আসেন, শাসন দণ্ড নিয়ে আসেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁর নীচের মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: 'এই জগৎ বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে এবং আনন্দের মূর্তি দেখতে পাই সৌন্দর্যে। এইজগৎ সত্যরূপের পরিচয় আমাদের অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে।'^{৩৪}

এর পরেও যদি কেউ মনে করেন আমাদের প্রতিপাত্তে ভ্রান্তির অবকাশ আছে, তা হলে জীবনদেবতা-তত্ত্বের সহিত বিশ্বস্তার সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ক'রে তাঁর নিজের যে একটি মন্তব্য আছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। মন্তব্যটি পাই একটি চিঠির মধ্যে। তাঁর সমালোচক টমসন তাঁকে সোজাশুজি চিঠি

৩৩ It may be that it was the same creative thing that is shaping the universe to its eternal idea; but in me as a person, it has one of its special centres of personal relationship.

—Religion of Man, The Vision

লিখেছিলেন জীবনদেবতা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা চেয়ে। উক্তরে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতেই এই ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায়। তিনি সেখানে স্পষ্টতই বলেছেন যে এই তত্ত্ব উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর মতে এই তত্ত্বের দুটি অঙ্গ আছে। একটি বৈষ্ণবের ঈশ্বরবাদের মত ঈশ্বর ও ভক্তের ব্যক্তিরূপে পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে। অপরটি উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের মত একটি সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নৈব্যক্তিক সত্তাকে গ্রহণ করে। ঈশ্বর একাধারে দুই। একরূপে তিনি ব্যক্তিবিশেষের প্রেমের ভিখারী এবং অপর রূপে বেদান্তের কল্পিত সকল বস্তুর ধারক সত্তাও বটে।^{৩৫}

জীবনদেবতা-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্য জীবনে তাঁর সাহিত্যকে চূড়ান্তরূপে প্রভাবান্বিত করেছিল। ঠিক বলতে কি দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে তাই তাঁর রচিত কবিতার প্রেরণারূপে ক্রিয়ানীল ছিল। ফলে সাহিত্যিক ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। একই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বিরামহীন ধারায় কবিতার পর কবিতা লিখিত হয়েছিল। সেই কবিতাগুলি সংখ্যায় এত বেশি যে তাদের নিয়ে তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তারা হল ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমান্য’ ও ‘গীতালি’। তিনটি গ্রন্থের প্রায় সকল কবিতা জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য করে লিখিত বললে ভুল হবে না। গ্রন্থ তিনটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। প্রথম প্রকাশিত হয় ‘গীতাঞ্জলি’। তাতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত কবিতাও কিছু আছে। কাজেই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জীবনদেবতা-তত্ত্ব তাঁর জীবনে পাঁচ বছরের অধিককাল মূলপ্রেরণার ভূমিকার অধিষ্ঠিত ছিল।

এই তিনখানি গ্রন্থে, বিশেষ করে ‘গীতাঞ্জলি’তে রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইতিহাসটি যেন কবিতায় রচিত হয়ে গেছে। যেমনি তাঁর ধারণা হল ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট হয়ে তাঁর সাহিত্যপ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন, অমনি তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ফুটে উঠল। তিনি মিলনের জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু প্রেমাস্পদ এলেন না। তখন বিরহবোধ ঘনীভূত হল। তাঁর পর তাঁর উপলব্ধি হল তিনি ত একটি রূপে আসেন না, তিনি প্রকৃতির মধ্যে নানা সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়ে তাঁর প্রীতির পরিচয় দেন। তাঁকে পেতে হলে বাহিরে খুঁজলে চলবে না, হৃদয়ে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে। এই উপলব্ধির পরেই মিলন ঘটল। সেই মিলনের যে আনন্দ তার উচ্ছ্বাস অনেক কবিতায় প্রতিফলিত। মিলন হলেও জীবনদেবতার সঙ্গে সম্বন্ধটি কি রূপ তাই নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেল। কবি তাঁকে চান বন্ধুরূপে, কিন্তু বাধা আসে পিতা বলে প্রণাম করে বসেন। এই বাধা কাটিয়ে যখন সাম্যের ভিত্তিতে উদ্বেলিত হল। তিনি তখন এই বুঝে তৃপ্তি পেলেন যে তাঁর যেমন ভুবনেশ্বরকে পাওয়া প্রয়োজন, যেমন তাঁকে না হলেও ভুবনেশ্বরের প্রেম সার্থকতা মণ্ডিত হয় না। এই ভাবে এই বিচিত্র ইতিহাসে কতকগুলি ক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল অবস্থা পাওয়া যায়। তারা হল—(১) জীবনদেবতাকে পাবার তাঁর আকুতি (২) না পাওয়ার বেদনা বোধ (৩) নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর প্রেমের পরিচয় লাভ (৪) তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্কার এবং সর্বশেষে (৫) পরম্পরের প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে প্রেমের বিকাশ তাতে উল্লাস বোধ। তাকেই তিনি সীমার মাঝে অসীমকে কেন্দ্র করে মধুর রসের বিকাশ বলেছেন।

৩: ‘The idea has a double strand. There is the Vaishnava dualism always keeping the separateness of the self and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual and is also the ground reality of all as in the Vedantic unification.’

এই পাঁচটি অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি নিজস্ব সাধনজীবনে কেমন ভাবে জীবনদেবতার সহিত পরিপূর্ণ মিলনের পথে এগিয়ে আসেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য তাঁর নিজের বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধিগুলি তাঁর এই সমগ্র রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হতেই সংগৃহীত হবে। কারণ এই কবিতাগুলি তাঁর মনের এই অবস্থার অল্পভূতি পরস্পরকে প্রতিফলিত করে।

যখন কবির মনে এই ধারণা জাগল যে বিশ্বস্তা জীবনদেবতা রূপে তাঁর প্রীতি পেতে উন্মুখ তখনই তাঁর হৃদয়ে তাঁকে পাবার জন্য আকুলতা উদ্বেল হয়ে উঠল। সে বিরহবোধের সহিত বোধ হয় শ্রীগোবিন্দের বিরহবোধের সহিত তুলনা চলে। এই অবস্থা স্মৃতিত করতে এই কাব্যংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ

ভুবনে ভুবনে রাজে হে।

কত রূপ ধ'রে কাননে সূধবে

আকাশে সাগরে রাজে হে ॥৩৬

দ্বিতীয় অবস্থার না পাওয়ার বেদনাবোধ যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন জীবনদেবতার সহিত বিচ্ছেদ একান্তই অসহ্য বোধ হল। তখন তিনি ধৈর্যহারা হৃদয়ের ককণ আবেদন জানানলেন। তাঁর এই তীব্র বেদনার অল্পভূতি এই কাব্যংশে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে মনে হয় :

তুমি এবার আমার লহো হে নাথ, লহো।

এবার তুমি ফিরো না হে—

হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো ॥৩৭

পরের অবস্থায় দেখি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কবির মন জীবনদেবতার প্রীতির স্পর্শ পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়েছে। ফলে তাঁর তীব্র বেদনাবোধের ওপর ছেদ পড়েছে এবং তার স্থান নিয়েছে উদ্বেল উল্লাস। এই অবস্থার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় নীচের ছুটি কাব্যংশে। কবির চেতনায় প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সৌন্দর্যের বিকাশ তা যেন জীবনদেবতার পাঠানো প্রেমের লিপি :

এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ।

এই-যে পাতার আলো নাচে সোনার বরণ।

এই যে মধুর আলসভরে

যেখ ভেসে যায় আকাশ-পরে,

এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃত করণ।

এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ ॥৩৮

তাঁর প্রীতির পরিচয়ে কবির যে উল্লাসবোধ তার সুন্দর পরিচয় পাই এই কাব্যংশে :

আলোর আলোকময় কর হে এলে আলোর আলো।

আমার নয়ন হতে আধার মিলালো মিলালো।

সকল আকাশ সকল ধরা

আনন্দে হাসিতে ভরা,

যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো ৷^{৩৯}

‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থে ‘সৌন্দর্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমাদের অন্তরাঙ্গার আমি ক্ষেত্রের একটি সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যাতায়াত আছে।’ তাঁর ধারণা, তিনি অরূপ, তাঁকে বাহিরে পাওয়া যায় না, তাঁকে হৃদয়ের অঙ্ককার মন্দিরে পাওয়া যায়, বাহিরে নয়। মনে হয় সেই উপলব্ধি যেন পরের অবস্থায় তাঁর মনে জেগেছিল। তার উল্লেখ নীচের কাব্যংশে পান :

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে

দেখতে আমি পাই নি।

বাহিরপানে চোখ মেলেছি

হৃদয়পানে চাই নি ৷^{৪০}

এর পরের অবস্থাতে পাই প্রীতির আদান-প্রদানের পরিচয়। কিন্তু এখানেও প্রথম অবস্থায় সাম্যের ভিত্তিতে সংকোচহীন মনে মিলনের উপযুক্ত মনোভাব ফুটে ওঠে নি দেখা যায়। মনের ইচ্ছা বন্ধুরূপে মিলবার, কিন্তু সংস্কার এসে বাধা দেয়; যিনি বড় তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন কি ক’রে? তাই বন্ধু বলে হাত না ধরে পারে প্রণাম ক’রে বসেন। এই সংস্কার ও ইচ্ছার দ্বন্দ্বের যে দোটানা তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় নীচের কাব্যংশে :

দেবতা জেনে দূরে বই দাঁড়ায়ে,

আপন জেনে আদর করি নে।

পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,

বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে।

আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে

আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে

সেথায় স্থখে বুকের মধ্যে ধ’রে

সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে ৷^{৪১}

এই সংকোচ ভাব অতিক্রম করবার পরেই জীবনদেবতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের পথ প্রস্তুত হল। তখনই সীমার মধ্যে অসীমের মিলনে মধুর রসের ধারা উৎসারিত হল। তখনই তিনি দৃষ্ট কর্তে এই কথা বলতে পারলেন :

‘তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর

তুমি তাই এসেছ নীচে।

আমায় নইলে, জিভুবনেশ্বর,

তোমার প্রেম হত যে মিছে ৷^{৪২}

গান্ধী-চেতনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি

দীপককুমার বড়ুয়া

সমস্থাপীড়িত আধুনিক যুগে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (২রা অক্টোবর ১৮৬৯—৩১শে অক্টোবর ১৯৪৮) এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি চির ভাস্বর, দীপ্যমান মহামুহূর্ত্তায়। কেননা অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে তিনি পৌছে গেছেন মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁর অমর জীবনকাহিনী অভিযাত্রী মানবদলকে প্রেরণা সঞ্চার করবে এবং সঠিক পথের নির্দেশ দেবে। গান্ধী এক বিরাট ধৈর্য ও অসীম ভালোবাসার প্রতিমূর্ত্তি। বজ্রকঠিন তাঁর দেহ। কিন্তু অমিত শাস্ত তাঁর স্বভাব।^১ পরম শত্রুর প্রতিও তাঁর অগাধ স্নেহ, অপার সৌজন্ম। অসীম তাঁর দীনতা। কারণ তাঁর সমগ্র চেতনা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বজ্রাধারায় প্রাবিত ও সঞ্জীবিত।^২ তাঁর সদা চঞ্চল দৃষ্টি আত্মা মহান তথাগতের নিকট নিবেদিত। প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রায় প্রথম পর্ব থেকেই গৌতম বুদ্ধের কর্ম ও বাণী গান্ধীকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করে। তাই গান্ধী স্বীকার করলেন—‘বুদ্ধ-চরিত আমি ভাগবত গীতার চেয়েও বেশি আনন্দের সঙ্গে পড়লাম। পুস্তকখানা হাতে নিয়ে শেষ না ক’রে থাকতে পারি নি।’^৩ বুদ্ধবাণীর সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম পরিচয় হয় ইংরাজি কাব্য ‘লাইট অফ এশিয়ার’ মারফৎ। কিন্তু এই গ্রন্থে স্তার এডুইন আরনল্ড বুদ্ধকে চিত্রিত করেছেন হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু উপকথার মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর বুদ্ধ একজন হিন্দু দেবতা। আরনল্ডের কাব্যে দেখা যায়, বুদ্ধ প্রশ্ন করছেন—‘আমার সাধ্য থাকতে আমি তো একটি মাত্র প্রাণীকেও কাঁদতে দেবো না। অথচ এ কেমন ক’রে সম্ভব যে, ব্রহ্ম এই বিশ্ব সৃষ্টি ক’রে তাকে দুঃখ বেদনায় পূর্ণ ক’রে রেখেছেন? কারণ তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন, আর বিশ্বের এই দুঃখ-বেদনার প্রতিকার না করেন, তবে তিনি মঙ্গলময় নন। আর যদি তিনি সর্বশক্তিমান না হন, তবে তিনি কেমন ভগবান?’ শুধু মানুষের বেদনায় নয়, সমগ্র প্রাণীজগতের বেদনাতেই বুদ্ধের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল। পৃথিবী থেকে মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই ভগবানের লীলায় তিনি বিশ্বাস করেন নি এবং উপদেশ দিয়েছিলেন—‘ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের মধ্যে সৃজনাত্মের সন্ধান করো না। ব্রহ্মকেও পাবে না, কোনো জ্ঞানও লাভ করবে না।’ সৃষ্টির আদি বিষয়ে বুদ্ধ ব্যস্ত নন। অনাদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্তও তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। কারণ তাঁর সকল চিন্তা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-কে নিয়ে পরিচালিত। তাই তিনি বললেন—‘যখন জীবন-মৃত্যু রয়েছে, রয়েছে আনন্দ-বেদনা, কার্য-কারণ, কাল-স্রোত তখন সেগুলিই কি যথেষ্ট নয়? কি প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানে, সৃজনাত্মের তথ্যে।’ সেজন্ম ঈশ্বর সম্পর্কে বুদ্ধ নীরব। অতীতকে গান্ধী আজীবন হিন্দু সংস্কারের মধ্যে লালিত এবং পরিবর্তিত। তাই তিনি ভগবানের নিকট অবিরত প্রার্থনা জানিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধ বলেছেন—‘প্রার্থনা করো না! অন্ধকার আলোকিত করে না। যা নীরব, তাকে প্রশ্ন করো না। নৈঃশব্দ্য বাক্শক্তিহীন।’^৪ জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধ অত্যন্ত নিরাশাবাদী। তবুও তাঁর নিকট জীবনের অসীম মূল্য রয়েছে। কারণ এই জীবনের পথেই নির্বাণের লক্ষ্যে জীবনকে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধ বিশ্বাস করেন, নির্বাণ-লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবন নিবস্তুর নীচ থেকে উঠে এবং উচ্চ থেকে নীচে আবর্তিত হচ্ছে। গান্ধীও বুদ্ধের জীবনচক্রে আংশিকভাবে

বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় তিনি ছিলেন বৈকুণ্ঠ-অভিলাষী। শ্রীর আরনন্দের বুদ্ধবিষয়ক উপবোধ পুস্তকখানি ছাড়া ঘেরোড়া জেলে থাকাকালীন তিনি নিয়মিত পাঠের জন্য অস্তুত বইয়ের সাথে কয়েকটি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থও সব সময় নিজের কাছে রাখতেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—পল কেয়স-এর 'গস্পেল অফ বুদ্ধ', ড. রিস ডেভিডস-এর 'লেকচারস অন বুদ্ধিজন্ম' এবং গুজরাটী ভাষায় লিখিত 'বুদ্ধ অনে মহাবীর'।^{১৫} এ ভাবে বৌদ্ধধর্মবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে গান্ধীজী ধীরে ধীরে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। বুদ্ধের তত্ত্বকথার মধ্যে চিন্তাবিকারকে জয় করার যে ইচ্ছিত আছে, বোহনহালের যেন তা এমনভাবে রেখাপাত করেছিল যে ধর্মের প্রতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত অহুয়াগ জেগে উঠলো তাঁর ক্ষমারে। ধর্মচর্চার দিকে তিনি রীতিমত ঝুঁকে পড়লেন। গান্ধী তাঁর সংগ্রামের নীতি ব্যাখ্যা করে লিখলেন—'এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় নাই, ...বুদ্ধ তাঁহার সংগ্রাম শত্রুর বিরুদ্ধে নকারিতা করেছিলেন, ফলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য মাথা নত করেছিল। মন্দিরে যারা বেসাতি করছিল ষ্ট্রী তাদের তাড়িয়ে দিলেন, ভগামির নিন্দা করলেন...ইহাই হ'ল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ। এঁদের প্রত্যেকের সংগ্রামের পশ্চাতে ছিল অপার করুণা।'^{১৬} পরস্পরে বিশ্বাসী হওয়ার তথ্যগতের মতো গান্ধীজী সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির উপরই অধিক নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যক্তির পূর্ণতম বিকাশের জন্য সমাজের একান্ত প্রয়োজন। তাই বুদ্ধ এবং গান্ধীকে অবশেষে সমাজেই ফিরে আসতে হয়েছে। বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন, করুণার বাণী, যেন সংঘ-জীবন পালনের উপদেশ। অপরদিকে গান্ধী নিজেকে সর্বহারার বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁরও নিকট ব্যক্তি মুখ্য এবং সমাজ গোণ। বুদ্ধের ন্যায় তিনি করুণার বাণী প্রচার করেন। কারণ জীবের হননে জীবের ব্যক্তিগত কর্মের সুযোগ দূরীভূত হয়। সেজন্য প্রত্যেক জীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হত্যার বিরতি, প্রয়োজন অহিংসা এবং করুণা। যা এ ক্ষেত্রে অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়মাত্র। সুতরাং বুদ্ধের মতো করুণা এবং অহিংসা গান্ধীজীর জীবনেও ধর্ম হয়ে উঠলো। শুধু এই দুই বিষয়ে নয়, আরো নানাভাবে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতির অপরিণীত প্রভাব গান্ধীজীর উপর পড়েছিল। দৈনন্দিন কর্মেও গান্ধীজী বুদ্ধের অনেক নির্দেশ যেনে চলতেন। তাঁর মৌন, বাকসংযম, ভাষণ ও আলাপনে প্রশান্ত ভাব এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে মনোভাব বহুলাংশে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। ত্যাগের প্রস্নেও গান্ধী বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'তিনি (যি: কলেনবেক) যি: খানের যি: ছিলেন। তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে বৈরাগ্য প্রবৃত্তি রহিয়াছে যি: খানের নিকট তাহা ধরা পড়ে এবং সেইজন্য তিনি আমার সহিত কলেনবেকের পরিচয় করাইয়া দেন। যখন পরিচয় হইল, তখন তাঁহার মখ ও খরচের বহর দেখিয়া আমি ডড়কাইয়া গেলাম। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে ধর্মবিষয়ে প্রেরণ করিলেন। তাহা হইতে ভগবান বুদ্ধের ত্যাগের কথা সহজেই উঠিল।'^{১৭} কারণ গান্ধী যেনে করতেন, বুদ্ধ ত্যাগমূলক সেবার আদর্শে জনগণকে প্রণোদিত করেছিলেন।

বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি গান্ধীজীর ঐকান্তিক অহুয়াগই ১৯২৭ সালে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বৌদ্ধ রাষ্ট্র সিংহলে। তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা আনবার জন্য সেখানকার বিজ্ঞোদয় মহাবিদ্যালয়ে এক বিরাট জনসভায় আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় পাঁচশত কারাব্যবস্থাপরিহিত বৌদ্ধ-ভিক্ষু গান্ধীজীকে ঘিরে ঐক্যকণ্ঠে আশীর্বাদী উচ্চারণ করেন। মহাত্মাজীকে তাঁরা বৌদ্ধসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘোষণা করলেন। অনেকের বক্তৃতায় এই অহুয়াগ প্রকাশ পেল যে ধর্মালোকের পুত্র মহেন্দ্র হরতো নবজন্ম লাভ করে

গান্ধী হয়েছেন। তাই তিরানগামার বৌদ্ধ মহিলা সমিতি তাঁকে যে অভিনন্দন-পত্র দেন তাতে প্রথমেই লেখা ছিল—‘অনেক শতাব্দীর পর আবার আপনার পবিত্র চরণ এই দেশের মাটি স্পর্শ করেছে।’ এ ছাড়া ১৯৩৮ সালে জাপানীরা যখন এশিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান রাষ্ট্র হয়ে উঠছে তখন মহাত্মাজী তাঁদের গৌতম বুদ্ধের নীতি পুনরালোচনা করতে এবং সেই বাণী পৃথিবীর বৃকে ছড়িয়ে দিতে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি জাপানীদের বৌদ্ধসংস্কৃতি সংরক্ষণের দায়িত্বের কথাও শ্রবণ করিয়ে দেন। তা ছাড়া দিল্লীতে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব কটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সভায় মহাত্মাজী বলেন—‘...যে সকল মহামানব পশ্চিমকে জ্ঞান দান করেন তাঁদের মধ্যে জোরোয়াষ্টারই প্রথম, তিনি ছিলেন প্রাচ্যের লোক। বুদ্ধ তাঁর অনুগামী, তিনিও ভারতবর্ষ অর্থাৎ পূর্ব-দেশের লোক।’ ঐ সম্মেলনে যোগদানকারী তিব্বতী প্রতিনিধিকে গান্ধীজী বলেন—‘বুদ্ধের বাণী জাগ্রত ক’রে তোলাই আপনাদের কর্তব্য।’ বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে গান্ধীজীর সচেতনতার পরিচয় তাঁর দিনপঞ্জীতেও পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর নয়াদিল্লীর বিড়লা ভবনে ব্রহ্মের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গান্ধীজী লেখেন—‘ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খুব বিনয় প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, ভৌগলিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি খুব পুরাতন।...ব্রহ্মদেশের বন্ধুদের আমি শ্রবণ করাইয়া দিতেছি, তাহারা বৌদ্ধধর্ম এই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছে। ফুদীদের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যাহা শ্রেষ্ঠ বস্তু তাহাই যেন তাঁহারা ভারত হইতে গ্রহণ করে।’^৮

বুদ্ধ প্রদর্শিত নৈতিক ডিস্তির উপর গান্ধী রাজনৈতিক উত্থানের সোধ রচনা করেন। অস্বল্প অপেক্ষা নৈতিক বলের শক্তি যে বেশি এই বিশ্বাস তিনি নিজ হৃদয়ে পোষণ করতেন এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ ক’রে নানাক্ষেত্রে সকল হন।^৯ জীবন সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মামুসারী। তাই মহাত্মাজী বলেছেন—‘ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ আমাদের এ উপদেশ দিয়েছেন এমন সব কথা যা দ্বারা, যে কথা কখনও ভুলবার নয় যে, এই জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, এই জীবন মায়ার মতো ছায়াময়।’^{১০} বস্তুত বিত্তহীন প্রকৃতি বিশ্বাস যুক্তি এবং বিচারকে পাথের ক’রে সহযোগী বিশ্বে তিনি বুদ্ধের এক অনুগত শিষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং যতই সময় অতিক্রান্ত হবে ততই আমরা অনুভব করতে পারবো, বৌদ্ধ সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত গান্ধীর জীবন বিংশ শতাব্দীর গগনে এক নূতন সূর্যোদয়। ষষ্ঠপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শাক্য রাজপুত্র শান্তি অহিংসা ও প্রীতির যে আদর্শের সূচনা করেছিলেন তাকে চরম অবস্থার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার উপায় গান্ধী তাঁর জীবনের ধ্যান জ্ঞান চিন্তা কর্মের দ্বারা দেখিয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন বস্তুবাদপীড়িত উদ্ভ্রান্তির পৃথিবীতে আন্তরিক্য সমৃদ্ধ একটি বিশ্বাসের প্রদীপ যা হ’ল এক জীবন্ত সত্যের প্রতীক। তাঁর জীবনের তেজ সমগ্র বিশ্বে সঞ্চারিত হয়েছে, মানবের সকল মানিয়া মার্জনা ক’রে নিতে চাইছে। তাঁর তেজোদীপ্ত সাধকের মূর্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার ক’রে আছে। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, স্বীয় ভ্রম তাঁকে ধ্বংস করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তাঁর মন অপ্রমত্ত। তাই মানবসমাজ তাঁকে ‘মহাত্মা’ বলে সম্বোধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—‘মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। তার আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ,

চাকাকড়ি-ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার ক'রে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেননা সকলের ক্ষমতে তাঁর স্থান, তাঁর ক্ষমতে সকলের স্থান।^{১১১} গান্ধীর মধ্যে এই বিশিষ্ট মানবিক গুণগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল বলেই তাঁকে 'মহাত্মা' আখ্যা দেওয়া হয়। দীর্ঘকাল যেন তাঁর অস্থি উৎসর্গ করেছিলেন বঙ্গাধির প্রভুত্বকরে, গান্ধীর মৃত্যুও তেমনি মানবমনের চিরন্তন অয়মোষণার 'অভীঃ'-মন্ত্রটি তুলে দিল জাতির উত্তরাধিকাররূপে।

২

বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি বিষয়ে মোহনদাস গান্ধী অতিশয় প্রভাবিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনায় তিনি তা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিক সেই মহান পুরুষের ব্যক্তিত্বে এবং সমুদ্রত মহিমায় মোহনদাস একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন—'এ কথা বলতে, এই সত্যকে স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে আমি ভগবান তথাগতের জীবনাদর্শ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রেরণা লাভ করেছি। বুদ্ধদেবের ভাবধারা-সম্পর্কীয় যে উচ্চাঙ্গের অমূল্যত্ব, আমি তা অনুভব করেই শুধুমাত্র নিশ্চয় হয়ে থাকি নি। আমি আরও জেনেছি, ভগবান বুদ্ধদেব হলেন চিরন্তন প্রার্থনারত বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধদেবের নানাবিধ মূর্তির দিকে তাকিয়েই দেখা যাবে যে বৌদ্ধধর্ম হ'ল এক সুদীর্ঘকালের অনন্ত প্রার্থনার প্রতীক।'^{১১২} সেজন্য গান্ধী মনে করতেন, গৌতম বুদ্ধের পথ ছিল সত্যিকারের ধর্মের পথ, জ্ঞানের পথ; তাঁর বাণী চিন্তা আদর্শ স্বপ্ন ও সাধনা ছিল মহান নীতির দ্বারা গৌরবময়, অতি শ্রদ্ধের এবং ত্যাগ-বিশুদ্ধ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জন্ত তথাগত পরম করুণার বাণী প্রচার ক'রে ধরনীতলকে কলঙ্কশূন্য ক'রে গেছেন। ধর্ম ও নীতির যে ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপিত করেছেন তা মানবসমাজের পরিধির চাইতেও অধিকতর সুদূরপ্রসারী। বুদ্ধের উপযুক্ত শিষ্যরূপে মোহনদাসও জীবনাদর্শের বিশুদ্ধতার প্রতি এবং খাঁটি ভাবাদর্শের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন—'পৃথিবীতে যদি এমন কোনো আদর্শবাদী শিক্ষক, ধর্ম উপদেষ্টা বা ধর্ম প্রচারক থেকে থাকেন, সেই উপদেষ্টা কার্যকারণ-সম্বন্ধ ও কর্মফলের চিরন্তন নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তবে তিনি হলেন গৌতম বুদ্ধ।' কারণ রাজপুত্র সিদ্ধার্থই বলেছিলেন ব্যক্তিগত সুখশান্তি নিঃশেষে বর্জন ক'রে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে শান্তি ও সুখের অংশ ভাগ ক'রে নিতে। সত্য আবিষ্কারের জন্ত এবং সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত তিনি অপরিমিত দুঃখভোগ করেছিলেন। অন্তর্দিকে গান্ধীর সম্পূর্ণ জীবনও সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত ছিল। মহাত্মাজী জানেন, ভারত পাকিস্তান চীন জাপান কোরিয়া তিব্বত ব্রহ্মদেশ সিংহল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বুদ্ধ-বাণী ও বৌদ্ধসংস্কৃতি এখনও অতি স্পষ্ট ও কার্যকরীভাবে বর্তমান। কিন্তু এশিয়ার এই ধর্মীয় আদর্শ শুধুমাত্র এশিয়ার নিজের জন্ত নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্ত। তাই গান্ধী এশিয়ার জনসাধারণকে গৌতম বুদ্ধের অমৃতবাণী পুনরায় নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রে সমস্ত পৃথিবীর উদ্দেশ্যে প্রচার করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।^{১১৩}

মোহনদাস গান্ধী বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধের অন্ততম অবদান হ'ল মানবসমাজের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার মহান নীতি ঘোষণা। মানুষ যত হীন হোক, নীচ হোক, পাপী হোক, স্বর্ণ্য হোক তথাগত সকলের প্রতি সমানভাবে ভালোবাসার এক মহান আদর্শ প্রচার ক'রে গিয়েছেন। একদিন বুদ্ধের ক্ষম

ভয়ানকভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল, তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ নিদারুণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছিল চিরাচরিত এক সংস্কারের বিরুদ্ধে, যে সংস্কারের বশে অনেক ভারতবাসী দেবতার তুষ্টির জন্য দেবতার নিকট জীবন্ত পশুও বলি দিতেন। প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে বুদ্ধ তাই বলেছিলেন, যে ঈশ্বর স্বীয় সৃষ্ট জীবের বলি লাভ ক'রে পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সেই ঈশ্বর ঈশ্বরই নন। অন্তরূপে বলা যায়, বুদ্ধ মনে করতেন ধারা ঈশ্বরের তুষ্টিবিধানের জন্য পশু বলিদান ক'রে থাকেন তাঁরা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হন।^{১৪} তিনি এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানবসমাজের যারা সবচেয়ে নীচ, জীবজগতে যে সকল জীব অত্যন্ত স্থণ্য ও হীন, তাদের প্রতিও সমান ব্যবহার করতে হবে।^{১৫} বুদ্ধের এই অপরিমীম প্রেম সম্পর্কে গান্ধী নিজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। 'লাইট অফ এশিয়া' গ্রন্থের একটি অংশে তিনি পড়লেন, কিভাবে সেই পরম করুণাময় তথাগত ক্রোধোন্মত্ত ও অজ্ঞান ব্রাহ্মণদের হাত থেকে একটি মেঘশাবককে নিজের কাঁধের উপর তুলে ধরে রক্ষা করেন। কারণ ঐ ব্রাহ্মণরা চেয়েছিলেন যে নিরীহ মেঘশাবকটিকে দেবতার নিকট বলি দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করতে। কিন্তু বুদ্ধ বীরদর্পে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে সাহসের সঙ্গে বলেন, যেন তাঁরা একটিও মেঘশাবককে বলি না দেন। বুদ্ধের শুধুমাত্র উপস্থিতিই ব্রাহ্মণদের শক্ত, পাষণ-হৃদয়কে কোমল ক'রে দেয়। ব্রাহ্মণগণ প্রভুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং এইভাবে প্রত্যেকটি মেঘশাবকের প্রাণ রক্ষা পেল।^{১৬} এই ঘটনা গান্ধীজীর তরুণ জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবস্থানকালে মহাত্মাজী বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। তিনি অমূল্য করলেন, খৃস্টের প্রেম অপেক্ষা বুদ্ধের প্রেমের প্রসার ছিল বিপুলতর। কারণ প্রাণীমাত্রেয় প্রতি প্রেম যিগুর জীবনে দেখা যায় না। তা দেখা যায় বুদ্ধের জীবন ও সাধনায়। এ প্রসঙ্গে তিনি এক দুঃখময় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি তখন ভারবান শহরে বাস করছিলেন। তাঁর 'আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—'(আমি) এই সময় অন্য একটি খৃস্টান পরিবারের সংস্পর্শে আসি। তাঁহাদের ইচ্ছায় আমি প্রতি রবিবারে ওয়েসলিয়ান গির্জায় যাইতাম। প্রায় প্রতি রবিবারেই সন্ধ্যায় তাঁহাদের বাড়ীতে ভোজন করিতে হইত।...যে পরিবারে আমি প্রতি রবিবারে যাইতাম, সেখানে যাইতে শেষে এক রকম নিষেধ করাই হইয়াছিল বলা যায়। গৃহিণী সরল, সাধাসিধা হইলেও খানিকটা সঙ্কীর্ণ-মনা ছিলেন। তাঁহার সহিত সব সময়েই কোনো-না-কোনো ধর্মচর্চা হইতই। সেই সময় আমি 'লাইট অফ এশিয়া' বইখানি পড়িতেছিলাম। আমরা যিগু ও বুদ্ধের জীবনের তুলনামূলক বিচার করিতে লাগিলাম। 'দেখুন না গোঁতমের দয়া। সে দয়া মানুষ জাতিকে লজ্জন করিয়া অন্য সকল প্রাণী পর্যন্ত পহুঁছিয়াছিল। তাঁহার কাঁধের উপর ছাগল ছানাটা তুলিয়া লইয়াছিলেন; আর সে খেলিতেছে এই দৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া আপনার হৃদয় কি প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না? প্রাণীমাত্রেয় প্রতি এই প্রেম আমি যিগুর জীবনে দেখিতে পাই না।' ভয়ীর দুঃখ হইল। আমি বুকিতে পারিলাম। এই আলোচনা আর বাড়াইলাম না।'^{১৭} এই ঘটনার কিছুদিন পর উক্ত মহিলার অনুরোধে তিনি ঐ গৃহে যাতায়াত বন্ধ করলেন। যিগু সহজে এরূপ যন্তব্যে গান্ধীজী তাঁর গোঁড়া খৃস্টান বন্ধুর বন্ধুত্ব হারালেন। তবুও বুদ্ধের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল। বাস্তবিকই বুদ্ধের প্রেম, তাঁর অপরিমীম ভালোবাসা যা বিশ্বের নিরস্ত্রদের জীবনের প্রতিও প্রসারিত হয়েছিল তা সংগোপনে সঞ্চারিত হয় মোহনদাসের মনে।

বৌদ্ধসংস্কৃতির সহস্রাবার গাছীর সমগ্র জীবন প্রাবৃত্ত এবং সম্বীভিত। তাই দেখা যায়, মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধকে, মাধুত্ব দ্বারা অসামুকে, ত্যাগের দ্বারা কপণকে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করায়^{১৮} বুদ্ধের মহান বাণীর প্রয়োগ এবং পরীক্ষাই ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্ম। মনে হয়, গাছীর পার্শ্ব জীবন প্রেম ও মৈত্রীর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করার জন্যই ব্যাপৃত ছিল। তিনি লিখেছেন—‘বুদ্ধ নির্ভর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কলে উদ্ভূত পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহার কাছে নতি স্বীকার করিয়াছিল।... প্রেমের মহিমায় যদি পুরোহিত সম্প্রদায়কে নিজ মতে না আনিতে পারিতেন তবে বুদ্ধদেব তাঁহাদের প্রতিরোধের চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেন।’^{১৯} এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার-এর আদর্শ স্বরণ করা যেতে পারে। গৌতম বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারে সাধনার পথে মানুষকে প্রবর্তিত করার জন্য বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। হৃদয় এবং হৃদয়ের জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেক মানবসত্তাকে কামনা করতে হবে—‘সকল প্রাণী স্থখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, স্থখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক,’^{২০} নিরাপদ হোক, স্থখ হোক। প্রেম মৈত্রী দ্বারা বাধাহীনভাবে বিস্তার করার উপায়ই হ’ল মৈত্রীসাধনা যার দ্বারা পূর্ণ মানুষের বিকাশ সম্ভব। ক্রোধ, ঘেব, লোভ এবং ঈর্ষা-শূন্য চিন্তে মৈত্রীভাবনা অনুশীলন করতে হয়। এই অনুশীলনের অঙ্গরূপেই প্রয়োজন পরস্পর পরস্পরকে বকনা না করা, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা না করা, কারো বাক্য বা মনে ক্রোধ ক’রে অন্যের দুঃখ কামনা না করা। যা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আত্মা দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। উর্ধ্বে অধোতে চতুর্দিকে সমগ্র জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস ও মৈত্রী রক্ষা ক’রে এবং এই অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত ক’রে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। বুদ্ধের এই উপদেশ গাছীর জীবনে আশ্চর্যসুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজনীতি, সমাজসংস্কার, স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বভাবনার মধ্যে যোহননাম তাঁর অরূপম প্রেম ও মৈত্রীর নিদর্শন রেখে গেছেন। মনে হয়, বুদ্ধের এই শাস্ত বাণীকে স্বীয় দর্শন ও কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করতে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ মনেপ্রাণে তিনি অনুভব করেছিলেন, মৈত্রী প্রেম সহস্রদ্বার এই অমের বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহৎ জীবনের অঙ্গুর। তাই জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন বুদ্ধের ব্রহ্মবিহারের আদর্শে।

অহিংসা শব্দটির সঙ্গে সত্যতার ইতিহাসে পাঁচটি নাম—বুদ্ধ, কৃষ্ণ, টলস্টয়, রোঁলা এবং গান্ধী—সহজে মনে পড়ে। অহিংসা-নীতিতে গান্ধীজী দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, সত্যেরই অন্য একটি নাম হ’ল অহিংসা। এদিক থেকে মহাত্মাজী বুদ্ধোপদেশের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। বুদ্ধ-নির্দেশিত পঞ্চশীল-এর প্রথম শীল হ’ল—প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা। গান্ধী আজীবন এই সঙ্গপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। বুদ্ধের আদর্শে ধর্মাচরণের অর্থ ই হ’ল প্রাণের প্রতি গভীর প্রজ্ঞার ভাব পোষণ করা এবং এই আদর্শে গান্ধীও দৃঢ় আস্থাবান ছিলেন। আহায়ে বিহারে আলাপ-আলোচনার-আচরণে তিনি কখনও এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। গান্ধী-চেতনায় অহিংসা-নীতি বহুলাংশে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এবং এই অহিংসা-নীতিকেই তিনি রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন—‘যথোচিত দীনতা সহকারে আমি নিবেদন করতে চাই যে, সত্য এক অহিংসা দ্বারা ভারত তার লক্ষ্য উপনীত হলে যে আন্তর্জাতিক শক্তির জন্য সমগ্র জাতিপুত্র প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানকে মোটেই নগণ্য বলা চলেবে না এবং তা হলে

যে সমস্ত জাতি তাকে মুক্তহস্তে সাহায্য দিয়েছে তাদের সে দানের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানও দেওয়া হবে।^{১২১} মহাত্মাজী বিশ্বাস করতেন, কেবল সত্যাশ্রয়ী, অহিংস ও শুদ্ধাশ্রয়ী সমাজবাদীরাই ভারতবর্ষ এবং সকল বিধে সমাজবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবেন। কারণ তিনি মনে করেন— ‘অহিংসা হইল মানবজাতির ধর্ম; যেমন হিংসা হইল পশুদের ধর্ম। পশুর মধ্যে আত্মবোধ স্বপ্ন থাকে এবং দৈহিক ক্ষমতার বাহিরে আর কোনো ধর্ম সে জানে না। মানুষের মর্যাদার অন্য প্রয়োজন উচ্চতর ধর্মের আত্মগত্যা স্বীকার, আত্মার শক্তির নিকট নতি স্বীকার।’^{১২২} অহিংসার যে এক কার্যকরী প্রভাব রয়েছে সে বিষয়ে গান্ধীজী বিশেষ সচেতন। বুদ্ধের অহিংসা-নীতির প্রতি তিনি অতিশয় প্রভাবিত ছিলেন। তাই কর্মে বাক্যে এবং ভাবনায় তিনি বুদ্ধপ্রদর্শিত অহিংসা-নীতিকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন—‘আপনারা যারা বুদ্ধদেবকে আপনারদের গুরু বলে মেনে নিতে রাজী আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অহিংসা ধর্মের সীমাহীন সম্ভাবনাকে ভালো ক’রে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাবেন। অহিংসার মূল্য অসামান্য। মানুষ যে মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎকে এত বেশি মূল্য দেয় তার চেয়েও কোটি কোটি গুণে বেশি মূল্য অহিংসা ধর্মের।’ গান্ধীজী আরও মনে করেন, ঠিক ঠিক মতো বুঝতে পারলে এবং কাজে লাগাতে পারলে অহিংসা ধর্ম অসাধারণ রকমের কার্যকরী শক্তিতে পরিণত হতে পারে, যে লোক অহিংস নয়, তার কর্মধারা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী থাকে ততক্ষণ সবাই দেখতে পায়। কিন্তু এর শক্তি সাময়িক। চেকিস খাঁর হত্যাকাণ্ডের মতোই তার ক্ষম একেবারে নগণ্য। সেজন্য গান্ধীজী বলেছেন—‘ভগবান বুদ্ধদেবের অহিংসা নীতির যে প্রতিক্রিয়া তা যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান এবং যত দিন কেটে যাবে ততই তার প্রভাব অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠবে।’^{১২৩} প্রাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা গান্ধীজীর জীবনদর্শনের মর্মকথা। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন বুদ্ধের অনন্ত ডক্ত ও শিষ্য। কারণ দেখা যায়, যথার্থ বুদ্ধ-শিষ্যের মতো তিনি তাঁর চিন্তায় ও কর্মে অহিংসার সর্বগুণি অনুশীলন ক’রে গেছেন। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো একটি স্থল কর্মকাণ্ডেও তিনি অহিংসা-চ্যুতি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর কাছে মুক্তিগ্রাম ও অহিংস আন্দোলনের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না। কারণ উপায় এবং উপায়ের মধ্যে কোনোরূপ স্বরূপান্তর তিনি মানেন নি। বুদ্ধ যেমন রাজধর্মকে অহিংসায় দীক্ষিত ক’রে, লোকধর্মকে অহিংসায় সম্পৃক্ত ক’রে সমাজজীবনের সর্বত্র অহিংসার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, তেমনি গান্ধীও চেয়েছিলেন ক্ষমতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্বভূমি রাজনীতি এবং যা নির্বিশেষ সম্পর্কের বন্ধন তাকে অহিংসার ভিত্তিতে স্থাপন ক’রে অহিংসার দ্বারা সম্পৃক্ত ক’রে সমাজমুক্তি আনয়ন করতে। বুদ্ধের মতো মানুষের দুঃখের অত্যন্তিক নিরুত্তি সাধন গান্ধীর লক্ষ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য অনেকটা সাময়িক তথা উপলক্ষিক।^{১২৪} এখানে মহাত্মাজীর জীবনের একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯১১ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলকাতায় এসে তিনি একদিন কালীঘাটের কালীমন্দির দেখতে গেলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরে ছাগবলি আরম্ভ হয়ে গেছে। তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে ঐ স্থান। আতংকে গান্ধীজী শিউরে ওঠেন। এই দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর মনে পড়ে যায় বুদ্ধের অহিংসার কথা। বেদনাধির হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করলেন। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে পরে তিনি এক বাক্যে বুদ্ধকে তাঁর অসহনীয় বেদনার কথা জানান। আত্মজীবনীতেও গান্ধী কলকাতার কালীমন্দির দর্শনের অভিজ্ঞতা লিখেছেন—‘কালীচরণ ব্যানার্জী আমাকে কালীমন্দিরের কথা বলিয়াছিলেন। আমার

সেই মন্দির দেখার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। ইহার বর্ণনা পুস্তকাদিতে পড়িয়াছি। সেইজন্য একদিন গিয়া উপস্থিত হইলাম।...রাস্তায় দেখিলাম সারি সারি ছাগ বলি দেওয়ার জন্ত লইয়া যাওয়া হইতেছে।... আমরা মন্দিরে গেলাম। সম্মুখে বুদ্ধের নদী বহিতেছে। উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিলাম না। আমার উদ্বেজনা বোধ হইল, অবস্টি বোধ করিতে লাগিলাম। সেই দৃশ্য আমি আজ পর্যন্তও ভুলিতে পারি নাই।...এই হত্যার প্রথা বন্ধ হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেবের সে কথা শ্রবণে আসিল। কিন্তু আমি দেখিলাম—ইহা আমার শক্তির অতীত।...আমার নিকট একটা ছাগের জীবনের মূল্য মানুষের জীবনের মূল্য অপেক্ষা কম নয়। মানুষের দেহ বাঁচাইবার জন্ত ছাগের দেহ নাশ করিতে আমি প্রস্তুত নই। যে জীব যত বেশি নিরাস্রয় তাহার মানুষের কাছে, মানুষেরই অসুষ্ঠিত হিংসা হইতে বাঁচিবার দাবি তত বেশি আছে বলিয়া আমি মনে করি।...জানী, বুদ্ধিমান, ত্যাগ-বৃষ্টি-পূর্ণ ভাবপ্রধান বাঙালী জাতি কেমন করিয়া এই হত্যাকাণ্ড সহ্য করিতেছে?''^{২৫} গান্ধী এখানে বুদ্ধ এবং ছাগ শিশু সম্পর্কের বহল প্রচারিত বৌদ্ধ কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মর্মস্পর্শী ভাষায় 'লাইট অফ এশিয়া'র ছাত্রাবলম্বনে রচিত তাঁর নাটক 'বুদ্ধদেব-চরিত'এ এই ঘটনা বিবৃত করেছেন।^{২৬} কাহিনীর অঙ্কে দেখা যায়, বুদ্ধ তাঁর অন্ততমর উপদেশে মহারাজ বিম্বিসারের হৃদয় জয় করলেন। রাজ্যময় প্রাণীহত্যার মত বন্ধ হ'ল এবং বিম্বিসার এই বকম মন্ত্রের অসারতা উপলব্ধি করলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত গান্ধীর অহিংসা-নীতি সম্বন্ধে বোঁমা বোঁলা বলেছেন—'তাঁহার (গান্ধীজীর) অহিংসার মতবাদ দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ভারতের অন্তরলোকে মুদ্রিত হইয়া আছে। মহাবীর, বুদ্ধ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় অহিংসাকে কোটি কোটি মানুষের আত্মার অন্তরতম বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। গান্ধীজী কেবল ইহার মধ্যে শৌর্ষের সংযোগ করিয়াছেন মাত্র। অতীতকালের যে মহাবাহী, যে মহাশক্তি মুমূর্ষু স্ববির হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি কেবল তাহাকে আশ্রয় করিয়া সচকিত সজীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাণী, এই শক্তি, তাঁহার মধ্যে আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। কিন্তু গান্ধী কেবল বাণীই নহে, তিনি বাণীরও অধিক, তিনি দৃষ্টান্ত। তিনি জনসাধারণের অন্তরাত্মার প্রতিমূর্তি।''^{২৭} বস্তুত বুদ্ধ এবং গান্ধীর ভূমিকা কেবল বাণী বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের ভূমিকা ছিল অন্তত অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের। দ্বিতবন্ধার সঙ্গে উভয়েই সংগ্রাম করেছেন, উভয়েই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন অহিংসাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অহিংসার ধারণা-সম্পর্কে বুদ্ধ ও গান্ধীর মধ্যে একটা মৌলিক ও ধারাবাহিক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বুদ্ধের অহিংসা হ'ল সকল সম্পর্কের নিরসন, গান্ধীজীর অহিংসা হ'ল মানবিক সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। বুদ্ধের অহিংসা মুখ্যতঃ মানুষের সর্বকালীন প্রব্লেম সমাধানে রত এবং গোপতঃ সাময়িক সামাজিক অন্ত্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গান্ধীজীর অহিংসা মুখ্যতঃ সাময়িক অন্ত্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার এবং গোপতঃ মানুষের সর্বকালীন প্রব্লেম একটি বিকল্প উত্তর। গান্ধীজীর নিকট অহিংসা শক্তি হিসাবেই ছিল বেশি গ্রাহ্য; বুদ্ধের নিকট অহিংসা হ'ল অবিকল্প এক অন্তিম অবস্থা। গান্ধীর অহিংসা-বোধ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য মনন ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট। অথচ বুদ্ধোপদিষ্ট অহিংসা-শীলে তিনি আমৃত্যু একনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছিলেন। সত্য্যগ্রহ আন্দোলনেও গান্ধীজী বুদ্ধের অহিংসা-নীতিকে মেনে চলেছেন। তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মচরাচর অহিংসা-নীতি সম্পর্কে আলোচনা হ'ত। তাঁরা পথভ্রষ্ট হলে তিনি বলতেন—'সত্য্যগ্রহী তিনিই হতে পারেন যিনি অহিংসাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন।' এ প্রসঙ্গে

তিনি আরও বলতেন—‘আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি ভগবান বুদ্ধ কেন ‘সম্যক আত্মীব’ বা সংজীবিকার উপর এতো জোর দিয়েছেন।’ তাই বলা যেতে পারে, বুদ্ধ অহিংসার যে মহাকাব্য রচনা করে গেছেন, গান্ধী তারই আধুনিক ভাষ্যকার।

খাদি আন্দোলন সফল করার জন্তও যে বুদ্ধবাণী একান্ত অপরিহার্য তা উল্লেখ ক’রে গান্ধী বলেছিলেন—‘যদি আপনারা বুদ্ধদেবের বাণীর মূলগত ভাবাদর্শকে অনুসরণ করেন এবং জীবনকে বৈরাগ্যের মহান আদর্শে মহীয়ান বলে মেনে নেন,—বৈরাগ্যের যে আদর্শ পার্থিব জীবনের সব কিছুকে সাগ্রহে পরিহার করতে বাধ্য করে, যে আদর্শের বলে আপনি বুঝতে পারেন জীবন অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী—তার প্রেরণার দ্বারা আপনি উপলব্ধি করবেন যে খাদির যে আদর্শ তা কত সুন্দর কত মহীয়ান। ঐ আদর্শের মূল কথা হ’ল অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করা, কিন্তু উচ্চতম চিন্তার দ্বারা জীবনকে মহীয়ান ক’রে তোলা।’ এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যদি কেউ বুদ্ধকে স্বীয় অস্তরের অধীশ্বর বলে মেনে নেন এবং মানবসমাজের পরমগুরু ব’লে স্বীকার করেন তবে খাদিশিল্প তাকে সক্ষম ক’রে তুলবে, তার নিজের মধ্যে এবং তার হৃদয়ের যিনি অধীশ্বর তাঁর সঙ্গে একটা জীবন্ত ও প্রাণবান যোগসূত্র রচনা করতে।

গান্ধীজী জাতি-বর্ণ-বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন, ঋষ্টপূর্ব বর্ষ থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত জাতি বিভাগের যে ধারণা প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই ব্যাপারে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ ক’রে তিনি জানান যে, বুদ্ধ ‘জাতি-বর্ণ-বিভেদের সব রকম শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতাকে একেবারে বাতিল ক’রে দিয়েছিলেন। ঐ ধরনের উচ্চ, নীচ ভেদ-বিভেদ হিন্দুসমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ ক’রে একেবারে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বর্ণাশ্রমধর্মকে পরিহার করেন নি—বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতি জাতিভেদের নামাস্তর নয়।’^{২৮} মহাত্মাজী মনে করেন, জাতি এবং বর্ণের মধ্যে কোথাও কোনো রকম ঐক্য নেই। কারণ বর্ণ যখন জীবন দান করে, জাতিভেদ তাকে হত্যা করে এবং অস্পৃশ্যতা হ’ল জাতিবিচারের চূণাতম শ্রেণীবিভাগ। সেজন্তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় ভারতবাসীকে সতর্ক ক’রে বলেছেন—‘যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সমাজের একজন মানুষকেও অস্পৃশ্য বলে মনে করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বৌদ্ধবাদকে অস্বীকার করবেন, যজ্ঞস্ববোধকে অবমাননা করবেন, আর ভারতবর্ষের মহান আদর্শকে হীন ক’রে তুলবেন।’^{২৯}

মোহনদাস গান্ধীর মনে আত্মজীবন এই স্থির সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল ছিল যে, ‘বুদ্ধদেব ছিলেন হিন্দুধর্মের একজন অতি উচুদরের সংস্কারক আর তার সে সংস্কারকার্য বহুদূর-প্রসারী।’^{৩০} গান্ধীজী আরও মনে করতেন, হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির ভাবধারাও নিহিত রয়েছে, শুধুমাত্র এই সহজ কারণে যে বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন একজন আদর্শ ভারতবাসী আর শুধু ভারতবাসী নন, তিনি ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন পরম ধর্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী হিন্দু। গৌতম বুদ্ধের সমগ্র জীবনের কর্ম ও সাধনা বিশ্লেষণ ক’রে গান্ধী দেখেছেন, সিদ্ধার্থের জীবনে এমন কিছু হয় নি যাতে মনে হয় তিনি হিন্দুত্বকে পরিহার করেছেন এবং তাই তাঁর হৃদয় অভিযত হ’ল, বুদ্ধ হিন্দুধর্মের যা শ্রেষ্ঠতম তা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু আদর্শের বেদ ও পুরাণের মধ্যে যে সব মহৎ ভাবধারা গোপনে সংরক্ষিত ছিল এবং যে সকল ভাবধারা নানাবিধ সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, গৌতম তা উন্মোচিত ক’রে তৎকালীন লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছিলেন। অসাধারণ ত্যাগের দ্বারা, অসামান্য বৈরাগ্য সাধনার দ্বারা এবং জীবনের বিত্তকতা ও পবিত্রতার দ্বারা হিন্দুধর্মের উপরে তিনি এমন এক ছাপ রেখে গিয়েছেন, হিন্দুধর্মকে এমনভাবে প্রভাবিত

করেছেন যে হিন্দুধর্ম এই মহান শিক্ষকের নিকট অপরিণীত ঋণী থাকবে। ভারতের যে সকল অঞ্চলে বুদ্ধ গিয়েছিলেন, সবত্রই তাঁর অমূল্যগামী হিসেবে তাঁকে অবিরত যে সকল লোক ঘিরে থাকতেন, তাঁরা সকলে অ-হিন্দু ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বৈদিক ভাবধারার আত্মাশীল আত্মপরিভূষিত হিন্দু। এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলেই গান্ধী বলেছিলেন—‘আমি নিজেকে যদি বুদ্ধদেবের অমূল্যগামী বলে অভিহিত করি এবং তাতে যদি আমি কোনো বকম অশোভন আখ্যাও প্রাপ্ত হই, তবু আমি দাবি করবো, আমি বলবো যে বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ ক’রে আমি হিন্দু হিসাবে জয়লাভ করেছি।’

গান্ধী একজন গোড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, মানবের চরম লক্ষ্য হ’ল ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা; প্রত্যেক মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় প্রভৃতি সকল কর্ম চালিত হবে পরিণামে ভগবদ্ দর্শনকে লক্ষ্য ক’রে। ঈশ্বরকে লাভ করবার একমাত্র মার্গ হ’ল তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখা, তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মবোধ করা; স্মরণ মানবসমাজের সেবা হ’ল সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ।^{৩১} তাই সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পেও মহাত্মাজী সত্য অহিংসা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসকে অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা ক’রে বলেছিলেন—‘সমাজবাদে সত্য ও অহিংসা মূর্ত হওয়া চাই। সেজন্য সমাজবাদী কর্মীর ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাস থাকতে হবে। সত্য ও অহিংসার কেবল যান্ত্রিক অনুসরণ করলে সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য আমি বলেছি যে, সত্যই ঈশ্বর আর ঈশ্বর হলেন চিৎশক্তি। আমাদের জীবন সেই শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। এই শক্তি অন্তরবাসী কিন্তু তা দেহ নয়। এই মহাশক্তির অস্তিত্ব যে অস্বীকার করে, সে নিজেকেই বঞ্চিত করে, কেন না এই অনন্ত শক্তির সহায়তা সে লাভ করতে পারে না এবং ফলে নিবোধ হয়ে পড়ে থাকে। তার অবস্থা হালহীন জাহাজের মতো হয়—তরঙ্গের আঘাতে ইতস্ততঃ চালিত হয়, সে একটুও অগ্রসর হতে পারে না এবং অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।’^{৩২} ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীর এরকম দৃষ্টিভঙ্গির জন্মই প্রস্তাবিত অহিংসা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে তিনি ঐক্য রক্ষা করতে চেয়ে বলেছিলেন—‘ঈশ্বরের উপর তাঁদের যেন অবিচল আস্থা থাকে। তিনিই একমাত্র সঙ্গী ও কর্মকর্তা। তাঁর উপর বিশ্বাস না থাকলে এই সব শাস্তিসৈনিকের দল নিপ্রাণ হয়ে পড়বে। ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা কেবল তাঁর শক্তির প্রসাদেই কাজ করতে পারি। এই জাতীয় বিশ্বাসে উদ্ভূত ব্যক্তি কারও প্রাণনাশ করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে তিনি নিজপ্রাণ উৎসর্গ করবেন এবং এই ভাবে মৃত্যুকে জয় ক’রে অমর হবেন।’^{৩৩} গান্ধীর মানবতাবোধের ভিতর দিয়ে এবং সহজাত সত্যনিষ্ঠার দ্বারা গান্ধীজী ঈশ্বরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সত্যস্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ করে।^{৩৪} ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই গৌতমবুদ্ধের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা উল্লেখ ক’রে তিনি গান্ধীর ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন যে অনেকেই মনে করেন বুদ্ধ ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না এবং বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ঈশ্বরবিশ্বাসের বিরোধী ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর নিজস্ব অনুভূতি হ’ল—‘ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থার ভাব বুদ্ধদেবের মূল আদর্শবাদের যে ভাবধারা তার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থাৎ বুদ্ধদেব যে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না, এ কথা ঠিক নয়।’ অথচ গৌতম বুদ্ধ নিঃসন্দেহে সেই প্রচলিত ঈশ্বরবিশ্বাসকে ভঙ্গ করেছিলেন, ‘যেই বিশ্বাসের মূল কথা হ’ল যে ঈশ্বর নামে এক মানব (?) রয়েছেন, যার ক্রোধ ঘেঁষ প্রভৃতি আছে, যিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ক’রে থাকেন এবং পৃথিবীর রাজ-রাজড়াদের মতো তাঁর কামনা আছে, বাসনা আছে, লোভ আছে আর আছে ভালোমন্দের বিচারবুদ্ধি।’ বুদ্ধ এ রকম

তথাকথিত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ-সাধারণভাবে তিনি নৈতিক বিধিনিষেধের উপর আস্থাশীল ছিলেন। এখানে আমরা সবিনয়ে জানিয়ে রাখছি, হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধের মতবাদ বিষয়ে গান্ধীজীর উপরোক্ত মন্তব্য বিশেষ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমাদের আলোচনার আমরা কেবলমাত্র তাঁর মন্তব্যগুলি উল্লেখ করেছি এবং সেগুলির যৌক্তিকতা বিচারের ভার পাঠকের উপর।

বুদ্ধ নির্দেশিত 'নির্বাণ' প্রসঙ্গে গান্ধী বলেছেন—'নির্বাণ' শব্দের অর্থ হ'ল কেবলমাত্র জৈবিক ও পার্থিব বিলুপ্তি নয়; তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হ'ল, জীবনে যত নীচতা, হীনতা, পাপ, অশান্ত ও অশোভন রয়েছে, তার চূড়ান্ত অবলুপ্তি, নিঃশেষে সেই পাপ-তাপ-কলুষ-মানিকে ধুয়ে-মুছে ফেলার যে আদর্শ, তাই হ'ল 'নির্বাণ'। তাঁর ভাষায়—'নির্বাণ' মৃত মানুষের কবরে স্তব্ধ, প্রশান্ত কালো রংয়ের মূক শাস্তি নয়, 'নির্বাণ' হ'ল জীবন্ত শাস্তি, 'নির্বাণ' হ'ল সুখ ও আনন্দবোধের জীবন্ত উপলব্ধি।^{৩৫} গান্ধীজী পূর্বজন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনিও মনে করতেন, বিষয়কামনা ক্ষয় হলে জন্মমৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি লাভ করা যায়, অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।^{৩৬}

৩

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতি বিষয়ক গান্ধীজীর বিধাহীন মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি বুদ্ধের একজন পরম অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন এবং সমগ্র জীবন বুদ্ধের অনুশাসনকেই যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সর্বজীবে অহিংসা, দয়া, প্রেম, সমদর্শিতা, অস্পৃশ্যতা, মাদকদ্রব্য অসত্য অনাচার বর্জন, পরমত-সহনশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, শ্রমের মর্যাদা, শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ এক কথায় জীবনের সর্বোন্নয়ন বা সর্বোদয় বৌদ্ধ নীতি অনুসারী। জীবনে সর্বপ্রকার পাপাচরণ বা অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকা ও সর্বপ্রকার কুশল কর্ম সম্পাদন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিন্তকে পরিণত করার যে আদর্শের কথা বুদ্ধ তুলিয়েছিলেন^{৩৭} তা গান্ধীজীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। মোহনদাসের অথও সত্যের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণার কোনো স্থান ছিল না। কারণ তাঁর সত্যসৌধ কেবল প্রেম ক্ষমা ও অহিংসার দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতি গান্ধী-চেতনায় অপ্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই গান্ধীজীর সমাজকল্যাণমূলক সকল কর্মপ্রচেষ্টা বৌদ্ধতাবাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে কদর্ঘ হানাহানির মধ্যে জগৎ বিভ্রান্ত। কিন্তু এই বিভ্রান্তির মধ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়রূপে ভারতের সেই সুপ্রাচীন অনুপম বৌদ্ধ অহিংসা নীতিকে পুনরায় গান্ধীজী সমুজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছেন। তাই আধুনিক যুগে তিনি হলেন অহিংসা এবং শান্তির অগ্রদূত। কিন্তু গান্ধী বুদ্ধের সত্য সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিবাগী হয়ে সংসারজীবন পরিত্যাগ করলেন না; সংসারে থেকেই তিনি কোটি কোটি ভারতবাসীর মুকুটহীন সম্রাট হয়ে তাদের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি সংক্রান্ত সমস্তার সমাধানে সচেষ্ট হলেন। ক্ষুদ্রকে ত্যাগ ক'রে তিনি এক পরম বিরাটের সন্ধানে গেলেন না; অতি নগণ্যের মধ্যে তিনি অনুসন্ধান করলেন সেই অদ্বিতীয় পরম বিরাটের।

বুদ্ধের মধ্যে আবিষ্কৃত হ'ল মানুষের পূর্ণতম বিকাশ। তাঁর জীবনের মধ্যেই তাঁর পরিচয়। তাঁর মহাশব্দবোধ সমগ্র মানবসমাজের পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধের মহত্বের বাণী প্রচার করেছেন।

আর বুদ্ধের মহান হৃদয় নিয়ে জয়গ্রহণ করেছিলেন বলেই গান্ধী আজ বিশ্বে মহাত্মা নামে পরিচিত। বুদ্ধভাবাদর্শে লালিত এবং অমুপ্রাণিত মোহনদাস গান্ধী আজীবন ছিলেন গোঁতম বুদ্ধের একজন দীনতম সেবক। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে হিংসা এবং নীচতার মধ্যেও প্রেমের অমৃতবাণীর এক শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেছেন—‘বুদ্ধদেবের সরল হৃদয়ের মতো তাঁর বাণীও ছিল বহু বিস্তৃত, বহু ব্যাপক এবং পরমতসহিষ্ণুতার প্রতীক, এবং সেই কারণেই বুদ্ধবাণী তাঁর জীবিতকালকে অতিক্রম ক’রে পৃথিবীর দিগ্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।’^{১৩৮} বর্তমান কালেও যে বুদ্ধোপাসনার একান্ত প্রয়োজন তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। গান্ধীজী নিজের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই দেখিয়েছেন, কিভাবে বুদ্ধের উচ্চতম নৈতিক আদর্শ পালন ক’রে জীবনকে সুন্দর এবং সুখময়ীকৃত করা যায়। তাই মনে হয়, গান্ধী ছিলেন পরম কারুণিক তথাগতের একজন আধুনিক ভাবশিষ্য। বৌদ্ধসংস্কৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী পূর্ণ মানবিক শক্তিতে আত্মবান ছিলেন। প্রবৃত্তির দাসত্ব ক’রে আত্মকর্তৃত্ব বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি কখনই ছিলেন না। উচ্চনীচ জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে সত্য, শ্রায় এবং অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করার যে পবিত্র সঙ্কল্প সিদ্ধার্থ একদা ঘোষণা করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাইই বর্তমান শতকে বহুদিন পরে পুনরায় বাস্তবে রূপদান করলেন। অবিচল তাঁর নিষ্ঠা, অতুলনীয় তাঁর বিশ্বমানবিক-সাধনা। বুদ্ধবিস্কৃত পৃথিবীতে নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত হলেন গান্ধী। তাই বৌদ্ধবাদ সম্পর্কে অমুশীলন এবং গবেষণা বিষয়ে মহাত্মাজী বলেছেন—‘আমি জোর দিয়ে সাহসের সঙ্গে বলতে পারি বৌদ্ধবাদ সম্পর্কে অমুশীলন অসম্পূর্ণ থাকবে যে পর্যন্ত না আপনারা মূল শাস্ত্রগুলি পাঠ করেন, যেই শাস্ত্র থেকে আমাদের পরমগুরু তাঁর প্রেরণা লাভ করেছিলেন, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না আপনারা সংস্কৃত গ্রন্থাদি ভালো ক’রে পাঠ করেন।’^{১৩৯} কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন, বৌদ্ধবাদের শাস্ত্রীয় বচন, বৌদ্ধধর্মের যথার্থ ভাবধারা, তার অন্তর্নিহিত সুর ও ছন্দ, গোঁতমের ধ্যান ও জ্ঞান ভালো ক’রে বুঝতে হলে কেবলমাত্র শাস্ত্র পাঠ করলেই যথেষ্ট হবে না। বৌদ্ধবাদে যে কার্যকারণ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে অমুশীলনের মাধ্যমে বৌদ্ধসংস্কৃতি অমুরাগীদের তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বৌদ্ধবাদ অমুসারে সংযম সাধনার পাঁচটি বিধিবদ্ধ নিয়মের উল্লেখ করলেন। ঐ পাঁচটি নিয়ম হ’ল—ব্রহ্মচর্য, সত্যপালন ও সত্য ভাষণ, অহিংসা, অষ্টেয় এবং অপরিগ্রহ। গান্ধীজী সমস্ত জীবন এই পাঁচটি নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি মনে করেন, যিনি এই পাঁচটি সংযম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তিনি কখনই বুদ্ধের আদর্শবাদের যে মূলনীতি তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। সত্যিকারের একজন বুদ্ধশিষ্যের শ্রায় গান্ধীজীও চেয়েছিলেন অমৃতের অধিকার। এই অমৃতত্ব লাভের পথ চলেছে সত্যের লক্ষ্যে। অদম্য সত্যামুরাগের দিব্য অগ্নিস্থলিঙ্গ নিজের মধ্যে বহন ক’রে এনেছিলেন তিনি। তাঁর পরমগুরুর মতো তিনি চিন্তা, বাক্য এবং আচরণের মধ্যে অখণ্ড ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। বস্তুত বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতির পরিপূর্ণ ভাবরূপ ফুটে উঠেছে মোহনদাস গান্ধীর সরল অনাবিল জীবনচর্যায়।

পাঠ-সংকেত

- ১ বুদ্ধদেব বহু। প্রবন্ধ সংকলন (ভারবি কলিকাতা ১৯৬৬) পৃ: ৩৩৮ ‘নোয়াখালি’
- ২ ভারত সরকার। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়। দি ওয়ে অফ দি (পাবলিকেশানস ডিভিশান দিল্লী ১৯৫৬) পৃ: ৪

- ৩ ঋষি দাস। গান্ধী-চরিত (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী কলিকাতা ১৩৫৫) পৃ: ৩২
- ৪ এডুইন আরনল্ড। দি লাইট অফ এশিয়া, অর দি গ্রেট বিনানসিয়েশন (ইন্টারন্যাশনাল বুক হাউস প্রা: লি: বোম্বাই ১৯৫৬) পৃ: ১৩৮
- ৫ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। যেরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত (খাদি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ১৯৩১) পৃ: ৭৪-৭৫
- ৬ ধীরেন্দ্রলাল ধর। আমাদের গান্ধীজী (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী কলিকাতা ১৯৪৮) পৃ: ১১৭
- ৭ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত, ২য় খণ্ড (খাদি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা)। পৃ: ১২৮-১২৯
- ৮ রতনমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। গান্ধীজীর দিল্লী ভায়েরী : প্রার্থনা-ভাষণ, ১০-২-৪৭ হইতে ২৯-১-৪৮ পর্যন্ত (হরিজন প্রকাশন কলিকাতা ১৯৪৮) পৃ: ১৮৪-১৮২
- ৯ ভারত সরকার। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়। মহাত্মা গান্ধী (পাবলিকেশানস ডিভিশন দিল্লী ১৯৫৮) পৃ: ৩
- ১০ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-১৯২৭
- ১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র-রচনাবলী (অশ্বত্থবার্ষিক সংস্করণ) ১১শ খণ্ড পৃ: ৪৫৮-৪৫৯
- ১২ হরিজন, ১৯-৮-১৯৩৯
- ১৩ হরিজন, ২৪-১২-১৯৩৮
- ১৪ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১২-১৯২৭
- ১৫ মহাদেব দেশাই। উইথ গান্ধীজী ইন সিলোন পৃ: ৫২
- ১৬ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-১৯২৭
- ১৭ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত, ১ম খণ্ড (খাদি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ১৩৩৮) পৃ: ২৬১-২৬৩
- ১৮ ধর্মপদ, গাথা সংখ্যা ২২৩ (কোধবগে, গা)। অক্রোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে, জিনে কদরিয়ং দানেন, সচেন অলিকবামিনং। তুলনায়। মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ৩৮/৭৩-৭৪। অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ। জয়েৎ কদর্ঘং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানুতম্ ॥
- ১৯ আর কে প্রভু এবং ইউ আর রাও, সম্পাদিত। দি মাইও অফ মহাত্মা গান্ধী (অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস লন্ডন ১৯৪৫) পৃ: ৬৮-৬৯
- ২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুদ্ধদেব (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা ১৯৬০) পৃ: ১৮
- ২১ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আমার ধ্যানের ভারত। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত (মিত্র ও ঘোষ কলিকাতা) পৃ: ৫
- ২২ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মাহুষ আমার ভাই : মাহাত্মা গান্ধীর নিজের ভাষায় তাঁহার জীবনকথা ও চিন্তাধারা। কৃষ্ণ কপালানি সম্পাদিত এবং প্রিয়ব্রজ সেন অনূদিত (সাহিত্য অকাদেমী নিউ দিল্লী ১৯৬৭) পৃ: ৮-৯
- ২৩ হরিজন, ২০-৩-১৯৩৭

- ২৪ বুদ্ধজয়ন্তী বুলেটিন (কেম্ব্রন-বিহার আগরতলা ১৯৬৯) ১৪শ খণ্ড ১৭শ সংখ্যা পৃ: ১০-১২ । বিনয় রায় । অহিংসা : বুদ্ধ ও গান্ধী
- ২৫ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ । সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত ১ম খণ্ড পৃ: ৩৭৮-৩৮০
- ২৬ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । বুদ্ধদেব-চরিত : দেব নাটক (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স কলিকাতা ১২৯৪) পৃ: ৮২-৯০
- সিদ্ধার্থ । করি পুত্রের কামনা/কর জগন্মাতা উপাসনা ;—/কেন তবে বধ কোটি কোটি প্রাণী ? জগন্মাতা—/পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি ।/দেখ—নীরব ভাষায়/ছাগপাল মুখ তুলে চায় !/যদি, নৃপ, কৃপা নাহি কর—/দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?/নির্দয় যে জন—/দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি ।'নরপতি !/কেন প্রাণীনাশ করি' ভাসাইবে ক্ষিতি ?/রাজকার্য্য দুর্বল-পালন—/দুর্বল এ ছাগপাল ;—/হায় ! হায় ! ভাষায় বঞ্চিত,—/নহে—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমাদ—/‘প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ !’
- ২৭ রোঁমা রোঁলা । মহাত্মা গান্ধী । ঋষি দাস অনূদিত (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৯৫৬) পৃ: ১৩৫
- ২৮ ইয়ং ইতিয়া, ১৫-১২-১৯২৭
- ২৯ মহাদেব দেশাই । উইথ গান্ধীজী ইন সিলোন । পৃ: ১৩৮
- ৩০ ইয়ং ইতিয়া, ১-১২-১৯২৭
- ৩১ ডি জি টেগলকর । মহাত্মা : লাইফ অফ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (বিঠলভাই জাভেরী এও ডি জি টেগলকর । বোম্বাই ১৯৫২) ৪র্থ খণ্ড পৃ: ১০৮-১০৯
- ৩২ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । অহিংস সমাজবাদের পথে । ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত (মিত্রালয় কলিকাতা ১৩৬৮) পৃ: ৮-৯
- ৩৩ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । পল্লী-পুনর্গঠন । শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত (গান্ধী স্মারক নিধি—বাংলা শাখা, বারাকপুর ১৩৬৮) পৃ: ৭৯
- ৩৪ শশিভূষণ দাসগুপ্ত । টেলস্টর গান্ধী রবীন্দ্রনাথ (মিত্র ও ঘোষ কলিকাতা ১৩৬৯) পৃ: ৩৯
- ৩৫ ইয়ং ইতিয়া, ২৪-১১-১৯২৭
- ৩৬ স্ববোধ ঘোষ । অমৃত পঞ্চমাত্রী (ইতিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ কলিকাতা ১৮৭৯ শকাব্দ) পৃ: ১৪৯
- ৩৭ ধর্মপদ, গাথা সংখ্যা ১৮৩ (বুদ্ধবগ্গে, গা) । সর্ব পাপস্, স অকরণং, কুসলস্, স উপসম্পদা, সচিহ্ন পরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধান সাসনং
- ৩৮ ইয়ং ইতিয়া, ২৪-১১-১৯২৭
- ৩৯ ভারত সরকার । তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় । গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী (পাবলিকেশানস ডিভিশান দিল্লী ১৯৫৭) পৃ: ৯

সাহিত্যশিল্পী বলেঙ্গনাথ ঠাকুর

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

জীবনে স্বপ্নায় হয়েও যারা তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে চিরায়ু হয়ে বেঁচে আছেন বিশ্বের সেই কণজয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে বলেঙ্গনাথ ঠাকুর অন্যতম। এঁদের মধ্যে যার নাম সবার উপরে তিনি জন্ কীটস্। কীটসের অকাল-মৃত্যু উপলক্ষ্যে শেলি যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন (*Adonais*) তার একটি স্তবক তিনি এই পঙ্ক্তিটি দিয়ে আরম্ভ করেন—‘The inheritors unfulfilled renown.’

কীটসের মতো অগ্ন্যান্ত যে সব কবি তাঁদের প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার আগেই ধরার পালা সাক্ষ্য ক’রে নবজীবনের কূলে যাত্রা করেছেন তাঁরাই এখানে শেলির স্মরণপথে এসেছেন, বিশেষতঃ চ্যাটার্টন, স্টিউয়ার্ট ও ল্যাটিন্ কবি লিউকান্। বলেঙ্গনাথের প্রসঙ্গেও শেলির পঙ্ক্তিটি মনে আসা স্বাভাবিক। বলেঙ্গনাথের সাহিত্যকীর্তি অবিনশ্বর, কিন্তু এই কীর্তির মধ্যে গভীর অপূর্ণতা রয়েছে। দীর্ঘজীবী হলে কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাক্ষণে তাঁর আসন অনেক উচুতে হতে পারত।

বলেঙ্গনাথের যখন ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘মাধবিকা’ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অন্তিম কবিতাটির নাম ‘অবসান’।^১ এই কবিতাটিতে কবি যখন তাঁর সংগীতকে ‘রে স্বপ্নায়’ ব’লে সম্বোধন করেন, তখন কি নিজের অকাল-মৃত্যু সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস তাঁকে শঙ্কিত ক’রে তুলেছিল?—

‘হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হ’ল অবসান।
এক বেলা নৃত্য শুধু এক বেলা গান,
ছড়িয়ে রঙীন পাখা কুসুমের শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধুলা মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিনশেষ—আর বেশি নয়।
রে স্বপ্নায়, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হ’তে হোক না সে, ভাই,
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি’ তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহা লাঞ্ছনা সে!
তার চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়া পাখা
খেলাশেষে কুসুমের বক্ষে মরে’ থাকা।’

এই কবিতাটির শেষ কয়েকটি পঙ্ক্তি রবীন্দ্রনাথের ‘ফুলিঙ্গ’র কথা মনে করিয়ে দেয়।

১ ‘বলেঙ্গ-গ্রন্থাবলী’ তৃতীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ১৩৭২, পৃষ্ঠা ৭৩

বলেজনাথও তাঁর পিতৃব্যের মতো স্বদূর আকাশে আঁকা ইন্দ্রধনুকে ছেড়ে মাটির ধরণীর প্রজাপতিটির পাখাকেই ভালোবেসেছেন।

উজ্জল সম্ভাবনার কোরক খুটেনোমুখ ব'য়ে গেল, প্রস্তুত হওয়ার স্বযোগ পেলো না। বলেজনাথের রচনার অনেক পাঠকের মনেই এই চিন্তার উদয় হয় এবং এই চিন্তার মধ্যে বেদনার আভাস আছে। বলেজনাথের লেখা পাঠ করার যে অভিজ্ঞতা তার মধ্যেও এ বেদনা পাঠকের অজ্ঞাতসারেই সঞ্চারিত হয়। বলেজনাথের রচনাতে করুণ স্বরের মুছ'না বারংবার প্রকম্পিত। (এ বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।)^২ আগন্তুক বেদনা ও অন্তর্নিহিত বেদনার মিশ্রণের ফলে কখনও কখনও পাঠকের অহুভূতি বিবাদাচ্ছন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

বলেজনাথের রচনা যদি নঞর্থক হ'ত তা হলে এই বিবাদ হয় ত বিশ্বনিন্দার প্রথম সোপান হতে পারত। কিন্তু প্রত্যয়নিষ্ঠ বলেজনাথের পক্ষে বিশ্বনিন্দকের ভূমিকা নেওয়ার চেয়ে অকল্পনীয় আর কিছু হতে পারে না। বিষন্নতা রোমান্টিক সাহিত্যশিল্পীর লেখনীতে নানা রূপ পরিগ্রহ করে। বলেজনাথের বিষন্নতা রোমান্টিক বিষন্নতা হলেও তিনি কখনও রোমান্টিক ফরাসী সাহিত্যিক শাতোব্রীয়া^৩র মতো জীবনক্লান্তিতে জর্জরিত হন নি। বলেজনাথ কোনো দিন লিখতে পারতেন না—‘কিছু উপভোগ করারও আগেই হতাশা এসে পড়ে; কামনাগুলি থেকে যায়, কিন্তু মোহ আর কিছু থাকে না। কল্পনা-শক্তিতে সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ও চমক রয়েছে; জীবনে রয়েছে দীনতা, গুপ্ততা আর মোহিনীমায়ার বিলুপ্তি। এ হচ্ছে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে শূন্য সংসারে বেঁচে থাকা, আর কোনো কিছু আশ্বাসন করারও আগেই সব কিছু বিবাদ হয়ে যাওয়া।’^৪ অভাব-বোধ বলেজনাথেও এসেছে—নিঃসঙ্গতা তাঁর প্রাণেও তীব্র হয়ে বেজেছে। তিনি কিন্তু যখন এ বোধকে বাণীরূপ দিচ্ছেন তখন তার মধ্যে তিক্ততার চেয়ে নির্বেদের ভাব অনেক বেশি—

‘মানব-জীবনের মধ্যে মধ্যে এইরূপ কণিক শূন্যতার তাহার অতৃপ্তির ভাবের বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে তৃপ্তি কোথায়? তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া অতীতের সাক্ষ্য, পদতলে ভবিষ্যতের কি-জানি-কি। পশ্চাতে কেবল একটা দূর—অতিদূর দূর যাত্রা; সম্মুখেও তাই—ধূ ধূ কেবলই একটা সীমাহীন মহাদূর। চতুর্দিকের এই অসীম বিস্তৃতির মধ্যে আপনার কণভঙ্গুর লইয়া কে পরিতৃপ্ত হইবে? আমরা সমস্ত জগতের সহিত জীবনের প্রবাহ অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠি, স্তম্ভিত হইয়া থাকি; কখনও আশায়, কখনও নৈরাশ্রে আমাদের অতৃপ্তি।’^৫

বলেজনাথ সংবেদনশীল লেখক—বেদনার স্বল্প কম্পনেও তাঁর হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দিত হয়। কিন্তু জীবনের বিচিত্র বেদনা তাঁকে বিশ্ব থেকে কোনো দিন বিমুখ করে নি। অনেক সময় হঠাৎ খুশির মতো হঠাৎ বিষন্নতা তাঁর চিন্তে ঘনিষ্টে এসেছে—‘ওধু অকারণ বিবাদে তাঁর মন বিধুর হয়ে উঠেছে। মেঘালোকে তাঁর

২ ‘বলেজনাথের রচনার মধ্যে একটি অব্যক্ত বেদনার ধ্বনি রয়েছে।...এই জীবনে বা কিছু স্বপ্ন—আর স্বপ্ন ব'লেই কণহারা—তাঁর চিত্ত এক দিকে আনন্দোন্মেষ ক'রে তুলেছে, অন্য দিকে করেছে বেদনার্ত্র। জীবনের উত্তাপ তিনি সর্বদেহে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর মনের কোণে বৈরাগ্যের হিমকণা অদ্বৈত থেকে গেছে। তিনি জীবনের গভীর গহনে প্রবেশ করেও একটা দূরত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন। বলেজনাথ প্রকৃত শিল্পী—জীবনই তাঁর শিল্প।’—বিষনাথ চট্টোপাধ্যায়। ‘জীবনশিল্পী বলেজনাথ ঠাকুর’ (বলেজনাথ বঙ্গীয় সম্পাদিত ‘সাহিত্যভীর্ষ’ ১০৭৭ সপ্তদশ বার্ষিকী)

৩ ফ্রাঁসোয়া ম্যানে ভীকিং ড শাতোব্রীয়া। ‘স্ট্রিটথের বঙ্গ’ (১৮০২)

৪ ‘কণিক শূন্যতা’ ব, এ, পৃ ২৮০

চিত্তও অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে—প্রাণ যখন পথের ধারে সকল বারি ঢেলে দেয় তখন চিত্তবিকার বোধ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়—‘ধরণীর স্বর্গভীর অন্ধকারে আবাঢ়াচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় ঢালিয়া দিয়া অন্ধকার আকাশ যখন বিরহনিঃসৃত স্বরে অবসাদ গাহিতে থাকে, তখন ঝরঝর ধারায় প্রাণের গভীর হৃদয় কোথায় ঝরিয়া যায়।...চারিদিকেই ক্রমাগত অন্ধকার ঘনীভূত হয়, স্বর্ধালোকে মেঘের ছায়া পড়ে, তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে অন্ধকারের উপর অন্ধকার যেন নৃত্য করিতে থাকে। এই অন্ধকারময় ভাবপ্রবাহের মধ্যে মানবের হৃদয়ও অন্ধকার না হইয়া কি থাকিতে পারে?’*

এক দিক থেকে দেখলে, করুণ রসই আদি রস। ক্রৌঞ্চবধে বিচলিত আদি কবির শোকের অমৃতভূতি স্থললিত শ্লোকে উৎসারিত হয়েছিল। করুণ রসের এই গুরুত্বের জন্যই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বসেন্দ্রনাথের বীণায় যে সকরুণ রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে তার মধ্যে আমরা জীবনের সেই মহাসংগীত শুনি ওয়র্ডসওয়ার্থ যাকে বলেছেন ‘still, sad music of humanity’।

বসেন্দ্রনাথ বেদনাবিলাসী aesthete নন, তিনি ভাবুক। আর ভাবুক বলেই তিনি নিজের অন্তরে আশ্রয়সৌধ নির্মাণ করতে পারেন, যে ধরনের নির্মিতের কথা কীটস তাঁর বন্ধু রেনল্ডস্কে একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—‘আমার এখন মনে হচ্ছে, প্রায় যে কোনো লোকই তার নিজের অন্তরলোক থেকে উর্নভের মতো নিজের বায়বীয় নগরভূগ বয়ন করতে পারে।’ বসেন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর আবিষ্কার করতে গেলে তাঁর হৃদয়ের গভীর গহনে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ দিক থেকেও বসেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে রোমান্টিক।

তাঁর যে অন্তর্মুখী প্রবৃত্তি বসেন্দ্রনাথকে নিজের হৃদয়ের অন্তস্তলে নিরে গেছে সেই প্রবৃত্তিই তাঁকে জীবনের অন্তঃপুরে পৌঁছে দিয়েছে। জীবনের অনাবরণ, প্রকৃত রূপ তিনি দেখতে চেয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন তার স্বাভাবিক নয়তা। ‘নয়তা আর কাহাকে বলে? অলঙ্কারশূন্যতা বৈ ত নয়। সৌন্দর্য সৌন্দর্যের আবরণে অবগুষ্ঠিত সর্বত্রই। যেখানে কৃত্রিমতার আড়ম্বরে সৌন্দর্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেইখানেই নয়তা প্রচ্ছন্ন। চাক্চিক্য সৌন্দর্য সঙ্কচিত হইয়া থাকে, ব্যক্ত হইতে পারে না। শুভ্র চন্দ্রালোকে যজ্ঞবিশেষের সাহায্যে সিন্দূরের আভা ফেলিলে কি সৌন্দর্য ব্যক্ত হইবার সুবিধা পায়? এই জন্ত প্রকৃতিতে নয়তা সৌন্দর্যময়ী। নয়তায় আত্মা পরিব্যাপ্ত।’^৬ জীবনকে বসেন্দ্রনাথ দেখেছেন, চিনেছেন, ভালোবেসেছেন। বাইরের হাসির ছটায় তিনি ভোলেন নি, ভিতরের অশ্রুজলের উৎস সন্ধান ক’রেছেন।

জীবনফুলের রঙ লাল। সেই লালিমায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে—বসেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা। তাই তাঁর লেখা অত সহজে আমাদের মর্ম স্পর্শ করে, তিনি এত অনায়াসে আমাদের অতি কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্যশিল্পীর লেখনী-তুলিকায় বসেন্দ্রনাথ যে সব বর্ণাঢ্য আলোচ্য অঙ্কন ক’রেছেন সেগুলিতে নানাবিধ বর্ণের বিস্তারিত সত্ত্বও রক্তিমারই প্রাধান্য। সংসার থেকে স’রে গিয়ে, জীবন থেকে পাগিয়ে বসেন্দ্রনাথ মুক্তি পেতে চান নি—আশ্রয় খোঁজেন নি কোনো গজদস্ত নির্মিত মিনারে, বা কোদলেয়ারের মতো কোনো নিভৃত কক্ষে যেখানকার হাওয়াতে লেগে আছে দিবান্বপের গোলাপী আমেজ

* ‘প্রাণের বারিধারা’ ব, প্র, পৃ ১৭৭

৬ ‘নয়তার সৌন্দর্য’ ব, প্র, পৃ ২৫৯

ও আলস্তের নীলিমা। বসন্তনাথ যে নন্দিনীর জনক তার হাতে রক্তকরবীর কঙ্কণ, তার গীমস্তে-
রক্তকরবীর রক্তিম।

বসন্তনাথের প্রাণপ্রাচুর্য তাঁর 'simple, sensuous and passionate' কবিতাগুলিতে উদ্ভল
হয়ে উঠেছে। 'যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাসে' 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' উচ্ছ্বসিত। কীটসের মতো বসন্তনাথও
ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী—'mighty abstract idea of beauty' বসন্তনাথকেও অভিভূত করেছে।
সঙ্কল্প সমালোচক যখন বলেন, 'সৌন্দর্য দর্শনের ও সৌন্দর্যভোগের এমন কীটসীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর
কোনো বাঙালি লেখক জন্ম গ্রহণ করেন নাই',^৭ তখন তিনি নিতান্ত অত্যাক্তি করেন না। নারী
বসন্তনাথের কাছে সৌন্দর্য মূর্তিমতী—তাই নারীর উন্মাদক রূপে তিনি বিহ্বল। তিনি রোমান্টিক
কবি—নারী তাঁর কাছে দেবীও। কিন্তু মানসীকে তিনি বার বার মানুষী রূপে পেতে চেয়েছেন—তাঁর
প্রেমসী নারী প্রদীপ্ত বাসনার প্রোক্ষল। স্রোতাবহার কলবেদনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেমিক হৃদয়ের
অভিলাষকে ভাষা দিয়েছেন—

‘রহিব ঘিরিয়া তব

তরল যৌবনখানি—তহু অভিনব—

শত নাগিনীবেষ্টনে অনঙ্গের মত।’^৮

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের প্রেমের কবিতার প্রভাব বসন্তনাথের এই সমস্ত কবিতায় থাকা স্বাভাবিক, কারণ,
প্রিয়নাথ সেনের ভাষায়, তখন ‘সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত, উচ্ছলিত।’^৯ তা ছাড়া
ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘পরমহোম্পদ’,^{১০} আর ‘বসন্তনাথের সকল কার্যেই রবীন্দ্রনাথের
যোগ ছিল।’^{১১}

রবীন্দ্রনাথের অনবত্ত ‘বিদায়-অভিশাপ’ ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত
হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার ঢেউ এসে বসন্তনাথের কবিচিত্তকেও দোলায়িত
করে। ‘বিদায়-অভিশাপ’ প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিন পরে বসন্তনাথ যে ‘অগ্নিহোত্র’ কবিতাটি রচনা
করেন তার দীপ্তিতে বসন্তনাথ রবীন্দ্র-রশ্মি বিচ্ছুরিত— ‘পড়েছে কি মনে

কোন পুরাণ কাহিনী—সবস্বতীতীরে

যবে ঋষিকণ্ঠাগণ চারি ধারে ঘিরে’

গুঞ্জন করিত বসি’ মৃদু মৃদু স্বরে

দিবসের দুঃখস্বথ যত, মৌনভরে

সুনিত একান্তচিত্তে কথা অভিনব

ঋষিমুখে, লাজাঞ্জলি দিত শিরে তব

বাম্পাকুলচোখে ধীরে মন্ত্র পাঠ করি’

৭ প্রথমনাথ বিনী। ‘বাংলার লেখক’ (প্রথম খণ্ড ১৩৫৭) পৃ ৮২

৮ ‘কলবেদনা’, ‘মাধবিকা’ ব. ৩, পৃ ৬৯

৯ ‘বঙ্গীয় বসন্তনাথ ঠাকুর’। ‘এলীপ’ (সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) আধুনিক-কালিক ১৩০৬

১০ ‘নারী’ কবিতার উৎসর্গ (২২শে মার্চ ১৯০২)

১১ এতাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ‘রবীন্দ্র-বীথনী’ দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫) পৃ ২৭

শ্মিতমুখে শুচিমনে দেবতারে স্মরি',
দীপ্তি তব ঝলকিত চাকু চন্দ্রানন
উজ্জ্বল আভায় ; সেই স্মৃতি পুরাতন
উঠিছে কি জাগি' আজি অরুণবরণে
তপ্ত বক্ষতলে, তাই খসিছ সঘনে
শত শিখা মেলি ?'^{১২}

ভাব ও ভাষা, দু'দিক থেকেই সমগ্র কবিতাটি রবির আলোয় উদ্ভাসিত। বালেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই রবীন্দ্র-রসসিক্ত। 'চৈতালি' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন কাব্যগ্রন্থগুলির সুর এই সব কবিতায় অনুরণিত।

'মাধবিকা'তে যে নারীকে আমরা নরমহচরী রূপে পাই, তার এক নূতন রূপ 'শ্রাবণী'তে।
মধুমাসে যে 'রহঃসখী', বর্ষণের দিনে সে 'গৃহিনী, সচিব'। বসন্তের অনঙ্গ-রঙ্গ বর্ষায় অনন্তের সুরে ধ্বনিত—

'বাহিরে তোমারে চাহি' পাই অস্তঃপুরে,— অস্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহু দূরে।'^{১৩}

গৃহস্থ-বধূ-রূপে নারীর যে কল্যাণী মূর্তি 'বধূ' কবিতায় ফুটে উঠেছে, তার পূর্ণ বিকাশ 'গৃহলক্ষ্মী' কবিতায়—

'তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জল,
আজিকে তোমারে হেরি' সর্ব অমঙ্গল
ধীরে সরে' যায় দূরে ;.....
ঘেরিয়াছে চারি ধারে কত দুঃখ স্থখ,
কত উন্মেষিত আশা, কত শ্রান মুখ।
সকল হৃদয়ভার বক্ষে লহ টানি'—
তাই তুমি, গৃহলক্ষ্মী, সকলের রানী।'^{১৪}

বালেন্দ্রনাথের এই কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'She was a phantom of delight' কবিতার প্রভাব স্পষ্ট, যে কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন তিনি তাঁর প্রণয়িনী-পত্নীকে 'nearer view' থেকে দেখেছেন, এবং spirit ও woman এই দুই রূপেই দেখেছেন।

ইংরাজি রোমান্টিক কবিতা যে বালেন্দ্রনাথ সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছিলেন তার পরিচয় আমরা বালেন্দ্রনাথের আলোচনাগুলিতেও পাই। 'অলঙ্কারে সৌন্দর্য সংকুচিত হইয়া থাকে কেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শেলি'র কবিতার স্কাইলার্ক-পাখীর সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার স্কাইলার্ক-পাখীর তুলনা করেছেন—

'শেলীর Skylark-এ সৌন্দর্যের সম্যক স্মৃতির কারণ, নগ্ন আত্মার অভিব্যক্তি। শেলী দেহাবরণের প্রত্যেক তরঙ্গ ভঙ্গে আত্মা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন।... ওয়ার্ডসওয়ার্থের Skylark-এ নগ্ন আত্মার এমন বিকাশ হয় নাই, সেই জগৎ তাঁহার পক্ষীর কর্ণধ্বনিতে হৃদয় সেইরূপ আতুল করে না। শেলীর বিহঙ্গ-কণ্ঠ সৌন্দর্যস্রোত, সে স্বরলহরীর মধ্যে জগতের ব্যবধান নাই, সে সৌন্দর্য অনাবৃত, সৌন্দর্যাক্ষর।'^{১৫}

সূর্য্যভাসারী শেলি'র (ব্রাউনিঙ, শেলি'কে 'sun-treader' বলেছেন) কবিকল্পনার স্বরূপ বালেন্দ্রনাথের কাছে সহজেই ধরা পড়েছে।

সমালোচনাশ্রমিক রচনা সম্বন্ধে হাজ্জলিট লিখেছেন—‘A genuine criticism should, as I take it, reflect the colours, the light and shade, the soul and body of a work.’^{১৬} এই নিরিখে বিচার করলে বলেজ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনার উৎকর্ষ সম্পর্কে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকে না। তাঁর সমালোচনাকে আমরা যথার্থই ‘সৃষ্টিমূলক’^{১৭} বলতে পারি। বলেজ্রনাথের সমালোচনা সেই শ্রেণীর সমালোচনা যার সম্বন্ধে অস্কার ওয়াইল্ডের মন্তব্য—‘a creation within a creation’.

শেক্সপীয়রের তরুণ ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক রোমিও বলেছিল, ‘I shall be the candle-holder and look on.’ এই রূপতুল্য বলেজ্রনাথেরও। রোজ-ছায়া মাখানো, ঋতুচক্রের আবর্তনে স্পন্দিত, শ্রামলী ধরণীর দিকে তিনি ‘মুগ্ধ নয়নে’ চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও ‘পথ চাওয়াতেই আনন্দ’। তাঁর চোখের সবটুকু আলো দিয়ে বলেজ্রনাথ নিখিল ভুবনের সবটুকু সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে চান। এর জন্য তিনি পথপরিক্রমাতেও প্রস্তুত, তবে যদি সমানধর্মী, সৌন্দর্যলাবী কালিদাসের মত সাথী পান—

‘মনে হয়, হে কবীন্দ্র, তব সাথে যদি

পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি !

... ..

তুই ধারে ক্ষীয়মান ছবি পরে ছবি—

সৌন্দর্যচয়নে দৌহে মগ্ন শুধু, কবি।’^{১৮}

অনেকে মনে করেন, এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। বলেজ্রনাথের কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘ঋতুসংহার’ কবিতার প্রভাব সুপরিস্ফুট। ‘কবীন্দ্র’ বলতে তখনকার দিনে সাধারণতঃ কালিদাসকেই বোঝানো হ’ত ; রবীন্দ্রনাথও তাই বুঝিয়েছেন ; বলেজ্রনাথ তাঁর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তা ছাড়া ‘চৈতালি’তে ‘ঋতুসংহার’এর ঠিক পরের কবিতার নাম ‘মেঘদূত’। ‘শ্রাবণী’তে ‘পথে পথে’র ঠিক আগের কবিতার নাম ‘মেঘদূত’। বলেজ্রনাথের ‘পথে পথে’ রবীন্দ্রনাথের ‘ঋতুসংহার’এর সূক্ষ্ম প্রতিধ্বনি—কিন্তু প্রতিধ্বনির মার্ধ্ব্য ধ্বনির মধুরতা থেকে দূরে নয়।

বড় লেখক হওয়ার আশা যিনি পোষণ করেন মহাকবি মিল্টন, তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন নিজেই প্রকৃত কবিতা হওয়ার জন্য।^{১৯} বলেজ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনে প্রকৃত কবিতা হতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের ছন্দোবন্ধনে ছিল কাব্যশিল্পের স্বপ্ন। তাঁর স্বভাবে একটা স্নিগ্ধ পবিত্রতা আছে যেটা তাঁর সব রচনার প্রতিভাত হয়েছে ও সেগুলিকে নূতন লাভ্য দিয়েছে। তাঁর নিজের উপমার সাহায্য নিয়ে আমরা বলতে পারি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতো তাঁর মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে। এই শুভ্র-সমুজ্জ্বল শুচিতা সাহিত্যশিল্পী বলেজ্রনাথের জন্য বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ একটি স্থান চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত রাখবে।

১৬ ‘নগ্নতার সৌন্দর্য’ ব, প্র, পৃ ২৬০

১৭ ‘On Criticism’, Table Talk

১৮ ‘বলেজ্রনাথের সমালোচনা সৃষ্টিমূলক। সাহিত্য ও শিল্প অবলম্বন করে বাসনালোকের স্বর্ণমেঘস্তর বেন নূতন মোহে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করে।’—ডক্টর রবীন্দ্রনাথ রায়। ‘বলেজ্রনাথের সমালোচনা’ ‘সাহিত্য-বিচিন্তা’ (নূতন সংস্করণ) পৃ ২৩৮

১৯ ‘পথে পথে’। ‘অবধী’ ব, প্র, পৃ ৭৬

২০ ‘He who would not be frustrate of his hope to write well hereafter in laudable things ought himself to be a true poem.’—*Apology for Smeectymnus*, introd., to sec. I.

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিভাসাগরের 'সীতার বনবাস'

নরেশচন্দ্র জ্ঞান

বিভাসাগরের 'সীতার বনবাস' রামায়ণের বিস্তৃত নারীচরিত্র সীতার দুঃখবিড়ম্বিত জীবনের করুণ কাহিনী। সীতার জীবনেতিহাসকে যদি দুটি পর্বে ভাগ করি, তা হলে এটির উপজীব্য সীতা-জীবনের অন্ত্যপর্ব বলা চল। সীতা-জীবনের আদি পর্ব হ'ল—তীর জন্ম, বিবাহ, রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে অহুগমন ও বনবাস, রাবণ কর্তৃক অপহরণ, রামচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধার ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। বিভাসাগর তাঁর আখ্যানে এ সব ঘটনা পুরোপুরিই বাদ দিয়েছেন। সীতা-জীবনের অন্ত্যপর্ব—যা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পাতায় লিপিবদ্ধ (রামের সীতাপবাদ শ্রবণ, প্রজাম্বরজনার্থে সীতা-পরিত্যাগ, বান্দীকির তপোবনে সীতার বাস ও পুত্র লবকুশের জন্ম, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও লবকুশের রামায়ণ গান, রামের সঙ্গে সীতার পুনর্মিলন ও সীতার পাতাল প্রবেশ) তাই তিনি আশ্রয় করেছেন। অবশ্য স্পষ্টভাবে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অহুসরণ তাঁর এই অষ্টপরিচ্ছেদ সম্বলিত গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই ঘটেছে। বাকি গোড়ার দুটি পরিচ্ছেদের আখ্যানাংশ ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' থেকেই আহরণ করেছেন। তাঁর ভাষাতেই বলি—'সীতার বনবাস প্রচারিত হইল, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদসকল পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সংকলিত হইয়াছে।'^১

বিভাসাগরের স্বভাষণটি বিচার করলে স্পষ্ট হবে যে, সীতার বনবাস কোনো বিশেষ একটি গ্রন্থের যথার্থ অহুসরণ নয়। স্মরণ্য এটিকে কোনো একটিমাত্র গ্রন্থের অহুবাদ বলা চল না, তবে গোড়ার দুটি পরিচ্ছেদে তিনি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' গ্রন্থকেই অহুসরণ করেছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি রয়েছে স্মরণ্য এই অংশকে কেবলমাত্র উক্ত গ্রন্থেরই অহুবাদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'পরিগৃহীত' এবং 'সংকলিত' শব্দ প্রয়োগ থেকে আরও প্রতীত যে, গোড়ার দুটি পরিচ্ছেদের অবলম্বিত মূলের প্রতি যতটা আহুগত্য তাঁর রয়েছে, শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে ঐগুলির অবলম্বিত মূলের প্রতি ততটা আহুগত্য তাঁর নেই।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য যে, বিভাসাগর ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের প্রতি কতটা অহুগত থেকেছেন এবং কতটাই বা স্বাধীনতা নিয়েছেন। এখানেও উল্লেখ্য যে, উত্তররাম চরিতের প্রথম অঙ্ক অবলম্বনে গোড়ার দুটি পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ অংশ লিখিত নয়, অধিকাংশ ভাগ লিখিত হয়েছে মাত্র। স্মরণ্য এ থেকেই স্পষ্ট যে, সীতার বনবাস উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের হুবহু আক্ষরিক অহুবাদ নয়। মূলের কাব্যসৌন্দর্যকে কিংবা নিছক তার বিষয়বস্তুকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভাসাগর অহুবাদকর্মে ত্রুটি হন নি। প্রকৃতপক্ষে সীতা-চরিত্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'সীতার বনবাস' রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সেই ভাবেই কাহিনীকে

১ সীতার বনবাস। বিজ্ঞাপন

আলোচ্য গ্রন্থে সীতার বনবাস হতে উদ্ধৃত সমূহপাঠ ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মুদ্রিত সীতার বনবাসের পঞ্চবিংশ সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

রূপ দেবার তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। আর তাঁর সামনে উদ্বেগ ছিল গল্পরচনার ভাবারীতি গড়া। তারই সাধনায় তিনি অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন বলা চলে। 'সীতার বনবাস' তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং এ সবেমাই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আখ্যানের প্রয়োজনে উত্তররামচরিতের গৃহীত অংশের যে অনুবাদ করেছেন, সেই অনুবাদের সাফল্য ও সিদ্ধি বিচার্য।

উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্কের ঘটনা একরূপ—রাজ্যাভিষেকের পর একদিন রামচন্দ্র ও সীতা অন্তঃপুরে সমাসীন, এমন সময়ে অষ্টাবক্র মুনির আগমন এবং সীতার গর্ভকালীন ইচ্ছাপূরণের জন্ত রামের প্রতি অরুণ্ডতী, শাস্তা প্রভৃতির নির্দেশ ও প্রজাহরজ্ঞানে মনোযোগী হওয়ার জন্ত বশিষ্ঠের উপদেশ জ্ঞাপন, তদনন্তর অষ্টাবক্রের বিশ্রাম গ্রহণ, লক্ষ্মণের প্রবেশ, সীতার চিত্তবিনোদনের জন্ত লক্ষ্মণ কর্তৃক আলেখ্য প্রদর্শন, সীতার তপোবনদর্শনের অভিপ্রায় ও রামের তা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি, চিত্রদর্শনকালে গভিনী সীতার আলস্ত ও নিদ্রাবেশ, রামের বাহ উপাধানে সীতার নিদ্রা, হুমুখ নামক গুপ্তচরের প্রবেশ, প্রজাদের সীতাপবাদবৃত্তান্ত কথন, রামচন্দ্রের মর্যাস্তিক বেদনাবোধ, প্রজাহরজ্ঞানের নিমিত্ত সীতা-ত্যাগের সংকল্প, হুমুখের কানে কানে লক্ষ্মণের প্রতি সীতা-পরিত্যাগের নির্দেশ, সীতার চরণ মস্তকে ধারণ পূর্বক বিদায় গ্রহণ, চিত্রদর্শনকালে তপোবন দর্শনের জন্ত সীতার যে ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল, সেই ইচ্ছাপূরণার্থে অথচ সীতা-পরিত্যাগ অভিলাষে রামচন্দ্রের নির্দেশে সর্বথ লক্ষ্মণের প্রবেশ, সীতার রথারোহণ ও তপোবনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান। এর পর দ্বিতীয় অঙ্ক (পঞ্চবতী প্রবেশ) সীতা-নির্বাসনের বারো বৎসর পরে আরম্ভ হয়েছে।

ভবভূতি তাঁর 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্কের নাম রেখেছেন 'চিত্রদর্শন'। বিদ্যাসাগর তাঁর সীতার বনবাসে এই 'চিত্রদর্শন' নামক অঙ্কের বিষয়বস্তুকে প্রথম ও দ্বিতীয় একরূপ দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ ক'রে সন্নিবিষ্ট করেছেন। কারণ মনে হয়, অষ্টাবক্র মুনির আগমন থেকে লোকাপবাদজনিত রামের সীতা-পরিত্যাগের সংকল্প ও সীতার তপোবন উদ্দেশ্যে যাত্রা পর্যন্ত সমূহ ঘটনার বিরামহীন দীর্ঘ বর্ণনা পাঠকের কাছে গুরুভার হবে মনে করেছেন। তাই দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ ক'রে কাহিনীকে লঘুভার ও মন্থরতার হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'উত্তরচরিত' অনুবাদে প্রথম অঙ্কটিকে দুটি দৃশ্যে বিভক্ত ক'রে নিয়েছিলেন দেখা যায়। যাই হোক, প্রথম পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর অষ্টাবক্র মুনির অযোধ্যায় আগমন এই ঘটনা থেকে আলেখ্যদর্শন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আরম্ভ 'উত্তরচরিত'এর অনুসরণেই ঘটেছে। তবে নাটকের নান্দীবাক্য পরিত্যক্ত হয়েছে এবং নাটকের 'প্রস্তাবনা' অংশের সূত্রধার ও নটের সংলাপও ছবহু রক্ষিত হয় নি। অবশ্য এর প্রয়োজনও ছিল না কারণ তিনি আখ্যান রচনা করতে চেয়েছেন। ফলে সূত্রধার ও নটের কথোপকথন থেকে প্রয়োজনীয় বর্ণনায় ঘটনাকে অভীষ্টমত সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন এবং তাইই সঙ্গত হয়েছে। প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ মূল কাহিনীর অবতারণিকা হিসেবেই রচিত হয়েছে, এই দুটি অনুচ্ছেদের রচনা ও বিভাগে তাঁর স্বাধীন ভাবনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' আরম্ভ করেছেন এইভাবে—'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন, করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনশৃঙ্গে, স্বল্প সময়েই, সমস্ত কোশলরাজ্য সর্বত্র সর্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ফলতঃ, তদীয় অধিকার কালে, প্রজালোকের সর্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্য সঞ্চার করিয়াছিল, তুমুলে, কোনও কালে, কোনও রাজার শাসন সময়ে, সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি, প্রতিদিন, যথাকালে, অমাত্যবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া,

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'

৩৬১

অবহিত চিত্তে রাজকার্যের পর্যালোচনা করিতেন ; অবশিষ্ট সময়, ভ্রাতৃত্বের ও জনকতনয়ায় সহবাসস্থলে অতিবাহিত হইত। কালক্রমে, জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদর্শনে, রামের ও রামজননী কৌশল্যার আশ্রমের সীমা রহিল না ; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল ; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার দেখিব, এই মনের উল্লাসে, স্ব স্ব আবাসে, অশেষবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল।'

উদ্ধৃত অঙ্কচ্ছেদ দুটি মূলে নেই। এ বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রচনা। এর পরের দুটি অঙ্কচ্ছেদ অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কচ্ছেদের অবলম্বন নাটকের প্রস্তাবনা অংশ। নটের মুখের দুটি উক্তি এই দুটি অঙ্কচ্ছেদে সম্প্রসারিত। এক স্থলে সূত্রধারের জিজ্ঞাসায় নট বলছেন—'বিভাওকনুতস্তামৃগশৃঙ্গং উপবেসে। তেন চ সাজ্জতং দ্বাদশবার্ষিকং সত্রসারক, তদমুরোধাৎ কঠোরগর্ভামপি বধুং জানকীং বিমুচ্য গুরুজনস্তুত্র গতইতি।'^২ বিদ্যাসাগর এই উক্তিকে আশ্রয় ক'রে লিখেছেন—'কিয়ংদিন পরে, মহর্ষি ঋগ্‌শৃঙ্গ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা রামচন্দ্র, পরিবারবর্গের সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইলেন। এই সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এ জন্ত তিনি এবং তদমুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে, জামাতৃ যজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারাও, পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় যাইতে, কোনও মতে, সম্মত ছিলেন না, কেবল জামাতৃ কৃত নিমন্ত্রণের উল্লঙ্ঘন সর্বথা অবিধেয়, এই বিবেচনায়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, যজ্ঞদর্শনে গমন করেন।' প্রস্তাবনা সমাপ্ত হয়েছে নটের এই উক্তিতে—

কেদানীং মহারাজঃ। (আকর্ণ্য) এবং জনাঃ কথয়ন্তি—

স্নেহাৎ সমাজয়িতুমেত্য দিনাত্মমুনি নীত্বোৎসবেন জনকোহুগু গতৌ বিদেহান্।

দেব্যাক্রতো বিমনসঃ পরিসাঙ্কনায় ধর্মাসনাদ্বিশতি বাসগৃহংনরেন্দ্রঃ ॥^৩

বিদ্যাসাগর এরই অনুবাদ দিয়ে মূলকাহিনীকে উপস্থাপনের ভূমিকাটুকু সেবে নিয়েছেন। অনুবাদ করেছেন এবংরূপ—'কতিপয় দিবসপূর্বে রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন, তিনি, কৌশল্যা প্রভৃতির নিমন্ত্রণ গমনের অব্যবহিত পরেই, মিথিলায় প্রতিগমন করিলেন। প্রথমতঃ স্বশ্রজ্ঞবিরহ, তৎপরেই পিতৃবিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুলা হইলেন। পূর্ণগর্ভ অবস্থায় শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে অনিষ্টপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ; এজন্য রামচন্দ্র, সর্বকর্ম-পরিত্যাগপূর্বক, সীতার সাঙ্কনার নিমিত্ত, সতত তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।'

এর পরেই মূল আখ্যান শুরু হয়ে গেছে এবং তা ভবভূতির উত্তররামচরিতের ছবছই অনুসরণ। মূলের মতোই রামচন্দ্রও এখানে অষ্টাবক্র মাধ্যমে প্রেরিত বশিষ্ঠের উপদেশ শিরোধার্য ক'রে নিয়ে বলেছেন—

২ 'মহর্ষি বিভাওকের পুত্র ঋগ্‌শৃঙ্গ তাহাকে বিবাহ করেন। তিনি এখন দ্বাদশবর্ষ নিম্পাত্ত একটি বজ্র আরম্ভ করিয়াছেন ; তাঁহার অনুরোধে কৌশল্যা প্রভৃতি গুরুজনবর্গ, পূর্ণগর্ভা সীতাদেবীকেও ছাড়িয়া সেইস্থানে গিয়াছেন'—উত্তররামচরিত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং।

৩ 'ওহে, মহারাজ এখন কোথায়? (শুনিয়া) লোকে এইরূপ বলিতেছে,—মহারাজ জনক, আপ্যায়িত করিবার জন্ত আসিয়া, এই কয়দিন উৎসবে অতিবাহিত করিয়া, আজ বিদেহদেশে গিয়াছেন। সেই কারণে বিষয় চিন্তা সীতাদেবীর সাঙ্কনার জন্ত, মহারাজ (রামচন্দ্র) বিচারালয় হইতে বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছেন।'—উত্তররামচরিত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং।

‘যদি প্রজালোকের সর্বাঙ্গীণ অম্বরধনের জ্ঞা, আমায় স্নেহ, দয়া বা সুখভোগে বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি বিন্দুমাত্র কাতর হইব না।’

স্নেহং দয়াক্ষ সৌখ্যক যদি বা জানকীমপি ।

আরাধনায় লোকানাং মুক্তোনাশ্চি মে ব্যথা ॥—উত্তররামচরিত, ১ম অঙ্ক

মূলের মতোই রামচন্দ্র উজ্জল ও দীপ্তরূপে চিত্রিত । এর পরে রামচন্দ্র ও সীতাকে লক্ষণ আলেখ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।^৪ ভবভূতির আলেখ্যদর্শনের চিত্রগুলির ক্রম পরম্পরা এরূপ—(১) জুহুকাণ্ড, (২) হরধনুভঙ্গ, (৩) জনক ও শতানন্দের বশিষ্ঠ অর্চনা, (৪) বিবাহসভা, (৫) পরশুরাম, (৬) অযোধ্যাপ্রবেশ, (৭) শূরবেদপুত্রের নিষাদপতির সহিত মিলন, (৮) জটাবদ্ধন, (৯) পুণ্যসলিলা গঙ্গা, (১০) কালিন্দীতটবর্তী বটবৃক্ষ, (১১) বিরোধ রাক্ষস, (১২) দক্ষিণারণ্য প্রবেশ, (১৩) প্রমথগিরি ও পাদদেশ প্রবহমানা গোদাবরী, (১৪) শূর্ণগথা, (১৫) জটায়ু, (১৬) পম্পা সরোবর, (১৭) হনুমান ও (১৮) মালাবানু পর্বত ।

বিজ্ঞানাগর এই ক্রমবিজ্ঞানের একটুও ব্যত্যয় ঘটান নি । কেবল (১) জনক ও শতানন্দের বশিষ্ঠ অর্চনা, (২) পুণ্যসলিলা গঙ্গা, (৩) বিরোধ রাক্ষস, (৪) জটায়ু ও (৫) হনুমান—এই পাঁচটি চিত্রের কথা বাদ দিয়েছেন । রাম-সীতার অসৌম্য, প্রগাঢ় প্রেমের নিবিড়তার পরিচয় দানই এই আলেখ্যদর্শনের নিহিত উদ্দেশ্য, কেউ কেউ মনে করেন।^৫ তাই যদি হয় এবং বিজ্ঞানাগরও যদি সেরূপ উদ্দেশ্য মনে পোষণ করেছিলেন মনে করি, তা হলে রাম ও সীতার মধুর দাম্পত্য জীবনের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে এই চিত্রগুলির ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি পরিত্যাগ ক’রে থাকতে পারেন । কারো কারো মতে আলেখ্যদর্শন বিজ্ঞানাগর খুবই সংক্ষিপ্ত করেছেন।^৬ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । চিত্রগুলির যেরূপ পরিচয়

৪ উল্লেখ্য যে, মূল রামায়ণে এই আলেখ্যদর্শন ব্যাপারটি নেই । রামায়ণে আছে, অশোকবনে বিহারের ফাঁকে সীতা হঠাৎ রামের নিকট তপোবনভূমি দেখার বাসনা প্রকাশ করেন,—

তপোবনানি পুণ্যানি ত্রৈলোক্যমিহাশি রাঘব । গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামুদীণামুগ্রভেজসাম্ ।

কলমূলানিবাং দেব পাদবুলেবু বর্তিতুম্ । এষ মে পরমঃ কামো যস্মৈ লক্ষ্মণভোজিনাম্,—উত্তরকাণ্ড ৪২।৩০-৩১

রামচন্দ্র সীতার এই মনোভিলাষ পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন । তিনি বলেন,—‘বিস্রুত। ভব বৈদেহি যো গমিবন্তঃশরম্’ । সীতার এই তপোবনদর্শনের আকাঙ্ক্ষা রামায়ণে আকস্মিক এবং কার্ণকারণ শৃঙ্খলাবিহীন লাগে । ভবভূতির কল্পিত আলেখ্যদর্শন খুবই শিল্পসিদ্ধ এবং নাটকীয় কলাকৌশলের দিক থেকে চমৎকৃতিপূর্ণ । পূর্বজীবনের স্মৃতিবিজড়িত চিত্রগুলি দেখার ফাঁকে সীতার বিগতদিনের মধুর মুহূর্তগুলির কথা মনে এসেছে এবং কলে তপোবন দেখার অভিপ্রায় খুবই স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত হয়ে উঠেছে । তবে আলেখ্যদর্শনের পরিকল্পনার বীজটি ভবভূতি খুব সম্ভব কালিদাসের রঘুবংশ থেকে পেয়েছিলেন ধারণা । রঘুবংশে আছে—

তরোর্থথাপ্রার্থিতমিহিয়ার্থানাসেহুযোঃসদ্যহ চিত্রবৎস্ ।

প্রাপ্তানি ছঃখাত্তপি দণ্ডকেবু সঙ্কিত্যমানানি সুখাত্তভুবন ॥—১৪।২৫

[রামসীতার বাসনার অমুরূপ কোনো ভোগ্যবস্তুরই অভাব ছিল না । তাহার আশ এই মিলনের দিনে, মনোহারিনী চিত্রশালার আশিরা দণ্ডকারণ্যের সেই অনন্তদুঃখের ঘটনাবলীর আলেখ্যদর্শনপূর্বক, সেই সেই ছঃখের দিনের ব্যাপারগুলি চিত্রা করিয়া ও কত সুখ পাইভেন ।—বহুমতী সংস্করণ]

৫ ‘ইহার উদ্দেশ্য এমন নহে যে, কবি সংক্ষেপে পূর্ব ঘটনার সকল বর্ণনা করেন । রাঘ সীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনাই উদ্দেশ্য ।’—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তরচরিত

৬ ডক্টর হনীলবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সীতার বনবাস পৃ ৮৪

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিভাসাগরের 'সীতার বনবাস'

৩৬৩

মূলে রয়েছে, বিভাসাগর তার অবিকল অনুবাদ বসিয়ে না দিলেও মূলের প্রতি প্রায় পূর্ণমাত্রায় অনুগত। কেবলমাত্র কাহিনীতে সাবলীলতা ও সরসতা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘ সমাসভার-মন্তর মূলের বর্ণনাকে কোথাও কোথাও সমাসমুক্ত ক'রে সামান্যমাত্র সংক্ষেপিত করেছেন। আবার এও দেখা গেছে, প্রয়োজনে মূলের চিত্রদর্শনের বর্ণনা পল্লবিতও করেছেন। চিত্রগুলির মূলের দৃশ্যসৌন্দর্য কোথাও কোথাও সুন্দর রক্ষিত হয়েছে।^৭ বিভাসাগর আলেখ্যদশনকে কতখানি অনুসরণ করেছেন, হ'একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ তা সম্যক দেখা যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

সীতার বিবাহ উপলক্ষ্যে যখন হরধনু ভাঙার জন্য রাম উদ্যত, তখনকার একটি চিত্র দেখে সীতা বলছেন—‘অঙ্গাহে দল্লবনৌল্পপলসামলসিগন্ধমসিগসোহমাণমংসলেণ দেহসোহগগেণ বিস্কমখিমিদতাদদীস-মাণসোম্মন্দরসিরী অণাদরখণ্ডিসকরসরাসণো সিহগুম্ভমুহমওলো অঙ্কউস্তো আলিহিদো।’

একালে হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ এর অনুবাদ করেছেন এরূপ—‘ওমা, এই আর্ঘপুত্রকে চিত্র করিয়া রাখিয়াছে; প্রস্তুটিত নব নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, সুন্দর অথচ বলিষ্ঠ দেহের সৌন্দর্যবশতঃ, আমার পিতৃদেব বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া, সুন্দর শোভা মন্দর্শন করিতেছেন; ইনি অবহেলার হরধনু ভাঙ করিয়াছেন এবং ইহার মুখমণ্ডল জুল্লিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছে।’

আর বিভাসাগরের কালে নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর অনুবাদ করেছেন এরূপ—‘আহা! আর্ঘপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহসৌন্দর্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন। আহা কি সুন্দর!’^৮

আর সীতার এই উক্তিকে বিভাসাগর পরিবেশন করেছেন এরূপ—‘তাইত, ঠিক যেন আর্ঘপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন! আ মরি মরি কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে!’

অনুবাদের তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট যে, প্রথম দুটি আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াস। তন্মধ্যে নৃসিংহ চন্দ্রের মূলের তৎসমশব্দগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে মূলের দৃশ্যসৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়তো কিছুটা সার্থক কিন্তু সংস্কৃত পদাঙ্ককে অনুকরণের চেষ্টার ফলে ভাষারীতিতে জটিলতা রয়েছে, বক্তব্য সহজ সাবলীলতা আসে নি।

বিভাসাগর তাঁর অনুবাদে সমাসসন্ধিবিজড়িত বাক্যবিভাসকে অনেকাংশে সাবলীল ক'রে তুলেছেন।

৭ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রদর্শনকালে বিভাসাগর নাটকের পাত্রপাত্রীর একের সংলাপকে অস্তের মুখে আরোপিত করেছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জনহানের চিত্রদর্শনকালে পূর্ণপথার চিত্র দেখে তাকে বর্ণার্থ ই পূর্ণপথা মনে ক'রে রামের সঙ্গে বিচ্ছেদ আসন্ন করনার সীতা মুহূর্ত্তান হয়ে পড়লে ‘এ কেবল চিত্রমাত্র’ এই বলে সাস্বনা দিয়েই পরমুহূর্ত্তে রাম বলেন, ‘হস্ত! বর্ত্তমান ইব মে জনহানবৃত্তান্ত প্রতিভাতি’ অর্থাৎ হায়! জনহানের বৃত্তান্ত যেন আমার বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইতেছে। বিভাসাগর রামের এই উক্তিকে লক্ষণের মুখে দিয়েছেন। ‘লক্ষণ ইত্যন্ততঃ দৃষ্টিসংকারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য! চিত্রদর্শনে চিত্রাভীত জনহানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সীতাকে ‘এ কেবল চিত্রমাত্র’ এই বলে সাস্বনা দেবার পরমুহূর্ত্তেই রামের ঐ উক্তি বিভাসাগরের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছিল, ধারণা, তাই বোধ হয়, রামের উক্তিকে লক্ষণের মুখে বলিয়েছেন।

৮ উল্লেখ্য যে, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত উত্তররামচরিতের অনুবাদ গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বকিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত ‘উত্তরচরিত’ গ্রন্থটি লেখেন

অবশ্য এটুকু সাবলীলতা আসার জন্য মূলের দৃশ্যসৌন্দর্যে কিঞ্চিৎ হানি ঘটেছে, ধ্বনিলালিত্য ও শব্দের সমৃদ্ধি স্বাক্ষর নষ্ট হয়েছে। তবে পূর্বেই বলেছি, মূলের সৌন্দর্যকে পরিবেশন বিজ্ঞানাগরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না। গল্পরচনার ভাবারীতি গড়া এবং তৎসঙ্গে আখ্যানে সাবলীল সরসতা আনা এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেদিক থেকে বিজ্ঞানাগরের অনুবাদ সর্বাধিক সফল। মূলের রামচন্দ্রের দেহসৌন্দর্য বর্ণনা পরিত্যক্ত হওয়াতে চিত্রের মূল আবেদনের তেমন কোনো ইতর বিশেষ ঘটে নি। তুলনায় চিত্রের সংক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও চিত্রদর্শনে সীতার মুগ্ধ বিশ্বয় ভাবটি অন্ত্যাদ্যের অপেক্ষা চমৎকার ফুটে উঠেছে। এ জাতীয় সংক্ষেপ বিজ্ঞানাগর দুটি একটি ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথাও করেন নি। আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি—

জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির পরিচয়টি লক্ষণ একরূপ দিয়েছেন—‘অয়সবিরলালোকহনিবহনির-স্তরনিধনীলপরিসরারণ্যপরিণক-গোদাবরীমুখরকন্দরঃ সন্ততমভিপন্দমানমেঘমেঘবিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।’ বিজ্ঞানাগর এর অনুবাদ করেছেন একরূপ—‘এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চারমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিধি নীলিমায় অলংকৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।’

নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর অনুবাদ করেছেন একরূপ—‘যাহার গহ্বরসমূহ, নিবিড় তরুরাজিপূর্ণ (সুতরাং একেবারে অবকাশরহিত অর্থাৎ বৃক্ষশ্রেণী একরূপ নিবিড় সন্নিবিষ্ট যে সূর্যরশ্মি তাহার ভিতরে কোনোরূপেই প্রবেশ করিতে পারে না) সুতরাং স্নিগ্ধ এবং শ্রামবর্ণ অরণ্যের প্রান্তভাগে বিস্তৃত। গোদাবরী নদীর ঝরঝর শব্দে অতুষ্ণ শস্যমান হইতেছে, এবং যাহার নীলবর্ণ, অতুষ্ণ শূন্যমার্গে বিচরণশীল জলদরাজি সহযোগে অধিকতর শ্রমলতা ধারণ করিতেছে। এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ নামে গিরি।’

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীস এর অনুবাদ করেছেন একরূপ—‘জনস্থানের মধ্যবর্তী এই প্রস্রবণ নামক পর্বত; সর্বদা বর্ণকারী মেঘসমূহ, ইহার নীলবর্ণকে বিশেষ স্নিগ্ধ করিয়াছিল এবং গোদাবরী নদীর তরঙ্গের আঘাতে উহার গুহা শস্যমান হইয়াছিল; গোদাবরী নদীর উত্তর তীরের প্রান্তভাগই বনসমূহে ব্যাপ্ত ছিল; ঘন ঘন বৃক্ষসমূহে সেই বনগুলিকে নিবিড় ও স্নিগ্ধ করিয়াছিল।’

বিজ্ঞানাগর তাঁর অনুবাদে মূলের সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ বর্ণনাকে টুকরো টুকরো ক’রে ভেঙ্গে নিয়েছেন। তাতে অনুবাদ খুবই স্খলপাঠ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মূলের রূপ ও রসের অক্ষুণ্ণতা বজায় রেখেছেন শব্দসন্নিবেশের আশ্চর্য যাদুকৌশলে। আর স্নিগ্ধ সঙ্গীতমাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন সলিত কঠিন অক্ষর বিজ্ঞানের কড়ি-কোমলে। বিজ্ঞানাগর এ অংশের অনুবাদে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে তাঁকে এক অসামান্য শিল্পীর আসন দিতে হয়। আরও যে দুটি অনুবাদ উদ্ধৃত করেছি তাতেও মূলের আনুগত্য রয়েছে এবং অনুবাদও অনান্যাসবোধ্য কিন্তু শিল্পীপ্রাণের স্পর্শ এ দুটিতে বিরল। মূলের সলিত পদের ধ্বনিংকার তথা শব্দসঙ্গীত এঁদের কেউই ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এইখানেই বিজ্ঞানাগরের কৃতিত্ব এঁদের থেকে সর্বাধিক। পূর্বেই দেখিয়েছি, হরধনু ভঙ্গের চিত্রটি বিজ্ঞানাগর সামান্য সংক্ষেপিত করেছেন। এখানে দেখছি, জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির চিত্রটি মূলেরই মতো অরণ্যপ্রকৃতির শ্যামল পরিবেশ সহ অবিকল অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এবার আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি, যেখানে মূলের চিত্রটিকে বিজ্ঞানাগর বিস্তারিত করেছেন, ধারণা। উত্তররামচরিতে রামচন্দ্র পম্পা সরোবর প্রসঙ্গে সীতাকে বলছেন—

দেবি । রমণীয়মেতৎ পম্পা সরঃ এতশ্চিন্ মদকলভমল্লিকাখ্যাপকব্যাধৃত ক্ষুদ্রদুন্দুপুওরীকাঃ ।

বাম্পাস্তঃ পরিপতনোদগমাস্তরালে সংদৃষ্টাঃ কুবলয়িনো ভুবো বিভাগাঃ ॥—১ম অঙ্ক, ৩১শ শ্লোক

[দেবি ! এই পম্পা সরোবর বড়ই মনোহর । অশ্রুজলের পতন এবং পুনরায় উৎপত্তি এর ফাঁকে এর মধ্যভাগ দেখেছিলাম ; এ স্থানগুলিতে বহু পদ্ম ছিল । পদ্মগুলির আবার বহুং দণ্ড ছিল । সেই দণ্ডগুলি আবার মদমন্ত মল্লিকা পাখীর ডানার হাওয়ায় কাঁপছিল ।

দেখা যাচ্ছে, পম্পা সরোবরের বর্ণনায় রামচন্দ্র সরোবরের কোটা পদ্মগুলির ও মল্লিকা পাখীর ডানার সেই পদ্মগুলির কাঁপার কথা কেবলমাত্র উল্লেখ ক'রে বর্ণনার সমাপ্তি টেনেছেন । বিদ্যাসাগর কিন্তু পম্পা সরোবরের রমণীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে মূলের অপেক্ষাও বেশি বিস্তারিত করে বলেছেন । তাঁর বর্ণনা একরূপ—‘প্রফুল্ল কমল সকল মন্দ মাকুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরের নিরতিশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে ; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে, মধুকরেবা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া, উড়িয়া বেড়াইতেছে ; হংস, মারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ, মনের আনন্দে, নির্মল মলিলে কেলি করিতেছে ।’

পম্পার যে রমণীয় সৌন্দর্যচিত্র বিদ্যাসাগর রচনা করেছেন তার তুলনায় মূলের চিত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসুস্পষ্ট দেখা গেল । সুতরাং মূলকে কেবলই তিনি যে সংক্ষিপ্ত করেছেন তা নয়, প্রয়োজনে বিবল বর্ণনাকে কল্পনা সংযোগে বিস্তৃতিও দিয়েছেন । কোথাও কোথাও মূলের চিত্রে নবতর মাধুর্যের সঞ্চার ক'রে এক অভূতপূর্ব রসান্বাদও এনে দিয়েছেন । যেমন নিম্ন দৃষ্টান্তটি—

বিবাহসভার চিত্রপ্রদর্শনকালে বধূবেশে সজ্জিতা চারিটি নারীমূর্তির পরিচয় দিতে গিয়ে লক্ষণ সীতাকে বলছেন—এই যে আপনি, এই যে শ্রুতকীর্তি, এই যে মাওবী । তার পর উর্মিলাকে দেখেই থেমে গেলেন । তখন সীতা বলছেন—‘বচ্ছ ! ইয়ং বি অবরা কা’ অর্থাৎ বৎস ! এই অপর স্ত্রীলোকটি কে ?

লক্ষণ তখন একটু লজ্জা পেয়ে ঈষৎ হাস্তে স্বগত (সলজ্জস্মিতং স্বগতম্) বলছেন—‘অয়ে ! উর্মিলা পৃচ্ছতার্থা ভবভূতঃ সকারয়ামি’ অর্থাৎ উর্মিলার কথা জিজ্ঞেস করছেন, অন্য দিকে এঁর মন ফেরাই ।

ভবভূতির এই সামান্য দুটি ছত্রের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের হাতে নবকলেবর লাভ করেছে । বিদ্যাসাগর লিখছেন—‘সীতা বুদ্ধিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্তমুখে উর্মিলার দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া লক্ষণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে ? লক্ষণ কোনো উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি দেখুন, দেখুন... ।’

বাঙালীর পারিবারিক জীবনের একটি মধুর আলোখা আমাদের সামনে চিত্রকালের অশ্রু উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে এখানে । বাঙালীর ঘরে ঘরে দেবর ও ভ্রাতৃজ্ঞার মধ্যে যে স্নেহ সরস কৌতুকের সম্পর্কটি বিद्यমান, তাই বিদ্যাসাগর অনার্যাস মাফল্যে চিত্রিত করে তুলেছেন । সীতা এখানে পৌরাণিক মহিমাম্বিতা নারী নন, তিনি যেন আমাদের পরিবার জীবনের স্নেহ-মমতা যায়ামাখানো বধু । এখানেই মনে হয় বিদ্যাসাগর কেবল নিছক অনুবাদক নন, তিনি এক মৌলিক রচনাকারও বটে ।^২

^২ রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থে এই অংশের অনুবাদ এইরূপ পাই—‘সীতা কেবল স্নেহ কৌতুকে একটবার হাত তুলার উপরে ভরসা রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস, ইনি কে ? লক্ষণ লজ্জিত হাস্তে মনে মনে কহিলেন, ওহো, উর্মিলার কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে হবি চাকিয়া কেলিলেন ।’ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের

ভবভূতির উত্তররাম চরিত্রের প্রথম অঙ্কের নাম রাখা হয়েছে 'চিত্রদর্শন'। বিভাসাগর তাঁর সীতার বনবাসে পরিচ্ছেদগুলির কোনো নামকরণ করেন নি। মূলের অনুসরণে প্রথম পরিচ্ছেদের নাম চিত্রদর্শন রাখলে কোনো অসঙ্গতি হ'ত না। এখানে প্রকৃতপক্ষে চিত্রদর্শনের পরেই প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি টানা হয়েছে। চিত্র দেখতে দেখতে সীতার আলমলক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে লক্ষণ চিত্রদর্শন স্থগিত রেখেছেন। 'এই সময়ে সীতার আলমলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষণ বলিলেন, আর্থ আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; আর্থ জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিশ্রামকূল সেবা আবশ্যক' আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।' এ মূলেরই অনুসরণ। মূলেও অবিকল একরূপ আছে, লক্ষণ বলছেন—, 'পরিশ্রান্তা চেয়মার্থা, তদ্বিজ্ঞাপয়ামি বিশ্রম্যাতামিতি।'।

ভবভূতির উজ্জ্বলচরিত্রের প্রথম অঙ্কের নাম রাখা করেছে 'চিত্রদর্শন'। বিভাসাগর তাঁর সীতার বনবাসে পরিচ্ছেদগুলির কোনও নামকরণ করেন নি। মূলের অনুসরণে প্রথম পরিচ্ছেদের নাম চিত্রদর্শন রাখলে কোনও অসঙ্গতি হ'ত না। এখানে প্রকৃতপক্ষে চিত্রদর্শনের পরেই প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি টানা হয়েছে। চিত্র দেখতে দেখতে সীতার আলমলক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে লক্ষণ চিত্রদর্শন স্থগিত রেখেছেন। 'এই সময়ে, সীতার আলমলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষণ বলিলেন, আর্থ আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; আর্থ জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিশ্রামকূলসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।' এ মূলেরই অনুসরণ। মূলেও অবিকল একরূপ আছে, লক্ষণ বলছেন—'পরিশ্রান্তা চেয়মার্থা, ও বিজ্ঞাপয়ামি বিশ্রম্যাতামিতি।'।

উপরে বিভাসাগরের রচনার প্রভাব স্পষ্ট। 'কৌতুক করিবার নিমিত্ত' সত্বেও কৌতুকে ও 'অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া' তর্জনী রাখিয়া রূপান্তর লাভ করেছে বেশ সহজেই বোকা বার। 'এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে হবি চাকিয়া কেলিলেন' এই অংশ মূলে নেই। এ রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন সংযোজন। বিভাসাগরের 'সীতার বনবাস' মধুসূদনকেও একটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছিল, যেন হয়। যেমনসিংহ কাব্যে চতুর্থ সর্গে সীতার উক্তি—

‘হিনু যোরা হুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী বধা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাধে নীড়, থাকে সুখে, হিনু যোর বনে,
নার পঞ্চবটী, মর্ত্যে হরবনসম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষণ হুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার বার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার; যোগাতেন আনি
নিত্য কল মূল বীর সৌমিত্রি……
ভুলিহু পূর্বের দুখ, রাজার নন্দিনী,
রম্যুল বধু আমি, কিন্তু এ কাননে,
পাইহু সরসা সই, পরম পিঙ্গীতি ?

স্পষ্টতঃই বিভাসাগরের 'সীতার বনবাস'এর রায়ের এই উক্তিকে স্মরণ করায়—বিদে। তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম, আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষণ, ইত্যন্ততঃ পৰ্বটন করিয়া, আহাযোগযোগী কলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরী তীরে বৃহৎ মল্ল পর্বতে ভ্রমণ করিয়া, আমরা, প্রাপ্তে ও অপর্যাপ্তে শীতল হৃদয় গভবহের সেবন করিতাম। হাঃ, তেমন অবস্থার থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

এর পর সীতা তপোবনদর্শনের অভিলাষ জানালে রাম সানন্দ অহুমতি দিয়ে লক্ষ্মণকে যাত্রার আয়োজন করতে বলেছেন। লক্ষ্মণও 'যে আজ্ঞা' বলে গমনের উপযোগী আয়োজন করবার জন্য প্রস্থান করেছেন। বিদ্যাসাগর মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানেই প্রথম পরিচ্ছেদের ইতি টেনে দিয়েছেন। প্রথম অঙ্কে এক্ষেপে এখানে একটি ভাগরেখা দিয়ে টেনে দিয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনা পরবর্তী ঘটনা দিয়ে আরম্ভ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি সম্পূর্ণরূপে মূলানুগ এবং খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। মূল থেকে একটুও ব্যত্যয় ঘটানো হয় নি এখানে। মূল এবংরূপ রয়েছে,—

সীতা—অঙ্কউত্ত ! এদেণ চিত্তদংসণেণ পচ্ছ প্লবদোহদাএ অখি মে বিল্লঙ্গং ।

রামঃ—নবাজ্ঞাপয় ।

সীতা—জ্ঞানে, পুণো বি পসল্লগস্তীরাহু বণরাইহু বিহরিস্,সং, পবিস্তগিম্মলসিসিরাবগাহাক ভাবদৌঃ ভাইবহৌঃ অবগাহিস্,সম্ ।

রামঃ—বৎস লক্ষণ !

লক্ষণঃ—এষোহস্মি ।

রামঃ—অচিরং সম্পাদনীয়োহস্তা দোহদঃ ইতি সম্প্রত্যেব গুরুভিঃ সন্দিষ্টম্ । তদন্থলিত স্তম্ভসম্পাতং রথমুপস্থাপয় ।

সীতা—অঙ্কউত্ত ! তুঙ্কোহিং বি তহিং গম্ভকং ।

রামঃ—অয়ি কঠিন হৃদয়ে ! এতদপি বক্তব্যমেব ।

সীতা—তেণ হি পিঅং মে ।

লক্ষণঃ—যথাজ্ঞাপত্যাৰ্য্যঃ । (ইতি নিজ্জাস্তঃ)

বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছেন এবংরূপ,—

'এই বলিয়া বিদায় লইয়া, লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে বলিলেন, নাথ ! চিত্র দেখিতে দেখিতে, আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম বলিলেন, প্রিয়ে ! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্বার মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া, তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথী সলিলে অবগাহন করিব। সীতার অভিলাষ শ্রবণগোচর করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! এইমাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। অতএব, গমনের উপযোগী আয়োজন কর ; কল্য প্রভাতেই ইনি, অভিলষিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন। সীতা সান্তিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, নাথ ! আপনিও সঙ্গে যাবেন। রাম বলিলেন, অয়ি মুগ্ধ ! তাহাও কি আবার তোমাকে বলিতে হইবেক। আমি কি তোমার নয়নের অন্তরাল করিয়া এক মুহূর্তও স্তম্ভ হৃদয়ে থাকিতে পারিব ? তৎপরে সীতা, সশ্রিতমুখে, লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস ! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া, গমনের উপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।'

লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে 'তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক' সীতার এই অহরোধ মূলে নেই। বিদ্যাসাগরের এটা স্বাধীন সংযোজন। এই প্রসঙ্গে এই সংযোজন অপূর্বসুন্দর হয়েছে। বাঙালী

ঘবের বধু সীতা স্বামীসোহাগিনী হয়ে কাছেই পরিজন আপনায় ছোট দেবরটির কথা বিস্মৃত হন নি, এতে সীতা-চরিত্রের মধুর্য কি অপরিমিতভাবেই না বেড়ে গেছে। অতীবাদের ফাঁকে ফাঁকে মূলের মধ্যে এইরূপে যে স্বল্প ভাবের পরিবর্তন সাধন করেছেন এতেই তাঁর মহৎ শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে এবং এখানেই তাঁর অসামান্য স্রষ্টা পরিচয় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলা চলে।

সীতার বনবাসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাম ও সীতার বিশ্রামালাপ, সীতার নিদ্রাকর্ষণ, দুর্মুখের প্রবেশ ও সীতাপবাদ জ্ঞাপন, রামের এবং বিধ মর্যাস্তিক সংবাদপ্রবণে কাতরতা ও বিলাপ এবং সীতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও লোকবক্তনামার্থে সীতা-পরিত্যাগের সংকল্প, এই পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এরও মূল ভবুতির উত্তররামচরিত্রের প্রথম অঙ্কই। বিভাসাগর প্রথম অঙ্কের ঘটনাকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন, পূর্বেই বলেছি। প্রথম অঙ্কের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ প্রথম পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট ক'রে বাকি ঘটনাকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যে, রামচন্দ্রের দুর্মুখ মাধ্যমে লক্ষণকে সীতা, পরিত্যাগের নির্দেশ, রথসজ্জাপূর্বক লক্ষণের দুর্মুখ মাধ্যমে সীতাকে তা জ্ঞাপন, সীতার রথারোহণ ও তপোবন উদ্দেশ্যে যাত্রা—মূলের এই ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। বিভাসাগর দুর্মুখের মুখে রামচন্দ্রের সীতাপবাদের কথা প্রবণ এবং তাঁর মর্যাস্তিক বিলাপ ও পরিশেষে নিদ্রিতা সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অমুজগণের সঙ্গে পরামর্শের উদ্দেশ্যে মন্ত্রভবনে যাত্রা—এই পর্যন্ত বর্ণনা করেই উত্তররামচরিত্রের অমুসরণে যতি চেনে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি বাক্যটি এরূপ—‘এই বলিয়া, দুর্বিষহ শোকদহনে দৃঢ় হৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং, অমুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নিরূপণের নিমিত্তে, মন্ত্রভবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।’ নিম্নরেখ অংশটুকু উত্তররামচরিত্রে নেই।

এর উৎস বান্দীকির রামায়ণ। এখান থেকেই তিনি বান্দীকিকে অমুসরণ ক'রে কাহিনীকে নিজ ঈঙ্গিত পথে পরিচালিত করেছেন। নিম্নরেখ অংশটুকু রচনায় বিভাসাগর অসামান্য শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন কারণ এই বাক্যটি ভবুতির উত্তররামচরিত্রের সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর সংযোগ রচনায় আশ্চর্য সার্থকতা অর্জন করেছে। ‘এই বলিয়া, দুর্বিষহ শোকদহনে দৃঢ় হৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন’—অংশটুকু ভবুতির উত্তররামচরিত্রের সীমাচিহ্নিত। বাকি অংশ ‘ভাইদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য মন্ত্রভবনে প্রবেশ’ উত্তররামচরিত্রে নেই। ‘এবং’—এই সংযোজক অব্যয় প্রয়োগ করে, ও ‘অমুজগণের সহিত...মন্ত্রভবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন’ এই বাক্যটি জুড়ে দিয়ে সার্থকভাবে তৃতীয় পরিচ্ছেদের ঘটনার প্রবেশ করেছেন এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। রামায়ণে আছে, ভদ্রমুখে (এই ভদ্র ভবুতিতে দুর্মুখ নাম নিয়েছে) সীতাপবাদ শুনে রাম মনে মনে নিজ কর্তব্যবুদ্ধি স্থির ক'রে ব্রাহ্মদেয়কে নিজের কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন,—

বিকৃত্য তু হৃদ্বর্গং বুধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ ২২ সমীপে স্বারহ্মমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥

শীত্ৰমানয় সৌমিদ্ভিঃ লক্ষণং শুভলক্ষণম্ । ভরতঞ্চ মহাভাগং শক্রমমপরাজিতম্ ॥

উত্তরকাণ্ড ৪৪।১-২

বিভাসাগর রামায়ণের এই বর্ণনাকে ঈষৎ পরিবর্তিত ক'রে আপনায় অভিপ্রায় সাধনের অমুকুল ক'রে নিয়েছেন, চমৎকার ভাবে তা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত আখ্যানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। যাই হোক, উত্তররামচরিত্রের অমুবাদেই ফিরে আসা যাক। সীতার বনবাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ ও

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'

৩৭১

ঘটনার অল্পপূর্বিকতা উত্তররামচরিতের অঙ্করণেই ঘটেছে। এই পরিচ্ছেদের আরম্ভ একেবারেই মূলানুগ। বিদ্যাসাগর আরম্ভ করেছেন—'লক্ষ্মণ নিশ্চান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, অসমুচিত ভাবে, অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইল।' মূলেও প্রায় অমুরূপ বর্ণনা দেখি। সীতার আকাঙ্ক্ষামত লক্ষ্মণ তপোবন যাত্রার আয়োজনে প্রস্থান করলে রামচন্দ্র বললেন—প্রিয়ে, এসো, একটু শয়ন করি, 'প্রিয়ে! ইতো বাতায়নোপকর্ষে মুহূর্তং সংবিষ্টো ভবাবঃ।' সীতা তত্বস্তরে বললেন—তাই হোক, আমারও নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে, 'একং ভোহু, ওহীরিজ্জামি কথু পরিসমজ্জনিদাএ নিহাএ'।

এরপরে সীতার দেহস্পর্শ পেয়ে রামচন্দ্রের আনন্দোচ্ছ্বাস, সীতার শয়নের আকাঙ্ক্ষা, রামচন্দ্রের বাহ্য উপাধানে নিদ্রা, নিদ্রিতা সীতাকে দেখে রামচন্দ্রের প্রেমভাষণ প্রভৃতি ঘটনা বিদ্যাসাগর অবিকল উত্তররামচরিতের অঙ্করণেই লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর নাটকে প্রতিহারীর প্রবেশ ও দুর্মুখের আগমন বার্তাঙ্গাপন, দুর্মুখকে প্রবেশের নির্দেশ, দুর্মুখের প্রবেশের পর মুহূর্তে রামচন্দ্রের স্থপ্তা সীতার স্বপ্নভাষণ শ্রবণ ও স্নেহের সঙ্গে হস্তামর্শন বর্ণিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর এখানে ঈষৎ বদ-বদল করেছেন। প্রতিহারী ও দুর্মুখের প্রবেশের পূর্বেই তিনি রামচন্দ্রকে দিয়ে স্থপ্তা সীতার স্বপ্নভাষণ শুনিয়েছেন। নিদ্রিত সীতার গারে হাত বোলানোর কার্যটিও প্রতিহারীর এবং দুর্মুখের প্রবেশের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিবর্তন স্পষ্টতই হয়েছে বলা চলে। যাই হোক, দুর্মুখ একজন রাজভৃত্যমাত্র। তার সম্মুখে স্থপ্তা সীতার গারে রামচন্দ্রের হাত বোলানো বিসদৃশ ঠেকে। ঘটনাটিকে ঈষৎ আগে পরে ক'রে নেওয়াতে মূলের বক্তব্যের কোনো হানিই ঘটে নি বরং শিল্পসম্মত হয়েছে বলা চলে। এ জাতীয় সূক্ষ্ম পরিবর্তন সীতার বনবাসে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এবং তা বিদ্যাসাগরের স্বাধীন স্রষ্টারূপের পরিচায়ক।

রামচন্দ্রের সম্মতিক্রমে প্রতিহারীর নির্দেশে দুর্মুখ প্রবেশ করে। রামচন্দ্র তাকে রাজ্যের অবস্থা জানাতে বলেন। দেশবাসী রামচন্দ্রের প্রশংসাই ক'রে এই কথা সে প্রথমে জানায়—'মহারাজ কি পৌরগণ, কি জনপদগণ, সকলেই বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম স্থখে আছি।' একেবারে মূলেরই অনুবাদ। মূলেও এমনি আছে—'উবচ্ছ্বসন্তি দেঅং পোরজাণবদা, বিহুমরিদা অন্ধে মহারাজদসরহস্স রামদেঅণ ত্তি।' একথা শুনে রাম বললেন—'তুমি প্রতিদিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক; যদি কেহ কোনও দোষকীর্তন করিয়া থাকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্ন হই।' এও মূলেরই অনুসরণ। মূলে আছে, রামচন্দ্র বলছেন—'অর্থবাদ এষং, দোষস্ত মে কঞ্চিৎ কথয়, যেন স প্রতিবিধীয়তে'। রামচন্দ্রের এই কথা শুনে দুর্মুখ অশ্রুপাতের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রের কানে কানে সীতাপবাদের কথা জানায়। ভবভূতির উত্তররামচরিতে দুর্মুখের পরিচয় এই পর্যন্ত। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসে দুর্মুখের চরিত্রটি অতিশয় বিস্তৃতিসহকারে চিত্রিত। কোনও দোষকীর্তন আছে কিনা, রামচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসায় দুর্মুখের দেহ ও মনের যে বৈকল্য বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন, ভবভূতিতে তার পরিচয় নেই। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'-এ দেখি রামচন্দ্রের দুর্মুখ অগ্রিয় সংবাদ গোপনের চেষ্টা করেছে কিন্তু তার স্বরবিকৃতি দেখে রামচন্দ্রের মনে সন্দেহ জন্মেছে। প্রকৃত সত্য জানানোর জন্য রামচন্দ্র তাকে আকুল আগ্রহে অনুরোধ করেছেন। 'এক্ষণে, রাম দোষকীর্তন কথার উল্লেখ করিবামাত্র, সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; পরে কথঞ্চিৎ বুদ্ধি স্থির করিয়া, শুক মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, না মহারাজ! আমি কোনও দোষকীর্তন শুনিতে পাই

নাই। সে এইরূপে অপলাপ করিল বটে, কিন্তু তাহার আকার প্রকার দর্শনে, রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাতিশয় চলচ্চিত্র হইয়া, আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, তুমি অবশ্যই দোষকীর্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন? কি শুনিয়াছ বল, বলিয়া করিও না; না বলিলে আমি যাবপর নাই অসন্তুষ্ট হইব, এবং এজন্মে, আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।'

বিজ্ঞানাগরের রচনার এই অংশে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডোক্ত রামকাহিনীর ছায়াপাত ঘটেছে ধারণা। সেখানেও দেখা যায় যে, রামচন্দ্র নিযুক্ত একটি চর রামচন্দ্রের নিকট সীতাপবাদ গোপন করার চেষ্টা করছে এবং রামচন্দ্র তাকে সত্য সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন—

ইত্যাदि वाक्यं चराणां पक्षानां वीक्ष्य राघवः ।
वष्टं प्रपच्छ चरं तं विलक्षणमुखाक्षितम् ।

सत्यां वद महाबुद्धे यच्छू तं लोकसङ्करे ।
तादृशं शंस मह्यं द्युमन्था पातकादिकम् ।

पुनः पुनश्चरं रामः पप्रच्छ श्रुतिविश्रुतिम् ।
तदापि न त्रयीत्येव रामं लोकेककडाक्षितम् ।

तदा रामः प्रत्यावोचच्छरं मुखविलक्षितम् ।
शशामि श्वास्त सत्येन शंस सर्वं यथातथम् ॥—৩১।২৬-২৯

[শ্রীরামচন্দ্র ক্রমিক পঞ্চচরের ইত্যাदि वाक्य শ্রবণ করিয়া সেই চরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে তাহার মুখমণ্ডল বিকৃতভাবাপন্ন বোধ হইয়াছিল। শ্রীরাম বলিয়াছিলেন—হে মহাবুদ্ধে, সত্য বল, তুমি প্রজাগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, আমার অবিকল সেইরূপ বল, অন্যথা তুমি পাতকী হইবে। শ্রীরামচন্দ্র সেই চরকে, সে কর্ণে যেরূপ বিকৃত কথা শুনিয়াছিল, তদ্বিষয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তথাপি সেই চর এক মাত্র রাজকথিত বিষয় বলিল না। তখন রামচন্দ্র, মুখের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সেই চরকে কহিলেন, তোমাকে সত্য দিবা দিয়া বলিতেছি, যথার্থরূপে সমুদয় বিষয় বল।—বঙ্গবাসী সংস্করণ]

রামচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত দুর্মুখ রামচন্দ্রকে সীতাপবাদের কথা জ্ঞাপন করতে মনস্থির করেছে। 'রামের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া দুর্মুখ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। কিরূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব। আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ কার্যের ভার গ্রহণ করিব কেন; কিন্তু যখন, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রভুর নিকটে, অকপটে, প্রকৃত কথাই বলা উচিত। একদিকে কর্তব্যনীতি ও অপরাধিত্ব, হৃদয়নীতি এ দুয়ের মধ্যে যে দুর্মুখ বিষ্ণু তার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। ভবভূতির দুর্মুখও এই কর্তব্য ও হৃদয়ের মধ্যে বিষ্ণু হয়েছে দেখা যায়। দুর্মুখ স্বগত বলছে—'হা! কথং সীতাদেইএ ঈরিসং অচিন্ত্যগিচ্ছং জনাপবাদং দেবস্ব কথইস্ম্যং; অহবা গিওও কথু ঈরিসো মন্দভাঅস্ম্য।' [হায়, সীতাদেবীর এরূপ অভাবনীয় লোকাপবাদ কি করে রাজার নিকট বলব; অথবা, মন্দভাগ্যের (আমার) উপরে আদেশই এরূপ।]

বিজ্ঞানাগর ভবভূতিরই বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন এখানে। ভবভূতির এই অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত দুর্মুখের দ্বিধাকাতর রূপটি বিজ্ঞানাগর আরও বিস্তৃতিসহকারে বর্ণনা করায় তা আরো সুন্দর, গভীর এবং রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। নাটকে দেখা যায়, সীতা রামের বাহুউপাধানে নিজ্জিতা, এমতাবস্থায় দুর্মুখ রামচন্দ্রকে সীতাপবাদ জানিয়েছে। রামচন্দ্র তাই শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। মূর্ছাভঙ্গে উঠেই বিলাপ, আর্তনাদ, ক্রন্দন করেছেন। অথচ আশ্চর্য যে এত সব ঘটনাতেও রামের বাহুউপাধানে শাস্তিতা সীতার নিভ্রাভঙ্গ ঘটে নি। বিজ্ঞানাগর এই জিনিসটি ঠিক স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে করতে পারেন না ধারণা। তাই বোধ করি তিনি দুর্মুখের সীতাপবাদজনিত অপ্রিয় সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারটি

গৃহাস্তরে সাধিত করেছেন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনে এটুকু বোধ ছিল যে, এরূপ একটি দুঃসংবাদ পাওয়াযাত্রই রামচন্দ্রের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং তাতে রামচন্দ্র হা হতাশ, আর্তনাদ ক'রে উঠবেন। স্থগী সীতার তাতে নিদ্রাভঙ্গ ঘটতে পারে এবং রামচন্দ্রকে এরূপ কাতর আর্তনাদ, বিলাপ প্রভৃতি করতে দেখলে সীতার মনে অহুসঙ্কিৎসা দেখা দেবে এবং তাই যদি হয়, তা হলে সেখানে রামচন্দ্রের সত্যগোপন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সমূহ ব্যাপারটি তাই সীতার অগোচরে সংঘটন করানোর জন্য বিজ্ঞাসাগর এই পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং তা খুবই সঙ্গত হয়েছে। বিজ্ঞাসাগর মূলের থেকে এইটুকু মাত্র স্বাধীনতা নিয়ে আবার মূলেরই অহুসরণ করে চলেছেন। মূলে দেখি হুমুখের কানে কানে বলা সীতাপবাদের সংবাদ শুনে রামচন্দ্র 'অহহ তীত্র সংবেগো বাগ্‌বজ্রঃ'—এই বলে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। সীতার বনবাসেও দেখি রামচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে হুমুখ যখন সীতাপবাদের কথা শেষপর্যন্ত রামের গোচরীভূত করল, তখন রাম সেই সংবাদ শুনে 'হা হতোহস্মি বলিয়া, ছিন্ন তরুর স্থায় ভূতলে পতিত হইলেন।' মূলের মতোই রামচন্দ্র ব্যাকুলতর বেদনায় নিশ্চিস্ত হয়ে উঠেছেন, হাহাকারে ভেঙ্গে পড়েছেন, বিলাপে উত্তরোল হয়েছেন, অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছেন। এখানে বিজ্ঞাসাগরের রামচন্দ্র ভবভূতির রামচন্দ্রেরই পরিপূর্ণ প্রতিবিন্দু বলা চলে। ভবভূতির রামচন্দ্রের মতো বিজ্ঞাসাগরের রামচন্দ্রও রোদনপরায়ণ, ভাবাবেগ ব্যাকুল ও বিলাপসর্বস্ব হয়ে উঠেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' আলোচনা প্রসঙ্গে ভবভূতির রামের এ ধরনের শিথিল চরিত্রের নিন্দা ক'রে বলেছেন,—'তাঁহার (অর্থাৎ ভবভূতির রামচরিত্র) চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। গাভীর্ষ এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়, সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাস্থলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণস্থল।' এই ভবভূতির আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি বিজ্ঞাসাগরের সীতার বনবাস সম্পর্কেও একটু বিরূপ সমালোচনা করেছেন—'ইহার অনেকগুলিন কথা সঙ্কলন বটে, কিন্তু ইহা আর্থবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোনো বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোনো যাত্ন আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আশাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালার মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাদে বটে।'।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য আমাদের যথার্থ মনে হয় না। বরং ভবভূতির তুলনায় বিজ্ঞাসাগরের রামচন্দ্র অনেক সংযত, প্রশমিত আবেগ, ধীর ও স্থির। হুমুখের কাছ থেকে অপ্রিয় সংবাদ শোনার পর তিনি যে বিলাপ করেছেন, তা ভবভূতির রামের চেয়ে অনেকাংশে সংক্ষিপ্ত। ভবভূতির রামচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত আবেগ ও বিলাপের উদ্বেল প্রবাহ বহুল পরিমাণে সংযত হওয়ায় তা বেশ স্বাভাবিক ও আস্তরিক হয়ে উঠেছে। যেমন, উত্তররামচরিতের—

'হা দেবি দেবযজনসম্ভবে। হা স্বজন্মগুণগ্রহপবিত্রিত বহুকরে ! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি ! হা পাবকবশিষ্ঠারুদ্রতী-প্রশস্তশীলশালিনী ! হা রামময়জীবিতে ! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি ! হা প্রিয়-স্তোকবাদিনি ! কথমেবং বিধায়ান্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ—এই সমাসঙ্কিভারাক্রান্ত, রামচন্দ্রের বিলাপশক্তিকে বিজ্ঞাসাগর খুব সংক্ষেপে অহুবাদ করেছেন,—হা প্রিয়ে জানকি ; হা প্রিয়বাদিনি ; হা রামময়জীবিতে ; হা অরণ্যবাস সহচরি ; পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর।'।

মূল নাটকে রামচন্দ্র বিলাপের ফাঁকে হুমুখের কানে কানে লক্ষণকে সীতা-পরিত্যাগের নির্দেশ জানাতে বলেছেন। প্রজাদের সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করেছেন এবং ধীরে ধীরে নিদ্রিতা সীতার মাথা থেকে বাহ্যমুক্ত ক'রে নিয়ে পুনরায় বিলাপে ভেঙ্গে পড়েছেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের নির্দেশ নিয়ে হুমুখ প্রস্থান করেছে। 'সীতার বনবাসে' এ সব নেই। হুমুখ গৃহান্তরে রামচন্দ্রকে সীতাপবাদ জানিয়েই কাদতে কাদতে প্রস্থান করেছে। রামচন্দ্র তাকে সীতা-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো কিছু নির্দেশই দেয় নি। রামচন্দ্র নিজেরই সীতা পরিত্যাগ বিষয় এই স্থির ক'রে বেদনার্ত হয়ে গৃহান্তরে একাকী বিলাপে, হাহাকাঁরে ভেঙ্গে পড়েছেন। তাঁর বিলাপ মূল নাটকের মতো হুমুখ প্রত্যক্ষ করে নি কিংবা মূল নাটকের মতো সীতা-সন্নিধানেও ঘটানো হয় নি।

গৃহান্তরে রামের বিলাপ বর্ণিত হলেও সীতা-সম্পর্কে রামচন্দ্র মূল নাটকে যে বিলাপ করেছেন, বিতাসাগর তারই অতুসরণে রামের বিলাপ বর্ণনা করেছেন। মূলের মতোই রামের বিলাপে কারুণ্যাতীততা ও গভীর বেদনাময়তা রয়েছে। তবে কোথাও কোথাও মূলের অল্পবিস্তর অংশ বজ্রিত হয়েছে। যেমন মূল নাটকে উপরে উদ্ধৃত অংশের পর রামচন্দ্র বিলাপ করেছেন—

ত্বয়া অগন্তি পুণ্যানি ত্বয়াপুণ্যা জনোক্তরঃ। নাথবস্তত্ত্বয়ালোকাত্মনাথ্য বিপৎশ্রমে ॥^{১০}

কিংবা— শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং সৌহৃদাদপৃথগাশ্রয়ামিমাম্।

ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে সৌনিকো গৃহশকুন্তকামিব ॥^{১১}

বিতাসাগর এসব অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। আবার কোথাও মূলের সংক্ষিপ্ত বিলাপোক্তিকে বিস্তারিত ক'রে তার মধ্যে রিক্ত স্থানের নিঃসীম ব্যাপ্তি এনে দিয়েছেন। যেমন, স্থপ্তা সীতার মাথা থেকে হাতটি তুলে নেবার কালে রামচন্দ্র বিলাপ করেছেন এরূপ—

অপূর্বকর্মচণ্ডালময়িমুখে, বিমুক্ত মাম্, ত্রিতাসি চন্দনভ্রাস্ত্যা দুর্বিপাকং বিষক্রমম্ ॥^{১২}

আর বিতাসাগর এর অতুসরণে লিখেছেন এরূপ—‘তুমি এমন ছরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগোর হস্তে পড়িয়াছিলে, যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটয়া উঠিল না। তুমি, চন্দনতরু বোধে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্রগুণে অধম; নতুবা, বিনা অপরাধে, তোমায় বিসর্জন দিতে উদ্ধত হইব কেন, হায়! যদি এই মুহূর্তে আমার প্রাণবিরোগ ঘটে, তাহা হইলে আমি পরিজ্ঞান পাই।’

মূলের বিলাপের ভাবকে অক্ষুর রেখে, কারুণ্য প্রকাশকম সুনির্বাচিত স্বাধীন শব্দপ্রয়োগে রামচন্দ্রের বেদনাকে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত ক'রে তোলাতে বিতাসাগর যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এখানে। এ ভাবেই

১০ 'তোমা দ্বারা ত্রিগুণ পবিত্র; কিন্তু তোমার বিষয়ে লোক প্রবাদ অপবিত্র এবং অগন্তের লোক তোমা দ্বারা নাথবান্; কিন্তু তুমি অনাথা অবস্থায় বিপন্ন হইবে'—উত্তররামচরিত, হরিনাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং

১১ 'হায় কি কষ্ট! আমি অতি যুগিতকর্মী নৃপসে হইয়াছি। বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি এবং অপরবশতঃ যিনি ভিন্ন স্থানে থাকেন নাই; এখন কসাই যেমন গৃহপালিত পক্ষিপীকে মৃত্যুর হাতে দান করে, আমিও সেইরূপ সেই প্রিয়তমাকে চলক্ৰমে মৃত্যুর হাতে দিতেছি।'—ঐ

১২ 'হে মরলে। আমি অপূর্বকর্ম চণ্ডাল; আমাকে পরিত্যাগ কর, তুমি চন্দনভ্রমে পুণ্যপ্রিয়াম বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে।'—ঐ

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিভাসাগরের 'সীতার বনবাস'

৩৭৫

মূলের ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে, অনুবাদে সামান্য স্বাধীনতা নিয়ে, পরিমিত কল্পনাযোগে 'সীতার বনবাস'এর আখ্যানকে প্রায় স্বতন্ত্র সৃষ্টির পর্যায়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের সমগ্র ঘটনা 'সীতার বনবাস'এর গৃহীত হয় নি, পূর্বেই বলেছি। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়েছে রামচন্দ্রের নির্দেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক সজ্জিত রথে সীতার তপোবন যাত্রারস্ত দিয়ে। সীতা সবার চরণে প্রণাম জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছেন—'গমো গমো তবোধাগং, গমো গমো রহউলদেবদাগং, গমো গমো অঙ্কউত্তচরণকমলাগং, গমো গমো সঅল গুরুঅণাণং'।^{১৩} এখানেই প্রথম অঙ্ক শেষ। আর উত্তররামচরিতের অনুসরণে লিখিত সীতার বনবাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে নিমিত্তা সীতার কাছ থেকে রামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ দিয়ে। 'এই বলিয়া, গলদশ্রনয়নে, বিশ্রামভবনে প্রতিগমনপূর্বক, রাম, নিদ্রাভিসূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক, মাতিশয় ককণশব্দে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! হতভাগ্য, রাম এ জন্নের মতো বিদায় লইতেছে। এই বলিয়া, হৃবিষহ শোকদহনে দগ্ধ হৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।'

নিমিত্তা সীতার কাছ থেকে রামচন্দ্রের এ ভাবে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটি মূলেরই অনুকরণে করা হয়েছে। মূলেও ঠিক একরূপ সমস্ত উচ্ছ্বাসকে সংযত ক'রে, ধীর স্থিরভাবে, যর্মস্পর্শী অনতিসংক্ষিপ্তবাক্যে রামচন্দ্র সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। নিমিত্তা সীতার চরণযুগল মাথায় ঠেকিয়ে রামচন্দ্র বলেছেন—'দেবি! দেবি! অয়ং পশ্চিমন্তে রামশ্চ শিরসি পাদপঙ্কজস্পর্শঃ' অর্থাৎ 'দেবি দেবি, রামের মাথায় তোমার এই শেষ চরণস্পর্শ।' এই পর্যন্তই বিভাসাগর উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের অনুসরণ করেছেন। সীতার কাছ থেকে রামচন্দ্রের বিদায়গ্রহণপূর্বে বিভাসাগর মূলেরই মতো সর্বপ্রকার উচ্ছ্বাস বর্জন করেছেন। 'এ জন্নের মতো বিদায় লইতেছে' এই অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে রামচন্দ্রের বেদনাকে অতলান্ত সমুদ্রের গভীরতা দান করেছেন। মূলের অনুসরণ হলেও বিভাসাগর পূর্বের জায় এখানেও অনুবাদকের স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়েছেন। বাঙালীমূলভ সংস্কারবশতঃই বোধ করি তিনি এখানে মূলের আনুগত্য মেনে চলতে সক্ষম হন নি। স্ত্রীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কান্না বাঙালী পাঠকের ভাবপ্রবণতাকে আহত করবে হয়তো ভেবেছিলেন। তাই 'সীতায়ঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা' স্থলে 'অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক' আর 'দেবি দেবি অয়ং পশ্চিমন্তে রামশ্চ শিরসি পাদপঙ্কজস্পর্শঃ' স্থলে 'প্রিয়ে হতভাগ্য রাম এ জন্নের মতো বিদায় লইতেছে,' এইরূপ সিঁথেছেন ধারণা। বাঙালী হৃদয়ের কাছে রামের এই বিদায়বাণী যে অধিকতর সংবেদনা বয়ে এনেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভাসাগর এ ভাবেই মূলের ভাবের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তাঁর অনুবাদে মাঝে মাঝে এই যে ভাবের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এই ভাব পরিবর্তনের ফলে আখ্যানের মধ্যে যে সরলতা ও সাবলীলতা, স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই তাঁর অনুবাদের সফলতা ও সিক্তির তৎপর্য নিহিত রয়েছে, ধারণা। বিভাসাগর মূলের ঘটনাকে যথাসম্ভব আনুপূর্বিকতা রক্ষা ক'রে বজায় রেখেছেন। অবশ্য প্রয়োজনে দুয়েক স্থলে অল্পস্বল্প পরিবর্তনও করেছেন। তবে ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, একথা মোটেই যথার্থ নয়।^{১৪} ঘটনা বিন্দুমাত্রও সংক্ষেপিত হয় নি

১৩ 'তপাধীদিগকে নমস্কার, রঘুকুলের দেবতাদিগকে নমস্কার, আর্ষপুত্রের চরণকমলে নমস্কার এবং সকল গুরুজনকে নমস্কার'—উত্তররামচরিত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং

১৪ 'সীতার বনবাসের প্রথম দুই অধ্যায়ে উত্তরচরিতের কাহিনী সংক্ষেপে গৃহীত হয়েছে'—ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে বিভাসাগর, পৃ: ২১

তার হাতে। কেবল উৎকট সমাসসন্ধিজনিত ছরুহ ও অর্থবোধে ব্যাঘাতযুক্ত দীর্ঘ বর্ণনাকে কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত ক'রে নিয়েছেন, কোথাও বা তা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। এ আমরা দৃষ্টান্ত যোগে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এখন উত্তররামচরিতের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবারীতি কিরূপ সার্থক হয়েছে, তার আলোচনা করা দরকার। প্রথমে ভবভূতির রচনারীতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাই উল্লেখ করি। সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব রচনায় বিদ্যাসাগর ভবভূতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—‘রচনার দোষে স্থানে স্থানে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসান্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দুষ্ট।’

বিদ্যাসাগর ভবভূতির ক্রটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর অনুবাদে ভবভূতির ক্রটি যাতে না দেখা দেয়, সেদিকে তিনি নিশ্চয়ই সতর্ক ছিলেন বলা চলে। ‘দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দুষ্ট’ এই সিদ্ধান্ত তিনি পোষণ করতেন বলেই দেখা যাবে বিদ্যাসাগর তাঁর অবলম্বিত মূলের দীর্ঘসমাস সন্ধিবাহিনীকে ভেঙ্গে নিয়েছেন, গুরুগম্ভীর ও উৎকট বাক্যবিদ্যাসকে অনেক ছোট ক'রে নিয়েছেন। সচেতন শিল্পীমন নিয়ে এইভাবে অনুবাদের কাজে এগিয়ে গেছেন। যেমন, উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা চলে পূর্বে উদ্ধৃত ‘অয়ম বিরলানোকনিবহনিবস্তর’ ইত্যাদি ও তার অনুবাদ ‘এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রসবণ গিরি’ ইত্যাদি অংশটি।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিই, যেমন মূল নাটকে আছে—

‘বচ্ছ এসো কুশুম্বিকঅম্বতকৃতওবিদবিরহিণো কিন্মামধেয়োগিরী! জন্ম অণুভাবসোহগ্গমেত্তর-পক্সিসেমধুসরসিরী মুহুস্তং মুচ্ছস্তো তুএ পবুদিএণ অবলম্বিদো তরুঅলে অঙ্কউস্তো আলিহিদো।’

সীতার এই সংলাপ সমাসসন্ধিমস্তর, গুরুগম্ভীর। বিদ্যাসাগর এর অনুবাদ কেমন করেছেন, দেখা যাক। তিনি লিখেছেন,—‘বৎস! ঐ যে পর্বতে কুশুম্বিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর ক্ষীণ কলেবর আর্ষপুত্র তরুতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রবণে উহারে ধরিয়া রহিয়াছে, উহার নাম কি?’

দেখা যাচ্ছে অনুবাদ বেশ সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল। মূলের গুরুগম্ভীরতা কিংবা সমাস সন্ধিজনিত মস্তবত্তা নেই। বাক্যগুলি ছোট ছোট, পদাশ্রয় স্বচ্ছন্দ, ছরুহ শব্দের প্রয়োগ বিরল—ফলে রচনা খুবই সহজবোধ্য। ভবভূতির রচনারীতির জড়তা ও দুর্বোধাতার হাত থেকে বিদ্যাসাগর নিজেকে এখানে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ক'রে নিতে সক্ষম হয়েছেন। মূলের জড়তামুক্ত ভাবারীতি অপূর্ব গতিছন্দসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমান দৃষ্টান্তে এভাবে নিজেকে ভবভূতির রচনার ক্রটি মুক্ত ক'রে নিয়ে সাবলীল ভাবারীতি গড়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু সর্বত্র এ সাফল্য তেমন অর্জন করতে পারেন নি। এর কারণ বলা চলে, ভবভূতির রচনাভঙ্গী। যেমন, লক্ষণের নিম্নোক্ত উক্তির অনুবাদ :

অথেনং রক্ষোভিঃ কনকহরিণচ্ছন্দ্রবিধিনা তথা বৃন্তং পাঠৈর্বাথয়তি যথা কালিতমপি।

জনস্থানে শূণ্ডে বিকলকরণৈর্বার্যচরিতৈরপি গ্রীবা বোদিত্যপি দলতি বহ্নয়ঃ হৃদয়ম্ ॥

—‘দ্বরাচার যারীচ, হিরণ্ময় মুগের আকৃতি ধারণ করিয়া, যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল।

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'

৩৭৭

যদিও সম্পূর্ণ বৈর নির্ধাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্বতিপথে আকৃষ্ট হইলে মর্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর, অর্ধ, মানবসমাগমশূন্য জনস্বানভূত্যাগে বিকলচিত্ত হইয়া, যেক্রপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে, পাষণ্ড ও দ্রবীভূত হয়, বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়।'

মূলের কাব্যসৌন্দর্যকে যথাযথ পরিবেশন করা বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল না বটে, তথাপি মূলের রূপ ও রস যাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। বাংলা গদ্য ভাবারীতির স্ব স্ব সবল রূপটি আগে থেকে নির্দিষ্ট থাকলে তাঁর পক্ষে অনুবাদকার্যটি অধিকতর স্বচ্ছন্দ হতে পারত। একদিকে মূলানুগ অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়েছে, অপরদিকে ভাবারীতিও তাঁকে সঙ্গ সঙ্গ নির্মাণ করে যেতে হয়েছে। এই উভয়দিকেই দৃষ্টি রাখতে গিয়ে মূলের গুরুগম্ভীর রচনাভঙ্গি পরিহার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, ধারণা। স্বধী সমালোচক সীতার বনবাসের আলোচনায় যন্তব্য করেছেন—'রচনা স্থললিত তবে শকুন্তলা অপেক্ষা কিছু গুরুগম্ভীর।'^{১৫} যন্তব্যটি যথার্থ সন্দেহ নেই। এই পার্থক্যের কারণ, আবার বলি, উভয় আখ্যায়িকার অবলম্বিত মূলের জন্মই ঘটেছে। কালিদাসের রচনা মন্থন, সাবলীল প্রসাদগুণসম্পন্ন। তুলনায় ভবভূতির রচনা দুরূহ শব্দ ও সমাসসন্ধিপরিবর্তিত। ফলে উভয়ের রচনার অনুবাদে স্বভাবতঃই একটিতে লালিত্য ও নমনীয়তা, অপরটিতে গাম্ভীৰ্য ও দুরূহতা দেখা দিয়েছে।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মরণে

অজিতকুমার ঘোষ

‘মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাকে’—পরলোকগত বন্ধুর স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করা খুবই বেদনাদায়ক। কিন্তু তবুও বন্ধু ছাড়া আর বন্ধুর কথা কে বলবে? প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর চেয়ে প্রিয়তর মানুষ বোধ হয় সংসারে আর কেউ নেই। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতি সম্পর্কের মধ্যে আমরা পরস্পরকে নিবিড় ভাবে পাই বটে, কিন্তু আমাদের সেই পাওয়া আংশিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্কের মধ্যে আমাদের সমগ্র সত্তার উন্মোচন হয়। তাই বন্ধু হয়ে মানুষকে যেমন পরিপূর্ণ ভাবে জানা যায় এমন আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা অনিবার্যভাবে ধরা দিয়ে থাকি, সেখানে ভিতরের ভালোবাসার সঙ্গে বাইরের একটা বন্ধন থাকে। কিন্তু বন্ধুর মধ্যে মানুষের আত্মা তার সমর্থমাকে পায়, তার দ্বিতীয়কে লাভ করে। তাই বন্ধুর মৃত্যুতে সেই আত্মা যেন এক নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয় শূণ্যতার মধ্যেই ছিটকে পড়ে।

সাধনদার মৃত্যুতে সেই নিষ্ঠুর ও নিরবচ্ছিন্ন শূণ্যতাই আজ প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি। একদিন যিনি এত সত্য ছিলেন, আমার চারদিকে এমন ভাবে ব্যাপ্ত হয়েছিলেন, আজ তিনি নীরব নিদ্রার যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য—‘He will awake no more, oh, never more’। একসঙ্গে দু’জন কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। কিন্তু কর্মজীবনের সাথে অল্পদিনেই হয়ে উঠেছিল নর্মজীবনের সখা। কর্মক্ষেত্রে আমরা ছিলাম পরস্পরের সহযোগী। কিন্তু তর্কবিতর্কের উত্তেজিত আসরে ছিলাম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর যখন সকল কাজ বন্ধ হ’ত, তর্ক শুরু হয়ে যেত তখন হৃদয়ের আলাপন শুরু হ’ত। সেই মুহূর্তগুলিই ছিল সব চেয়ে প্রিয় ও পবন মুহূর্ত। সেই মুহূর্তগুলি বাস্তব মাটি থেকে হারিয়ে গেছে। হয়তো দূর আকাশের তারার ঝিকিমিকিতে তাদের কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। একসঙ্গে দীর্ঘপথ চলেছি—হাসি-কান্না, মান-অভিমান, বাদ-প্রতিবাদে ভরা দীর্ঘপথ। তাঁর চলা হঠাৎ থেমে গেল, রাতের অন্ধকারে তিনি হারিয়ে গেলেন। আমি এখনও চলেছি, চলেছি নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা বহন ক’রে, ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে। সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, হাস্তোজ্জ্বল মুখ, দৃঢ়প্রত্যয়শীল বাহু দুটি এবং অসহিষ্ণু পদযুগল আজ আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও বৈদগ্ধ্যের আসরে তাঁর অলঙ্কিত প্রবেশ অনুভব করি। কর্মহীন অবকাশের যত্নর ভাবনায় তাঁর সান্নিধ্য পাই এবং সকল রমনীয় বস্তুর মধ্যেই তার উদ্ভাপ ভরা অস্তরের স্পর্শ লাভ করি। শেলি, টেনিসন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি তাঁদের শোকবাণীর মধ্যে বন্ধুর স্মৃতি অমর ক’রে রেখে গেছেন। আমার লেখনীর সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমি তাঁর সমগ্র কর্মজীবনের প্রতিটি দিনের খবর রাখি এবং তাঁর আত্মিক বিকাশের প্রতিটি স্তর আমার জানা। সেজন্য তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টাই আমি করব।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পিকলিয়া গ্রামে সাধনকুমার ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল অমৃতলাল ভট্টাচার্য এবং মাতা ছিলেন মহামায়া দেবী। অতি শৈশবেই পিতামাতাকে হারাবার পরে তাঁর অ্যাঠাইমা কীরোদাম্বরদেবী তাঁকে লালন

পালন করেন। জ্যাঠাইমার কোনো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, কিন্তু বুকজোড়া স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। জ্যাঠাইমার স্নেহের ঋণ সাধনকুমার কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। পরবর্তী জীবনে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মধ্যেও শৈশবের এই স্নেহময়ী জ্যাঠাইমার স্মৃতি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন। কয়েকখানি বই জ্যাঠাইমার নামে উৎসর্গ করেন এবং দমদমস্থিত নিজস্ব বাড়িটির নামও জ্যাঠাইমার স্মৃতিজড়িত করে রেখেছেন। জ্যাঠাইমার স্নেহরসে পরিপুষ্ট হবার ফলেই তাঁর নিজস্ব অন্তরও অতখানি স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল।

সাধনকুমারের শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গ্রামের পাঠশালাতেই। পরে কাশিয়ানী গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলে পড়েছিলেন এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বহুদিন আগে পিছনে ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। তাই তাঁর মূখে তাঁর গ্রামের দিনগুলির কথা প্রায়ই শোনা যেত—শৈশব ও কৈশোরের স্নেহভালোবাসা মাথানো বহু স্মৃতি তাঁর অন্তরে নানা রঙের রাগরাগিনী জাগিয়ে তুলত। খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদের বহু সঙ্গীসঙ্গীর সঙ্গে তাঁর মানসিক বিচ্ছেদ কোনোদিন ঘটে নি। পরবর্তীকালে গ্রামের সঙ্গে তাঁর সামান্যই যোগ ছিল। কিন্তু গ্রাম্য মানসিকতা কোনোদিন তিনি ছাড়তে পারেন নি। শুধু যে তাঁর কথার মধ্যে গ্রাম্য উচ্চারণের কিছু ঝোঁক ছিল তা নয়, বেশভূষার প্রতি তাঁর উদাসীনতা, কথাবার্তায় তাঁর অকপট সরলতা ও অনাবৃত কাঠিন্য, বাহ্য রীতিনীতি ও সৌজন্মের প্রতি তাঁর জরাজপহীনতা এবং অকৃত্রিম অন্তরের উদার আতিথ্যের কথা চিন্তা করলে মনে হয়, তিনি শেষ দিন পর্যন্ত গ্রামের একটি খাঁটি মানুষ হয়েই রইলেন। গ্রামে থাকতেই তাঁর অভিনয়ে হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের থিয়েটারে তিনি একজন ভালো অভিনেতা ছিলেন বলে গ্রামে তাঁর বেশ একটু খ্যাতিরও ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে পড়বার জন্ত এলেন কলকাতায়। এক সদাশয় পরিবারে থেকেই তিনি কলেজে পড়াশুনা করতেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে তিনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আই. এ. এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। নানারূপ মানসিক অশান্তির জন্ত পরীক্ষায় আশাহুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এর পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করেন এবং পুনরায় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করেন বাংলায়।

তাঁর অধ্যাপক জীবন শুরু হয় পাটনা বি. এন. কলেজে। পাটনায় তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী কর্মজীবন বন্ধুদের প্রীতিকর সাহচর্যে ও আমোদপ্রমোদে মধুময় হয়ে উঠেছিল। সেখানে অনেক নাটকের অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা জহর রায়ের পিতা সতু রায় ছিলেন তাঁদের নাট্যাভিনয়ের পরিচালক ও শিক্ষাদাতা। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে যশোহর মাইকেল মধুসূদন কলেজে যোগদান করেন। তখনকার সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনীলাল সেন, শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী, শ্রীহরিপদ ভারতী, আমি এবং আরো অনেকে। তাঁর পরবর্তীকালের মননশীল সমালোচক জীবনের সূচনা হয় এই কলেজে কাজ করবার সময়ে, কলেজে ও কলেজের বাইরে একটি মননশীল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেই গোষ্ঠীর অগ্রতম প্রধান সক্রিয় সদস্যরূপে তিনি তর্কবিতর্ক, বিচার-আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতেন। যশোহরে পূর্ণিমা-সম্মিলনী নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। পরে ওই প্রতিষ্ঠানের নতুন নাম দেওয়া হয় মনন-পরিষদ। প্রতিষ্ঠানের মাসিক অধিবেশনে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। আমি তখন বাংলা নাটকের ইতিহাস লেখা শুরু করেছিলাম। লিখছি আর বন্ধুবান্ধবদের ডেকে শোনাচ্ছি। সাধনদা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিতেন,

কিন্তু অনেক বিষয়েই আমার সঙ্গে তাঁর মতভেদ হ'ত। আমাদের মধ্যে প্রবল বাদ প্রতিবাদ চলত। তিনি বললেন—‘দাঁড়াও, আমিও সমালোচনা লিখে তোমার মতের প্রতিবাদ করব।’ এই ‘চ্যালেঞ্জ’ থেকেই তাঁর নাট্যসমালোচনার সূত্রপাত হয়। তাঁর প্রথম দিককার সমালোচনা গ্রন্থগুলিতে যথা, ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘সাজাহান’, ‘প্রফুল্ল’ ইত্যাদিতে আমার নানা মতের প্রবল বিরোধিতা করা হয়েছে। লোকে আমাদের সমালোচনা পড়ে ভাবত, আমরা দু'জন পরস্পরের ঘোর শত্রু। কিন্তু যখন দেখত, পরস্পরের ঘোর শত্রু এই দু'জন কখনও পরস্পরের কাছ ছাড়া হয় না, তখন সত্যই তারা অবাক হ'ত। যশোহরের দিনগুলি অনেক দূরে স'রে গেছে, কিন্তু সেই তাকুণ্যরসে ভরা দিনগুলির স্মৃতি আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেই অপরিমিত স্মৃতি নিয়ে জ্ঞানভাণ্ডারের নিত্য-নতুন কক্ষে প্রবেশ, সেই আড্ডা, মজলিস আর প্রতিদিন শহরের বাইরে গ্রামপথের নির্জনতাকে হাসি, হলা ও গানে সচকিত ক'রে তোলা—পলাতক সেই দিনগুলি!

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে সাধনকুমার বঙ্গবাসী কলেজের বাংলার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। কিছুকালের মধ্যেই কৃতী অধ্যাপকরূপে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবাসী কলেজে প্রধানত অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবন নামে একটি স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়। আমি তখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছি। সাধনদা গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবনে অংশকালীন অধ্যাপকরূপে আমাকে নিয়ে এলেন। তাঁর পর থেকে তাঁর আর আমার কর্মস্থানের ব্যবধান ঘটে নি। যাদের একবার তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেন তাঁদের আর কখনো ভুলতেন না, যে ভাবে হোক তাঁদের কিছু উপকার করবার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবনে কলকাতার কৃতবিদ্য বাংলার অধ্যাপকগণ মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা ক্লাসে যেমন উচ্চ মানের শিক্ষা দিতেন, তেমনি ক্লাসের বাইরে একটি অস্তুরঙ্গ আসর গ'ড়ে তুলেছিলেন। সেই আসরে যোগ দিতেন মোহিতলাল মজুমদার, হুসৈলকুমার দে, বিভূতি চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রণীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি দিকপাল অধ্যাপকগণ। সেই আসর যেমন ছিল বৈদগ্ধ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর, তেমনি আড্ডার রসে রমণীয়। ওই অধ্যাপকগোষ্ঠী নিয়ে রবীন্দ্র-পরিষদ নামে একটি নাট্যসংস্থা গ'ড়ে ওঠে। অভিনয়ের পরিচালক ছিলেন সাধনকুমার ও মুরারিমোহন সেন। অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। একটি বহু অভিনীত নাটকের ভূমিকা-লিপি এই : (‘বৈকুণ্ঠের খাতা’) বৈকুণ্ঠ—সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অবিনাশ—অজিতকুমার ঘোষ, কেদার—মুরারিমোহন সেন, তিনকড়ি—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশান—জগদীশ ভট্টাচার্য, বিপিন—ব্রজেন্দ্র দাস। পরিচালকরূপে তিনি ছিলেন কঠোর নিয়ম নিষ্ঠ, কিন্তু তাঁর কঠোর ও গম্ভীর মূর্তি মহলার ফাঁকে ফাঁকে পরিহাসে তরল হয়ে পড়ত—নিয়ম ও বেনিয়মের এই সংমিশ্রণের ফলেই নাটকের মহলা হয়ে উঠত খুবই উপভোগ্য।

বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এক একখানি বাংলা নাটক নিয়ে তিনি সুবিদ্বত বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করলেন। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, প্রফুল্ল, রক্তকরবী, বিষমঙ্গল, নীলদর্পণ, নূরজাহান প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সম্পর্কে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ক'রে যেতে লাগলেন। এই সমালোচনাগুলিই ‘নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার’ নামে পাঁচ খণ্ডে সংকলিত হয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরস থেকে সাহিত্যতত্ত্বের দিকে তাঁর অধিকতর প্রবণতা দেখা যেতে লাগল। প্রথমত সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে তিনি তত্ত্বব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সাহিত্যবিচার গৌণ হয়ে গেল, নিছক তত্ত্বব্যাখ্যাই মুখ্য হয়ে উঠল। নাট্যতত্ত্ব নিয়ে শুরু করলেও শিল্পতত্ত্বের আলোচনার

দিকেই তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হলেন। অ্যাবিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' অনুবাদ করে তিনি ওই গ্রন্থ ভিত্তি করে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা করেন এবং অনুবাদ ও তাঁর নিজস্ব আলোচনা 'অ্যাবিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ওই গবেষণা-গ্রন্থের জন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধিতে ভূষিত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি পাশ্চাত্য জগতের অপর দু'জন ক্লাসিক তত্ত্বাচার্য হোরেস ও লফাইনসের সাহিত্যতত্ত্ব বাংলায় অনুবাদ করেন। বঙ্গীয় সেন্সপীয়ার পরিষদে নানা নাট্যশাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করে নাটকীয়তার লক্ষণ বিচার করলেন 'নাটক ও নাটকীয়ত্ব' নামক প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন 'রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা' নামক গ্রন্থে। ওই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সমসাময়িক সমাজমানসের বিবর্তন সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডক্টর ভট্টাচার্য ও আমার যুগসম্পাদনায় 'একাত্তর সংকলন' নামে বাংলায় প্রথম একাত্তর সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যার ভূমিকায় একাত্তর নাটকের রূপ ও রীতি নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করলাম। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে ডক্টর ভট্টাচার্য নাট্যবিভাগের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। একাডেমির নাট্যবিভাগের ডীন নটমর্ফ অহীন্দ্র চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে তিনি নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান লাভের প্রেরণা পান এবং সেই প্রেরণাতেই তিনি নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে দু'খানি বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা' ও 'নাটক লেখার মূলমন্ত্র' রচনা করেন। 'নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ' নামে আর একখানি নাট্য-রীতিবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। ওই গ্রন্থে নাট্য-রীতি অপেক্ষা সমাজদর্শন-প্রসঙ্গই প্রাধান্য লাভ করেছে। শেষ দিকে তাঁর নাটকের আলোচনায় বস্তুবাদী দর্শনের কথাই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান ও কলাবিভাগের ডীন নিযুক্ত হন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে তিনি ওই পদেও অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বাংলা বিভাগের রীডারের পদ থেকে বিদায় নিয়ে নাট্যবিভাগের প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এর পূর্ণ সম্প্রসারণে বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেগুলির বাস্তব রূপায়ণে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি শিল্পতত্ত্বের আলোচনা ও অধ্যাপনাতেই প্রধানত নিবিষ্ট ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার কিছু আগে তিনি 'শিল্পতত্ত্বের কথা' নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। পরে ওই গ্রন্থটি 'শিল্পতত্ত্ব পরিচয়' নামে পরিবর্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ক্রোচের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন তিনি দু'খানি গ্রন্থে, যথা 'ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অব এস্থেটিক' এবং 'শিল্পতত্ত্ব ক্রোচের অনুবাদ'। তাঁর চেষ্ঠায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় শিল্পতত্ত্ব অবশ্য পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। তিনি নাটক, সংগীত ও নৃত্যের শিল্পতত্ত্ব আলোচনাতেও নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। হান্সলিকের 'The Beautiful in Music' গ্রন্থটি তিনি 'সংগীতে সুন্দর' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি দেন তাঁকে 'স্বধীর দাসগুপ্ত বক্তৃতামালা' দেবার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে। মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে আমার সঙ্গে একযোগে 'বিশ্বনাট্য পরিক্রমা' নামে একটি মহাগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর আর পূর্ণ হ'ল না।

ডক্টর ভট্টাচার্য বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বরূপা

নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের অন্যতম পরিচালক-সদস্য ছিলেন। কলকাতা এবং মফঃস্বলের বহুজায়গায় প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য নাট্য-সম্মেলন, আলোচনা ও বিতর্কে তাঁর মননদীপ্ত আলোচনা দ্বারা শ্রোতাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি শানিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র তিনি আমাদের নিয়ে বিভিন্ন নাট্য-প্রতিযোগিতার বিচারক রূপে গেছেন এবং প্রকাশ্য ভাষণ এবং ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা সেই সব জায়গার বহু লোককে নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে উৎসাহী ও কৌতূহলী ক'রে তুলেছেন। নাট্য-বিচার উপলক্ষে কলকাতার বাইরে কয়েকদিন কাটিয়ে আসাই ছিল আমাদের কর্মজীবনের মধুরতম অবকাশ। কাজ নেই, ভাবনা নেই, নিয়মের বাধন নেই—শুধু কেবল অবাধ ছুটির মধ্যে নিজেদের নিজেদের হাঙ্গা জীবনকে মেলে ধরা। মুর্শিদাবাদের পথে প্রান্তরে ইতিহাসের রোমান্সের সন্ধানে ঘোরা, মাইথনের জলাশয়ে মোটর বোটে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাওয়া, কল্যাণেশ্বরীমন্দির কিংবা পঞ্চকোট পাহাড়ের দিকে অভিযান, সাঁওতাল পরগনার গ্রামে অপরিচিতের আনন্দ আশ্বাদ করা, রূপনারায়ণপুরের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের আলস্যের মধ্যে নিজেদের নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে দেওয়া কিংবা চিত্তরঞ্জন পথে শুধু উদ্বেগহীনভাবে চলা—এ-সব স্মৃতি মনের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। সেই অলস মনের নিভৃত আলাপ, সেই প্রাণের সম্ভাবনী উদ্ভাপ, সেই বাধনহেঁড়া অস্তরের উদাস রঙ্গরসিকতা—সে-সব চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেল।

সাধনকুমার ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ক'রে এসেছেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে তাঁর অভিনয়-দক্ষতা ও পরিচালনা-নৈপুণ্য উভয়দিকই পূর্ণ স্বযোগ লাভ করে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-থিয়েটারের কর্ণধার ছিলেন তিনি। তাঁর প্রযোজনায় ছাত্রছাত্রীরা বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ ক'রে সমবদার দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন অর্জন করেছে। 'ক্ষুধিত পাষণ', 'শেষ কথা', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় ও মঞ্চপ্রয়োগ কলা বোঙ্কা সমালোচক দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্চে অহুষ্ঠিত কয়েকটি নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সারাজীবন ধ'রে তিনি যে-সব ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা আত্রেয়ী ও চাণক্য ('চন্দ্রগুপ্ত'), কামন্দক ও বরাহ ('খনা'), রঘুপতি ('বিসর্জন'), বৈকুণ্ঠ ('বৈকুণ্ঠের খাতা'), গোবিন্দ গাঙ্গুলী ('রমা'), গোপী ('দুই পুরুষ'), পোটার ('ম্যাকবেথ'), বটু ('মুক্তধারা')। চাণক্যের ভূমিকা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি বার বার এই ভূমিকায় আবার অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। করুণ রসায়ক ভূমিকা এবং কৌতুক রসায়ক টাইপ চরিত্রের ভূমিকা—উভয় ভূমিকাতেই সমান দক্ষতা ছিল। জ্ঞাত অভিনেতা ব'লে করুণরসের গভীরে সহজেই নামতে পারতেন, মুহূর্ত মধ্যে চোখের সজলতা, কণ্ঠস্বরের ভগ্নতা ও মুখের করুণ রেখার অভিব্যক্তি দর্শকচিতে বেদনার আলোড়ন জাগাত। তবে চেহারা, কণ্ঠস্বর ও স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রবণতা টাইপ ভূমিকার পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। কথাবার্তা ও ভাষণ সব কিছুই অভিনয় হয়ে উঠত—চোখ ও মুখের রেখার অভিব্যক্তি যেমন ক্ষণেক্ষণে বদলাত, তেমনি দেহও উত্তেজনার স্তরেস্তরে কম্পিত, ঘূর্ণিত ও আন্দোলিত হতে থাকত।

ডক্টর ভট্টাচার্য অতিশয় জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় আবেগের প্রাবল্য ছিল না, অনর্গল ভাষাপ্রবাহ ছিল না, কবিত্ব ও অলঙ্কারের দিকেও কোনো মনোযোগ ছিল না। তাঁর ভাষণ হ'ত নৈসর্গিক অথবা আইন সভার সদস্যের মতো। অর্থাৎ আবেগের ইন্দ্রজালের চেয়ে যুক্তির শরজালের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল বেশি। তিনি কেটে কেটে একটির পর একটি কথা ছুড়তেন শ্রোতাদের দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

হেনে তাদের কাছ থেকে যেন উত্তর দাবি করতেন এবং কিছুকণ অস্বস্তিজনক কৌতূহলের মধ্যে রেখে এমন একটি মন্তব্য করতেন যাতে শ্রোতারা হেসে লুটিয়ে পড়ত। প্রতিপক্ষের দিকে কখনো কৌতূকের আবরণে ঢাকা প্লেষের বাণ নিক্ষেপ করতেন। কখনো বা ধিকারের গদা নিক্ষেপ ক'রে তাকে ধরাশায়ী করতে চাইতেন। মাঝে মাঝে যখন তিনি অতিরিক্ত ক্রোধে বশীভূত হয়ে পড়তেন তখনই তাঁর বক্তৃতা ভারসাম্য হারিয়ে আক্রমণাত্মক ও একঘেয়ে হয়ে যেত। ক্লাসে যখন তিনি পড়াতেন তখন প্রতিটি ছাত্রের দিকেই তাঁর কড়া নজর ছিল, একটানা বক্তৃতা না ক'রে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ক'রে তাদের বিপন্ন ক'রে তুলতেন। তাঁর কল্পমূর্তি দেখে দেখে ছাত্ররা যখন প্রমাদ গুণছে তখনই তিনি আবার সরল কৌতূকের পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে সকলকে আনন্দ ও প্রসন্ন ক'রে তুলতেন। তাঁর বক্তৃতা অনেক সময়েই সোজা পথ ছেড়ে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, সরস গল্পকথন প্রভৃতি পার্শ্বপথে বহুদূর চ'লে যেত—তাঁর গ্রাম্য জীবনের স্মৃতি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের কথা এসে যেত। এমনি ভাবে তিনি শ্রোতাদের কাছে টেনে আনতেন, তাঁর ভাব ও ভাবনার সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে পড়ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে যেত, কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল থাকত না।

ডক্টর ভট্টাচার্যের ভাষণের মতো তাঁর সমালোচনাও ছিল যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী। সমালোচনার মধ্যে সর্বপ্রকার অস্পষ্টতা ও স্বার্থবোধকতা পরিহার ক'রে তিনি তাঁর ব্যক্তব্যকে ঋদ্ধ, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টরূপে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিপক্ষের যুক্তি একটির পর একটি খণ্ডন ক'রে তিনি তাঁর নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমস্তার গভীরে প্রবেশ ক'রে তিনি যেন বৈজ্ঞানিকের মতো অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে অদৃশ্য জীবাণুদের রহস্য সন্ধান করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বতন্ত্র মতের পক্ষে এমন অকাটা যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন যে, পাঠক তার সারবত্তা স্বীকার না ক'রে পারে না। তাঁর দ্রুত রচনাশক্তি ছিল, কিন্তু দ্রুততার জন্য অনেক সময়েই তিনি তাঁর রচনাকে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করতে পারতেন না। অত্যধিক নৈয়ামিক ভঙ্গির জন্য তাঁর রচনারীতি জায়গায় জায়গায় অস্বচ্ছ হয়ে পড়েছে এবং অতিরিক্ত বিতর্ক ও তির্যক ভঙ্গির জন্য তাঁর ভাষাও কিছুটা প্রাঞ্জলতা হারিয়েছে। অতিশয় উদ্ধৃতি কটকিত হওয়ার ফলে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যও খানিকটা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে নিছক শৈল্পিক সৌন্দর্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর প্রথম দিকের সাহিত্যসমালোচনা ছিল অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বস্তুবাদী সমাজদর্শনে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হওয়ায় তিনি তাঁর সমালোচনার ক্ষেত্রেও এই সমাজদর্শনের প্রয়োগ করেছিলেন। জীবনের শেষ দিকে সাহিত্যবিচারে তিনি বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্মের বিচার না ক'রে বস্তুবাদী সমাজতাত্ত্বিক চেতনা কতখানি রূপায়িত তাই যাচাই করার দিকে অধিকতর প্রবণতা দেখিয়েছেন।

সাধনকুমার তাঁর প্রথম যৌবনে কংগ্রেসী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। যশোহরে তাঁকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিন তাঁকে খন্দর-শোভিত, ত্যাগব্রতী দেশসেবক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভিন্নতর রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমিক অবনয়নের ফলে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ও প্রকাশ্য ভাষণে তাঁর মতবাদ অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ত। অবশ্য বিশেষধারার মতবাদে বিশ্বাসী হলেও তিনি দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচী সবসময়ে সমর্থন করতেন না। দক্ষিণপন্থী নেতাদের ন্যায় বামপন্থী নেতারাও অনেক

সময় তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পেতেন না। জীবনের শেষ দিকে তিনি অনেক সময়েই মতবাদে অত্যধিক উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ক'রে ফেলতেন। চারপাশের অন্তর্য, অসাদুতা ও অবিচার দেখে তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন, তাঁর পরিকল্পিত সমাজমুক্তি যতই বিলম্বিত হতে লাগল ততই তিনি অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। শেষদিকে তাঁর দেহ যত জীর্ণ হতে লাগল তাঁর মনের বৈপ্লবিক ভাবনা ততই তীব্র হতে থাকে। ভগ্নদেহ মনের ইঙ্গিত অগ্নিদীর উপকূলে পৌছতে পারল না, মাঝপথেই হার মানল।

অনেক বিখ্যাত মনস্বীর মতোই সাধনকুমারের সন্তার মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্যের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁকে দেখে সময়ে সময়ে খুবই ক্রুদ্ধ ও কঠোর মনে হ'ত। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল খুবই কোমল ও দুর্বল। ছাত্রদের সামনে তিনি মাঝে মাঝে সংহারমূর্তি ধারণ করতেন, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে আবার সম্মেহে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন। যে বন্ধুদের তিনি ভালোবাসতেন তাদের প্রতি কষ্ট হতেন সব চাইতে বেশি। তিনি যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী ব'লে নিজেকে জাহির করতে চাইতেন, কিন্তু হৃদয়ের অবুঝ ও অশান্ত আবেগ অশ্রুভূতির কাছে বার বার তিনি পরাজিত হয়েছেন। তিনি মতবাদের দিক থেকে ছিলেন তাঁর সময় থেকে অনেকখানি এগিয়ে কিন্তু বেশভূষা, অভ্যাস ও সংস্কারের দিক থেকে ছিলেন তাঁর সময় থেকে অনেকখানি পেছিয়ে। অর্থনৈতিক মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, কিন্তু নৈতিক মতবাদের দিক থেকে ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর আধময়লা জামাকাপড়, বিজ্ঞাসাগরী চটী ও উল্কাখুন্সো চুল দেখে মনে হ'ত কোনো নিরীহস্বভাব প্রাচীন পণ্ডিত, কিন্তু কথা যখন বলতেন তখন যেন আগুনের ফুলকি ছুটত। শেষদিকে তাঁর দেহের তেজ যত কমতে লাগল, মনের তেজ ততই বাড়তে লাগল। যেদিন তাঁর শরীর সবচেয়ে খারাপ থাকত, সেদিন তাঁর বক্তৃতা সবচেয়ে দীর্ঘ হ'ত। তিনি পুরোনো স্মৃতিচারণ করতে ভালোবাসতেন কিন্তু নতুন ভাবনার তাঁর মন পূর্ণ থাকত। সংস্কৃত নিয়ে জীবন গুরু করেছিলেন কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে জীবন শেষ করলেন। বিপ্লব ও মুক্তির জয়গানে তাঁর কণ্ঠ ছিল সর্বদা উদ্দীপ্ত কিন্তু অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা পরিচালক রূপে তিনি ছিলেন কড়া শাসক। চিন্তায় ও মননে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রী, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ভীতু, সতর্ক ও অতিসাবধানী। তাই সমুদ্রজলে স্নান করতে ভয় পেতেন, পাহাড়ে উঠতে নিবেদন করতেন এবং একটু বিপজ্জনক রাস্তায় চলতে আশঙ্কায় কণ্টকিত হতেন। মুখে বলতেন অনবরত—Speed, Speed দাও। কিন্তু যখন সত্যি Speed-এর মুখে পড়তেন তখন প্রবলভাবে আপত্তি করতেন। একবার দু'জনে বালুরঘাটে গিয়েছিলাম বাস-এ চেপে। কিন্তু বাস-এর দ্রুতগামিতায় তিনি এতই ক্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কেরার সময় তাঁর জেদে ট্রেন-এ আসতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।’ সাধনকুমারের মৃত্যুতে আমাদের এই সাক্ষনা যে, সেই মৃত্যু তাঁর নিত্যকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না। সংসারকে তিনি যা দিলেন তার মধ্যেই তিনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। তিনি নিজে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস না ক'রে বাঁচব কি ভাবে? ‘I trust he lives in thee, and there I find him worthier to be loved’—এই আশ্বাসেই আমরা তাঁর শোক ভুলে থাকতে পারি। ‘ব্যাপিয়া সমস্ত বিধে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে বৃহৎ করিয়া’—এই দেখার মধ্য দিয়েই তাঁকে আমরা চিরকাল আমাদের কাছে ধ'রে রাখতে পারি।

গ্রন্থসমালোচনা

সঞ্জয় উবাচ । সঞ্জয় । বিচিত্রা প্রকাশনী ৭ নবীন বুক্‌সেন কলকাতা ৯ । দাম পাঁচ টাকা ।

সঞ্জয়-লিখিত 'সঞ্জয় উবাচ' গ্রন্থটি এক কথায় স্বনামখ্যাত ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর জীবনকথা । আর সে জীবন তৃণশূন্য দেশে বিশাল এক বনস্পতির জীবন । কৃতী ছাত্র, কৃতী চিকিৎসক, কৃতী শিল্পপতি—কার্তিকচন্দ্র সম্পর্কে এ সব খুব বড় কথা নয়, তিনি যে এক মুষ্টি-ধুলো থেকে একটা বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন সেইটাই বড় কথা । বড় কথা, তিনি যেমন বৃহত্তর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনি বৃহত্তর উত্তোগে সে-স্বপ্নকে শুধু রূপায়িত নয়, প্রাণায়িত ক'রে গিয়েছেন । দ্বির সংকল্প, উদীপ্ত উদ্যম, অবিচ্যুত শ্রম ও নিয়মস্থিত নিষ্ঠা—এই চার স্তম্ভের উপর তিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর রম্যগন শিল্পের কর্মমন্দির, যার ভিত্তিতে ছিল তাঁর সুদৃঢ় চরিত্র, চূড়ায় ছিল অনন্তস্পর্শী দেশহিতৈষ্য । সেই পুণ্যকাহিনী সঞ্জয় তাঁর নিপুণ লেখনীতে সরস সুন্দর ক'রে রচনা ক'রে বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন । এ রচনার চেয়ে বেশি, এ এক বহুস্তরাজ্যের স্বারোদ্ঘাটন । এ উপহারের চেয়েও বেশি, এ এক দেশকে, দেশের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার আমন্ত্রণ ।

বিনা চিকিৎসায় মা-কে মরতে দেখে কিশোর কার্তিক প্রতিজ্ঞা করেছিল বড় হয়ে সে ডাক্তার হবে, আর তার জ্ঞাতসারে কাউকে সে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেবে না । কিন্তু গরিব সংসারের ছেলে ডাক্তারি পড়ার মত পরস্রা পাবে কোথায় ? পড়া যায়, যদি কলেজে ফ্রি-শিপ মেলে । আর ফ্রি-শিপ মেলে পরীক্ষায় ফাস্ট হলে । সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদেই কার্তিককে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম হতে হল । চিকিৎসা করতে নেমে গরিবদের কথা তিনি ভোলেন নি কখনো । খ্যাতির শিখর স্পর্শ করেও ফি বাড়ান নি । চিরকাল ঘোড়ার গাড়ি ক'রে কল-এ গিয়েছেন, আর ঘোড়ার গাড়ি পুষেছেন একসঙ্গে অনেকগুলি গরিবের অরসংস্থান হবে বলে । পরিহাস ক'রে বলতেন,—আই আম এ বাজার ডক্টার । কিন্তু রোগীমহলে সর্বত্র এই ডাক্তারের সম্মান রাজার মত । তাই রাজাবাজারে দাঙ্গার সময় যখন তাঁর গাড়ির পা-দানিতে ছোরা-হাতে গুণ্ডা লাফিয়ে উঠেছিল তখন তার বাপ হাত চেপে ধরে বাধা দিয়ে বললে,—কাকে খুন করতে চাস, ওয়ে ডাগদার সাব, যিনি তোর আত্মজানের জান বাঁচিয়েছিলেন ।

দুঃস্থ-দরিদ্র দেখলে এ ডাক্তার শুধু বিনা-ফি-এই দেখেন না, নিজের পকেট থেকে ওষুধ পথ্যেরও ব্যবস্থা করেন । ওষুধ রোগ নির্গয়ে কি হবে যদি নিরাকরণের ওষুধ না থাকে ? ওষুধের জগ্রে বিদেশের স্বারস্ব হয়ে থাকলে রোগ গেলেও রোগী বাঁচবে না । সুতরাং দেশেই ওষুধ উৎপাদন করতে হবে । দেশীয় গাছ-গাছড়ায় আধুনিক পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরি করতে পারলেই রোগী বাঁচবে, দেশ বাঁচবে । উৎপাদনের এই বিরাট কর্মযজ্ঞে কার্তিকচন্দ্র তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন—পি-সি'র সঙ্গে কে-সি এসে জুটল ।

'অনেকগুলি দোকান থেকে অর্ডার এসে পড়েছে । সারাদিনের চেণ্টায় মাল তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু বোতলে ভরা এবং লেবেল লাগানো এবং প্যাক করা বাকি । বিকালে ডক্টর রায় কলেজ থেকে ফিরেছেন । দুই বন্ধুতে লেগে গেলেন ওষুধ ভর্তি ক'রে লেবেল লাগাতে । আকাশে অঝোর ধারে বৃষ্টি নেমেছে । বাড়িটির ছাদ ফাটা ছিল । ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে মেঝেতে । উঁচু টেবিলের উপর বোতল শিশি রেখে সেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন দুই বন্ধু—একজন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ডক্টর পি. সি. রায় আর একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় গোল্ড মেডালিস্ট ডাক্তার কে. সি. বোস ।'

এইভাবে ধীরে ধীরে কারখানার পত্তন হল—জোয়ানের আরক আর বাসব সিরাপ থেকে বেঙ্গল

কেমিক্যাল আর অশোক কডিয়েল, নানালা, টাইকো সোডা ট্যাবলেট-থেকে ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরী। পরাধীন দেশকে শিল্প-সম্পদে সর্বতোভাবে স্বাধীন করতে হবে। তার জন্তে চাই দেশী ভেষজ সম্পর্কে গবেষণা। চাই ওষুধ তৈরির যাবতীয় যত্নপাতি। চাই সেই যন্ত্র নির্মাণের কারখানা। স্বাবলম্বনই কাস্তিকচন্দ্রের একমাত্র তপস্কা—তার লক্ষ্য ও স্বাবলম্বন, মন্ত্র ও স্বাবলম্বন।

কি মনোরম ক'রে জীবনকাহিনীটি লিখেছেন সত্ত্বয়। তাঁর বর্ণনার ভঙ্গিটি শিল্পহুমায় কাস্তিময়। কত ছোটবড় ঘটনার কি নিখুঁত ক'রে হৃদয়বান বীরতপস্বীর ছবি এঁকেছেন। বীর্য ও সৌন্দর্যই দেব-সেনাপতি কাস্তিকের বৈশিষ্ট্য—কে. সি. বি.-র চরিত্রেও সেই বীর্য আর সৌন্দর্যই প্রতিকলিত। এই আবিষ্কার সত্ত্বয়ের লেখনীতে কত যত্নে কত রসে-রূপে চিত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আরো কত মহামনীষীর কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রাজশেখর বসু। গিরীন্দ্রশেখর বসু, বিধানচন্দ্র রায়, এম. কে. গান্ধী ও ধরা পড়েছেন।

ধনস্বরী ও ধননায়ক হয়েও কাস্তিকচন্দ্র যে মানুষ হিসাবে সকল হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। সকলের হিতেই যে তিনি প্রেরিত-প্রবৃত্ত, এই মহৎ পরিচয়টুকু রচনাকেও মহৎ করেছে।

‘সহজ হয়ে সব দিবি তো সহজ হয়ে সকল লবি।’—কাস্তিকচন্দ্রের জীবনও তেমনি সহজ ছিল। আর সত্ত্বয়-ও সেই সহজের জাদুকর।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শিল্পদর্শন ও সাহিত্যসমালোচনা। সাধনকুমার ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা ২। মূল্য পাঁচ টাকা।
অধ্যাপক সুধীরকুমার দাসগুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতামালার অন্ততম উজ্জ্বল মণি এই আলোচ্য গ্রন্থখানি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ডক্টর ভট্টাচার্য এই বক্তৃতাগুলি দেন ১৯৬৭ সালে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর দাসগুপ্ত রসবাদের অব্যাপ্তি পর্যালোচনা করিয়া রম্যার্থবাদের ভিত্তির উপরে যে কাব্যতত্ত্ব নির্মাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াও তাঁহার আলোচিত বিষয়সমূহেরই পর্যালোচনা করিয়াছেন গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থটিতে। শিল্পতত্ত্ব ও শিল্পসমালোচনার মূল তত্ত্বগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ডক্টর ভট্টাচার্য যে সুনিপুণ বিশ্লেষণচর্চা-আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা গভীর ভাবে প্রশংসনীয়। শিল্পতত্ত্বের কয়েকটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যসমালোচনার সূত্র অবলম্বন করিয়া শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন গ্রন্থকার। সমালোচনা হইতেছে শিল্পের মূল্যবিচার, তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার; শিল্পমূল্যের স্বরূপ কি, শিল্পের মধ্যে মানুষ তার কোন মূল্যচেতনাকে প্রকাশ করিতে চাহে। কোন মূল্যের উপলব্ধি হওয়ার শিল্পসম্বোধে মানুষ আনন্দ পায়। এ সবই হইল শিল্পতত্ত্বের মৌল প্রশ্ন। এই যে শিল্পানন্দ, ইহাই শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি না? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এই আনন্দের স্বরূপ কি? ইহা কি ব্রহ্মানন্দসহোদর? এই রূপ অসংখ্য দুরূহ প্রশ্ন শিল্পসমালোচনা তথা সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উপস্থিত হয়। ভরতমুনি, প্রেতো, অরিস্তভল হইতে আরম্ভ করিয়া কনসিয়ের, সান্ত্রো, র'মা র'লা ও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অসংখ্য প্রতিভাধর মানুষ শিল্পস্বরূপের সার্থক আলোচনা করিয়াছেন বটে, তবুও কিন্তু যুগপ্রযুক্ত সমস্যাগুলির সমাধান হয় নাই। তাই যখন আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকারকে এই সব অতিপুরাতন সমস্যাগুলির আলোচনা করিতে দেখি, তখনই ভালোই লাগে। চর্চিতচর্চণের অপ্রসাদ এই আলোচনাকে কোথাও অচিন্ত্যকরী করিয়া তোলে নাই।

ডক্টর ভট্টাচার্য বিভিন্ন শিল্প মতবাদকে কয়েকটি মৌল ধারণার ভিত্তিতে পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্ত

করিয়া আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। তাহারা হইল, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকাশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, অতীতগাহুভূতিবাদ এবং জৈবিক ঐক্য বা সমন্বিত ক্ষেত্র নির্মাণবাদ। শিল্পে বাস্তববাদী দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে অমুকরণবাদ, সংস্কৃতবাদ ও সত্য প্রকাশবাদ সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থকারের সুধীর দাশগুপ্ত স্মৃতিবক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতার উপজীব্য। এই বক্তার উপসংহারে বাস্তববাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন ক'রে গ্রন্থকার বলেন—‘সংগীত স্থাপত্য এবং অলংকৃত বিমূর্ত চিত্র ও ভাস্কর্যগুলি নিজেদের ছাড়া আর কোনো কিছুকেই উপস্থাপিত করে না অথচ সেগুলি শিল্প নামেই পরিচিত, ইহা হইল শিল্পে বাস্তববাদ গ্রহণের প্রধান অন্তরায়’। তাই গ্রন্থকার দ্বিতীয় পর্বে শিল্পতত্ত্বে আবেগবাদী ও আনন্দবাদী মতগুলির পর্যালোচনা করিয়াছেন। শিল্পের সঙ্গে আবেগের ও আনন্দের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিল্পের জগৎ যাহুয়ের আবেগাহুভূতির অভিব্যক্তি, শিল্পের উপাদান ও রূপৈশ্বর্য মানবাত্মার আনন্দময় কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। তাই শিল্পানন্দ হইল উপযোগ সম্পর্কবিহীন। ইহা একদিকে যেমন স্রষ্টা সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে লাভ করিয়া থাকেন, অন্যদিকে আবার সহৃদয় হৃদয়সংবাদী শিল্পবস্তুর অমুখ্যান করিয়া অমুরূপ আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ মহোদর। ইহা পরম আনন্দের দোসর। আবেগমূলক প্রকাশই হইল এই আনন্দের বাহন। তৃতীয় পর্বে শিল্পতত্ত্বে কল্পনাবাদ ও অবস্থ-বস্তুকিঞ্চিদবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। এই ধরনের মতবাদীরা আত্মাকে বা চৈতন্যকে পারমাণবিক সত্তারূপে গ্রহণ করে এবং বস্তুজগতকে চৈতন্যের পরিণাম অথবা চৈতন্য সত্তার সমান্তরাল বলিয়া কল্পনা করেন। এ'রা সম্পূর্ণরূপে বস্তু বা বাস্তববাদের বিরোধী মত পোষণ করেন। বিস্তৃত কল্পনাবাদ এবং অপূর্ববস্তুবাদ বা অবস্থ-বস্তুকিঞ্চিদবাদ উপরোক্ত ভাববাদী ধারণার স্বাভাবিক পরিণতি। মন কল্পনার আশ্রয়ে রূপ সৃষ্টি করিতে পারে এবং এমন কি বিস্তৃতরূপেরও ধ্যান করিতে পারে। শেষ পর্বে ‘সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনা’ শীর্ষক অধ্যায়ের মূখবন্ধে গ্রন্থকার যে অমুকরণবাদ, সংকেতবাদ, প্রকাশবাদ, সত্যবিষয়-বস্তুবাদ, শিল্পে আবেগবাদ, কল্পনাবাদ, প্রতিভানবাদ, অপূর্ব বস্তুনির্মাণবাদের বা কনফিগারেশনবাদের আলোচনা করিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখপূর্বক বলিতেছেন যে, কিভাবে এই সব মতবাদের পর্যালোচনা সাহিত্যসমালোচনার বিষয়ে উপযোগী হইয়া উঠিবে তাহাই এই শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যশিল্পের মাধ্যমের এবং উপাদানের বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যে বিমূর্ত উপাদান বিস্তার কৌশলের অর্থোক্তিকতা ও নিরপেক্ষরূপবাদী সমালোচনার তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

পুস্তকখানি জিজ্ঞাসু পাঠকপাঠিকার পক্ষে একান্ত সহায়ক। ইহা হইল নন্দনতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করিয়া সৃষ্টির অন্ততলোকে গোমুখীধারায় স্নানপান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে চাহেন, তাহারা এই পুস্তকটিকে মূল্যবান বলিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করিবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

সুধীরকুমার নন্দী

সরস সার কথা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পাদনা কুমারেশ বোষ। প্রথম ৮৫ কলেজ স্ট্রিট বার্কট কলকাতা ১২।
মূল্য একত্রে দশ টাকা।

আড়তার অভিধান। সম্পাদনা কুমারেশ বোষ। প্রথম ৮৫ কলেজ স্ট্রিট বার্কট কলকাতা ১২।

এক ধরনের বই আছে যা না দেখা পর্যন্ত তার প্রয়োজনীয়তার কথা সচরাচর আমরা ভুলে থাকি, কিন্তু

একবার হাতে পেলেই এতদিনের অভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। প্রখ্যাত ব্যঙ্গরসিক শ্রীযুক্ত কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত দুটি গ্রন্থই এই শ্রেণীর—যা না পেয়েও আমরা এতকাল তেমন অস্ববিধা বোধ করি নি (এবং করি নি বলেই এ জাতীয় বইয়ের কথা ভাবিও নি), কিন্তু পাবার পর হাতছাড়া করা কঠিন। একটি নতুন পথের পথিকৃতের স্বীকৃতি সম্পাদকের প্রাপ্য।

এই দু'টির বিষয়বস্তু নামের দ্বারাই স্ব-ব্যাখ্যাত। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব থেকে রবীন্দ্র-যুগ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' লেখকের রচনা অবলম্বনে রঙ্গব্যঙ্গমূলক উদ্ধৃতিসম্ভার—উদ্ধৃতিগুলি যুগপৎ সরস ও সারগর্ভ। সংক্ষিপ্তকার উদ্ধৃতিগুলি লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হবার যোগ্যতা রাখে। লেখকদের জীবনদৃষ্টি, সমাজচেতনা ও বিশিষ্ট মেজাজের পরিচিতি রূপেও এ-সব উদ্ধৃতি সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে মূল্যবান।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব। দুঃসাহসিকও বটে। রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, কেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বকুমার রায়, পরশুরাম, তারাপ্রসাদ, বনমাল, সৈয়দ মুজতবা আলী, বিমল কর, সমরেশ বসু ও গৌরকিশোর ঘোষের রচনা থেকে 'আজ্ঞা-চল' শব্দ সংযোজন করায় গ্রন্থটির মূল্য বেড়েছে, ইতিমধ্যে এ অভিধানের অনেক শব্দই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে গৃহীত হয়ে গেছে, ক্রমে ক্রমে আরও হবে। সেজন্য প্রচারের প্রয়োজন। সমালোচ্য গ্রন্থটির এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে একটি ভূমিকা থাকবে। সাধারণ শব্দের ম্যায় এই শ্রেণীর শব্দের ক্ষেত্রেও অর্থ-সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে। কোনো কোনো অঙ্গুল বা চলিত কথা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে বেশ কোতূহলোদ্দীপক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। সম্পাদক 'কেলানো' শব্দের অর্থ দিয়েছেন 'পেটানো' (পৃ: ৭৪), কিন্তু শব্দটি প্রকাশ, প্রচার বা বের করা জাতীয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 'দাঁত কেলানো' বললে 'দাঁত বের করা' এই অর্থ বোঝায়। সম্পাদক 'গাবিয়ে বেড়ানোর' অর্থ বলেছেন 'প্রচার করে বেড়ানো' (পৃ: ৭৫), কিন্তু ভিন্ন অর্থে এর প্রয়োগ অনেকেরই জানা আছে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোকে নিন্দা বা তিরস্কারের মনোভাব থেকে 'গাবিয়ে বেড়ানো' বলা হয়। লোকমুখে সৃষ্ট এবং লোকব্যবহারে প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে এরূপ অর্থের পার্থক্য অস্বাভাবিক নয়। এইসব শব্দের উৎপত্তি ও অর্থের ব্যাখ্যার সাহায্যে সমাজমানসের বিবর্তনের ধারাটি পাওয়া যায়। লোকজীবন ও লোকমানস আলোচনায় তাই এ গ্রন্থটি স্বীকৃতি পাবে।

বিষয়বস্তুর আকৃতির দরুণ প্রথম গ্রন্থটিকে নিখুঁত করা কঠিন এবং প্রকৃতির দরুণ দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ করা কার্যত অসম্ভব। সম্পাদক সে দাবিও করেন নি। তিনি প্রাথমিক ভিত্তিটি রচনা করে দিয়েছেন এবং সে ভিত্তি দুর্বল নয়—একে পূর্ণতর ও উন্নততর করার কাজটি অতঃপর সহজসাধ্য হবে।

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

উদ্বাস্ত। হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা ১। দাম দশ টাকা।

'উদ্বাস্ত' শব্দটি মনে পড়লে এবং তা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক মর্মপীড়া বোধ হয় যা ভাষার রূপ দিতে পারি না। অথচ নানা দেশেই আজ এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা এমন এক একটি অঙ্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যা সেই সব রাষ্ট্রের কাছে কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। তবু আমাদের দেশের উদ্বাস্তদের

দুঃখ-দুর্দশার কোনো তুলনা নেই। এমন কি উদ্বাস্ত পাঞ্জাবীদের পুনর্বাসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে, তার সঙ্গে তুলনা করতে গেলেও বাঙালী উদ্বাস্তদের দুর্দশায় শুধু দুঃখই পেতে হয়।

উনিশ শ পঞ্চাশে 'ছেড়ে আসা গ্রাম'এর কাহিনী সংগ্রহ করতে গিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে ও বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রিত বাস্তুহারা মানুষদের চোখে যে জল দেখেছি পশ্চিম জার্মানীর আশ্রয় শিবিরে গিয়ে তেমন বেদনাদায়ক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয় নি আমাকে। নিজের গ্রামের স্মৃতিচারণ করতে করতে এক একজন উদ্বাস্ত যখন কঁদতে কঁদতে বলতেন—'গরীবই হই আর যাই হই, নিজের ঘরে নিরাপদেই তো ছিলাম এবং যে ভাবেই হোক দু'বেলা দু'মুঠা শাক-ডাত জুটতোই। কিন্তু এ কি হ'ল, কি অপরাধ আমাদের?' তখন আমিও চোখের জল রোধ করতে পারি নি। আমিও যে 'ছেড়ে আসা গ্রাম'এরই মানুষ!

পূর্ববাংলার অতি নগণ্য সংখ্যক বাস্তুহারাই ভারতখণ্ডে এসে যথার্থরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। অধিকাংশই আজো প্রায় নিরাশ্রয় এবং বহু কষ্টে দিনাতিপাত ক'রে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গেই হোক বা অন্য রাজ্যে অথবা দণ্ডকারণ্যে কিংবা আন্দামানে সরকারী পুনর্বাসন ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ত বাঙালী খুব শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দ্যের মধ্যে আছেন তেমন খবর বেশি পাওয়া যায় নি এবং বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্ত শিবির দেখতে গিয়ে কোথাও তেমন সুখী পরিবেশও দেখতে পাই নি। যেখানেই গিয়েছি সেখানেই সর্বহারা এই সব মানুষের নানা দুঃখের কাহিনী ও শত অভাব-অভিযোগের কথাই শুনেতে হয়েছে।

দুর্গত উদ্বাস্তদের দুঃখ-বেদনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে, প্রবন্ধও অনেক লেখা হয়েছে। ভ্রষ্ট রাজনীতির পাপাচারের ফলে যে দেশ বিভাগ তারই ভয়াবহ পরিণতি এই অসংখ্য মানুষের এই অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। জাতীয় সাহিত্যে সেই দুর্ভোগ ও জীবনযন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটবেই। সে বেদনা এপার বাংলা ওপার বাংলার কবি-কথাসিল্পীদের লেখনীতে স্বাভাবিক ভাবেই রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে কখনো তা যথেষ্ট বলে মনে হয় নি।

মানুষেরই ভুলের বা পাপের প্রারম্ভিক হিসেবে একই সঙ্গে যখন বহু মানুষের সর্বনাশ ঘটে তার একটা আত্মপূর্বিক রেকর্ড তৈরি থাকে দরকার এবং সে রেকর্ড দেয়ালে তুলে রাখার অন্তে নয়, হাতে হাতে তা তুলে দেওয়া প্রয়োজন—ভবিষ্যতে মানুষ যাতে এমন ভুল না করে, স্বার্থান্বেষিতার খেয়ালে এমন পাপের পথে আর যেন না পা বাড়ায়।

এমনিভাবে আমি যখন চিন্তা করছিলাম, পত্র-পত্রিকার পাতায় একটি বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়লো যা দেখে আমার মনে হ'ল, তেমনি একটি রেকর্ডই আমরা পেতে চলেছি। অবশ্যই মনে হয়েছে তেমনি রেকর্ড রচনার যোগ্যতা শুধুমাত্র শ্রীহরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে পশ্চিম বাঙলায় আর কার বেশি থাকতে পারে? প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে দেশ বিভাগের সময় থেকে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁকে যে উদ্বাস্ত-স্রোত (যার অবসান আজো ঘটে নি) লক্ষ্য করতে হয়েছে এবং সেই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর পুনর্বাসনে সরকারী প্রয়াসের ব্যর্থতা ও সাফল্যের যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন নিঃসন্দেহে তা অতুলনীয়। এ বিষয়ে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেই জানা যায়—'সেই একান্ত দুর্দশার দিনে প্রশাসনিক কর্মচারী হিসাবে আমি পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্ত সমস্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে আমি দীর্ঘকাল উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের বিভাগীয় সচিব এবং মহাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলাম। সেই সময়ে আমি এক অনন্ত সাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম যা কোনো বিশেষ মানুষের

ভাগো কথাচিং ঘটে। অগণিত মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার সঙ্গে সহকর্মীদের নিয়ে যে অবিরাম যুদ্ধ চলেছিল তা যেমন একদিকে একান্ত দুঃখময়, তেমনি অপরদিকে আত্মসেবায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্তে নানাক্ষেত্রে সমৃদ্ধ।

এ প্রসঙ্গেই শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় এমন কিছু কথা বলেছেন যেখানে আমার পূর্ববর্ণিত মত অনেকখানি প্রতিকলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—‘পশ্চিম বাংলার ইতিহাসের সেই একান্ত করুণ অথচ রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের ইতিহাস ভবিষ্যতে কোনোদিন লিপিবদ্ধ হবে কি না জানি না। সরকারী দপ্তরে তার যে প্রমাণপত্র আছে তা হয়ত একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায় সম্বন্ধে বিবরণ উত্তরকালের জন্তে রক্ষিত হওয়া উচিত—এই রকম একটা বোধ অনেকের মনে জেগেছে।’ আমিও তেমনি একটি রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাই বলছিলাম।

কিন্তু শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উদ্ধাস্ত’ গ্রন্থখানি তাই বলে নিছক একটি নিরস রেকর্ডমাত্র নয়, মানুষের বেদনার সাহিত্যিকস্বলভ সহানুভূতিশীলতার এবং ইতিহাসপ্রিয়তার একটি মূল্যবান দলিল, দরদী ভাষায় যে দলিল রচনার জন্তে বাঙালী মাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

গ্রন্থের শুরু থেকেই লেখক একজন দক্ষ কথাশিল্পীর মতো ভাষায় দেশ বিভাগের বিবরণ দিয়ে চলেছেন। তিনি লিখেছেন—‘আমি তখন অবিভক্ত বাংলা সরকারের জেলা জজের কাজে নিযুক্ত। উত্তর-বঙ্গের দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং এই তিনটি জেলা জুড়ে আমার জজিয়তি। জজের অপিস অবস্থিত দিনাজপুর শহরে, কিন্তু তাঁকে পালা ক’রে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংএ কোর্ট ক’রে আসতে হ’ত।’

কিন্তু দেশ বিভাগের ঘোষণায় দিনাজপুর যখন পাকিস্তানে চলে যাবে স্থির হ’ল তখন দেশ বিভাগের কারণে বিষন্ন অথচ স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে উজ্জ্বল সেই ১৫ই আগষ্ট দিনটির আগেই বিচক্ষণ আই-সি-এস জজ এমনভাবে জলপাইগুড়িতে তাঁর কাজ ফেললেন যাতে ১০ তারিখেই তাঁকে দিনাজপুর থেকে বিদায় নিয়ে আসতে হ’ল। সেই বিদায় মুহূর্তের বর্ণনাকে অপূর্ব একটি ছোট গল্পের ভাষা বলেই আমার মনে হয়েছে। সে সময়ের বিবরণে গ্রন্থকার লিখেছেন—‘হঠাৎ গাড়ির ঘণ্টা বাজল, সঙ্গে গার্ডের হুইস্‌ল শ্রবিত হ’ল! তাই শুনে মন একটু বিচলিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা করুণ আত্ননাদ সেই শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে স্টেশনের প্র্যাটফর্মে ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেখি আমারই এক আদালি গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুকে করাঘাত ক’রে কাঁদছে আর বলছে—হায়, আমার সাহেব চলে গেল, আর আসবে না। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না সায়েব। এ দুখ-খু কোথায় রাখব?’ কি মর্মস্পর্শী!

ঐ আদালির বিষয়ে লেখক শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন—‘আমার সে আদালি ছিল জাতিতে মুসলমান। আমাকে সে ভালোবেসেছিল। দিনাজপুর তার স্বদেশ। তা হতে চলেছে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তার এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে দিতে হচ্ছে। এ ছাড়াছাড়ি রীতিমত ছাড়াছাড়ি। এ শুধু বিচ্ছেদ নয়, আপন মানুষকে পর ক’রে দেওয়া। আমার সেই সরল হৃদয় সহকর্মী বন্ধু লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ হলেও এই দারুণ সত্যটি রীতিমত হৃদয়ঙ্গম করেছিল। তাই সে এমন ক’রে কান্নায় ভেঙে পড়ল।’ কিন্তু তিনি নিজেকে কি করলেন। ‘আমি আর কি করব!’ লিখেছেন গ্রন্থকার। ‘হাত দুটো জড়িয়ে ধ’রে ‘কৈদো না ভাই’ বলে বৃথা সাঙ্ঘনা দেবার চেষ্টা করলাম।—বৃথা সাঙ্ঘনা বৈকি। মন তো কোনো রাজনৈতিক সীমানা মানে না, মনের কাছে হিন্দু-মুসলমান

গ্রন্থমালোচনা

বা বিধান-অবিধানের তো কোনো প্রশ্ন নেই! কাজেই দেশবিভাগ হলেও মানুষের মনের ঐক্যস্থত্র যাবে কোথায়?

এমনি এক একটি ঘটনার ও কাহিনীর বর্ণনায় গ্রন্থকার তাঁর আপন মনের সমুদ্র-মগ্নন ক'রে ভাষার যে অমৃত পরিবেশন করেছেন সমস্ত পাঠককেই তা মুগ্ধ করবে।

প্রায় সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার এ বইতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্ত পুনর্বাসন দপ্তরে তাঁর কর্মকালের নানা বিবরণ যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের এবং নেতৃবর্গের ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মনোভাবও অসঙ্কোচে অথচ সরল প্রকাশপূর্ণ ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিশিষ্টে যে সংখ্যাতর পরিবেশিত হয়েছে তাতে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্ত সংক্রান্ত অনেক তথ্যই পাওয়া যায়।

কিন্তু গ্রন্থের উপসংহারে লেখক উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা যেমনি আন্তরিকতা ও সহানুভূতিশীলতার পরিচায়ক তেমনি যুক্তিপূর্ণ। দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে বা অন্য কোথাও উদ্বাস্ত বাঙালীর পুনর্বাসনে তাঁর আস্থা নেই। তেমন সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে বলে এই বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লেখকের ধারণা। তিনি বলেছেন—‘নিজের নৈতিক কর্তব্যকে স্বীকার ক'রে নিজে পশ্চিমবঙ্গে এদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে অবস্থা ভিন্ন রকম হতে পারত। এই সহস্র পরিবারগুলি প্রয়োজনীয় সাহায্য পেলে স্বাবলম্বী হতে পারত। দায় না হয়ে তারা দেশের সম্পদ হতে পারত। দণ্ডকারণ্যে তাদের পুনর্বাসনের জন্ত যে বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রয়োগ করা হয়েছে তা পশ্চিম বাংলায় খরচ হলে তার অর্থনীতিকে বলবান ক'রে তুলত।’

গ্রন্থকার আরো বলেছেন—‘এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তার জায়গা কোথায়। জায়গা পশ্চিম বাংলাতেই আছে। চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ জুড়ে যে সুন্দরবন আছে, তার পরিমাণ ১৫০০ বর্গ মাইল। একশত বর্গ মাইলে ৬০,০০০ একরের ওপর জমি পাওয়া যায়। তাতে অনারাসে ২০,০০০ উদ্বাস্ত পরিবারকে বসানো যায়। তার পর এই প্রাথমিক উৎপাদকদের ভিত্তি ক'রে শিক্ষক, দোকানদার, ছুতোয়, কুমার, কামার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষও আরও শতকরা দশভাগ বসানো যায়। সুতরাং এইভাবে পুনর্বাসন দেবার সঙ্গতি যে পশ্চিম বাংলার নেই তা নয়। কথা উঠতে পারে সুন্দরবনে জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে কি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব? তা সম্ভব কি না তার উত্তর হেড়োভাঙার উদ্বাস্ত পরিবারগুলির নিকট হতে পাওয়া যাবে। এখানে দণ্ডকারণ্য হতে অনেক সহজ পথে পুনর্বাসন সম্ভব। আর এ কথা নিশ্চিত যে এখানে যারা পুনর্বাসন পাবে তারা উপনিবেশ ত্যাগ ক'রে চলে আসতে চাইবে না।’—এ অভিযত অনেকেরই যে সমর্থন পাবে তা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। ‘উদ্বাস্ত’ গ্রন্থের কোথাও কোথাও পুনরুজ্জীবা বা মুদ্রণ-প্রমাদে মতো ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ একান্তই নিম্নপ্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রণ-পারিপাট্য ও বহিঃস্থ সজ্জায়ও বইখানি প্রশংসার দাবি রাখে।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হল। বর্তমান বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত চিত্রপ্রদর্শনীর আরোদঘাটন উৎসবের ভাষণটি বিশিষ্ট বক্তার শিল্পচৈতন্যের মৌলবক্তব্য বহুল তাই শিল্প প্রসঙ্গের আলোচনাটি প্রকাশিত করার সুযোগ-পাওয়ায় শিল্পসাহিত্যবসিক-পাঠক প্রবীণ কথাসাহিত্যিকের চিত্রচর্চার বিচরণকথাও পাঠ করতে পারলেন। বিশিষ্ট নাট্যকলা-বসিক কথাসাহিত্যিকের 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র' প্রসঙ্গের আলোচনাটিও আলোচ্য সংখ্যায় স্থাপিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অপর প্রবীণ সাহিত্যিকও এবার গ্রন্থসমালোচনা ক'রে বিশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তিনি একাধারে কবি-কথাসিল্পী ও জীবনীকার তাই তাঁর ভাষায় জীবনকাহিনী-গ্রন্থের আলোচনা মূল্যবান। অপর গ্রন্থসমালোচক যিনি কবি-কথাসিল্পী পরন্তু কর্মসূত্রে সাংবাদিক ও অধ্যাপক, সেহেতু বঙ্গভঙ্গুর ফলে উদ্বাস্তজীবনের কথা বহুভাবে দেখেছেন, তাই তাঁর লেখনীতেই আলোচিত হ'ল উক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থটির বিবরণ।

বর্তমান সংখ্যায় বঙ্গের দুজন বিশিষ্ট সন্তানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। দেশবন্ধুর জন্মশতবর্ষ দিবস ছিল পাঁচুই ও বলেজ্জনাথ ঠাকুরের ছয়ুই নভেম্বর। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে বলেজ্জনাথ স্বল্পায়ু জীবনে আর্ষসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির সংযোগ প্রচেষ্টায় বা শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়নে অথবা বাণিজ্যিক উদ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদান রাখলেও বাংলা গল্পসাহিত্যেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রেখে গিয়েছেন। গান্ধী জন্মশতবর্ষ-পূর্তিনয়নে আলোচ্য সংখ্যায় তাঁর অহিংস বোধিতে বৌদ্ধ-প্রভাব প্রসঙ্গের একটি আলোচনা প্রকাশ ক'রে তাঁরও পুণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা হ'ল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের সার্থশত বর্ষ চলছে, তাই বর্তমান সংখ্যায় তাঁর 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকটি পাঠকমহলে উপস্থাপিত হয়েছে।

'রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রসঙ্গের গভীর দর্শনতাত্ত্বিক প্রবন্ধটির সূচনাভাগ প্রকাশিত হ'ল, বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় স্থাপিত হবে। 'রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা'—এই প্রবন্ধটি গত দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সূচনা হয়েছে, আসন্ন প্রকাশিত সংখ্যাগুলিতেও স্থাপিত হবে।

'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি বিশ্বভারতীর অবগতিক্রমে প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুকদিনের সাদী' চিত্রটি 'রবীন্দ্রভারতী-সমিতি'র সৌজন্যে মুদ্রিত।



রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

সম্পাদক
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

অষ্টম বর্ষ

মাঘ ১৩৭৬—শেষ ১৩৭৭
জানুয়ারী—ডিসেম্বর ১৯৭০

বর্ষসূচী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	গ্রন্থসমালোচনা	৩৮৫
অজিতকুমার ঘোষ	রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি	১৭৬
	গ্রন্থসমালোচনা	২৮৫
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্বরণে	৩৭৮
	জ্যেবুনেসা (দ্বিবর্ণচিত্র)	১
আশুতোষ ভট্টাচার্য	মুকুন্দিনের মাদী (চিত্র)	২২১
উমা রায়	রবীন্দ্রনাথ ও বাউলসাধনা	১১৭
	রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা	১৩৪
	গ্রন্থসমালোচনা	২৮৭
ক্ষেত্র গুপ্ত	গ্রন্থসমালোচনা	২৪, ১২১
	বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী	২৪২
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আশ্চর্য-প্রদীপ (দ্বিবর্ণ চিত্র)	১২৫
তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিল্পপ্রসঙ্গে	২২২
দক্ষিণারঞ্জন বসু	গ্রন্থসমালোচনা	৩৮৮
দীপককুমার বড়ুয়া	গান্ধী-চেতনায় বুক ও বৌদ্ধসংস্কৃতি	৩৪১
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	সাহিত্যে স্টাইল	২৭৪
ধীরেন্দ্র দেবনাথ	গ্রন্থসমালোচনা	২৮৬, ৩৮৭

নরেশচন্দ্র জানা

হালকবি সংকলিত 'গাহাসঙ্কসর্গ' ও বৈষ্ণবপদাবলী ২৪
ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিজ্ঞানাগরের
'সীতার বনবাস' ৩৬১

নারায়ণ চৌধুরী

গান্ধীজী ও অহিংসা ৭৮

নিমাইচাঁদ বড়াল

ভারতীয় সংগীতের রস ৮৬

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

অমৃত্যুর আর বিসর্গের কথা ২১

পীযুষকান্তি মহাপাত্র

গ্রন্থসমালোচনা ১৮৮

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৫৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র ১, ২২, ১২৫, ২২১

স্বপ্রতিকৃতি (ত্রিবিধ চিত্র) ২২

রমা চৌধুরী

সৃষ্টিতত্ত্বের আবোধাতা ২

ভাস্করের ঔপাধিক ভেদাভেদ ২১৬

রামানুজের বিশিষ্টাষ্টভৈতবাদ ৩১৭

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

গ্রন্থসমালোচনা ২৫, ২৮২

শিবপদ চক্রবর্তী

রাসেলের নৈতিকচিন্তা ২৫২

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ২২৫

সম্পাদকীয়

২৮, ১২৪, ২২০, ৩২২

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরসুহরীদের গবেষণা ১৬০

সুকুমার সেন

বাংলা গল্পের আদি কথা ও অক্ষয়-ঈশ্বর ২৬৪

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বারটো ও রাসেলের জীবন ও দর্শন ৬৫

গ্রন্থসমালোচনা ১৮৫

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৩০৬

সুধীরকুমার মন্ডল

গ্রন্থসমালোচনা ৩৮৬

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা ১০০

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ১২৬

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ১২৬

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ১২৫, ২৩৩, ৩৩৩

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী

ঈশ্বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের তথা বাংলার নবজাগণের ইতিহাসের অন্যতম বিশিষ্ট মনোবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত বহু নতুন তথ্য সম্বলিত কর্মধারার বিবরণবিধৃত গ্রন্থ। তাঁরই বংশের উদ্ভূতপুরুষের দীর্ঘকালপূর্বে লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থাকারে জীবনীটি প্রকাশিত হল।

দাম সাড়ে পঁচ টাকা

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যে ও চিত্রে যে শিল্পতাত্ত্বিক অবদান ও অনুভূতি, যে নান্দনিক ব্যাখ্যা ও বোধি শাস্ত্রত মর্যাদায় প্রকাশিত তারই সহজ সুন্দর রসবিচার। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ঐস্থৈটিক চিন্তার সামগ্রিক আলোচনা।

দাম আট টাকা

RABINDRABHARATI JOURNAL

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপকবৃন্দের মৌলিক প্রবন্ধ ও রবীন্দ্র-কবিতার ইংরাজি অনুবাদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বার্ষিক ইংরাজি সংকলনে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে ১ম খণ্ড, ১৯৬৯ সালে ২য় খণ্ড এবং ১৯৭০ সালে ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতি খণ্ডের মূল্য দু'টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়



লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
মুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে



শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচি পরিচায়ক